মন্মথ রায়

নাট্য গ্রন্থাবলী

চতুর্থ খণ্ড

পূর্ণাঙ্গ

(দ্বিতীয় পর্ব)

॥ মনমথন প্রকাশন ॥
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

Anthology of Plays by Manmatha Ray

॥ মনমথন ॥
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৭০০০০৬

মন্মথ রায় নাট্য-গ্রন্থাবলী—চতুর্থ খণ্ড
প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮

প্রচ্ছদপট : বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক : দেব প্রিণ্টার্স
৭এ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

শ্রীশ্রী মা

[শ্রীশ্রী সারদা রামকৃষ্ণ-লীলা নাটক]

সারদা রামকৃষ্ণায় নমঃ

প্রণত

মন্মথ রায়

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগত জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট গোষ্ঠিগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

প্রবেশানুক্রমিক পরিচয়লিপি

১ সারদামণি (শ্রীশ্রী মা)
২ অম্বিকা (চৌকিদার)
৩ শ্যামাসুন্দরী (সারদামণির মাতাঠাকুরাণী)
৪ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সারদামণির পিতাঠাকুর)
৫ ভানুদাসী (গ্রামসুবাদে সারদামণির বিধবা পিসি)
৬ রামকৃষ্ণ
৭ দীনু (দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ)
৮ হৃদয় (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয়)
৯ চন্দ্রমণি (শ্রীরামকৃষ্ণের জননী)
১০ ভিখারী
১১ ডাঃ সরকার (মহেন্দ্র সরকার)
১২ নরেন্দ্র
১৩ গিরিশ
১৪ বাবুরাম
১৫ লেটো
১৬ নিরঞ্জন
১৭ রাখাল
১৮ মাষ্টার (ভক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত—শ্রীম)
১৯. লক্ষ্মী (শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিতা কন্যা)
২০। গোপাল মা

ভারতবর্ষ পত্রিকাতে বঙ্গাব্দ ১৩৬২ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যাত্রয়ে প্রথম প্রকাশ এবং কলিকাতা মিনার্ভা থিয়েটারে নটশ্রী কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ও পরিচালনায় সমৃদ্ধ প্রথম প্রযোজনা।

॥ শ্রীশ্রী মা ॥

প্রথম দৃশ্য

[১২৭৮, চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ। জয়রামবাটী। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহ প্রাঙ্গণ। সকালবেলা। এক আঁটি দল-ঘাস কাঁধে লইয়া বাহির হইতে সারদা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নেপথ্যে গ্রামের অম্বিকা চৌকিদারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

অম্বিকা। (নেপথ্যে) মুখুজ্যেমশাই বাড়ি আছেন গো ?

সারদা। কে ?

[ঘাসের বোঝা নামাইয়া রাখিলেন]

অম্বিকা। আমি তোমাদের ছেচরণের অম্বিকে চৌকিদার গো।

সারদা। অম্বিকাদাদা! তা বাইরে কেন, ভেতরে এসো।

[অম্বিকার প্রবেশ]

অম্বিকা। তোমার বাবা কোথায় সারদা-দিদি ? চিঠি আছে যে।

সারদা। চিঠি! কার চিঠি ? কে লিখেছে ? কোত্থেকে এসেছে ?

অম্বিকা। অতশত কথা কে জানবে দিদি ? কাল শিহড়ের হাটে রামু ডাকপিওন চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললে—তোমাদের রামচন্দ্র মুখুজ্যের চিঠি গো। ঐটুকুই যা জানি। কে লিখেছে, কোত্থেকে এসেছে, সে মুখুজ্যে-মশাই দেখলেই বুঝবেন। কোথায় তিনি ?

সারদা। বাবা পুজোয় বসেছেন। দাওনা আমায় তুমি চিঠিটা।

অম্বিকা। না, না। এ বাবা সরকারী ডাক। এই দেখছ না—টিকিট মারা আছে—রানীর মাথা! দিতে হবে একেবারে খোদ্ কর্তার হাতে। রামু পিওন আমায় পই পই করে বলে দিয়েছে।

[জলের কলসী কাঁখে সারদার মাতা শ্যামাসুন্দরী ঘাট হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অম্বিকা। এই যে মা-ঠাকরুণ। পেন্নাম হই।

[প্রণাম করিল]

চিঠি এসেছে কর্তার নামে। এই দেখ না।

[চিঠিটা দেখাইল]

শ্যামা। কে লিখেছে বাবা অম্বিকা ?

অম্বিকা॥ তাই যদি বলতে পারব মা—তবে চৌকিদার না হয়ে দারোগা হ'ত তোমার এই অম্বিকা দাস। আমার যে 'ক' অক্ষর গো-মাংস।

শ্যামা॥ উনি তো পুজোয় বসেছেন। আমি দেখছি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন সারু? অম্বিকাকে বসতে দে।

[শ্যামাসুন্দরী ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন। সারদা অম্বিকাকে বসিবার জন্য বারান্দায় একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন]

সারদা॥ চিঠিটা একটিবার আমার হাতে দাও অম্বিকা-দা। পড়তে পারি না আমি সত্যি, কিন্তু তাঁর হাতের লেখাটা আমি দেখেছি কি না, আমি চিনি।

অম্বিকা॥ কার লেখা দিদি?

সারদা॥ তুমি যে কি। তুমি কিচ্ছু বোঝ না অম্বিকা-দা।

অম্বিকা॥ ও! আমাদের সেই ক্ষ্যাপা জামাইয়ের কথা বলছিস? দেখ-দেখ।

[অম্বিকা পিঁড়িতে বসিল এবং ঝোলা হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া দিল। সারদা সাগ্রহে পত্রখানি লইয়া হাতের লেখা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিরোনামার হস্তাক্ষর পরিচিত নয় দেখিয়া বিষণ্ণ মনে চিঠিখানি ফেরৎ দিলেন। অম্বিকা চিঠিখানি হাতে লইল]

অম্বিকা॥ কেমন, তার লেখা নয় তো? তুমিও যেমন! সে লিখবে চিঠি! আরে মাথা ঠিক থাকলে তবে তো লিখবে চিঠি! কি বলব দিদি, দক্ষিণেশ্বর তো এমন কিছু দূর নয়। লোকের মুখে মুখে খবর সবই আসে। যা সব শুনি! কানে আঙুল দিতে হয়।

সারদা॥ অম্বিকা-দা!

অম্বিকা॥ সে সব দিদি তোমার না শোনাই ভালো। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্যে সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন। তাঁর ছেলে গদাধর তোকে যখন বিয়ে করতে এলো—তখন তো তুই দু'বছরের খুকী। কিন্তু বরের চেহারা দেখে আমাদের মন গলে গেল। মনে হলো পিঁড়িতে বসে আছেন সাক্ষাৎ মহাদেব। তা সেই মানুষটাই কি না—

সারদা॥ (ম্লান হাসি হাসিয়া) দক্ষিণেশ্বরের শ্মশানে-মশানে দিগম্বর হ'য়ে বাঁশ কাঁধে ঘুরে বেড়ায়। কাঙালীদের এঁটো খায়। কখনও বসে থাকে অসাড় হয়ে। কখনও-বা পড়ে থাকে গঙ্গার কাদাতে মাথা গুঁজে, মুখ ঢেকে। কখন-ও বা সন্ন্যাসী হয়ে রামনাম জপছে, আবার কখনও ফকির হয়ে—আল্লা আল্লা জপছে। মহাদেব নয় তো কি অম্বিকা-দা?

[গৃহাভ্যন্তর হইতে পূজা সারিয়া রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তৎপশ্চাৎ শ্যামাসুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন]

রামচন্দ্র ॥ কি অম্বিকা—আমার নাকি চিঠি এসেছে ?

অম্বিকা ॥ হ্যাঁ কর্তা।

[চিঠি প্রদান করিল]

রামচন্দ্র ॥ হৃদয় মুখুজ্যেকে চিঠি দিয়েছিলুম। বোধ হয় তারই উত্তর। (চিঠি খুলিয়া চোখ বুলাইয়া) হ্যাঁ, হৃদুই লিখেছে বটে।

শ্যামা ॥ কি লিখেছে ? পড়ো।

রামচন্দ্র ॥ (অম্বিকার দিকে তাকাইয়া) আচ্ছা তুমি তাহ'লে এসো অম্বিকা।

অম্বিকা ॥ অম্বিকা তোমাদের চিঠি শুনতে চায় না কর্তা। শুধু জানতে চায় সব কুশল তো ?

রামচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ সব কুশল।

অম্বিকা ॥ ব্যস্ হয়ে গেল। আমরা হলুম গিয়ে চিনির বলদ। এই যা পেলুম—এইটুকুই লাভ।

[অম্বিকার প্রস্থান]

শ্যামা ॥ তুমি চিঠিটা পড়।

রামচন্দ্র ॥ (সারদার দিকে তাকাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া) সারু ...

সারদা ॥ আমি যাচ্ছি বাবা।

শ্যামা ॥ না, না, সারু থাক। কপাল যা পোড়বার তা পুড়েছে। এখন আর ওর কাছে লুকোবার কি আছে ? তুমি পড়ো।

রামচন্দ্র ॥ (চিঠি পড়িতে লাগিলেন)

"শতকোটি প্রণামমিদং, শ্রীচরণ আশীর্বাদী পত্র প্রাপ্ত হইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। লোকে বলে তীর্থ করিলে সুফল হয়। আপনার জামাতা-জীবন—আমার পরমারাধ্য মাতুল মহাশয় কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া রানী রাসমণির সেজ-জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের সহিত কত তীর্থ-ই তো ঘুরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহাতে সুফল হইল কি ? আমার স্ত্রীর অকালমৃত্যু হইল। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল। মাতুল মহাশয়ের অশেষ স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের বিবাহ হইল। মৃত্যুও হইল। বিশেষ পরিতাপের বিষয় গত ১লা শ্রাবণ সেজবাবু মথুরামোহন বিশ্বাসেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানি না। মাতুল মহাশয়ের কর্ণে আপনার কন্যা সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিতে সাহস পাইতেছি না। তাঁহার মনের অবস্থা ভাল বোধ হয় না। নিবেদন ইতি—সেবকাধম

শ্রীহৃদয়নাথ দেবশর্মণঃ।"

শ্যামা ॥ মেয়ে স্বামীর ঘর করতে যাবে—তোমার কত আশা! নাও, হ'লো তো! (সারদার প্রতি) দল-ঘাস কেটে এনেছিস্?

সারদা ॥ এনেছি মা।

শ্যামা ॥ আনবি না তো কি! বাপের বাড়ি বসে ঐ দল-ঘাস কেটেই তোর জীবন যাবে। যাই আমি হেঁসেলে যাই। (সারদার প্রতি) গরুটাকে খাইয়ে, পারিস্ তো তুইও আয়—তরকারিগুলো কুটে দে। ছেলেপুলে সব ক্ষেতে গেছে। ফিরে এসে খাই-খাই করবে।

[শ্যামা ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন]

রামচন্দ্র ॥ আমি মা, মণ্ডলদের বাড়ির ষষ্ঠী পুজোটা সেরে আসি। তুই ভাবিস্‌নে সারু। এখনও আমার মন বলছে, আমি তোকে জলে ফেলে দিইনি রে—জলে ফেলে দিইনি।

সারদা ॥ না বাবা, তা কেন! তবে······

রামচন্দ্র ॥ ও, আর যদি দিয়েই থাকি, কূল তুই একদিন পাবিই পাবি।

সারদা ॥ আমি জানি বাবা। তুমি মন খারাপ করো না।

রামচন্দ্র ॥ হা ভগবান। ও আমায় বলছে মন খারাপ করো না।

[হাত দিয়া উদ্গত অশ্রু ঢাকিয়া ত্বরিৎপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সারদা ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া গোয়াল ঘরের দিকে যাইবেন, এমন সময় বিধবা ভানু দ'সীর প্রবেশ।]

ভানু ॥ সারু—

সারদা ॥ ভানু পিসি এসো।

[সারদা ঘাসের বোঝা নামাইয়া রাখিলেন।]

ভানু ॥ তোর বাবার চোখে জল দেখলুম কেনরে সারু?

সারদা ॥ ও বাবার চোখে যখন-তখন জল আসে। চোখের অসুখ ভানুপিসি।

ভানু ॥ কিন্তু এতো দুঃখেও চোখে যদি জল না আসে—সেটাও চোখের অসুখ। সে অসুখটা হয়েছে তোর। আশ্চর্য, তোকে একদিনও কাঁদতে দেখলুম না সারু!

সারদা ॥ দুঃখ আমার কই পিসি যে কাঁদতে যাব। লোকে তাঁকে যা খুশি বলুক, কিন্তু সেই যে চার বছর আগে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে এসে আমায় নিয়ে গেলেন কাছে, সেই ক'মাসেই তাঁর যে-পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তাঁকে ভুল বুঝব না আমি কোনদিন—তিনি যে কী—তিনি যে কে—সে আমি ভালভাবেই বুঝে এসেছি।

ভানু ॥ তবু সারু—যা রটে তার কিছুটা বটে। স্বামী হয়ে কেনইবা স্ত্রীকে ভুলে যান, কেন তোকে এ দুঃখ দেন?

সারদা ॥ দুঃখ তিনি দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু দুঃখ সইবার শক্তিও তিনিই দিয়ে গেছেন। তোমায় বলেছি তো পিসি, যে আনন্দের পূর্ণ ঘট তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন, এই চার বছরেও তার এতটুক ক্ষয় হয়নি। আমি কি ভাবি জানো পিসি ?......

ভানু ॥ কি সারু ?

সারদা ॥ আজ বাবার কাছে হৃদয়-ভাগ্নের চিঠি এসেছে। হৃদয় ভাগ্নে লিখেছেন—তাঁর বউ মারা গেছেন, অক্ষয় মারা গেছে। ওঁদের ওখানকার কর্তা মথুরবাবু মারা গেছেন। এতে তোমাদের জামাইএর মনের অবস্থা ভালো নয়। এঁরাই সব তাঁকে দেখাশোনা করতেন—সেবা-যত্ন করতেন। আজ না জানি তাঁর কত অযত্ন হচ্ছে। কিন্তু আমি তো রয়েছি। কেন আমি যাব না তাঁর কাছে ? কেন করবো না আমি তাঁর সেবা—আমার যা কাজ।

[হন্তদন্ত হইয়া রাম মুখোপাধ্যায়ের পুনঃ প্রবেশ]

রামচন্দ্র ॥ এই যে সারু, মণ্ডলবাড়িতে গিয়েই শুনলুম সামনের এই ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথিতে এখান থেকে ওরা যাচ্ছে গঙ্গা নাইতে কলকাতায়। রওয়ানা হচ্ছে কাল ভোরে। আমিও যাব ওদের সঙ্গে। কাপড়-চোপড়গুলো এখনই কেচে দে।

সারদা ॥ বাবা—

রামচন্দ্র ॥ হ্যাঁ—আর কথার সময় নেই। এখুনি কেচে দে। নইলে ওগুলো শুকোবে না। তাই তো ছুটে এলুম পুজোয় না বসে। তুই যা—তুই যা ·· আমি পুজো সেরে এসে আর সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

ভানু ॥ আমি বলছিলুম কি দাদা, সারুকেও তবে সঙ্গে নিন।

রামচন্দ্র ॥ কি বিপদ! সারু যাবে বলেই-না আমি যাচ্ছি। এমনি তোদের বুদ্ধি বলেই দশ হাত কাপড়েও তোদের কাছা হয় না।

[রামচন্দ্রের দ্রুত প্রস্থান]

সারদা ॥ পিসি......

[আবেগে ভানুর বুকে মুখ লুকাইল]

ভানু ॥ নে হলো তো। রথ দেখা, কলাও বেচা—দুই-ই হবে। গঙ্গা নাওয়াও হবে, আর দেখেও আসবি লোকে যা বলছে তা সত্যি কিনা।

সারদা ॥ লোকে যা বলে বলুক। পাগল হোন আর যাই হোন—তিনিই আমার দেবতা—তাঁর পায়েই আমার ঠাঁই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[১২৭৮, চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গঙ্গাতীরবর্তী কক্ষ।]

রামকৃষ্ণ ॥ হরিবোল—হরিবোল। হরি গুরু—গুরু হরি। মনকৃষ্ণ—প্রাণকৃষ্ণ। জ্ঞানকৃষ্ণ—ধ্যানকৃষ্ণ—বোধকৃষ্ণ—বুদ্ধিকৃষ্ণ। জগৎ তুমি—জগৎ তোমাতে। আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী।

[এই বলিয়া হাততালি দিয়া বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীনু পূজারীর প্রবেশ।]

দীনু ॥ ওকি ঠাকুর, ওকি হচ্ছে! পাগলের মতন অমন হাততালি দিচ্ছেন কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ গাছ জুড়ে কাক বসেছে। নীচে দাঁড়িয়ে হাততালি দাও। সব উড়ে যাবে তো!

দীনু ॥ তা যাবে বৈকি।

রামকৃষ্ণ ॥ তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে বিষয়-বাসনা, পাপচিন্তা সব শালা উড়ে পালাবে। এমনি করে মন নির্মল করে তবে না ধ্যান জপ।

দীনু ॥ আচ্ছা ঠাকুর, আপনার এত জ্ঞান। তবে আপনারও এমন হয় কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ কি হয়?

দীনু ॥ কখনো বালকের মত স্বভাব হয়। আবার পাগলের মতন কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ ঈশ্বর দর্শন হোক, তোমারও হবে। যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নেই। আবার শুচি-অশুচি তার কাছে দুই-ই সমান; তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে, কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে। তাই উন্মাদবৎ। আবার কখনো-বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে—জড়বৎ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়ের প্রবেশ]

হৃদয় ॥ ও মামা, আছ কোথায়? এদিকে যে জয়রামবাটি থেকে ছোটমামী এসে উপস্থিত।

রামকৃষ্ণ ॥ কোথায় রে হৃদু?

হৃদয় ॥ কোথায় আবার—এই দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে। বল্লেন, 'বাপের সঙ্গে এসেছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গঙ্গা নাইতে।'

রামকৃষ্ণ ॥ তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু ও দীনুঠাকুর—আজ না বিষ্যুৎবার ?

হৃদয় ॥ আমিও তো তাই বললুম। তা দেখলুম ছোটমামীর জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে। বলেন কিনা—আমি গঙ্গার ওপরেই নৌকোয় বিষ্যুদবারের বারবেলা কাটিয়ে এসেছি। বুঝলে মামা, এ যেন এঁচোড়ের আঠা।

রামকৃষ্ণ ॥ আরে ম'লো। লোকটা কোথায় তা না বলে বক্তিমে শুরু করে দিয়েছে !

হৃদয় ॥ আরে লোকটা তো তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে। দীনুঠাকুর, আমার পুজোর দফা তো আজ গয়া। যাও—পুজোটুজোগুলো তুমি দেখো—

[দীনুকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। দীনু পুবের দরজা দিয়া চলিয়া গেল।
হৃদয় পশ্চিমের দরজায় গিয়া ডাকিল—]

এসো মামী, এসো। হুকুম হয়ে গেছে।

[অবগুণ্ঠিতা সারদাদেবীর প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ ॥ এসেছ, বেশ করেছ। ওরে হৃদে, মাদুর পেতে দে রে। সেই এলে—দুদিন আগে এলে না কেন ? আহা, আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার যত্ন হবে ? আরে সেই যে মথুরবাবু গো—রানী রাসমণির জামাই—কি ভালোই-না আমায় বাসতো। তা এই পয়লা শ্রাবণ সজ্ঞানে দিব্যধামে চলে গেল।

[হৃদয় মাদুর পাতিয়া দিল]

হৃদয় ॥ আমি যাই, মুকুজ্যেমশায়ের আদর-আপ্যায়ন করে আসি।

[হৃদয়ের প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ ॥ কি গো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো।

[সারদা অগ্রসর হইয়া রামকৃষ্ণকে প্রণাম ক'রতে গেলেন]

আমায় তো প্রণাম করছো—মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণী মাকে প্রণাম করেছো ? নহবৎখানায় গিয়ে আমার চন্দ্রমণি-মাকে প্রণাম করেছো ?

সারদা ॥ এইবার যাবো।

[ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখিয়া সারদা প্রণাম করিলেন। সারদার জ্বর-সন্তপ্ত
কপাল স্পর্শে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—]

রামকৃষ্ণ ॥ আরে, তোমার কপালটা যে আগুনের মত গরম। জ্বর হয়েছে নাকি ?

সারদা ॥ পথে জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলুম। আর দেখা হবে ভাবিনি। জ্বরের ঘোরে দেখলুম, একটি কালো মেয়ে—আহা কি তার রূপ—আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিলে।

রামকৃষ্ণ ॥ বটে! তা ঐ বেটিই তোমাকে টেনে এনেছে। তা বেশ করেছে। কিন্তু এখন ঠ্যালা সামলায় কে?

[হৃদয়ের পুনঃপ্রবেশ]

হৃদয় ॥ কি আবার ঠ্যালা?

রামকৃষ্ণ ॥ ও হৃদু। ছাখ দেখি গায়ে জ্বর। ঠাণ্ডা লেগে এখনি হু হু করে বেড়ে যাবে। আমার এই ঘরেই আর একটা বিছানা করে দে, কোবরেজকেও ডাকতে হবে। আর ছাখ, একটু সাবু বার্লি, তাও ভুলিস নি হৃদু।

সারদা ॥ আমি বরং নহবতে মার কাছে যাই।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে হৃদে, নহবতে যেতে চাইছে। ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে—এ ঘরেই থাক। ঐ ছোট খাটটায় একটা বিছানা করে দিস্, হ্যাঁরে হৃদে কবরেজকে একবার খবর দিতে পারিস্?

[হৃদয় যাইতে উদ্যত]

আচ্ছা থাক, এত রেতে থাক। তুই বরং একটু জলপটি······

[হৃদয় যাইতেছিল]

আচ্ছা সে হবেখন। ভাঁড়ার বন্ধ হয়ে যাবে। তুই বরং আগে একটু সাবু বার্লির চেষ্টা দেখ।

[হৃদয় গেল না]

দাঁড়িয়ে আছিস্ যে? যা।

হৃদয় ॥ আর যদি কিছু থাকে তো একেবারে বলো মামা।

রামকৃষ্ণ ॥ আগে তো এই হোক, তারপর দেখা যাবে—তুই যা।

[হৃদয় চলিয়া গেল]

সারদা ॥ না, না, আমার জন্যে তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ কেন গো? তুমি কি আমার পর? তুমি কি আমার ফেলনা?

[সারদা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

সে কি গো? তুমি কাঁদছ কেনে গো?

সারদা ॥ সবাই বলেছিল তুমি আমাকে ভুলে গেছ। আরও কত কি বলেছিল।

[এবার চোখে আসিল আনন্দাশ্রু]

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি তাই বিশ্বাস করেছিলে? অগ্নিসাক্ষী করে তোমাকে অর্ধাঙ্গিনী করে নিয়েছি, তোমাকে নিয়েই-না আজ আমি গো। একি তুমি কাঁপছ যে! এসো, বসো।

[তাঁহাকে ধরিয়া ঠাকুরের খাটে বসাইলেন]

ওরে হৃদে, কোথায় গেলি তুই ?

[প্রকাণ্ড এক ধামা মুড়ি লইয়া ছুটিয়া হৃদয়ের প্রবেশ]

হৃদয়। এই যে মামা, ভাঁড়ার বন্ধ। দুধ সাবু কাল হবে। আজ এই কটি মুড়ি এনেছি মামীর জন্যে। হবে তো ?

তৃতীয় দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানা। রামকৃষ্ণ-জননী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন]

চন্দ্রমণি। বৌমা, ও বৌমা······

সারদা। (নেপথ্যে) দুধের কড়াটা নামিয়ে আসছি মা।

চন্দ্রমণি। আসতে হবে না মা, আমি গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসছি।

[রামকৃষ্ণের প্রবেশ]

এই যে গদাধর, আয় বাবা আয়। ছাখ এসে—নহবৎখানার ওপরের ঐটুকু ঘরে একদিনের ভেতর বৌমা আমার কেমন সংসার সাজিয়েছে। যত বলি জ্বর থেকে উঠেছো, ও শরীরে অত সইবে না, তা শুনছে কে ?

রামকৃষ্ণ। কিন্তু তার আগে বল দেখি মা, নহবৎখানার এই ঘরে ঢুকতে ওর চৌকাঠে ক'বার মাথা ঠুকেছে ?

চন্দ্রমণি। (হাসিয়া) সে ঠুকবে তোর। বৌমা আমার হিসেবী আছে রে। ছাখনা একদিনেই কেমন গোছগাছ করেছে। আমাকে রাঁধতেও দিলে না।

রামকৃষ্ণ। ইঃ, বৌয়ের হাতে সেবাযত্ন পেয়ে তোমার মুখখানি চিকমিক করছে যে! আনন্দ আর ধরে না দেখছি।

চন্দ্রমণি। মন তো এসব চায়। কিন্তু হবে কি ? তুই বোস, আমি গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসি।

[একটি ভিখারীর প্রবেশ]

ভিখারী। এই যে মা, গঙ্গা নাইতে চললে ?

চন্দ্রমণি। হ্যাঁ বাবা, বসো, গানটান গাও। বৌমা আমার ভিক্ষে দেবে এখন। আমি ডুবটা দিয়ে আসি।

[চন্দ্রমণির প্রস্থান]

ভিখারী। 'ডুব দেরে মন কালী বলে'—ঠাকুর, তোমার গাওয়া এ রামপ্রসাদী গানটা আমি শিখে নিয়েছি। গাইছি।

[খঞ্জনী বাজাইয়া গান শুরু করিল]

'ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি-রত্নাকর জলে।'

[গানের মধ্যে দেখা গেল দরজার আড়ালে ভিক্ষা লইয়া সারদা দাড়াইয়া আছেন। গান শেষ হইতেই অবগুণ্ঠিতা সারদা অগ্রসর হইয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে আসিলেন।]

ভিখারী ॥ এ যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মা গো।

[প্রণাম করিয়া ভিক্ষা লইতে লইতে]

এই কৈলাসপুরী ছেড়ে আবার বাপের বাড়ি পালিয়ো না। তুমি মা ছিলে না, তাই পাগলা-বাবা আমার শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। বাঁধ মা, বাবাকে আমার বাঁধ।

[ভিখারীর প্রস্থান]

[সারদা গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ এঁ্যা—তুমি আমায় বাঁধবে নাকি গো?

সারদা ॥ সে কি! বাঁধব কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ তা একদিনেই যে রকম জাঁকিয়ে বসেছ .....

সারদা ॥ জানতো—বসতে পেলেই শুতে চায়।

রামকৃষ্ণ ॥ (ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) বলো কি গো! তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?

সারদা ॥ না, না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাব? আমি যে তোমার সহধর্মিনী গো। তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। তুমি যা চাও—আমিও তাই চাই। তুমি যা চাওনা—আমিও তা চাই না।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে কি তাই তুমি এসেছ?

সারদা ॥ হ্যাঁ গো। তোমার ইষ্ট পথে সাহায্য করতেই আমি এসেছি। তাও বলি—তুমি যদি বলো—থাকো—তবেই থাকব। তুমি যদি বলো—না—আমি থাকব না।

রামকৃষ্ণ ॥ (উৎফুল্ল হইয়া) সহধর্মিনীর কথাই বলেছ। সহধর্মিনী যখন—কেন থাকবে না? একশ'বার থাকবে—লাখোবার থাকবে। আমি গিয়ে এখনি শ্বশুরমশায়কে বলে দিচ্ছি,—আপনি মশায় আসুন, ইনি মশায় যাবেন না।

[রামকৃষ্ণ দুই পা যাইতেই সারদার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

এই যে—মেঘ না চাইতেই জল!

রামচন্দ্র ॥ সে কি বাবা গদাধর!

রামকৃষ্ণ॥ আপনার কাছেই ছুটছিলুম। তা আপনি এসে গেছেন, ভালই হয়েছে। ইনি মশায় থাকেন না। আপনি মশায় আসুন।

রামচন্দ্র॥ আমিও তো বাবা, তাই চেয়েছিলুম। তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ হলো বাবা। সুখে স্বচ্ছন্দে তোমরা ঘর-সংসার করো, এই আশীর্বাদই করি।

রামকৃষ্ণ॥ ঘর নেই তো ঘর-সংসার! এ যা দেখছেন, এ সবই মা ভবতারিণীর। তা সে বেটিও কম নয়। কী পরীক্ষায় ফেলেছিল—জানেন না তো, বসুন।

[সারদা একটি আসন আনিয়া দিলেন। রাম মুখোপাধ্যায় বসিলেন]

না গো—তুমিও শুনে যাও। তোমারও শোনা দরকার। এবার আমি আমার চন্দ্রমণি-মার কথা বলছি।······ঐ যে সেই মথুরবাবু—রানী রাসমণির জামাই—কী ভালোই না আমায় বাসতো! কোন কালে আমার ভরণ-পোষণের কষ্ট না হয়—শালার সব সময় সেই চেষ্টা। আমার কাছে তাড়া খেয়ে কেবলই পালিয়ে যায়। কিন্তু শালার ভারী কূট বুদ্ধি! শেষটায় ধরে পড়লো আমার বুড়ী মাকে। ইনিয়ে-বিনিয়ে একথা সেকথা ব'লে-বলে কিনা, আমার অভাবে তোমরা মায়ে-পোয়ে কষ্ট না পাও তাই তোমার কাছে এসেছি দিদিমা। তোমার কি অভাব আছে, আমায় বলো দিদিমা। আমি তোমাদের সব দিচ্ছি।

রামচন্দ্র॥ তাতো ঠিকই। জোত-জমি, ঘর বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি তিনি কি না দিতে পারতেন। তা বেয়ান-ঠাকরুন কি চাইলেন?

[গঙ্গাস্নানান্তে চন্দ্রমণির প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ॥ বলো মা—তোমার বেয়াইমশায়কে বলো—সেজবাবুর কাছে তুমি কী চেয়েছিলে?

চন্দ্রমণি॥ যা চেয়েছিলুম—তা দিলে কই? কেবলই বলে—কি তোমার অভাব? অভাব যে কি—আমি তো ভেবে পাই না। ভেবেচিন্তে দেখলুম—মুখে দেবার গুল নেই। বললুম—এক আনার দোক্তা-তামাক আনিয়ে দাও। তা এই কথায় কিনা মথুরের চোখে জল এলো।

রামচন্দ্র॥ আমার চোখেও জল আসছে বেয়ান। এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়! সাক্, মা! তোকে এই ধর্মের সংসারে রেখে মহা-আনন্দে আজ আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি মা। গিয়ে তোর গর্ভধারিণীকে বলছি আমি আমার মা উমাকে কৈলাসে রেখে এলুম, কৈলাসে রেখে এলুম।

চতুর্থ দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কক্ষ। রামকৃষ্ণ উপবিষ্ট, পাশে সারদা দাঁড়াইয়া আছেন। হৃদয় রামকৃষ্ণের কাপড় কোঁচাইতেছে]

রামকৃষ্ণ ॥ (সারদার প্রতি) তোমাকে যখন বিয়ে করে নিয়ে এলুম কামারপুকুরে, লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে খানকতক গয়না ধার করে আনলেন মা। তাই দিয়ে বৌ-পরিচয় করালেন তিনি। তোমার মনে পড়ে গো?

সারদা ॥ (ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—'না'।)

হৃদয় ॥ মামী তখন আমার সাত বছরের খুকী, মামীর মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমার মনে আছে। জানো মামী—তোমার সেই ধার-করা গয়নাগুলো তোমার গা থেকে চুরি করে খুলে নিয়েছিলেন—ঐ আজ যিনি এত বড় ধর্মাবতার। ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন তুমি দেখলে গায়ে গয়না নেই, তখন তোমার সে কি কান্না মামী! কুলের আচার, তেঁতুলের আচার এসব দিয়েও আমরা তোমাকে ঠাণ্ডা করতে পারিনি বাপু। ঠাণ্ডা হ'লে কখন জানো? যখন আমার দিদিমা, তোমার ঐ শাশুড়ী বুড়ী তোমায় কোলে নিয়ে বললেন—'আমার গদাই তোমাকে এর চেয়ে ঢের ভালো গয়না গড়িয়ে দেবে।'

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি এখানে আসার পর থেকে মা'র সেই কথাটা বড্ড বেশি মনে পড়ছিল আমার। পুজুরী বামুন আমি, যা দু'পয়সা জমেছিল, বাক্স খুলে হৃদুকে নিতে বলেছিলুম, তোমাকে এক জোড়া ডায়মনকাটা বালা গড়ে দিতে। বের করে দে হৃদে—

[হৃদয় বাক্স খুলিয়া ডায়মণ্ডকাটা বালাজোড়া রামকৃষ্ণের হাতে আনিয়া দিল]

এসো গো পরিয়ে দিই। মাতৃসত্য পালন হোক।

[সারদা কাছে আসিয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণ বালাজোড়া হাতে লইয়া বালা পরাইতে পরাইতে]

এর নাম নাকি ডায়মনকাটা বালা! পঞ্চবটীতে বসে সেদিন রামসীতার ধ্যান করছিলুম। ধ্যানে দেখলুম—সীতার হাতে এই বালা। মন বললে 'যে সীতা সেই সারদা।' যেটুকু বাদ ছিল সেটা আজ পূরণ করছি।

হৃদয় ॥ তুমি যে কি বলো মামা! শুনলেও পাপ হয়।

[হৃদয়ের প্রস্থান]

সারদা ॥ তুমি অমন করে বলো না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে গো! বলব না কেনে? ছাইচাপা আগুন তো। লোকে অশুদ্ধ মনে দেখবে বলে এবার রূপ ঢেকে আসা—তাই না গো?

সারদা ॥ রাত হয়েছে, তুমি শোও। আমি তোমার গায়ে—মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

রামকৃষ্ণ ॥ না, না, এখনি শোব কি গো! বরং তুমি শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ, ভাল কথা—দেখ সারদামণি, রাতে যখনই আমি জেগে উঠি, দেখি তুমিও জেগে রয়েছ। এক একদিন মনে হয়—যেন তুমি কাঁদছিলে। কেন বলোতো?

সারদা ॥ রোজ রাতে শুতে এসে দেখি তোমার ভাব-সমাধি হয়। এক একদিন অল্পতেই জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু এক একদিন এমন হয় যে, আমি ভারি ভয় পাই। ভয়ে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রামকৃষ্ণ ॥ বটে! তাই তো! এই ক'মাস তুমি সারারাত জেগে কাটিয়েছ? দ্যাখো সারদামণি, তুমি যদি এই ভাবে সারা রাত জেগে বসে থাক, তবে নহবতখানায় মা'র কাছে তোমার শোবার ব্যবস্থা করি—কি বল?

সারদা ॥ আমি কি বলবো, তোমার যা ইচ্ছে।

রামকৃষ্ণ ॥ রাত হয়েছে। একা যেতে পারবে?

সারদা ॥ (দরজার কাছে গিয়া) কেন পারবোনা! (হাসিয়া) আকাশে চাঁদা-মামা পাহারা দিচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ শোন সারদামণি, শোন। কাছে এসো।

[সারদামণি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

(সারদাকে সস্নেহে বিছানায় বসাইয়া) বড় সুন্দর কথাটি তুমি বলেছ সারদামণি—"চাঁদা-মামা পাহারা দিচ্ছেন।" চাঁদা-মামা যেমন সকলের মামা—তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকবে তিনি তাকেই দর্শন দানে কৃতার্থ করবেন, তুমি ডাকো তো তুমিও তাঁর দেখা পাবে।

সারদা ॥ ডাকবো। তোমার মতন যাতে ডাকতে পারি—তুমি আমায় শিখিয়ে দিও।

রামকৃষ্ণ ॥ ওদেশে দেখিছি, সব চিঁড়ে কোটে; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে। ওর ভেতর আবার খদ্দের আসছে, তার সঙ্গে হিসেব করছে—'তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হ'ল। এই রকম সে সব কাজ করছে বটে, কিন্তু তার মন সর্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে। সে জানে যে, ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে হাতটি জন্মের মত যাবে। সেইরকম, সংসারে থেকে সকল কাজ কর। কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে। এই দেখ, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় কত রাত হয়ে গেল।

সারদা ॥ তোমার শোবার সময় হয়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ কিন্তু আমার ঘুম পাচ্ছে না।

সারদা ॥ তুমি শোও, আমি তোমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

রামকৃষ্ণ ॥ তা মন্দ বলোনি।

[রামকৃষ্ণ শুইলেন। সারদা তাঁহার পা টিপিতে লাগিলেন]

সারদা ॥ আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয়?

রামকৃষ্ণ ॥ যে মা মন্দিরে রয়েছেন, তিনি এই দেহকে জন্ম দিয়েছেন। হাঁ গো—এখন নহবৎখানায় বাস করছেন। আবার তিনিই এই মুহূর্তে আমার পদসেবা করছেন। সবই সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ।

[কক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল। পরে যখন আলো জ্বলিয়া উঠিল তখন দেখা গেল শয্যায় নিদ্রিতা সারদামণি, পার্শ্বে দণ্ডায়মান রামকৃষ্ণ।]

মন—এরই নাম স্ত্রী-শরীর। লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে—ভোগ করবার জন্যে সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দ-ঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মন, ভাবের ঘরে চুরি করো না, পেটে একখানা মুখে একখানা রেখো না। সত্যি বলো, তুমি এ চাও, না ঈশ্বরকে চাও। যদি এ-ই চাও, তো এই তোমার সমুখে রয়েছে, নাও।

[এইরূপ বিচারপূর্বক রামকৃষ্ণ সারদামণির অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে বিলীন হইয়া গেল। কক্ষ পুনরায় অন্ধকার হইয়া গেল। এবার যখন আলোকিত হইল তখন ১২৮০, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রি। দেখা গেল অর্ধ বাহ্যদশাপ্রাপ্তা, মন্ত্রমুগ্ধা সারদামণি আলিম্পন-ভূষিত পীঠাসনে রামকৃষ্ণের দক্ষিণ ভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্ট। রামকৃষ্ণ সারদামণিকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি—সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর শরীর মনকে পবিত্র করে এঁর মধ্যে আবির্ভূতা হ'য়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।

[প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তিনিও অর্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া পূজার উপকরণ ও জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব সারদা দেবীর পাদপদ্মে বিসর্জনপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।]

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি—তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।

[রামকৃষ্ণ সারদাকে প্রণাম করিলেন। সারদা তাহা গ্রহণ করিলেন—প্রতি প্রণাম করিলেন না।]

বিরাম

পঞ্চম দৃশ্য

[শ্যামপুকুরের বাড়ির কক্ষ :

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫ মঙ্গলবার, বেলা ৫-৩০মিঃ, ঠাকুর উপবিষ্ট। চতুর্দিকে ভক্তগণ—যথা নরেন্দ্র, ডাঃ সরকার, শ্যাম বসু, গিরিশ ঘোষ, দুকড়ি ডাক্তার, ছোট নরেন, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। ডাঃ সরকার ঠাকুরের হাত দেখিলেন ও ওষুধের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন—]

ডাক্তার ॥ এই তো, আগের চেয়ে অনেক ভালো।

রামকৃষ্ণ ॥ সে বাপু তুমি দেখছো, তোমার হাতযশ। ওরা বলে ডাক্তার তো ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, তোমার ওষুধ নাকি কথা কয়।

ডাক্তার ॥ তা বাপু দক্ষিণেশ্বরে থাকলে আমি তোমার চিকিৎসার ভার নিতে পারতাম না।

নরেন্দ্র ॥ সেইজন্যেই তো মশাই ওনাকে শ্যামপুকুরে আনা। আপনি যেমন যত্ন নিয়ে দিনে তিনবার এসে দেখছেন—ওখানে থাকলে তো আর এরকমটি হ'তো না।

গিরিশ ॥ তা শুনলাম ডাঃ সরকার—আপনি নাকি ভিজিট নিচ্ছেন না। তাহলে আপনারও এখন বিশ্বাস হয়েছে।

ডাঃ সরকার ॥ ভিজিট না নেবার কারণ এই ত্যাগী ছেলেদের নিঃস্বার্থ সেবা দেখে আমি charmed কিন্তু, তাই বলে তোমার মত আমি ওঁকে অবতার বলে মানতে রাজী নই। আর সব কর, but do not worship him as God. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছে!

গিরিশ ॥ কি করি মশাই, যিনি এ সংসার-সমুদ্র আর সন্দেহ সাগর থেকে পার করলেন—তাঁকে পুজো ছাড়া আর কি করবো বলুন?

ডাঃ সরকার ॥ আমার কথা তা নয়। গিরিশবাবু আমি বিশ্বাস করি উনি একজন সৎ লোক - সাধু লোক, আমি কি এঁর পায়ের ধুলো নিতে পারি না, এই দেখ নিচ্ছি।

[ডাঃ সরকার রামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন]

গিরিশ ॥ ধন্য! ধন্য!

নরেন্দ্র ॥ We offer to him worship bordering on divine worship.

রামকৃষ্ণ ॥ (মাষ্টারকে) কি বলছে হে, নরেন কি বলছে?

নরেন্দ্র ॥ বলছি, আপনাকে আমরা পূজা করি, সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি।

[রামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ তা বাপু, পুজো-টুজো এখন থাক। বসো ডাক্তার—আর একটু বসো—ওর একটা গান শোনো।

[নরেন্দ্র তানপুরা ও মৃদঙ্গযোগে গাহিলেন]

গান

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অপরূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী ॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি ॥
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি ;
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলি জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার ॥ It is dangerous to himএ-গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়। এ অবস্থায় যদি ভাব-সমাধি হয়, অনর্থ ঘটতে পারে। (রামকৃষ্ণকে) শোন, তোমার ভাব চেপে রাখতে হবে। আর দেখ—তুমি ভাব হলে লোকের পায়ে পা দাও—সেটা ভাল নয়।

রামকৃষ্ণ ॥ ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদনা হয়। উন্মাদে এরূপ হয়—কি করব।

ডাক্তার ॥ ইনি মেনেছেন গিরিশবাবু। He express regret for what he does. কাজটা sinful, অন্যায়—এটা বোধ আছে।

গিরিশ ॥ মশাই, আপনি ভুল বুঝেছেন। এ দেহ শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা—তবু আপনার যখন কলিক্ হয়েছিল, তখন কি আপনার regret (দুঃখ) হয় নি—কেন রাত জেগে এত পড়তুম। তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য regret (দুঃখ কষ্ট) হতে পারে—তা বলে জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করবেন না।

নরেন ॥ (ডাক্তারের প্রতি) আর একটা কথা দেখুন। একটা Scientific discovery-র (জড়-বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের) জন্য আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) করতে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান)

এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হোক, এরূপ মনের ভাব) করবেন না?

ডাক্তার ॥ (অপ্রতিভ হইয়া, গিরিশের প্রতি) তোমার কাছে হেরে গেলুম গিরিশ, দাও পায়ের ধূলো দাও।

[ডাক্তার গিরিশের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তারপর নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন]

আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে!

[এমন সময় বাবুরাম রামকৃষ্ণের কক্ষে ত্রস্ত হইয়া প্রবেশ করিল]

বাবুরাম ॥ মা এসেছেন, মা—

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে রে বাবুরাম, আমি তো আজ ভালই আছি। তা কোথায়?

[ভক্তরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—একণে চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ বিছানায় বালিশে ভর দিয়া অর্ধ শয়ান হইলেন। সারদা মা আসতেই উঠিয়া বসিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কি গো ব্রহ্মময়ী হঠাৎ?

সারদা ॥ মন মানে না, চলে এলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ এসেছো বেশ করেছো। তা আমি তো আগের চেয়ে অনেকটা ভালো আছি গো। বরং বলো—তুমি কেমন আছ গো?

সারদা ॥ তুমি যেমন রেখেছো। দেখা-শোনা নেই—এই যা।

রামকৃষ্ণ ॥ সেই তো হয়েছে বিপদ, তোমার হাতের পথ্য পেলে আরও একটু বল পেতাম। তা যে ছোট বাড়ি, কোথায় যে এসে থাকবে তাই ভাবি! ছেলেরা তো সব তোমাকে আনতে চায়—তোমার কষ্ট হবে ভেবেই আমি সায় দিই নি।

সারদা ॥ আমার কষ্টটাই বড় হলো?

রামকৃষ্ণ ॥ তা নয় তো কি? নহবতে ওইটুকু ঘর হলেও সেখানে কত আলো—কত হাওয়া। এখানে দুদিনেই যে তুমি শুকিয়ে যাবে গো।

সারদা ॥ শুকিয়ে যাবো আমি—শুকিয়ে যাবো—আমি···

[হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ এ কি গো—তুমি কাঁদছো যে?

সারদা ॥ (উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া) না—কিছু না। কিন্তু আমাকে তোমার মাপ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ মাপ! তুমি আবার কি করলে গো?

সারদা ॥ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি। (আবার কাঁদিতে লাগিলেন) গোলাপ বলছিলো, তুমি নাকি আমার ওপর রাগ করে চলে এসেছো—আমি তা' বিশ্বাস করেছিলুম। কেন করেছিলুম ?

রামকৃষ্ণ ॥ এই দেখো—তোমার ওপর আমি কি কখনও রাগ করতে পারি ? তাহলে আমার কি রইলো গো ?……

সারদা ॥ ওগো ওগো ……

[রামকৃষ্ণের পায়ে বার বার মাথা ঠেকাইতে লাগিলেন। এমন সময় লেটো ঠাকুরের জন্ত সুজির পায়েস এবং কাঁচের গ্লাসে ঘোল লইয়া আসিলে সারদা তখন ঠাকুরের পায়ে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছেন। রামকৃষ্ণ সারদার হাতে পথ্য দিতে লেটোকে ইংগিত করিলেন।]

লেটো ॥ মা।

[সারদা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন লেটো তাহার হাতে
পথ্য দিবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে]

রামকৃষ্ণ ॥ আজ কি পথ্য রে ?

লেটো ॥ পায়েস—সুজির পায়েস বাবা।

রামকৃষ্ণ ॥ দাও গো ব্রহ্মময়ী, কদিন তোমার হাতে খাই নি।

[সারদা চোখের জল মুছিয়া লেটোর হাত হইতে পথ্য লইলেন এবং
রামকৃষ্ণের সম্মুখে ধরিলেন। লেটো চলিয়া গেলো]

সুজির পায়েস মাকে নিবেদন করতে করতে মারও বোধ হয় অরুচি ধরে গেছে। [সারদা শিউরিয়া উঠিলেন]।

সারদা ॥ মাকে আর নিবেদন করতে হবে না। তুমি খেলেই মার খাওয়া হবে। হ্যাঁ গো—সেদিন দক্ষিণেশ্বরে কি হয়েছে শুনবে ? এই দেখ—জুড়িয়ে যাচ্ছে যে। তুমি বরং খাও, আমি বলি।

রামকৃষ্ণ ॥ (এক চুমুক খাইয়া) বলো বলো।

সারদা ॥ সেদিন কয়েকজন ভক্ত মেঠাই মণ্ডা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শুনলেন—তুমি চিকিৎসার জন্ত কোলকাতায় আছ। তখন তাঁরা তোমার ছবির সামনে ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিলেন।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে কেন দিলে গো ? এটা কি উচিত হলো ?

সারদা ॥ (সাতঙ্কে) এ্যাঁ ! তা হলে ?

রামকৃষ্ণ ॥ তাহলে আবার কি ? আমার ছবির পুজো তো তুমিও করো। তোমায় তো বলেছি গো—এরপর দেখবে ঘরে ঘরে (নিজ দেহ দেখাইয়া) এর পুজো হবে। হবেই হবে—যখন তুমি পুজো করেছ।

[রামকৃষ্ণের পথ্য খাওয়া শেষ হইয়াছে]

দাও, হলো তো ! সবটা খেয়ে ফেলেছি। এই দেখ, এই সুজির পায়েস

খেতে ঘেন্না ধরে গিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে যেন অমৃত খাচ্ছি গো আমি তো দেখি—তোমার হাত-ধোয়া জলেও আমার পেট ভরে যায়।

সারদা ॥ আমি থাকব ?

রামকৃষ্ণ ॥ থাকবে না কি গো! যখন এসে পড়েছ, তখন নিশ্চয় থাকবে। ছিলে না—মনে হচ্ছিল বিদেশে আছি। এয়েছ—মনে হচ্ছে, আমি যেন রয়েছি নিজের ঘরে—দক্ষিণেশ্বরে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাস।]

[কাশীপুর উদ্যান-বাটিকার সদর। বাবুরাম, রাখাল ও নরেন। পূর্বপরিচিত ভিখারী গাহিতেছে]

গান

আপনাতে মন আপনি থেকো যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন যে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
(ও মন) কত মণি পড়ে আছে, সে চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥
তীর্থগমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন-উচাটন হয়ো না রে।
(তুমি) আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে শীতল হওয়া মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে।
(তুমি) বাজিকরে চিনলে নাকো, (যে এই) ঘটের ভিতর বিরাজ করে॥

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন ॥ এই পাগলা, তুই এখানেও ধাওয়া করেছিস ?

ভিখারী ॥ তুমিও তো বাবা আমায় ধাওয়া করেছ।

নিরঞ্জন ॥ না করে উপায় আছে ? ঠাকুর এই সবে একটু ঘুমিয়েছেন। যা চেঁচিয়ে গাইছিস—ঘুম ভেঙে যাবে। তুই পালা।

ভিখারী ॥ কিন্তু ঠাকুর যে আমার গান শুনতে বড় ভালোবাসেন। দক্ষিণেশ্বরে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে গেলাম শ্যামপুকুরে। তা দেখলাম বাবা—আমার শ্যামপুকুরে নেই। শুনলাম এসেছেন কাশীপুরে। তা বাবা কাশীপুরে এসে কাশীশ্বরের দেখা পাব না ?

নিরঞ্জন ॥ না বাবা—তাঁর বড় অসুখ। অসুখ ভালো হোক—তারপর এসো।

ভিখারী ॥ তোমাদের মত নন্দী-ভৃঙ্গী যার—তার অসুখ হবে না তো কি ?

দক্ষিণেশ্বরে নন্দী-ভৃঙ্গী ছিলাম আমরা—তখন বাবার কোন অসুখ ছিল না—কোন অসুখ ছিল না। তা থাকো বাবা, তোমরাই থাকো; শুধু দেখো, মূলধন যেন বজায় থাকে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে।

[ভিখারীর প্রস্থান]

বাবুরাম ॥ মা গেছেন তারকেশ্বরে হত্যা দিতে। তিনি যদি এখন কিছু করতে পারেন। নইলে আমি তো আর কোন ভরসা দেখছি নে নরেন। কর্কট রোগ, ও নাকি যাবে না।

রাখাল ॥ আমাদের যতদূর সাধ্য তা তো করে দেখলাম বাবুরাম। চিকিৎসায় সুবিধার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে আসা হ'ল শ্যামপুকুরে। সে বাড়িতে আলো-হাওয়া নেই। নিয়ে আসা হলো গঙ্গাতীরে, কাশীপুরে এই বাগান-বাড়িতে। মহেন্দ্রলাল সরকারের মত সেরা ডাক্তার চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কি হলো ?

নরেন্দ্র ॥ গেল পয়লা জানুয়ারি ঠাকুর এই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গৃহী-ভক্তদের কাছে কল্পতরু হয়ে সকলকে চৈতন্য দিয়েছেন। তখনই মনে হয়েছে, সময় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে দেহরক্ষার সংকল্পই করেছেন। সময় থাকতে তাঁর সেবা আর ধ্যান-ভজন করে যে যতটা পারিস করে নে। নইলে তিনি সরে পড়লে অনুতাপের আর শেষ থাকবে না।

বাবুরাম ॥ এটা করবার পর ভগবানকে ডাকব, ওটা হয়ে গেলে সাধন-ভজনে লাগব, দিনগুলো যাচ্ছে এমনি করে। বাসনা-জালে জড়িয়ে পড়ছি নরেন।

নরেন ॥ ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, ঐ বাসনাতেই মৃত্যু। বাসনা ত্যাগ কর—বাসনা ত্যাগ কর।

রাখাল ॥ মা! মা এসেছেন!

বাবুরাম ॥ তাই তো!

রাখাল ॥ চুপ।

[ক্ষণিক স্তব্ধতা, সারদার প্রবেশ।]

মা, ঠাকুর আমাকে মানস-পুত্র বলেন। তুমি কথা বলো মা, কথা বলো।

সারদা ॥ তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম। একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাত্তিরে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম। যেন অনেকগুলি হাঁড়ি সাজানো থাকলে, তার ওপর ঘা মেরে যদি কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়—তাতে যেমন আওয়াজ হয়, এ সেই রকম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এ জগতে কে কার স্বামী। এ সংসারে কে কার! কার জন্যে এখানে প্রাণ হত্যা করতে বসেছি! সবই তো এক—এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি।

[সারদা গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। ভক্তগণ নত মস্তকে তাঁহার অনুসরণ করিলেন]

সপ্তম দৃশ্য

[কাশীপুর রামকৃষ্ণের কক্ষ। রোগশয্যায় ধ্যান-মগ্ন রামকৃষ্ণ বালিশে ঠেসান দিয়া অর্ধ শয়ান রহিয়াছেন। সারদা মা ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া রামকৃষ্ণের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণ চক্ষু মেলিয়া সারদাকে দেখিলেন। তাহার চোখে মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল।]

রামকৃষ্ণ॥ কি গো, কিছুই হবার নয়।

[সারদা পদতলে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন]

আমি, আমিও দেখেছিলাম গো—ওষুধ আনতে হাতি গেলো। হাতি মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্য, তা পাবার নয়—বুড়োগোপাল এসে স্বপ্নটা ভেঙে দিলে।

সারদা॥ হ্যাঁ গা কি হলো, পিঠময় ঘা বেরুলো!

রামকৃষ্ণ॥ সে বুঝি জানো না! (শরীর দেখাইয়া) এ থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো, দেখলাম ওঁর পিঠে ঘা। ভাবলাম একি! গলায় ঘা আবার পিঠেও ঘা কেন? মা বললেন, পাপীদের ছোঁয়াচ লেগেছে। গলায় ঘাও তাই—যার-তার হাতে খেয়ে।

সারদা॥ এমন যে হয় তুমি জানতে—জেনে শুনে তবে কেন...... ?

রামকৃষ্ণ॥ বলো কি গো—, তাদের আমি তাড়িয়ে দেবো? সারদামণি, খালি কি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলাম? না তুমিই এসেছ? তা যা হলো—এও মায়ের ইচ্ছা। ডাক্তার কবরেজ কি করবে—সবই মায়ের হাত। উকিল যা বলে বলুক,—ও সবই হাকিমের হাত। মা'র মনে যা আছে তাই হবে। তুমি এখন যাও দেখি ব্রহ্মময়ী, একটু পথ্য করে দাও। আজ ক'দিন তোমার হাতের পথ্য খাই নি।

[সারদা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামকৃষ্ণ বিছানায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন। কক্ষ অন্ধকার হইল। পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেলো ভক্তগণ পরিবেষ্টিত রামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র এবং রাখাল—রামকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন। রামকৃষ্ণকে নিদ্রাগতপ্রায় বোধ হইতেছে। ভক্তগণের চক্ষু ঠাকুরের প্রতি নিবদ্ধ। ঠাকুর মাঝে মাঝে অব্যক্ত যাতনায় অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছেন। পরক্ষণেই তাঁহাকে আবার নিদ্রিত মনে হইতেছে। ভক্তগণ অশ্রুসিক্ত চক্ষে নীরব।]

নরেন্দ্র॥ একি নিদ্রা, না মহাযোগ?
"যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।"

[ঠাকুর চক্ষু মেলিলেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়া ইংগিতে তাহাকে আরো কাছে আসিতে বলিলেন। মাস্টার কাছে আসিয়া বসিলেন।]

রামকৃষ্ণ॥ (আস্তে আস্তে, অতি কষ্টে) তোমরা কাঁদবে বলে এখনও আছি।

রাখাল ॥ আপনি বলুন—আপনি থাকবেন।

রামকৃষ্ণ ॥ সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র ॥ আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ এখন দেখছি—এক হয়ে গেছে। (শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর দুটি আছেন! একটি তিনি। আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙেছিল—তারই এই অসুখ করেছে। দেহধারণ করলেই কষ্ট আছে।

[অব্যক্ত যন্ত্রণাবোধ করিতে লাগিলেন]

তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি—সব্বাই যদি বলো যে—'এত কষ্ট—তবে দেহ যাক্'—তা'হলে দেহ যায়!'

[রামকৃষ্ণ মাস্টারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মাষ্টার কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ঠাকুর তাঁহার দৃষ্টি অন্যান্য ভক্তদের দিকে পরিচালিত করিলেন—ভক্তগণ তাঁহার এই নিদারুণ বাণী সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সকলে কোনমতে ক্রন্দন চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শুধু রহিলেন নরেন।]

নরেন্দ্র ॥ সত্যি কি ইনি স্বয়ং ভগবান! সত্যিই কি ইনি অবতার! দেহের এই নিদারুণ কষ্ট, এর মধ্যেও কি এর উত্তর দিতে ইনি সক্ষম!

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে নরেন, তোর বিশ্বাস হলোনি—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ।

[নরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন]

আজ তোকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম—জগতের কল্যাণে তোর সব শক্তি বিলিয়ে দে।

নরেন্দ্র ॥ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্—সত্যম জ্ঞানমনন্তম্।

[ঠাকুর বরাভয় মূর্তিতে নরেন্দ্রকে আশীর্বাদ করিলেন। কক্ষ অন্ধকার হইয়া আসিল। পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল ঠাকুর অর্ধশায়িত হইয়া বিছানায় বসিয়া আছেন। লক্ষ্মী বার্লির বাটি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁরে, তোকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে বুঝি?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ বাবা।

[লক্ষ্মী বার্লি খাওয়া দিতে চেষ্টা করিল। ঠাকুর খুব কষ্টেই দুই এক ঢোক খাইলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ থাক্। এ কষ্টটা ও সইতে পারে না।

[নিজের হাতের কবচটি খুলিতে খুলিতে]

এই কবচটা ওকে দিস।

লক্ষ্মী ॥ না বাবা, এ কবচ তুমি খুলো না।

রামকৃষ্ণ ॥ আর আমার দরকার নেই। যার দরকার তাকে দিচ্ছি।

[কবচটি খুলিয়া লক্ষ্মীর হাতে দিলেন]

যা, নিয়ে যা—

[লক্ষ্মী কবচ লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। ঠাকুর পুনরায় অর্ধ শয়ান হইলেন। লক্ষ্মী নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্বেই সারদা দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোন কথা বলিবারে শক্তি লক্ষ্মীর ছিল না। লক্ষ্মী কবচটি সারদার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল মাত্র। সারদা আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

সারদা ॥ এঁ্যা—সে কি!

লক্ষ্মী ॥ তোমাকে রাখতে বললেন।

[সারদা অস্ফুট আর্তনাদে কবচটি বুকে চাপিয়া ধরিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ গা, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি—জলের ভেতর দিয়ে, অ-নে-ক-দূ-র……

[সারদা ও লক্ষ্মী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

তোমাদের ভাবনা কি গো? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। ছেলেরা, আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে।

[কম্পিত হাতটি লক্ষ্মীর মাথায় রাখিয়া]

লক্ষ্মীটিকে দেখো—কাছে রেখো।

[রামকৃষ্ণ নীরব হইলেন। চিন্তামগ্ন সারদা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের দেহটি মুহূর্তকালে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলেন। তারপর হঠাৎ নিদারুণ যাতনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

সারদা ॥ মা কালী গো!

[ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখিয়া সারদা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কক্ষটি অন্ধকার হইল। পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল শূন্য কক্ষ। অদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সারদা তাঁহার অঙ্গ হইতে একে একে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পরিশেষে যখন সোনার বালাও খুলিতে উদ্যত হইলেন—তখন ঠাকুর গলারোগের পূর্বেকার মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া সারদাকে ইংগিতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সারদা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ঠাকুরের মূর্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ আমি কি মরেছি গো—যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছো? এ তো শুধু এ-ঘর ও-ঘর।

[ঠাকুরের মূর্তি অন্তর্হিত হইল। সারদা বালা খুলিলেন না—ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তারপর তিনি তাঁর পরণের কাপড়ের চওড়া লাল পাড় ছিঁড়িয়া সরু করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোপালের মা থান কাপড় হাতে প্রবেশ করিলেন।]

সারদা ॥ (গোপাল-মাকে দেখিয়া) থান কাপড় এনেছো? কিন্তু ও তো আমি পরতে পারব নি। আমি হাতের বালা খুলতে যাচ্ছিলাম—ঠাকুর এসে বাধা দিলেন—অসুখের আগের ঠিক সেই মূর্তিতে। বললেন, "আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?" আমি তাঁকে দেখেছি—আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখেছি। তিনি আছেন, আমার কাছেই আছেন। শুধু এ-ঘর থেকে ও-ঘর।

যবনিকা

ও সারদা-সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে। ·····ও জ্ঞানদায়িনী। মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।

—শ্রীরামকৃষ্ণ।



দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, কো রামঃ? দাদা, ওই যে বলছি ওইখানেই আমার গোঁড়ামি।—রামকৃষ্ণ পরমহংস কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।

মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? —শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখেছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শরৎ বিপ্লব

উৎসর্গ পত্র

'বাংলা নাটকের ইতিহাস'

'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার'

রচয়িতা

কীর্তিমান্

সাহিত্য-সমালোচক

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

জয়যুক্তেষু

মন্মথ রায়

।। শরৎ বাণী ।।

সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই—যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত—মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।

এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর আসব না। সেদিন একথা কারো-বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো-বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

প্রবেশানুক্রমিক

পুরুষ	স্ত্রী
কুঞ্জবিহারী	গায়ত্রী
কেষ্ট	
শরৎচন্দ্র	
গিরিন	
যোগেন	
হরিহর	
বজ্রচন্দ্র	
সুরেন মান্না	
শশাঙ্ক	
পাঁচকড়ি	
নন্দদুলাল	
ভোলা	শান্তি
কৃষ্ণদাস	মোক্ষদা (হিরন্ময়ী)
ঘোষালবুড়ো	
অক্ষয়	
অমরেন্দ্র	মন্দিরা
জলধর	
প্রকাশ	
পঞ্চানন	
প্রবোধ	
সি-আই-ডি	
সুরেন্দ্রনাথ	
নিবারণ	
যামিনীকান্ত	

শরৎ বিপ্লব

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[১৯০৭ সাল। রেংগুনের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠকখানা ঘর। কাল: সন্ধ্যা। কুঞ্জবাবু আসিয়া বসিলেন। কুঞ্জবাবুর পশ্চাতে গায়ত্রী জলের গ্লাস ও খল হাতে প্রবেশ করিয়া কুঞ্জবাবুকে খল ও জলের গ্লাস দিলেন। কুঞ্জবাবু খল হইতে ওষুধ খাইলেন ও জল পান করিয়া গ্লাস ও খল গায়ত্রীর হাতে ফিরাইয়া দিলেন। সর্বপশ্চাতে আগত ভৃত্য কেষ্টর আনীত গড়গড়ায় তামাক সেবন শুরু করিয়া টেবিলের গায়ে রাখা একটি হাতে-লেখা প্ল্যাকার্ড দেখিয়া কেষ্টকে কুঞ্জবাবু বলিলেন—]

কুঞ্জ ॥ আরে কেষ্ট, ঐ প্ল্যাকার্ডটা কি আমার এই বসবার ঘরে পড়ে থাকবে? যেদিন-যেদিন বাবুরা এ বাড়িতে মিটিং করতে আসবেন, সেদিন আমার হলঘরে টাঙিয়ে রাখবি।

কেষ্ট ॥ আজ্ঞে আচ্ছা।—এতে কি লেখা বাবুমশাই?

কুঞ্জ ॥ তুই না 'ক—খ' শিখছিলি?

কেষ্ট ॥ কিন্তু এটা তো 'ক—খ' নয় বাবুমশাই, 'ক—খ'-এর বাপ-ঠাকুর্দা এ পড়া আমার কম্ম নয়।

[গায়ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিলেন]

কুঞ্জ ॥ "রেংগুন বাঙালী বান্ধব সমিতি। স্থাপিত—১৯০৭ সাল।" এই দেখ—প্ল্যাকার্ড লিখতেও ভুল! ১৯০৭ সাল তো হল এ বছর। এটা স্থাপিত হয়েছে দু'বছর আগে—১৯০৫ সালে। তা আমি বাপু এসব সাতে-পাঁচে নেই। বাবুদের গিয়ে বল্—ভুলটা শুদ্ধ করে দিক। যা—

[কেষ্ট প্রস্থান করিতেছিল, এমন সময় শরৎচন্দ্র আসিতেছিলেন]

কেষ্ট ॥ (শরৎকে) না না, এ ঘরে নয়। আপনাদের সবাই বসেছেন ঐ হলঘরে। ঐ ঘরেই আপনাদের এখন তামাক দেওয়া হবে।

[তামাকের কথায় শরৎ লজ্জিত হন]

শরৎ ॥ আঃ কেষ্ট!

[কেষ্টর প্রস্থান]

কুঞ্জ ॥ এই যে, কি যেন তোমার সেই নামটা?

শরৎ ॥ আজ্ঞে শরৎচন্দ্র। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র। তা শরৎ, আজ আসতে তোমার দেরি হল যে?

শরৎ ॥ আমাদের বস্তিতে একটা চীনা মিস্ত্রি মারা গেছে, তার সৎকার করে এলাম। কিন্তু হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন কুঞ্জদা?

কুঞ্জ ॥ (গায়ত্রীকে দেখাইয়া) এই এদের জন্য। এদের জন্যই আজ রেংগুন বাঙালী বান্ধব-সমিতির এই বিশেষ অধিবেশনটি ডাকা হয়েছে।

গায়ত্রী ॥ আমি ভেতরে যাচ্ছি মেসোমশায়।

কুঞ্জ ॥ না না, তুমি ভেতরে যাবে কেন? কি যেন তোমার নাম?

গায়ত্রী ॥ গায়ত্রী।

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, রোজ যা জপ করি। (শরৎকে) কি হে, তুমিও তো কর?

শরৎ ॥ বামুনের ছেলে যখন করাই উচিত। (গায়ত্রীর দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, তা করি।

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ, এ হল গায়ত্রী আর এর স্বামী—কি নাম বললে—হ্যাঁ, ঐ যে কৃষ্ণের শত নামের এক নাম! আচ্ছা, সে পরে বলব এখন। আমার ঐ নাম নিয়েই যত বিপদ, কিছু মনে থাকে না। ফাঁক পেলেই তাই নিজের নামটা বার বার আওড়াই—কুঞ্জবিহারী ব্যানার্জী—কুঞ্জবিহারী ব্যানার্জী—কুঞ্জবিহারী ব্যানার্জী। ভয় হয়, নিজের নামটা ভুলে না যাই। তাহলেই তো গেছি। কিন্তু জানো, কোর্টে গেলেই আর কোন ভয় নেই। মক্কেলদের নামগুলো তো হরিনামের মালা হয়ে থাকে। তা কি যেন বলছিলাম—

শরৎ ॥ এঁরা স্বামী স্ত্রী—

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ, এঁরা স্বামী স্ত্রী, সদ্যবিবাহিত স্বামী স্ত্রী, এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের এই রেংগুনে এসেছেন। কার কাছে নাকি শুনেছেন, এখানে অঢেল চাকরি। তা সে একদিন ছিল বটে, যখন বাঙালীরা এখানে এলেই চাকরি-বাকরি পেত। এই তুমিই তো কয়েক বছর আগে এক-কাপড়ে, খালি-পকেটে রেংগুনে এসে তোমার মেসো অঘোর চাটুজ্যের বাড়িতে উঠে তরে গেলে। অঘোর চাটুজ্যে ছিল আমাদের বাঙালী সমাজের মাথা। সে মারা যেতে এখন সেই দায়-দায়িত্ব তোমরা চাপিয়েছ আমার ঘাড়ে। কিন্তু আমার হাত-পা তো তোমরাই হে। তা এই নববিবাহিত দম্পতিটিকে তরিয়ে দেবার জন্যে তোমাদের আজ ডেকেছি। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই লেখাপড়া মোটামুটি ভালই জানেন। বন্ধুটিও কেরানীগিরি করতে পারবেন। তবে একটু রোগা। তিনজনে নাকি একই সঙ্গে ঘর-সংসার করবেন। তা এঁদের জন্য সবার আগে চাই একটা বাসা। যেখানে গিয়ে এখনি উঠতে পারে। আর চাকরি তো চাই-ই। বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে বলো—সর্বদা বলে থাকেন তোমার বৌদি। তা ঠিকই বলে থাকেন, কি বলো হে নষ্টচন্দ্র?

শরৎ ॥ আজ্ঞে, আমার নাম শরৎচন্দ্র।

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র। তবে মাঝে মাঝে তোমার অনেক নষ্টামিও শুনি কি না। সেইটেই মনে পড়ে আগে। তা হলঘরে গিয়ে বস, আমি এই

মামলার নথিটা দেখেই তোমাদের ডাকছি। তোমরা হলঘরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দাও। আচ্ছা, তুমিও যাও সাবিত্রী, তোমার কাজে যাও।

শরৎ ॥ আজ্ঞে, ওঁর নাম আপনি বলছিলেন—গায়ত্রী। যে-নাম জপ করে থাকেন।

কুঞ্জ ॥ ও হ্যাঁ, গায়ত্রী। আর তুমি যখন নামটা ভোলনি, তুমি তো কম নও! জপ-তপও কর দেখছি! খুশি হলাম হে, খুশি হলাম। এস।

[শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু গায়ত্রী কুঞ্জবাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

কুঞ্জ ॥ না না, তুমিও এখন যেতে পার, এই মামলার কাগজপত্রটা দেখে আমিও যাচ্ছি। (কুঞ্জবাবু নথির কাগজটায় মন দিলেন এবং হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন) এটা দেখছি, একেবারে ক্লিয়ার কেস অব চিটিং—জলজ্যান্ত জোচ্চুরি।

গায়ত্রী ॥ আমিও তাই বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি বাবা।

কুঞ্জ ॥ কি বলবার জন্য ?

গায়ত্রী ॥ এটা জলজ্যান্ত জোচ্চুরি।

কুঞ্জ ॥ আমার এই কেসটার কথা বলছিলাম। এ যা দেখছি, ঐ আসামীকে পাঁচ বছর আমি ঘানি টানিয়ে ছাড়ব। কিন্তু তুমি এই জোচ্চুরির কথা জানলে কি করে ?

গায়ত্রী ॥ আমি আপনার ও কেস-টেসের কথা জানি না মেসোমশায়। আমি আমাদের নিজেদের কথাই বলছিলাম।

কুঞ্জ ॥ নিজেদের কথা মানে ?

গায়ত্রী ॥ ঐ নন্দদুলাল রায়, ও কোনকালেই আমার স্বামী নয়। আমি কলকাতার ভবানীপুরের একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা।

কুঞ্জ ॥ বিধবা!

গায়ত্রী ॥ হ্যাঁ মেসোমশায়। বিধবা হয়ে আমার বাপের বাড়িতে এসে যখন আশ্রয় নিই, তখন ঐ নন্দদুলাল আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

কুঞ্জ ॥ কিরকম, কিরকম অতিষ্ঠ, কতটা অতিষ্ঠ ?

গায়ত্রী ॥ নিজেই ওর সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে দুর্নাম রটিয়ে দেয়। আমার বাবা রেগে গিয়ে আমাকে একদিন কাটতে আসেন। সেদিন ঐ নন্দদুলালের হাত ধরেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে জীবন রক্ষা করতে হয়। তারপর ও আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে রেংগুনে। আমাকে ওর স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছে সর্বত্র। জাহাজে আলাপ হয়েছে ঐ পাঁচকড়ির সঙ্গে। ছেলেটির হাতে কিছু টাকা আছে, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে

রেংগুনে এসে শুনেছে, আপনি এখানে নবাগত বাঙালীদের আশ্রয় দেন। তাই আমাদের নিয়ে আপনার এখানে উঠেছে। আমরা আসতে না-আসতেই মাসীমা চলে গেলেন মান্দালে। তাঁকে এসব কিছু বলবার সুযোগ না পেয়ে আজ আপনাকেই বলছি। আপনার এই বাড়িতে এই প্রথম একঘরে ও আমার সঙ্গে থাকতে পেরেছে। ওর অত্যাচারে এ দুটো রাত যে আমার কি-ভাবে কেটেছে, সে বলবার নয়—সে বলবার নয়। আজও যদি ওর সঙ্গে একই ঘরে শুতে হয় বাবা—তবে আর আমার রক্ষা নেই—রক্ষা নেই।

কুঞ্জ ॥ তুমি বলছ কি--তুমি বলছ কি মা? আমি তোমার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমার ঘরে এমন অনাচার! ঐ পাপিষ্ঠ শয়তানকে আমি দেখে নিচ্ছি। এখন আমি কোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। (চিৎকার করিয়া) কেষ্ট—কেষ্ট, শীগগির শুনে যা। এই হারামজাদা, শুনতে পাচ্ছিস না? শীগগির শুনে যা। কেষ্ট—কেষ্ট—

[ছুটিয়া আসিল কেষ্টধন]

হলঘরের বাবুদের গিয়ে বল্, এ ঘরে আগুন লেগেছে। শীগগির এখানে সবাইকে ছুটে আসতে বল্।

কেষ্ট ॥ আগুন? কোথায় আগুন?

কুঞ্জ ॥ ওরে হারামজাদা, যা বলছি তাই কর্। শীগগির ওদের ডেকে আন্। তারপরে দেখবি, কোথায় আগুন।

কেষ্ট ॥ আগুন লেগেছে—আগুন লেগেছে—বাবুরা, শীগগির এস—

[বলিতে বলিতে কেষ্ট ছুটিয়া চলিয়া গেল।
কুঞ্জবাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন]

গায়ত্রী ॥ বাবা—বাবা, আপনি এমন উত্তেজিত হবেন না বাবা। মাসীমা বলে গেছেন, আপনার শরীর ভাল নয়। আপনার জন্য আমার যে বড় ভয় করছে বাবা।

কুঞ্জ ॥ না না, সরে দাঁড়াও! আমি এখন কারো বাবাও নই—মাও নই। কোর্টে দাঁড়িয়ে যেমন বিচারের দাবি করি, আজ বাঙালী সমাজের কাছে সেই বিচারের দাবি করছি আমি।

[ইতিমধ্যে হলঘর হইতে শরৎচন্দ্র, যোগেন সরকার, গিরিন সরকার, হরিহর চক্রবর্তী, শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়, বঙ্গচন্দ্র দে, সুরেন মামা, নন্দদুলাল রায়, পাঁচকড়ি দাস, কেষ্ট সকলে হুড়মুড় করিয়া এখানে ছুটিয়া আসিলেন। সকলের মুখেই কিছু না কিছু চিৎকার—"কোথায় আগুন—জল আনো—জিনিসপত্র সরাও—কোথায় আগুন—কেউ পোড়েনি তো"—ইত্যাদি]

শরৎ ॥ এই তো আমি এইমাত্র এখান থেকে গেলাম। কোথায়—কি করে আগুন লাগল?

বঙ্গচন্দ্র ॥ আগুনের কথা কওন যায় না। স্বর্ণলঙ্কাতেও আগুন লাগছিল।

গিরিন ॥ নির্ঘাৎ হুঁকো-কল্কে থেকে টিকের আগুন উড়ে গিয়ে সর্বনাশ করেছে।

হরিহর ॥ কিন্তু আগুনটা কোথায়?

শশাঙ্ক ॥ দেখছি না তো!

কুঞ্জ ॥ (টেবিল চাপড়াইয়া) Silence—Silence. এ যে-সে আগুন নয়। এ হচ্ছে পাপের আগুন। এ আগুন চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ঘর-সংসার ছারখার করে দেয়। তোমরা সব চুপ করে, আমি যা বলছি শোন। এই যে একটি মহিলা দেখছ. এর নাম কি যেন জপ করি—হ্যাঁ, গায়ত্রী দেবী। (কেষ্টকে) কেষ্ট, এ ঘর থেকে বাইরে যাবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে, একটা লাঠি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্। আমার হুকুম না নিয়ে কাউকে বাইরে যেতে দিবি না।

[কেষ্টর প্রস্থান]

বঙ্গচন্দ্র ॥ এ বড় কড়া হুকুম দেখ্‌তে আছি। ঘরে লাগছে আগুন, আমরা পলায়ন না কইর‍্যা পুইড়া মরুম নাকি এহানে?

শরৎ ॥ আঃ থাম না বঙ্গচন্দ্র। কুঞ্জদা বলছেন, এটা পাপের আগুন—ব্যাপারটা কি শোনাই যাক্-না।

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ, পাপের আগুন, আরও ভীষণ—আরও সাংঘাতিক। একটা ঘর-সংসার চিরকালের জন্য পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ধরুন, আপনারা Gentlemen of the Jury। জুরী মহোদয়গণ, একটি নিষ্পাপ বালবিধবা—শ্বশুরালয়ে ঠাঁই হল না—পিত্রালয়ে এসে আশ্রয় নিল। একটি পাপাসক্ত যুবক ঐ বালবিধবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললে—ক্রমে ক্রমে পাড়ায় দারুণ কলঙ্ক রটালে। মেয়েটির বাপ ক্ষেপে গিয়ে মেয়েটিকে কাটতে গেলে—প্রাণ বাঁচাতে মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আর; শেষে তার জীবনের শনি ওই যুবকটি তাকে ফুস্‌লিয়ে কাজ-কর্মের আশা দিয়ে পাড়ি দেয় এই রেংগুনে। জাহাজে টাকা-পয়সাওয়ালা একটি বন্ধু জোটে। তিনজনে এসে আশ্রয় নেয়—

শরৎ ॥ বুঝেছি। আশ্রয় নেয়, অধমতারণ বাঙালীবান্ধব এই কুঞ্জবিহারী ব্যানার্জীর আনন্দাশ্রমে।

কুঞ্জ ॥ হ্যাঁ, আমার এখানে আশ্রয় নেয়। সেই তিনজন লোক এখানেই উপস্থিত। বালবিধবাটি ঐ গায়ত্রী দেবী—তাকে ফুস্‌লিয়ে এনেছে যে শয়তান যুবকটি সে ওই নন্দদুলাল রায়—আর চিনির বলদটি হচ্ছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে ঐ পাঁচকড়ি দাস—

[সকলে হাসিয়া উঠিলেন]

কুঞ্জ ।। হ্যাঁ, তা তোমরা হাসতে পার। রেংগুনে এরকম ঘটনা আজ এই নতুন নয়।

যোগেন ।। রেংগুন তো এখন দেখছি একটা Honeymoon-এর জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুঞ্জ ।। তা হোক্, আমার বলবার কিছু নেই। সামাজিক অপরাধের এরা আসামী হলেও আইনতঃ কোন অপরাধের ধারায় আমি আপাতত এদের ফেলতে চাইছি না এইজন্য যে, এরা তিনজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। আর, গায়ত্রীকে নন্দদুলাল বেঁধে আনেনি, ভুল-পথে পদক্ষেপ করলেও গায়ত্রী স্বেচ্ছাতেই নন্দদুলালের সঙ্গে এসেছে। পাঁচকড়ির বোকামী ছাড়া আর কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।

হরিহর ।। তবে পাপের আগুনটা বইছে কোথায়, সেইটে বলুন স্যার!

বলচন্দ্র ।। হ। সেইটা না কইয়া দিলে তো বোঝোন যায় না। পাপের আগুন দেখতে হইলে পাপচক্ষু চাই, সেটা তো আমাগো নাই।

কুঞ্জ ।। Silence—Silence. পাপটা করেছে ঐ নন্দদুলাল। এখানে এসে আমাদের কাছে পরিচয় দিয়েছে—গায়ত্রী ওর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী। আমাদের মনে সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করে, সবার সঙ্গে প্রতারণা করে গত দুই রাত্রি গায়ত্রীকে নিয়ে একই কক্ষে রাত্রি যাপন করেছে এই বাড়িতে। সেটাও যদি-বা ক্ষমা করা যায়, কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না তার শেষ অভিযোগ।

অনেক ।। (উত্তেজিত কণ্ঠে) সেটা কি ? বলুন—বলুন!

কুঞ্জ ।। এই প্রথম সুযোগ পেয়ে নন্দদুলাল তার রুদ্ধ কক্ষে গায়ত্রীর উপর বলাৎকারের চেষ্টা করেছে। আমার স্ত্রী যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন আর এই অভিযোগ শুনতেন, তবে ওই নারাধমকে প্রথমেই জুতো -পেটার হুকুম দিতেন।

সকলে ।। আমরা সে হুকুমের অপেক্ষা রাখি না। ধর শালাকে—মার শালাকে!

সুরেন ।। আমরা ওকে খুন করব।

কেষ্ট ।। ওকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে চলুন, আচ্ছা করে সব ধোলাই দিই।

শশাঙ্ক ।। কিন্তু তার আগে গায়ত্রী দেবীর নিজের মুখে অভিযোগটা আমাদের শোনা উচিত নয় কি ?

শরৎ ।। শশাঙ্কদা, কোন নারীর মুখ থেকে এই কলঙ্কজনক কথাটা শোনার কি আর কোন প্রয়োজন আছে ? যখন তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এই অভিযোগটা নীরবে সমর্থন করছেন ?

বঙ্কচন্দ্র ॥ হু, মরার উপর আর খাড়ার ঘা না মারাই উচিত। আয়েন' খাড়ার ঘা যেখানে মারণ উচিত সেইখানেই মারি। (নন্দদুলালকে) ওরে শালা, তুই বুঝি ভাবছিলি এ জাগটা মগের মুল্লুক, যা খুশি করণ যায় এহানে? চল্ শালা বাইরে, একটু হাতের সুখ কইর‍্যা লই।

হরিহর ॥ দাঁড়ান মশাইরা—দাঁড়ান। আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন, একহাতে তালি বাজে না। যিনি ধর্মাবতারের কাছে অভিযোগ করেছেন, কুলত্যাগ করে অপরাধ তিনিও কিছু কম করেননি। বিচার যদি করতে হয় ন্যায্য বিচার করুন, দণ্ড যদি দিতে হয়—তাকেও দিন। যে গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা জপ করে থাকি, সেই গায়ত্রীতে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে মশাইরা, ঐ কুলত্যাগিনীর এই সব নির্লজ্জ আচরণে। এখন তো আর সতীসাধ্বী সাজলে চলবে না! হেঃ হেঃ হেঃ!

শরৎ ॥ দেখুন চক্কোত্তিমশাই, আমি যতদূর ব্যাপারটা বুঝছি গায়ত্রী দেবীর এই অভিযোগটা মূলতঃ এই নন্দদুলাল রায়ের বিরুদ্ধে হলেও, আসলে কিন্তু বর্তমান হিন্দু-সমাজের ওপরেই একটা তীব্র তীক্ষ্ণ কষাঘাত।

অনেকে ॥ কেন? ধান ভানতে এই শিবের গীত কেন?

শরৎ ॥ দয়া করে শুনুন। গায়ত্রী দেবী যে বয়সে বিধবা হয়েছেন, সেই বয়সে মেয়েরা তাদের সংসারযাত্রা শুরু করে থাকে, জীবনে কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা—কত স্বপ্ন নিয়ে। এই কচি-বয়সে হঠাৎ যদি কালের রূঢ় আঘাতে তার বৈধব্যযোগ আসে, তার বাকী জীবনটা কি শুধু জপতপ আর উপবাসের মধ্য দিয়ে ব্যর্থ করে দিতে হবে? আর সেই জপতপ আর আচার-বিচারের কঠোর শৃঙ্খলে তার সমগ্র জীবনটা শৃঙ্খলিত রেখে তার হৃদয়টাকে—মনটাকে শুকিয়ে মারতে হবে? আমি বলব, সবচেয়ে বড় অপরাধী আমাদের রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের এই হৃদয়হীন অনুশাসন—যে সমাজে-বিধবা বিবাহের আইন থাকলেও বালবিধবাদের বিয়ে দেয় না।

[অনেকের করতালি]

কুঞ্জ ॥ Silence—Silence! আজ এখানে হিন্দু-সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানর এক্তিয়ার আমাদের নেই। বরং তোমার ঐসব বক্তৃতা ক'লকাতার গড়ের মাঠে কোন Public Meeting-এ গিয়ে কর। আমরা আপাততঃ এখানকার বাঙালী-সমাজে এসব অনাচার—এসব ব্যভিচার সইব না।

নন্দ ॥ শুনুন, দয়া করে শুনুন। পাপ সত্যিই আমি অনেক করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত আছি। বিধবা-বিবাহ আইন অনুযায়ী গায়ত্রীকে আমি বিয়ে করতে সম্মত আছি।

গায়ত্রী ॥ না, আমি সম্মত নই।

বজ্রচন্দ্র ॥ লও, হইল তো ? কেস তোমার ডিস্‌মিস্ । এখন বধ্যভূমিতে পদার্পণ করণই তোমার পরথম কাম্ ।.

[সকলের হাস্য]

কুঞ্জ ॥ Silence—Silence. Gentlemen of the Jury—মানে, জুরী মহোদয়গণ, এইবার বলুন, আসামী নন্দদুলাল রায় দোষী কি নির্দোষ ?

অনেকে ॥ দোষী—দোষী—দোষী ।

নন্দ ॥ আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি ।

অনেকে ॥ না, ক্ষমা নেই—এ পাপের ক্ষমা নেই ।

নন্দ ॥ শুনুন, আপনারা দয়া করে শুনুন । আমি এই কানমলা খাচ্ছি—নাকে খৎ দিচ্ছি । আমি পরের জাহাজে রেংগুন ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছি । মা কালীর নামে শপথ করে বলছি— এমন কর্ম আমি আর জীবনে করব না । পরের জাহাজ ছেড়ে যাবার পরও যদি আমাকে এখানে পান, আপনারা আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবেন অথবা আমার নামে ফৌজদারী মামলা দায়ের করবেন দয়া করে এ যাত্রা আমাকে ছেড়ে দিন !

কুঞ্জ । তোমরা কি বলো ?

গিরিন ॥ আমি বরং বলব, ব্যাপারটা ঐ গায়ত্রী দেবীর উপরই ছেড়ে দেওয়া হোক্ । উনি যেরূপ বলেন, তাই করা হোক্ ।

কুঞ্জ ॥ আমার আপত্তি নেই ।

যোগেন ॥ অভিযোগটা যখন উনিই করেছেন, আসামীর দণ্ডটাই উনি চান ।

সুরেন ॥ তা নয় তো কি ? নইলে কোন মেয়ে তার কলঙ্ক এমনি করে প্রচার করে ?

বজ্রচন্দ্র ॥ গায়ত্রী দেবী যখন বিচার চাইছেন—আর আসামীও দোষী সাব্যস্ত হইছে, পাঁঠাটা বলি দেওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করবেন তিনি ।

[সকলের হাস্য]

কুঞ্জ ॥ Silence—Silence. গায়ত্রী, আমাদের সাব্যস্ত হয়েছে, তুমি যা বলবে, আমরা তাই করব । তোমার কি মত ?

গায়ত্রী ॥ যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি, তারপর ওকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মেসোমশাই ।

কুঞ্জ ॥ কিন্তু গায়ত্রী, ঐ নন্দদুলাল যদি তোমাকে এখন একবার মা বলে ডাকে, তবু কি তোমার পক্ষে ওকে ক্ষমা করা সম্ভব নয় মা ?

[সকলে হাততালি দিলেন]

নন্দ ॥ মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ।

গায়ত্রী ॥ অমন কুপুত্রের মা হতে আমি চাই না । আমি শুধু চাই ওর

হাত থেকে নিষ্কৃতি। ওকে ছেড়ে দিন—ওকে আপনারা ছেড়ে দিন। ও পালাক—আমি বাঁচি।

[কাঁদিতে কাঁদিতে গায়ত্রীর ছুটিয়া প্রস্থান]

বঙ্কচন্দ্র ॥ নাও, আসামী বেকসুর খালাস।

কৃষ্ণ ॥ কেষ্ট, দরজা ছেড়ে চলে আয়। ওঁরা সব এখন চলে যাবেন। গিরিন, পাঁচকড়ির হেফাজতে এই মেয়েটাকে রাখার জন্য অল্প ভাড়ায় একটা বাসা খুঁজে দাও ওদের জন্য।

গিরিন ॥ শরৎ, তোমার শহরতলীর ঐ মিস্ত্রি-পল্লীতে একটা বাসা খুঁজে দাও না!

শরৎ ॥ খুঁজতে হবে না। মোটামুটি একটা ভাল বাসা আমার বাসার কাছেই খালি রয়েছে। এখনি পাওয়া যাবে'

কৃষ্ণ ॥ তা যদি হয়, ভালই হবে। শরৎ তবে দেখাশোনাও করতে পারবে। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। আর দরকার, পাঁচকড়ির একটা চাকরি। তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কিছু না-কিছু একটা জুটে যাবেই। আর হ্যাঁ, গায়ত্রীর একটা কাজকর্মও দেখতে হবে।

শশাঙ্ক ॥ দেখতে হবে বৈকি! অবশ্যই দেখব। আমার কাঠের গোলার জন্য একজন য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার খুঁজছি। তা আপনারা যখন বলছেন, ঐ পাঁচকড়িবাবুকেই আমি কাজটা দেব। মাসিক বেতন কিন্তু ষাট টাকার বেশি দিতে পারব না।

[সকলের হাততালি]

কৃষ্ণ ॥ এ বেশ ভালই হল। বেশ, তবে আজকের সভা শেষ। আসামী যখন অনুতপ্ত হয়ে এ দেশ ছেড়ে চলেই যাচ্ছে—চলো, হলঘরে গিয়ে চা খেতে খেতে ওকে আমরা বিদায়-সম্বর্ধনা জানিয়ে দিই। কেষ্ট, হলঘরে চা দে—

বঙ্কচন্দ্র ॥ আরে কেষ্ট, খালি চায়ে চলবো না। চায়ের সহিত টাও দিবা। এটা হইতেছে একটা Grand Farewell Party।

[সকলের হাসিতে হাসিতে হলঘরে প্রস্থান]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[রেংগুনে মিস্ত্রি পল্লীতে শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল : সন্ধ্যা। গায়ত্রী ও পাঁচকড়ির প্রবেশ]

পাঁচকড়ি ॥ ভোলা - ভোলা—শরৎদা—শরৎদা—

[বার বার চিৎকার। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলা আসিল]

ভোলা ॥ ও, এই যে রাঙাবাবু—রাঙাদিদি এসেছেন! তা কর্তা তো আপিসে, বাড়ি ফেরেননি।

পাঁচকড়ি ॥ তা অফিস তো ছুটি হয় ৪টায়, এখনও ফিরলেন না?

ভোলা ॥ কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, আমি কি করতে পারি কন!

পাঁচকড়ি ॥ আমাদের যে খুব দরকার!

ভোলা ॥ তা আপনারা বসুন। শান্তিদিকে ডেকে আনি, চা-টা করুক।

পাঁচকড়ি ॥ না না, এখন না।

গায়ত্রী ॥ শান্তিদিটি কে?

পাঁচকড়ি ॥ ঐ যাকে শরৎদা অশান্তি বলেন—রাঁধুনি।

ভোলা ॥ তা কর্তা ঠিকই কন। ওর রান্নাটা খেতে ভারী শান্তি। কিন্তু কথাবার্তা কইলেই অশান্তি। যাই আমি, ডেকে আনি।

পাঁচকড়ি ॥ না না, থাক্। শরৎদা এলেই ডেকো।

ভোলা ॥ বলেন কি রাঙাবাবু, তাহলে কি রক্ষে আছে! কর্তার হুকুম, লোকজন এলে, পান তামাক চা দিতেই হবে। তা তাঁরা খান আর না খান। এই যে, বইটই কাগজপত্তর আছে, আপনারা দেখুন।

[ভোলা ছুটিয়া ভিতরে গেল। গায়ত্রী ভারতী মাসিক পত্রিকাটি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন]

গায়ত্রী ॥ এ কি 'ভারতী' পত্রিকা রেংগুনেও আসে দেখছি!

পাঁচকড়ি ॥ শরৎদার শখের তো শেষ নেই। গানবাজনা, ছবি আঁকা—মাছ ধরা, শিকার করা—বই পড়া। ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'দিন আলাপ করেই বুঝেছি, কি অদ্ভুত লোক উনি।

[ভোলার ছুটিয়া প্রবেশ, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট ও দিয়াশলাই। সে উহা পাঁচকড়িকে দিল]

ভোলা ॥ শুরু করুন রাঙাবাবু। আমি কিছু মিষ্টি আনতে যাচ্ছি।

[বলিয়াই ছুটিল]

পাঁচকড়ি ॥ (উচ্চকণ্ঠে) না না, অশান্তি আর ক'র না।

[ঠিক সেই মুহূর্তেই শান্তির প্রবেশ]

শান্তি ॥ অশান্তি মানে !

ভোলা ॥ (অশান্তি কথাটা সামলাইতে) ওঁরা চা খাবেন না। খেলেই নাকি—অশান্তি—মানে খুব পেট গরম হয়, মাথা ধরে—বুক ধরফড় করে।

শান্তি ॥ তবে সরবৎ দিচ্ছি। (গায়ত্রীকে) রাঙাবাবু তো কয়েকবার এ বাড়িতে এসেছেন, কিন্তু আপনি তো আসেননি। আপনিই তো সেই রাঙাদি ?

গায়ত্রী ॥ কি জানি বাপু, আজই এখানে প্রথম এসেছি সত্যি—কিন্তু রাঙাদি হচ্ছি কি সুবাদে তা তো জানি না।

শান্তি ॥ বারে ! দাদাঠাকুর ঐ বলতে বলেছেন যে ! এই ভোলা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি শুনছিস ? উনুনটা জালিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে তুই বিকেলের বাজারটা সেরে আয়। আপনারা বসুন, আমি একটু সরবৎ করে আনছি।।

[ভোলা ও শান্তির প্রস্থান]

গায়ত্রী ॥ দেখুন—দেখুন পাঁচকড়িবাবু, আমাদের শরৎদা এই 'ভারতী' পত্রিকায় গল্প লিখেছেন—"বড়দিদি"।

পাঁচকড়ি ॥ সে কি, কই দেখি ? (পত্রিকাটি দেখিয়া) তাই তো ! আমি ক'লকাতায় থাকতে ঐ বড়দিদি গল্প পড়েছি। আশ্চর্য সুন্দর গল্প। কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের তো নাম দেখিনি। আমরা সবাই বলাবলি করতাম—যখন এত ভাল লেখা, রবি ঠাকুরই লিখে থাকবেন।

গায়ত্রী ॥ কিন্তু ১৩১৪ সালের এই আষাঢ় সংখ্যাটিতে দেখছি, লেখকের নাম দিয়েছে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্পটাও এই সংখ্যাটাতে শেষ হয়েছে। আমি কিন্তু সত্যিই অবাক হ'চ্ছি পাঁচকড়িবাবু, এত বড় লেখক রেংগুনের এই বস্তিতে লুকিয়ে আছেন !

পাঁচকড়ি ॥ কিন্তু শরৎদা এ কয়দিনে আমাদের কত কথাই-না বলেছেন। বড়দিদি যদি তাঁর লেখা হত, তিনি কি চুপ করে থাকতেন ? খুব জাঁক করেই বলতেন। এ হয়তো আর কোন শরৎবাবু।

গায়ত্রী ॥ পাঁচকড়িবাবু, শরৎদা লোকটি একটু অসাধারণ বলেই, সাধারণ যা করেন, তা করেননি।

পাঁচকড়ি ॥ গল্পটা উনি কি করে শেষ করেছেন, ক'লকাতা গিয়েই পড়ব। তুমি যখন থেকেই যাচ্ছ, শরৎদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ে নিও। দেখো, গল্পটাতে বিধবা যুবতী মাধবীর চরিত্রটা দেখো। সেই যে বলে না—'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' বড়দিদি মাধবীর চরিত্রটা হুবহু তাই।

গায়ত্রী ॥ বিধবাদের ও ছাড়া গতিই বা কি ? কথা বলার স্বাধীনতা তাদের কোথায় ?

[শান্তি দুই গ্লাস সরবৎ লইয়া প্রবেশ করিল এবং ইহাদের দিতে গেল। পাঁচকড়ি গ্লাসটি লইল, কিন্তু গায়ত্রী লইল না]

গায়ত্রী ॥ সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে আমি কিছু মুখে দিই না ভাই।

শান্তি ॥ তবে আর জোর করব কি করে? ঢেকে রেখে দিচ্ছি, দাঠাকুর এসে খাবেন এখন।

গায়ত্রী ॥ উনি বুঝি সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছু করেন না?

শান্তি ॥ সন্ধ্যায় নামগান করেন, আর ফাঁক পেলেই গায়ত্রী জপেন। আপনার খুব সুবিধে রাঙাদি।

গায়ত্রী ॥ কি সুবিধা?

শান্তি ॥ আপনার নামই গায়ত্রী। জপ করলেও গায়ত্রী—না করলেও গায়ত্রী।

[তিনজনেই হাসিয়া উঠিল]

গায়ত্রী ॥ নামগান যে করেন, একাই করেন, না আরও লোকজন আসেন?

শান্তি ॥ তারও কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোনদিন করেন, কোনদিন করেন না। মানে, ভারী খামখেয়ালী লোক। আপিস থেকে ফেরার পথে যেদিন বেলফুলের মালা কিনে আনেন, সেদিন মালাটি তুলসী গাছে চড়িয়ে দেন। আর আমাদের নিচের বস্তি থেকে আমার বাবা আর সব মিস্ত্রিবাবুদের ডেকে এনে নামগানের আসর বসিয়ে দেন। হরির লুটের সময় খুব হৈ-হুল্লোড় হয়। তারপর একটু বেশি রাতে বেসামালও হয়ে পড়েন অনেকে। আমার পিতাঠাকুরটি তো এই সুযোগই খোঁজেন।

গায়ত্রী ॥ তোমার মা নেই?

শান্তি ॥ না রাঙাদি, মা থাকলে আজ আমার এই দুর্গতি! বামুনের মেয়ে হয়ে নিচের বস্তিতে অজাত-কুজাত মিস্ত্রিদের সঙ্গে ঘর নিয়ে বাস করতে হচ্ছে। আমার দুঃখের শেষ নেই রাঙাদি। এই দাদাঠাকুরের রান্নাবান্না করে দিই, তাই ভাত-কাপড় জোটে। নইলে, আমার বাপের কীর্তি আর কি বলব! যা রোজগার করেন, নেশা-ভাঙে উড়িয়ে দেন। এই যা! বাবাই আসছেন!

[হরিহর চক্রবর্তীর প্রবেশ]

শান্তি ॥ এ কি বাবা, তুমি এখন এখানে?

হরিহর ॥ ওরে শান্তি, তোকে আমি সাবধান করে দিতে এলাম।

শান্তি ॥ কি হয়েছে, কি সাবধান?

হরিহর ॥ শরৎঠাকুর আজ এক কীর্তি করে বসেছেন।

শান্তি ॥ বলো-না কি করেছেন!

হরিহর ॥ এঁরা সব রয়েছেন, বলব?—তা বলাই ভাল, ওঁদেরও সাবধান থাকাই উচিত। শরৎঠাকুর আজ আপিসে যাননি।

শান্তি ॥ তবে কোথায় গেছেন?

হরিহর ॥ সুরেন মামার কাছে খবর পেলাম, বেণিপাড়ায় সেই যে নামকরা বাসন্তী বাঈজী, সে কাল বসন্তে মারা গেছে।

শান্তি ॥ আ—হা—হা—হা! এই তো কিছুদিন আগে এই বাড়িতে —এই ঘরেই এসে দাঠাকুরকে কি সুন্দর সব খেয়াল ঠুংরী গান শুনিয়ে গেছে!

হরিহর ॥ হলে কি হবে, বেবুশ্যে তো! শখের পায়রা নিয়ে কারবার। বসন্ত রোগে মারা যেতেই সব পায়রা ভয়ে উড়ে গেছে। এখন লাশটি পোড়ায় কে?

শান্তি ॥ দাঠাকুর বুঝি সেই বসন্তের মড়া পোড়াতে গেছেন?

হরিহর ॥ যাবেনই। আমি তো বলি—শরৎঠাকুর, আমাদের নেশা একটা, কিন্তু তোমার দুটো নেশা। এক নম্বর নেশা—মদ খাওয়া, দু'নম্বর নেশা—মড়া পোড়ান। কিন্তু আজ যে ঐ মড়া পুড়িয়ে কি সর্বনাশ হয়, আমি ভাবতে পারছি না রে শান্তি। অমন ছোঁয়াচে রোগ তো আর দ্বিতীয় নেই! সুরেন বললে—এ নাকি সেই জাতের বসন্ত, যা নাকি শিবেরও অসাধ্য! সেই ছোঁয়াচ লেগেছে শরৎ ঠাকুরে। বুঝলি শান্তি, দিন সাতেক দেখতে হবে। এই দিন সাতেক তোর এ বাড়ির ছায়া মাড়ান চলবে না। আমি মিস্ত্রিদেরও এই কথাই বলে দিয়েছি, সবাই তো ভয়ে কাঁপছে। আপনারাও মশাই সরে পড়ুন। শ্মশান থেকে শরৎঠাকুরের বাড়ি ফেরবার সময় হয়ে গেছে। চল্, ঘরে যাবি চল্।

শান্তি ॥ দাঠাকুর যা করেছেন, সেটা মানুষের মধ্যে যাঁরা দেবতা, শুধু তাঁরাই করে থাকেন। আমাকে যদি তুমি এমনি করে তাঁর কাজ ছেড়ে দিতে বলো তবে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমার কোন ছোঁয়াচে অসুখ-বিসুখে আমি তোমার ত্রিসীমানাতেও যাব না।

হরিহর ॥ য়্যাঁ!

শান্তি ॥ যাব না—যাব না—যাব না। এই তিন সত্যি রইল।

হরিহর ॥ ওরে বাবা! না না, তুই থাক্। আমার যা বলার বলেছি। এখন তুই যা ভাল বুঝিস—কর্। থাকতে হয় থাক্—বাঁচতে হয় বাঁচ্—মরতে হয় মর্। কিন্তু আমাকে অমন করে মারিস নে মা।

[হরিহরের প্রস্থান। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। শান্তি বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াই হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল]

শান্তি ॥ দাঠাকুর আসছেন, স্নান করে ভিজে কাপড়েই আসছেন। (ছুটিয়া আসিয়া) আপনারা বসবেন, না চলে যাবেন?

গায়ত্রী ॥ না, আমরা থাকব। ওঁর কি দরকার তুমি দেখ।

শান্তি ॥ হ্যাঁ, দেখছি—

গায়ত্রী ॥ এখন বোধ হয় একটু গরম দুধ বা চা—

শান্তি ॥ দুধ উনি খান না। কিছু যদি মনে না করেন—ঐ যে, ঐ রান্নাঘরে চায়ের জল ফুটছে—

গায়ত্রী ॥ আমি যাচ্ছি।

[গায়ত্রী রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে ত্বরিৎপদে চলিয়া গেলেন।
দ্বারপথে সিক্তবস্ত্রে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ, শান্তি ছুটিয়া
গিয়া সামনে দাঁড়াইল]

শরৎ ॥ (হাস্যমুখে) এই যে, পাঁচকড়ি ভাই যে? একটি মড়ার মত মড়া পুড়িয়ে এলাম হে।

শান্তি ॥ আমরা জানি, বাবা এসে জানিয়ে গেছেন।

শরৎ ॥ হাঁ, আমি সুরেন মামাকে তোমাদের সব খবর দিতে বলেছিলাম। তুমি বস পাঁচকড়ি, আমি কাপড়চোপড় ছেড়ে আসছি।

[শান্তির সহিত শরৎচন্দ্র ভিতরে চলিয়া গেলেন। পাঁচকড়ি অস্থিরচিত্তে পায়চারি করিতে লাগিল। কিশোরী কন্যা মোক্ষদাসহ কীর্তন গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রবেশ। কীর্তন শেষে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ]

শরৎ ॥ এ না হলে কৃষ্ণদাস অধিকারী? ঠিক এই সময় আমার মনে যে ভাবটি উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, কি আশ্চর্য! আপনার ঐ গানটিতেই তা ভাষা পেল। রাতটা আজ এখানেই থেকে যান না!

কৃষ্ণদাস ॥ না বাবাঠাকুর, আজ দুর্গাবাড়িতে গান হবে—প্রসাদও হবে। আমি শুধু এসেছিলাম জানতে, আমার মেয়েটার কোন একটা গতি করতে পারলে বাবাঠাকুর? কচি মেয়েটাকে নিয়ে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আর কদ্দিন ভবঘুরে হয়ে পড়ে থাকব? তোমাদের আপিসের সেই পাত্রটি—

শরৎ ॥ হবে—হবে। আপনি তো জ্ঞানী মানুষ। আপনার জন্যে আমরা চেষ্টা কিছু কম করছি না। ফলটা ধীরে ধীরে পাকছে। কিন্তু কবে টুপ্ করে হাতের মুঠোয় পড়বে তা কেউ জানে না। শাস্ত্রে বলে 'মা ফলেষু কদাচন'।

কৃষ্ণদাস ॥ যা বলেছ। তা বাবাঠাকুর, তুমি তো এই বয়েসে কম জ্ঞানী নও। তাহলে চলি, আমার বেশ দেরিই হয়ে গেছে। (মোক্ষদা শরৎকে প্রণাম করিল) হরি কৃপাহি কেবলম্! হরি কৃপাহি কেবলম্।

[বলিতে বলিতে মোক্ষদাসহ কৃষ্ণদাসের প্রস্থান]

শরৎ ॥ এই শান্তি, দু'পেয়ালা গরম চা!

[গায়ত্রী একটি ট্রেতে দুইজনের উপযোগী চা ইত্যাদি লইয়া
প্রবেশ করিল]

শরৎ ॥ এ কি—গায়ত্রী! তুমি! ব্যাপার কি?

পাঁচকড়ি ॥ আমরা খুব বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

শরৎ ॥ গায়ত্রী, তোমার চা ?

গায়ত্রী ॥ আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক এখনও হয়নি শরৎদা ।

শরৎ ॥ ও ! হ্যাঁ, তা বিপদটা কি ?

গায়ত্রী ॥ চায়ে চিনি কম হয়নি তো ?

শরৎ ॥ না না, ঠিক হয়েছে—সুন্দর চা হয়েছে । চমৎকার ! এমনি এক পেয়ালা চায়ের জন্যই প্রাণটা আইঢাই করছিল । তা শান্তিও কিন্তু খুব সুন্দর চা করে । ঐটাই শান্তি—আর সব অশান্তি ।

গায়ত্রী ॥ না না, দেখলাম তো, শান্তি খুব ভাল মেয়ে ।

শরৎ ॥ ভাল তো নিশ্চয়ই । নইলে, এমন একটা খাপছাড়া লোকের সব অত্যাচার সয়ে চাকরি করে যাচ্ছে আজ কয়েক বছর ! যাক্‌গে, কি বিপদ পাঁচকড়ি ?

পাঁচকড়ি ॥ শরৎদা, আজ টেলিগ্রাম পেলাম—বাবা মৃত্যুশয্যায় । আমাকে পরের জাহাজেই দেশে যেতে বলেছেন ।

শরৎ ॥ সত্যিই দুঃসংবাদ । বিশেষ তোমার যখন একটা চাকরিও হয়ে গিয়েছিল এখানে । দেশে তো চাকরি-বাকরি মেলা ভার । সে যাক্‌, তুমি কবে যাচ্ছ ?

পাঁচকড়ি ॥ কালই একটা জাহাজ ছাড়ছে । কিন্তু বিপদ হয়েছে গায়ত্রী দেবীকে নিয়ে । আমি চলে গেলে উনি একা ও বাড়িতে থাকবেন কি করে ?

শরৎ ॥ হুঁ ! আচ্ছা, কুঞ্জবাবুকে আমরা গিয়ে ধরি, তাঁর বাড়িতে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আশ্রয় দিতে ?

পাঁচকড়ি ॥ শরৎদা, টেলিগ্রাম পেয়েই আজ আমি কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি । তিনি ভেতরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, বাইরে এসে আমাকে জানালেন—পারবেন না । মনে হল, তাঁর স্ত্রীর আপত্তি আছে ।

শরৎ ॥ হুঁ ! তবে ? আচ্ছা গায়ত্রী, তুমি তো রেংগুনে স্বেচ্ছায় আসনি, নন্দদুলাল তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে এনেছিল । দেশে ফিরে যেতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে ?

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

পাঁচকড়ি ॥ ঠিক এই কথাই আমিও ওঁকে বলেছি ।

শরৎ ॥ উনি কি বলেছেন ?

গায়ত্রী ॥ দেশে আমি আর যাব না । শ্বশুরবাড়িতে স্থান না পেয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম । কিন্তু সেই বাপের বাড়িতেও আজ আমার স্থান নেই । এই কালামুখ দেশে আর আমি দেখাতে পারব না শরৎদা । (কাঁদিয়া ফেলিল) আমি উচ্চ-বৃত্তি পরীক্ষা পাস করেছি । সেলাইয়ের কাজকর্ম জানি, রান্নাবান্নাও জানি, ছোট ছেলেমেয়েদের গানবাজনাও শেখাতে পারি, কোন

হাসপাতালে নার্সের কাজও চালিয়ে দিতে পারব, এ ভরসা রাখি। এ দেশ থেকে আমাকে তাড়াবেন না। দয়া করে আমাকে কোন একটা কাজ দিয়ে আমাকে মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই দিন।

শরৎ ॥ আচ্ছা পাঁচকড়ি, শশাঙ্কবাবু তো সেদিন এক কথায় তোমাকে একটা চাকরি দিয়ে দিলেন। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়ানো আর গান শেখানোর জন্য ওঁকে একটা কাজ দিতে পারেন না?

পাঁচকড়ি ॥ টেলিগ্রামটা নিয়ে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করার পর তার সঙ্গেও আমি দেখা করেছি। কলকাতা যাবার ছুটি চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তিনি তিনমাসের ছুটি দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গায়ত্রী দেবীর কথা তুলে বললেন—ও বাড়িতে একা থাকা ওঁর চলবে না। ওঁকে আমার বাড়িতে রেখে যাও। আমার স্ত্রী চিররুগ্ণা, চলাচল শক্তিও নেই। গায়ত্রী এসে আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার নিন। ভাল বেতনই আমি দেব।

শরৎ ॥ তবে আর সমস্যাটা কি?

গায়ত্রী ॥ পাঁচকড়িবাবু অফিস থেকে ফেরার আগেই ঐ প্রস্তাবটা নিয়ে তিনি স্বয়ং ছুটে এসেছিলেন আমার বাসায়, আজ বেলা দুটোয়। আমার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত আমাকে জাগিয়ে তুলে যে চোখে প্রস্তাবটা তিনি আমাকে দিয়েছেন, সেটা মানুষের চোখ নয় শরৎদা—ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। আমি চেঁচামেচি করে জানোয়ারটাকে একরূপ তাড়িয়েই দিয়েছি শরৎদা।

শরৎ ॥ যাক্, ব্যাপারটা তবে শেষ হয়ে গেছে।

গায়ত্রী ॥ না শরৎদা, শেষ মোটেই হয়নি। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন—কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় তবু একবার ভেবে দেখ গায়ত্রী। আজই রাতে তোমার কাছে আমি আবার আসব।

শরৎ ॥ বটে!

গায়ত্রী ॥ হ্যাঁ।

শরৎ ॥ তাই তো!

গায়ত্রী ॥ (পাঁচকড়িকে) আসুন পাঁচকড়িবাবু। শরৎদা, একটা বেশ্যার মড়া পোড়ানোর চেয়ে একটা মেয়েকে বেশ্যা হতে না দেওয়াটা কিছু কম কি?—ভেবে দেখুন।

[গায়ত্রী ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচকড়ি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ভোলা এবং শান্তিকে ডাকিতে লাগিলেন]

শরৎ ॥ ভোলা—ভোলা, শান্তি—শান্তি! [উভয়েই ছুটিয়া আসিল]

শরৎ ॥ শান্তি. এক্ষুনি সুরেন মামাকে একবার ডেকে আনতে পারিস?

শান্তি ॥ কেন পারব না দাঠাকুর?

শরৎ ।। বললি, খুব জরুরী দরকার। যা ভো।

[শান্তি ছুটিয়া গেল]

ভোলা, আমার সেই গুপ্তি লাঠিটা বের কর্ দেখি। আরে, সেই লাঠিটা—যার পেটের ভেতর একটা তরোয়াল লুকানো থাকে।

[ভোলা শুনিয়াই হাত দিয়া তরোয়াল ঘুরাইতে ঘুরাইতে
ছুটিয়া চলিয়া গেল। সুরেন মান্নাসহ শান্তির প্রবেশ]

শান্তি ॥ মান্নামশাই আপনার কাছেই আসছিলেন দাঠাকুর।

সুরেন ॥ ব্যাপার কি শরৎদা ?

শরৎ ॥ আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি—ছোট্ট চিঠি। চিঠিটা নিয়ে তোমাকে এখনি সাইকেলে ছুটে যেতে হবে শশাঙ্কমোহনের কাছে, চিঠিটা তাঁর হাতে দিতে। পারবে কি ?

সুরেন ॥ কেন পারব না ? আপনার কোন কাজ করে দিতে পারলে আমার যে কি আনন্দ, সে তো আপনি জানেন।

শরৎ ॥ এস।

[সুরেনসহ শরৎচন্দ্রের প্রস্থান]

শান্তি ॥ ব্যাপার কি ! এ যে দেখছি এক কুরুক্ষেত্র ! গায়ত্রী রূপ নিয়ে দুই বামুনের যুদ্ধ। আমি তো দেখেই বুঝেছি, রূপ তো নয়—যেন আগুন। ঐ অশান্তির ভয়েই ভগবান আমাকে রূপ না দিয়ে, নাম দিয়েছেন—শান্তি।

[শান্তির প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[পাঁচকড়ির বাসা। কাল : রাত্রি। ঈষৎ মত্ত অবস্থায়
গুপ্তি হাতে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ]

শরৎ ॥ এ কি, সব যে নিঝুম ! (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন) পাঁচকড়ি—ও পাঁচকড়ি !

[গায়ত্রীর প্রবেশ]

গায়ত্রী ॥ যাক্, তবু ভাগ্যি আপনি এসে গেছেন। আমি তো একা একা বসে বসে ভয়ে কাঁপছিলাম।

শরৎ ॥ কেন ? পাঁচকড়ি—পাঁচকড়ি কোথায় ?

গায়ত্রী ॥ তাঁর কথা আর বলেন কেন ? একে তো শরীর খারাপ, তার উপর বাপের ঐ খবর। সবার উপর আজ রাতে না-জানি কি হয়, এই দুশ্চিন্তায়—

শরৎ ॥ গায়ত্রী জপছে ?

গায়ত্রী ॥ আমার নামটাই হয়েছে দেখছি, আমার কাল।

শরৎ ॥ বলো কি ? আমি তো এখন ঐ একটি মন্ত্রই জপ করছি। একটিবার ডেকে আন তো পাঁচকড়িকে, দরকার আছে।

[কিন্তু দেখা গেল পাঁচকড়ি আসিতেছে]

পাঁচকড়ি ॥ এই যে শরৎদা, আপনি এসে গেছেন ? আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কি সব দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে ডাকছেন। আপনিই বোধ হয় ?

শরৎ ॥ না কি শশাঙ্কবাবু ?

পাঁচকড়ি ॥ (আতঙ্কে) ওরে বাবা ! এসে গেছে নাকি, কোথায় ?

শরৎ ॥ আপাততঃ আমার পকেটে, এই দেখ।

[শরৎচন্দ্র পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া পাঁচকড়ির হাতে দিলেন]

চিঠিটা বড় করে পড় তো। তোমার কর্তার হাতের লেখাটা তো তোমার চেনার কথা।

পাঁচকড়ি ॥ হ্যাঁ শরৎদা, শশাঙ্কবাবুরই স্বহস্তে লেখা। চিঠিটা দেখছি আপনাকে লিখেছেন।

গায়ত্রী ॥ আঃ, কি লিখেছেন, পড়ুন না পাঁচকড়িবাবু।

পাঁচকড়ি ॥ (পত্রপাঠ)

প্রিয় শরৎবাবু,

সুরেন-মামার হাতে আপনার চিঠি পেয়েছি। সত্যিই আমার মতিভ্রম হয়েছিল। সাময়িক এই চিত্তবিকারের জন্য আমি এখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত। একথা খুবই সত্য, যে অভিযোগ আপনার কাছে করা হয়েছে, সে অভিযোগ কুঞ্জদার কাছেও করা সম্ভব ছিল। আর তা হলে, সমাজে শুধু আমার প্রতিষ্ঠাই নষ্ট হত না, আমার ব্যবসাটিরও গুরুতর ক্ষতি হত। তাই শরৎবাবু, আপনি আমাকে সময়মত সাবধান করে দিয়ে পরম বন্ধুর কাজই করেছেন। আমার এই কথাগুলি আপনার সঙ্গে দেখা করে মুখেও বলতে পারতাম। কিন্তু আমার আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ এই স্বাক্ষরিত চিঠি দেওয়াই সঙ্গত মনে করলাম। যিনি অভিযোগ করেছেন, এই চিঠিখানি আপনি তাঁকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন। আশা করি এ ব্যাপারটাতে এখানেই যবনিকা পড়বে এবং এটা চিরতরে গোপনই থাকবে।

শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়

গায়ত্রী ॥ আপনি একটা পশুকে দেবতায় পরিণত করেছেন শরৎদা। সেজন্য আপনাকে একটিবার আমায় প্রণাম করতে দিন। না না, বাধা দেবেন না। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই সঙ্গে সেই শশাঙ্কবাবুর উদ্দেশ্যেও আমি আমার মুগ্ধ প্রণতি জানাই। (উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাইয়া) কিন্তু আপনাকে আরও একটি প্রণাম করতে চাই আমি—

শরৎ ॥ (হাসিয়া) না না, এত প্রণামে আমার পা খোঁড়া হয়ে যাবে যে গায়ত্রী। ব্যাপার কি?

গায়ত্রী ॥ আপনিই যে স্বনামধন্য লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এটা আবিষ্কার করেছি আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়িতে 'ভারতী' পত্রিকা দেখে।

পাঁচকড়ি ॥ হ্যাঁ শরৎদা, আমি 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র প্রথম দুই সংখ্যা পড়েছিলাম। কি অদ্ভুত আপনার মননশীলতা আর মানবিকতা!

গায়ত্রী ॥ আর তার ফলেই দুরন্ত অস্পৃশ্য রোগে মৃত অন্ত্যের অস্পৃশ্যা পতিতা নারীর শবদাহ করেন আপনি।

পাঁচকড়ি ॥ আর তারই ফলে শশাঙ্কমোহনের মত কলঙ্কী চাঁদকেও নিষ্কলঙ্ক করতে পারেন আপনি।

[উভয়েই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন শরৎচন্দ্রকে—
কোন বাধা মানিলেন না]

শরৎ ॥ এ তো দেখছি, আমাকে পালাতে হবে এখান থেকে!

পাঁচকড়ি ॥ না না, শরৎদা, পালাচ্ছি আমি। কাল ভোরেই আমাকে জাহাজ ধরতে ছুটতে হবে। আপনারা দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করুন, কাল থেকে গায়ত্রী দেবী কোথায় থাকবেন?

শরৎ ॥ সে আলোচনায় তোমারও থাকা আবশ্যক পাঁচকড়ি।

পাঁচকড়ি ॥ কিছুমাত্র না। আমি জানি আপনি যখন রয়েছেন, গায়ত্রী দেবী সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাঁকে দেখাশোনার ভারটা আমি আপনাকে আজ দেওয়ার বহু আগে স্বয়ং কুঞ্জবাবু সেদিনকার সেই সভাতেই আপনাকেই দেননি কি? নিন, আপনারা আলোচনা করুন। শরৎদা, আমার বিছানার পাশে আপনার বিশ্রামের সেই বিছানা পাতা রয়েছে, দরজাও খোলা রইল। এই রাতে আর বাড়ি না গিয়ে শুতে হলে, ওখানেই গিয়ে শোবেন। আচ্ছা চলি।

[পাঁচকড়ির প্রস্থান]

শরৎ ॥ কিছু মনে কর না গায়ত্রী, মদ্যপান আমার জীবনের একটি অঙ্গ। নেশাটা শুরু হয়েছে বছর ষোল বয়স থেকে। কোন উপদেশ দেওয়া বৃথা। মার কথাই যখন রাখিনি, তোমার কথাও রাখতে পারব না। যদি আপত্তি কর, চলে যাচ্ছি।

গায়ত্রী ॥ আমি আগেও আপত্তি তো করিনি শরৎদা।

শরৎ ॥ (পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া এক ঢোক খাইয়া বোতলটি আবার পকেটে রাখিলেন) নির্জলা খাওয়া কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু বেসামাল আমি হবো না। দেখেছো তো—আমি মদ খাই, কিন্তু মদ আমাকে খেতে পারে না।

গায়ত্রী ॥ কিন্তু শুনেছি, লিভরটা খেয়ে ফেলে। কিন্তু এটাও আপনি কিছু নতুন শুনছেন না, হাজারও জনে হাজারও বার একথা আপনাকে বলে থাকবেন।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, তা বলেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ, আজ পর্যন্ত আমার জীবনে এমন কোন লোক আসেনি, যে হয়তো একবার বললেই তার কথা না শুনে উপায় ছিল না। সে কথা যাক্। এখন তোমাকে নিয়ে কি করা যায় বলো?

গায়ত্রী ॥ সেটা তো আজ আপনার বাড়িতে গিয়েই বলে এসেছি।

শরৎ ॥ পাঁচকড়ির সঙ্গে তুমি দেশে ফিরবে না?

গায়ত্রী ॥ না।

শরৎ ॥ সমাজসেবী কুণ্ড-দম্পতি তোমাকে আশ্রয় দেবেন না?

গায়ত্রী ॥ না।

শরৎ ॥ শশাঙ্কমোহনের প্রস্তাবে তুমি রাজীও হলে না?

গায়ত্রী ॥ না। রাজী হলে কি আপনি খুশি হতেন শরৎদা?

শরৎ ॥ না। খুশিই যদি হব, তবে তাঁকে ঠেকাতে যাব কেন? নাঃ, এ তো মহাবিপদ হল! তোমাকে নিয়ে এখন আমি কি করি বল তো? (হঠাৎ) বিয়ে করবে?

গায়ত্রী ॥ (চমকিত হইয়া) বিয়ে!

শরৎ ॥ হ্যাঁ গো, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দয়ায় বিধবা বিয়ে তো এখন আইনসম্মত।

গায়ত্রী ॥ আইনসম্মত, কিন্তু সমাজে অচল।

শরৎ ॥ (চটিয়া গিয়া) সমাজে অচল—সমাজে অচল—সমাজে অচল! যত সব ভীরু—কাপুরুষের দল! যাদের দুঃখ দেখে বিধবা বিবাহ আইন পাস হল, সেই বালবিধবারাই যদি আইনের সুযোগ না নেয়, আর কান্নাকাটি করে—আমার কি হবে গো! তার জন্য আর যার সহানুভূতি থাক্, আমার কোন সহানুভূতি নেই।

গায়ত্রী ॥ আপনি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন শরৎদা? আবার একটা বিয়ে করাই যে বিধবাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এ আপনাকে কে বলেছে শরৎদা? অন্ততঃ আমার তা নয়।

শরৎ॥ হ্যাঁ।

গায়ত্রী॥ হ্যাঁ। তাছাড়া, বিয়ে যে আমি না করেছি তাও তো নয়। এমনও তো হতে পারে—(হঠাৎ থামিয়া গেলেন)

শরৎ॥ কি হতে পারে—বলতে বলতে থেমে গেলে কেন?

গায়ত্রী॥ না, থামবই-বা কেন? বলতে আমার ভয়টাই-বা কি?

শরৎ॥ হ্যাঁ, বল।

গায়ত্রী॥ এমনও তো হতে পারে, আমি বিধবাবিবাহ চাই না। আইন আছে বলেও চাই না—সমাজে চালু থাকলেও চাইতাম না।

শরৎ॥ কিন্তু নন্দদুলালের সঙ্গে ঘর ছেড়ে রেংগুনে এসেছিলে কেন গায়ত্রী?

গায়ত্রী॥ রেংগুনের হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে দেবে কথা দেওয়াতেই তার হাত ধরে এসেছিলাম।

শরৎ॥ কিন্তু চাকরিই যে তোমাকে করতে হবে, একথাটা আঁকড়ে ধরে আছ কেন?

গায়ত্রী॥ বিয়ে করতে যখন রাজী নই—চাকরি ছাড়া আমার গতি কি আপনিই বলুন না শরৎদা?

শরৎ॥ হুঁ, তাও বটে। শশাঙ্ক যে প্রস্তাব দিয়েছিল সেটা প্রকারান্তরে রক্ষিতা হয়ে থাকার কথাই বলেছিল। তা দেখলাম রক্ষিতা হয়ে থাকতেও তো তোমার নিদারুণ আপত্তি। বরং বলব, নন্দদুলালই সুস্পষ্ট ভাষায় বিধবাবিবাহ আইনে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সেও তো তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ। নন্দদুলালের সমগ্র আচরণটাই কুৎসিত—কদর্য ছিল। (আবেগে) গায়ত্রী—গায়ত্রী—কিন্তু এমন যদি কোন লোক তোমাকে আজ বিয়ে করতে চায়, যাকে তুমি শ্রদ্ধাভরে বার বার প্রণাম কর? [গায়ত্রী দুই কান হাতে ঢাকিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন]

গায়ত্রী॥ আঃ—!

শরৎ॥ গায়ত্রী—গায়ত্রী—তোমাকে দেখা অবধি আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়েছি। জানি না—কি বলতে কি বলছি!

গায়ত্রী॥ ওসব কথা থাক—থাক্ শরৎদা। শুধু তো প্রণাম নয়, আপনার লেখা পড়ে আপনাকে যে আমি মনে মনে পূজা করি শরৎদা!

শরৎ॥ যে লেখা আমার পড়েছ—সে তো রক্ত। অত রক্ত কেন জানো? প্রথম জীবনে একটি মেয়েকে আমি আমার সমস্ত সত্বা দিয়ে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু তাকে আমি পেলাম না। আজ তোমাকে যদি

পেতাম, রক্তাক্ত হতো না আমার লেখা, হতো আনন্দের উৎস। আসবে নাকি তুমি আমার জীবনে? আসবে?

গায়ত্রী ॥ তবে শুনুন শরৎদা। প্রথম জীবনে আমিও একটি ছেলেকে ভালবেসেছিলাম। আমি কিন্তু তাকে পেয়েছিলাম। আর, অমন পাওয়া বুঝি কেউ পায় না শরৎদা। অনেক কিছু ঐশ্বর্য ছিল তার। অসবর্ণা এই দীনদরিদ্র মেয়েটিকে বিয়ে করতে সব ঐশ্বর্য তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। নিঃস্ব হয়েই ঘর বেঁধেছিলাম আমরা। কিন্তু প্রেমের ঐশ্বর্য আমাদের স্বর্গসুখে রেখেছিল। আমাদের অমন সুখ বোধ করি বিধাতার সইল না। রক্ষণশীল অভিজাত সমাজের ষড়যন্ত্রে নিহত হল আমার সেই প্রিয়তম। স্বামীর সেই অক্ষয় স্মৃতি—সেই অনন্ত প্রেম, আজও এই বালবিধবার বুকের ধন হয়ে রয়েছে। আমার কাছে তাই নন্দদুলালের কোন দাম নেই, শশাঙ্কমোহনের কোন দাম নেই, আর অমন যে স্বনামধন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁরও কোন দাম নেই। [কাঁদিতে কাঁদিতে গায়ত্রী ছুটিয়া চলিয়া গেলেন]

শরৎ ॥ গায়ত্রী—গায়ত্রী—তুমি আমাকে বার বার প্রণাম করেছ। এবার প্রণাম করার পালা, তোমাকে—আমার। আমার প্রেমের এই অপবিত্র অর্ঘ্য নিয়ে তোমার স্বর্গীয় প্রেমের এই পুণ্য-মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি পালাই—আমি পালাই—

[শরৎচন্দ্রের প্রস্থান]

———

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

প্রথম কাণ্ড

[শরৎচন্দ্রের বাসা। কাল: সকাল। দৃশ্যটি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। একতলার কোন বাসিন্দা 'হরেকৃষ্ণ' নাম গান গাহিতেছে। শান্তি একটি পাত্রে কিছু ফুল লইয়া গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে গাহিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিল যে, এই বাসার সকলে এখনও নিদ্রিত, সেই মুহূর্তে তাহার কণ্ঠের সুর স্তব্ধ হইয়া গেল]

শান্তি ॥ বাঃ চলে! এ রাজ্যে দেখছি এখনও ভোর হয়নি! মুনিবটি ঘুমোচ্ছেন তো চাকরটিরও ওঠবার নাম নেই। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) ভোলা—এই ভোলা! এরা সব আছে বেশ। কাল রাতে মদ খেয়ে এখানে খুব ঢলাঢলি হয়েছে নিশ্চয়ই। আমি আছি বেশ! নিচে

রাত-দুপুর পর্যন্ত চলে বাপের গাঁজা-ভাঙের আড্ডা, আর ওপরে মনিবের এই মদের ফোয়ারা। আমি এখানে থাকব না, আমি কলকাতা পালাব। লোকে কলকাতা থেকে পালিয়ে এখানে আসে· আমি এখান থেকে কলকাতায় পালাব। শহর থেকে দু'মাইল দূরে মিস্ত্রিদের এই বস্তিতে কোন বামুনের মেয়ে টিকতে পারে! মামাকে লিখে পাঠিয়েছি—টাকার যোগাড় হলেই আমি পালাব। যাঃ বাবা, ভোলাটা এখনও এল না!—এই লাটসায়েবের নাতি—খেয়াল আছে যে, সূর্যিঠাকুর মাথায় চড়ছেন? তোর কাজকর্ম সব করবে কে শুনি?—এই ভোলা—ভোলা—

[চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ভোলার প্রবেশ]

শান্তি ॥ এই যে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে দেখছি! তা কাল রাতে বুঝি খুব—চলেছে? [ভোলা নীরবে মাথা নাড়িয়া সমর্থন জানাইল]

শান্তি ॥ দলবল এসেছিল? [ভোলা মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না']

শান্তি ॥ তবে?

ভোলা ॥ একাই একশো—

শান্তি ॥ খাওয়া-দাওয়া?

ভোলা ॥ ঐ মদই খেয়েছেন—আর কিছু নয়।

শান্তি ॥ তুমি?

ভোলা ॥ উনি না খেলে আমি কি করে খাই?

শান্তি ॥ কেন, উনি যা খেলেন তার একটু পেলাদ—গিললেই তো হতো। [ভোলা লজ্জায় জিভ কাটিল]

শান্তি ॥ ওঃ, লজ্জার বহর দেখে বাঁচিনে! তা এখন মানিবটির ঘুম ভাঙাও। ধরাধরি করে কুয়োতলায় নিয়ে যাও—চান করাও। যাও!

ভোলা ॥ ওরে বাবা! ও আমি পারব না। লাথি খাবে কে?

শান্তি ॥ তবে কে পারবে শুনি?

ভোলা ॥ পারবে, তুমিই পারবে শান্তিদিদি। আমি বরং উনুনটা ধরিয়ে দিই গে, চা করতে হবে তো।

শান্তি ॥ আপ, খোরাক পাঁচ টাকা মাইনেতে আমি তোর বাবুর রান্নার কাজ করি। ঘুম ভাঙতে গিয়ে লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। নেহাৎ পাড়ার দাদাঠাকুর—সবাই মান্য-মাননা করে—ভালবাসে, তাই আমিও একটু মাঝে মাঝে ব্যাগার খাটি। নইলে, আমার কি? মদ গিলে উনি যদি এ বস্তির আর দশ জনের মত গোল্লায় যান, আমার কি বলবার? তবে হ্যাঁ, পাঁচজনের উপকার করে বেড়ান, সেইটে বন্ধ হবে। তাই না যা একটু দেখাশোনা করি! নইলে আমার ভারি দায় পড়েছে!

[কথার মাঝে ভোলা চলিয়া গেল। কথার শেষাংশে শরৎচন্দ্র নিদ্রাচ্ছন্নভাবে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন]

শরৎ ॥ কে রে, বক্‌বক্‌ করে শেষরাতের কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি ? ও, সাতসকালেই অশান্তি! ও বাবা! রোদ উঠে গেছে দেখছি! তা উঠুক। আমি এখন উঠতে পারব না—আবার শোব। (ইজিচেয়ারে শুইয়া) ওরে আমার অশান্তির-শান্তি, তুই একটু গা-হাত-পা টিপে দে তো। খোঁয়াড়িটা ভাঙুক, তবে তো উঠতে পারব।

শান্তি ॥ সে আমি পারব না দাদাঠাকুর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি সে বামুন নারায়ণকে করি, মাতাল নারায়ণকে তো না। ভাত ফুটিয়ে দেওয়া আমার কাজ, আমি সেই কাজেই চললুম।

শরৎ ॥ আরে শোন—শোন, রাগ করছিস কেন ? তুই ভাত রাঁধলে খাবে কে, আমি যদি উঠতে না পারি ?

শান্তি ॥ বেশ, পা টিপছি। সে আমি নারায়ণের পা টিপছি। জেনে রাখবেন—সে আপনার পা নয়। (বলিয়া পা টিপিতে টিপিতে গাহিতে লাগিল) 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে'—(ইত্যাদি)

শরৎ ॥ ওরে বাবা, একি বিপদ!—তারক ব্রহ্ম নাম! এ নাম-গান তো আর সহ্য করতে পারছি না। থাক্—থাক্। (শান্তিকে) এ অশান্তি থাক্। এইবার আমাকে একটু তুলে ধর দেখি বাপু!

শান্তি ॥ আচ্ছা দাদাঠাকুর, এ কি আমার কাজ! এসব ছাই-পাঁশ আপনি গেলেন কেন ?

শরৎ ॥ কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

শান্তি ॥ যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি। দেখব, ভাতের হাঁড়ি ঠেলে কে? এ তল্লাটে বামুনের মেয়ে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাও কুলীন বামুনের মেয়ে। বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি।

শরৎ ॥ ওঃ ভারী যে দেমাক দেখছি! তোর বাপে এসে সাধাসাধি করে ধরেছে, তাই তোকে রাঁধুনীর কাজ দিয়েছি। নইলে আমি বামুনঠাকুরের হোটেলেই খেতাম। তা সে হতভাগ্য কোথায়—ভোলা ?

শান্তি ॥ তিনি তো লাটসায়েবের নাতি! তার মনিব যতক্ষণ ঘুমোবেন, তিনিও ততক্ষণ ঘুমোবেন। তাঁর মনিব খাবেন তো তিনিও খাবেন। কাল রাতে তিনিও খাননি।

শরৎ ॥ ও তাই তো! কাল রাতে কিছু খাওয়া হয়নি, তাই এই সাত-

সকালেই এত খিদে পেয়েছে। তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাবে বলছিলে—যাও চলে! কে তোমাকে ধরে রেখেছে?

শান্তি ॥ যখন যাব—তখন যাবই, একেবারেই যাব। কারো সাধ্য হবে না ঠেকাতে। আজ যখন এসে একবার কাজে হাত দিয়েছি, পুরো কাজ করেই যাব। এ দিনটার মাইনে কাটতে দেব না। কিন্তু আজই শেষ। একতলায় বাপের হাতে এমন যন্ত্রণা, আর দোতলায় মনিবের মুখে এমন গঞ্জনা, এতে প্রাণ বাঁচে! আপনার কাছে আমার জমান টাকার যে খাম রয়েছে—আমি ফেরত চাই। চলে যাব, ড্যাং-ড্যাং করে চলে যাব কলকাতায়। মা মরে গেলে কি হবে, এখনও মামা বেঁচে রয়েছে। ভাবনাটা কি! (বলিয়াই কাজে যাইবার জন্য পা বাড়াইল শান্তি)

শরৎ ॥ দাঁড়া, টাকার খামটা নিয়ে যা।

শান্তি ॥ সে তো আমি এখন চাইনি, যখন আমার নেবার দরকার হবে তখন নেব।

শরৎ ॥ শোন অশান্তি!

শান্তি ॥ আপনি আমায় অশান্তি বলে ডাকবেন না। আপনাকে আমি অনেকবার বলেছি, আমার নাম অশান্তি নয়—শান্তি।

শরৎ ॥ তা হ্যাঁ, এখন শান্তি। হ্যাঁরে শান্তি, চায়ের কতদূর?

শান্তি ॥ সবে উনুন ধরিয়েছে। এখনও তো দুধই আসেনি।

শরৎ ॥ আমার ভোলানন্দ মহারাজটি কোথায়?

[দুধ লইয়া ভোলার প্রবেশ]

শান্তি ॥ ঐ যে, এতক্ষণে দুধ নিয়ে এলেন। (ভোলাকে) আসুন মহারাজ, রান্নাঘরে আসুন। (শান্তির রান্নাঘরে গমন)

শরৎ ॥ হ্যাঁ রে, কাল রাতে তুইও খাসনি?

ভোলা ॥ না কর্তা—হাঁ কর্তা—

শরৎ ॥ না কর্তা—হাঁ কর্তা! শোন কর্তা, আমি কুয়োতলা থেকে চান করে আসছি। দুধ রেখে, কাপড় গামছা, তেলের বাটি চট্ করে নিচে দিয়ে আয় দেখি।

[ভোলা আদেশ পালন করিতে গেল। একতলা হইতে শান্তির পিতা হরিহর চক্রবর্তীর প্রবেশ। বয়স্ক লোক, টাক মাথা, খর্বাকায় গোলগাল চেহারা। স্নান সারিয়া খালি গায়ে পা টিপিয়া অনেকটা চোরের মত এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

হরিহর ॥ (চুপিচুপি) হতচ্ছাড়িটা কোথায়?

শরৎ ॥ রান্নাঘরে চা-জলখাবার করছে।

হরিহর ॥ বুঝলেন দাঠাকুর, এখন আমার পকেট কাটা শুরু করেছে। কেমন উড়ু-উড়ু ভাব দেখছি। ওই মা-মরা মেয়েটার একটা গতি করার জন্যই এ বয়েসেও মান-মর্যাদা খুইয়ে কলকারখানায় মিস্ত্রির কাজ করছি। তা এতটুকু পিতৃভক্তি আছে? কি কাল পড়েছে বলুন দাঠাকুর, মেয়ে হয়ে বাপের পকেট কাটছে! আর সে পয়সা রাখে কোথায়, তন্নতন্ন করে খুঁজেও বের করতে পারছি না। নিশ্চয়ই মানুষ জুটিয়েছে মশাই—মানুষ জুটিয়েছে।

শরৎ ॥ রান্নাঘরেই রয়েছে কিন্তু। শুনতে পেলেই এখন কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। তখন কিন্তু আমি কাউকেই ছেড়ে কথা কইব না।

হরিহর ॥ ও হাঁ, তাই তো! আমার টাকার খামটা? এই ফাঁকে কিছু রেখে যাচ্ছি। নইলে পকেটে থাকবে না—মেরে দেবে।

[শরৎচন্দ্র ড্রয়ার খুলিয়া খামটি বাহির করিলেন]

শরৎ ॥ (খামের শিরোনামটি পড়িয়া) হ্যাঁ, এই তো হরিহর চক্রবর্তী। নিন।

[খামটি হরিহর চক্রবর্তীর হাতে দিলেন শরৎচন্দ্র। হরিহর খামটি লইয়া তাহার মধ্যে কিছু নোট রাখিয়া পুরাপুরি ভর্তি খামটি শরৎচন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিলেন]

শরৎ ॥ খামটার পেটে আর জায়গা নেই দেখছি। আর কিছু জমা পড়লে ফেঁসে যাবে। একটা দু'নম্বর খাম আনবেন।

হরিহর ॥ না, আর বোধহয় লাগবে না। ঐ ঘোষালবুড়ো এসেছে—মেয়েটাকে মনে ধরেছে। বিয়ে করতেই চাইছে। আমার ঘর খরচা বাবদ এতদিন কিছু কিছু দিচ্ছিল, আজই ওর শেষ দেওয়া। এই দেনয়াটাই জমা রেখে গেলাম।

শরৎ ॥ ও!

হরিহর ॥ আচ্ছা চলি। বুড়ো আবার নিচে বসে রয়েছে—চলি। (গমনোদ্যত)

শরৎ ॥ শুনুন। [হরিহর দাঁড়াইলেন]

শরৎ ॥ আচ্ছা যান।

হরিহর ॥ কিছু বলবেন মনে হচ্ছিল?

শরৎ ॥ না, কি আর বলব? আপনার পাঁঠা আপনি লেজেই কাটুন আর মাথাতেই কাটুন, আমার কি বলবার আছে?—আচ্ছা আসুন।

হরিহর ॥ ও!—হতচ্ছাড়িকে একবার নিচে পাঠিয়ে দেবেন তো। নইলে, ওই ঘোষালবুড়ো আবার আপনার এখানে উঠে না আসে—

শরৎ ॥ (রুদ্রমূর্তিতে) খবরদার!

হরিহর ॥ এই দেখুন ! এ যে কি বিপদে আমি পড়েছি, মা তারাই জানেন ! তারা – তারা ! বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা !

[হরিহর কাঁদিতে কাঁদিতে নিচে নামিয়া গেল। এমন সময় একটি ট্রেতে করিয়া চা ও জলখাবার লইয়া ত্বরিতপদে শান্তির প্রবেশ। পিছনে ভোলার প্রবেশ এবং তার হাতে তেল, গামছা ও ধুতি]

শান্তি ॥ চা-টা—এই .য চা টা—

শরৎ ॥ (চলিতে চলিতে) ভোলা—ঐ ভোলাটা—কাল রাত থেকে কিছু না খেয়ে আছে। ওকে খাইয়ে দাও। মাধবের ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ, কাল দেখে এসেছি। ওষুধও দিয়েছি। আজ কেমন আছে না দেখে শান্তি পাচ্ছি না। আমি রোগী দেখে ফিরে, একেবারে ভাত খেয়ে অফিসে যাব।

ভোলা ॥ চানটা সেরে গেলেন না কর্তা ?

শরৎ ॥ চান আজ আর হবে না। রোগীটাকে বাঁচাতে হবে তো !

[শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন। শান্তি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—পরে ভোলাকে কহিল]

শান্তি ॥ নাও, আর কেন ? তুমিই চানটা সেরে এসে দয়া করে এগুলো সব গিলে আমাকে উদ্ধার কর। [শান্তি ট্রেটা ভোলার দিকে আগাইয়া ধরিল]

ভোলা ॥ প্রভুর যখন তাই ইচ্ছা—দাও।

[শান্তির হাত হইতে ভোলা ট্রেটি লইল]

শান্তি ॥ ওঃ—ভক্তির কি বহর ! ওগুলো গিলে বাজারটা চট্ করে আন দেখি ! এখনি তো আবার বাড়া ভাত চাই ; তা খাবার সময় হোক আর না হোক। চাই কি, রোগীর বাড়ি থেকেই হয় তো ছুটে যাবেন আপিসে। এমন পাগলের সংসারে আর কিছুদিন কাজ করলে আমিই পাগল হয়ে যাব। এসব আর আমার সইবে না, আমি কালই কলকাতা চলে যাব। মামার বাড়িতে ঝিগিরি করে খাব সেও ভাল –কিন্তু এখানে আর নয়—

[শান্তি ভিতরে প্রস্থান করিল। এই সময় দেখা গেল হরিহর চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। তাঁর অনুগমনকারী ঘোষালবুড়োর উদ্দেশে বলিতেছেন]

হরিহর ॥ ঘোষালমশাই, শীগগির আসুন। দাঠাকুর যে বাড়িতে রুগী দেখতে গেলেন, সে খুব কাছেই, যখন-তখন ফিরে আসতে পারেন। আপনার যা বলবার আছে, এই ফাঁকে বলে যান। চাকরটাও বাজার গেছে।

[মদমত্ত অবস্থায় ঘোষালবুড়োর প্রবেশ]

ঘোষাল ॥ হ্যাঁ—হঁ্যা—হঁ্যা, শাস্ত্রেই বলেছে—শুভস্য শীঘ্রম্। তা এখানে তো অশান্তি দেখছি—শান্তি কই ?

হরিহর ॥ শান্তি—এই শান্তি! বাইরে এসে একটু শুনে যা মা। ঘোষালমশাই কি বলবেন।

[শান্তি প্রবেশ করিল]

শান্তি ॥ (সবিস্ময়ে) কি সাহস তোমাদের! দৌরাত্ম্য করতে শেষে তোমরা এখানে এসে গেছ?

ঘোষাল ॥ ঘরের বৌ ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। এতে কার কি বলবার আছে? ধর্মপত্নীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বংশরক্ষা করতে ধর্মকর্ম করব, এর চাইতে বড় ধর্ম আর কি আছে? (শান্তির দিকে অগ্রসর হইয়া) গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমার হাত দু'খানি ধরে দুর্গা বলে চলে এস। বুঝলে হরিহর, এ সময়ে একটু উলু দিতে হয়। কেউ যখন নেই, তুমিই সেটা দাও।

শান্তি ॥ ওরে বুড়ো শয়তান! আজ তোমার এত সাহস? আসছি—

[আসছি বলিয়া শরৎচন্দ্রের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল শান্তি এবং ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল]

ঘোষাল ॥ অ চক্করবর্তী, এটা কি রকম হল! একি অশান্তি বল দেখি—

হরিহর ॥ দাঠাকুরের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলে, শব্দ শুনলেন না? বেটির পেটে পেটে শয়তানি! বোতলটা বের করুন দেখি, এক পাত্তর খেয়ে নিয়ে ভেবে দেখা যাক্—এখন কি করা যায়—

[ঘোষাল পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া নিজে এক ঢোক খাইয়া চক্রবর্তীকে বোতলটি দিলেন। এবং চক্রবর্তীও এক ঢোক মদ্যপান করিয়া বোতলটি ঘোষালকে ফেরত দিলেন]

হরিহর ॥ দাঠাকুর এসে পড়লেই আগুন জ্বলে উঠবে। এখন থাক্। চলুন, আমরা কেটে পড়ি। হতচ্ছাড়ি নিচে না নেমে আর কোন্ চুলোয় যাবে? নিচেই আপনাদের দু হাত এক করে দেব'খন।

ঘোষাল ॥ না—না—না, ও আর নিচে নামবে না। তোমাদের ওই দাঠাকুরই ওকে মজিয়েছে। তামাকও খাচ্ছে—ডুডুও খাচ্ছে।

হরিহর ॥ দেখুন ঘোষালমশাই, আর যাই বলুন, ঐ কথাটি বলবেন না। আমাদের ওই দাঠাকুরটি মদ-টদ খায়, ইয়ার-বন্ধু নিয়ে গান-বাজনা, খানা-পিনাও করে। কিন্তু চরিত্তির দোষটি কোনদিন নেই। ওঁর নামে এ কলঙ্ক দিলে পাপ হবে ঘোষালমশাই। দাঠাকুরকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, চলুন নামি।

[শরৎচন্দ্রের গলা শোনা গেল]

নেপথ্যে শরৎ ॥ ক্যামোমিলা—এক ডোজ ক্যামোমিলা—কি ভেল্কী খেলল!

হরিহর ॥ এই রে, আপনার-আমার যম এসে গেছে !

[শরৎচন্দ্রের প্রবেশ]

শরৎ ॥ সিদ্ধ এক্স এক ডোজ ক্যামোমিলা কি ভেঙ্কীটাই—(ইহাদের দেখিয়া) একি ! এ আবার কি ভেঙ্কী ! আপনারা মশাইরা এখানে কেন ?

হরিহর ॥ (ঘোষালকে) বলুন না ঘোষালমশাই, কি বলবেন বলুন ! আপনার ভয়টা কি ?

ঘোষাল ॥ আরে বাবা কন্যাদায় তোমার, যা বলবার তুমিই বল ।

শরৎ ॥ কিন্তু এখন কিছু শোনবার আমার সময় নেই, আমার অফিসের তাড়া আছে। (সোজা শয়নকক্ষের দরজায় গিয়া) একি ! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কেন ? (উচ্চৈঃস্বরে) ঘরের ভেতর কে ? দরজা খুলে শীগগির বাইরে এস বলছি ।

ঘোষাল ॥ (চিৎকার করিয়া) আমার বিয়েকরা বউকে মশাই আপনি আপনার ঘরের মধ্যে কিড্‌ন্যাপ করে রেখেছেন ।

[দরজা খুলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শান্তি ছুটিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্রের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল]

শান্তি ॥ আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে রক্ষা করুন দাঠাকুর !

শরৎ ॥ কি হয়েছে শান্তি ? স্থির হয়ে বলো। কান্নাকাটি আমি ভালবাসি না ।

শান্তি ॥ ওই দুই শয়তান নেশার ঝোঁকে এখানে ঢুকে পড়েছে। এই ঘাটের মড়া বুড়োটা নেশার ঝোঁকে দাবি করছে, আমি নাকি ওর বউ। কেমন বউ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। (অদূরে একটি ঝাঁটা পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ঘোষালের সামনে রুখিয়া গিয়া) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি ! নইলে, আমি তোমাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব ।

শরৎ ॥ আঃ শান্তি ! এ সব কি হচ্ছে ? তুমি সরে এস, যা করবার আমি করছি। (শান্তি সরিয়া আসিলে হরিহরকে) আজ সকালে আপনি যে পাত্রের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দেবেন বলেছিলেন, ইনিই বুঝি সেই পাত্র ?

হরিহর ॥ হ্যাঁ, দাঠাকুর ।

শরৎ ॥ তা এর মধ্যে বিয়েটা হল কখন ?

হরিহর ॥ হয়নি, আজই হবে ।

ঘোষাল ॥ আজ সকালেই একশ টাকার কড়কড়ে নোট হরিহরের হাতে ঘরখরচা ধরিয়ে দিয়েছি। বিয়েটা তো তখনই হয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু —ঘরকন্না—বংশরক্ষা—

শান্তি ॥ (ঝাঁটা তুলিয়া রুখিয়া) সেটা এই আমার হাতে—দেখাচ্ছি—

শরৎ ॥ আঃ শান্তি, এসব ভাল হচ্ছে না কিন্তু। এটা তোমার বাপের ঘর নয় যে, ঝাঁটা হাতে যখন-তখন—যাকে-তাকে—

ঘোষাল ॥ ওরে বাবা! এই বউ ঘরে তুলতে হবে? থাক্ বাবা। চক্কোরবর্তী, আমার টাকাটা ফেরত দাও, এখানে আমার দম আটকে আসছে। আমি নিচেই যাই—

হরিহর ॥ হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি নিচে গিয়ে আমার ঘরে বসুন ঘোষালমশাই। আমি হতচ্ছাড়িকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আপনার হাতে সম্প্রদান করছি। দশজনের সামনে মালাবদল করে আজই বিয়েটা হয়ে যাক্।

ঘোষাল ॥ দেখ। জয় গুরু—জয় গুরু! [ঘোষাল চলিয়া গেলেন]

শরৎ ॥ শান্তি ঠিকই বলেছে—ঘাটের মড়া! ঐ ঘাটের মড়ার সঙ্গে এই মা-মরা মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দেবেন চক্কোত্তিমশাই?

[চক্রবর্তী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

হরিহর ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি বড় গরীব। নেশা-টেশা করি। যা রোজগার করি, তাতেই যায়। মেয়েটাকে দু'বেলা পেটভরে খেতেও দিতে পারি না। তার ওপরে মেয়েটার তো ঐ চেহারা। না খেতে পেয়ে দিন দিন হাড্ডিসার হচ্ছে, বিয়ের বয়েস উৎরে যাচ্ছে। অনেক বলেকয়ে ঘোষালকে বিয়েতে রাজী করিয়েছি। আজ সকালে একশ টাকা খরখরচাও গুনে দিয়েছে।

শরৎ ॥ সেটা কিছু বড় কথা নয়, সে টাকা এখনি ফেরত দেওয়া যায়।

হরিহর ॥ কেন দেব—বলি, কেন দেব? এই বিদেশে স্বজাতির মধ্যে ওর চেয়ে ভাল পাত্র আমি পাব কোথায়? লোকটা টাকার কুমীর। মা মরা মেয়েটা দুটো খেয়েপরে বাঁচবে। তবে হ্যাঁ, ঘোষাল নেশা-ভাঙ করে। সে এখানে কে না করে? আমিও করছি—তুমিও করছ। আর, যদি বয়সের কথা তোল, তবে আমি বলব,—পুরুষমানুষের আবার বয়েস কি?

শরৎ ॥ তবু আমি বলব, বড় ভুল করছেন আপনি। মা-মরা মেয়েটিকে বলি দিতে চলেছেন।

হরিহর ॥ আহা—হা, কি আমার দয়া রে! অতই যদি দয়া, করবে তুমি আমার এই মা-মরা মেয়েটাকে বিয়ে করে উদ্ধার? (চিৎকার করিয়া) করবে —বলো, করবে?

শরৎ ॥ (সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে) করব—করব আমি বিয়ে তোমার এই মেয়েকে।

হরিহর ॥ য়্যাঁ!

শরৎ ॥ হ্যাঁ।

হরিহর ॥ আমার টাকার খামটা—টাকার খামটা দাও। টাকাগুলো ওই ঘোষালবুড়োর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসছি।

[শরৎচন্দ্র চট্ করিয়া হরিহরের টাকার খামটা তাঁহার হাতে দিলেন। হরিহর উহা লইয়া নিচে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় বাজার করিয়া ফিরিল ভোলা। শরৎচন্দ্র শান্তির দিকে ফিরিয়া দেখেন, ভাবাবেগে কম্পিতদেহা শান্তি পড়িয়া গিয়া মূর্ছিতা হইল]

শরৎ ॥ শান্তি—শান্তি—শান্তি, মূর্ছা গেছে! ওরে ভোলা, জল দে—পাখা আন।

[শুশ্রূষাতে শান্তির চৈতন্য ফিরিল। ইহার মধ্যে চক্রবর্তীও ফিরিয়া আসিয়াছেন]

হরিহর ॥ চুকে গেছে, সব কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে এসেছি—এ কি!

শরৎ ॥ না, না, এই তো জ্ঞান ফিরেছে।

হরিহর ॥ মূর্ছা গিয়েছিল! তা এমন আনন্দে কে না মূর্ছা যাবে দাঠাকুর? ওর মা শেষ-নিশ্বাসেও আমাকে বলে গিয়েছিল—'ওগো, আমার শান্তির একটা ভাল বিয়ে দিও।' (ঊর্ধ্বে তাকাইয়া) ওগো শুনছ, তোমার শান্তিকে আজ যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি, সে বড়লোক নয়। কিন্তু, অমন কল্জে আর কারও নেই। এস বাবা, তুলসীতলায় চলো। তোমাদের দু'হাত এক করে দিই।

[একদিকে শান্তি ও অপরদিকে শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া হরিহর চলিয়া গেলেন]

কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে—

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড

[কাল : সন্ধ্যা। কৃষ্ণদাস অধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ রায় ও অন্যান্য কয়েকজন লোক রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক একটি কীর্তন গান গাহিতে গাহিতে আসিলেন। কৃষ্ণদাস অধিকারী অসুস্থ থাকায় তাঁহার কিশোরী কন্যা মোক্ষদা তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছে। গানের শেষাংশে নৃত্য শুরু হইল। শরৎচন্দ্র ও শান্তি গরদবস্ত্র পরিহিত হইয়া প্রবেশ করিলেন এবং হরির লুট দিলেন। সকলে আনন্দিত হইয়া হরির লুটের বাতাসা তুলিয়া লইলেন এবং নৃত্যরত গায়কগণ গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন]

শরৎ॥ সবাই তোমাকে কেমন অবাক হয়ে দেখছিল, সেটা চোখে পড়েছে?

শান্তি॥ আমাকে দেখছিল না। দেখছিল, আমার পরা গরদের এই শাড়িখানি। ভাবছিল আমার মতন মেয়ের গায়ে উঠে এ শাড়ির জাত গেছে। আর ভাবছিল—

শরৎ॥ আর কি ভাবছিল?

শান্তি॥ আশ্বিনের চাঁদে গেরণ লেগেছে।

শরৎ॥ ও, আশ্বিন মানে শরৎকাল। তার মানে, শরৎচন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে?

শান্তি॥ তা জানিনে, এতে এখন যা বোঝেন। বুঝলেন কিছু?

শরৎ॥ কিচ্ছু বুঝিনি। শুধু এইটুকু বুঝছি, তুমি আমার ঘরে আসাতে আমার অশান্তিটা দূর হয়েছে। বুঝেছ?

শান্তি॥ (খুশিতে) হুঁ।

শরৎ॥ এরপর আজ রাত্রে আর যে কয়েকজন আসবেন, তাঁদের কথা তো তোমাকে বলে রেখেছি। খাওয়া-দাওয়া, তারপর একটু আনন্দের আসর—

শান্তি॥ তার মানেই তো—

শরৎ॥ তা—হ্যাঁ, একটু—আধটু—

শান্তি॥ শুনুন। আপনাকে একটা গল্প বলছি—এই বস্তিতে একজনের বউয়ের খুব অসুখ করেছিল। বাঁচারই কথা নয়। মা কালীর কাছে তখন স্বামী মানত করল—মা, আমার বউকে যদি ভাল করে দাও, তবে ও সেরে উঠলেই আমি সেই জিনিসটি চিরকালের জন্য তোমাকে উৎসর্গ করব, যে জিনিসটি আমি সবচেয়ে ভালবাসি। আচ্ছা, এমন অসুখ যদি আমার কখনও হয়, তবে ঠাকুরকে কি দেবেন আপনি? মদ তো?

শরৎ॥ ভারী দুষ্টু মেয়ে তুমি।

শান্তি ॥ আমি আপনাকে মদ ছাড়াবই, দেখবেন আপনি।

[মোক্ষদার সাহায্যে কৃষ্ণদাসের প্রবেশ]

কৃষ্ণদাস ॥ বাঃ! সত্যিই তোমাদের দু'জনকে কি সুন্দর মানিয়েছে! মনে হচ্ছে, এ যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওরে মোক্ষদা, প্রণাম কর্—প্রণাম কর্।

[মোক্ষদা শরৎচন্দ্র ও শান্তিকে প্রণাম করিল এবং শরৎচন্দ্র ও শান্তি কৃষ্ণদাসকে প্রণাম করিলেন]

কৃষ্ণ ॥ দীর্ঘজীবী হয়ে চিরসুখে থাক। এত উঁচু মন তোমার, ভগবান তোমাকে আরও উঁচু করবেন শরৎবাবু।

শরৎ ॥ না খেয়ে যাবেন না কিন্তু অধিকারীমশাই।

কৃষ্ণ ॥ নেমন্তন্ন ছিল আমারই। কিন্তু এই রাতে মেয়েটাকে একলা ঘরে রেখে আসতে পারলাম না।

শরৎ ॥ বেশ করেছেন—খুব ভাল করেছেন। ওটা আমার খেয়ালই ছিল না।

কৃষ্ণ ॥ এই মেয়ে নিয়ে আমার হয়েছে বিপদ! রোজগারের ধান্দায় যেখানে যেখানে ঘুরতে হয়, ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

শান্তি ॥ আমাকেও তো একলা থাকতে হয়। (মোক্ষদাকে) তুমি আমার কাছে থাকবে ভাই?—(শরৎকে) থাকবে?

শরৎ ॥ তোমার ইচ্ছা হয়, রাখ। অবশ্য যদি অধিকারীমশাই মত করেন।

কৃষ্ণ ॥ বেঁচে যাব গো—বেঁচে যাব। এখানে-ওখানে গিয়ে গান গেয়ে রোজগার করতে পারব, মেয়েটার বিয়ের চেষ্টাও করতে পারব। জয় গুরু—জয় গৌর—

[শান্তি মোক্ষদাকে কাছে টানিয়া লইলেন। আনন্দাশ্রু কৃষ্ণদাস বাহিরে গেলেন। সুরেন মান্না ভিতরে আসিলেন]

শরৎ ॥ এই যে সুরেন! তাই তো ভাবছিলাম, তুমি গান গাইতে গাইতে চলে গেলে কেন? রাতে খাওয়ার কথাটা তুমি ভুলে গেলে নাকি?

সুরেন ॥ না না, ভুলব কেন? বরং ঐ ভোজের আনন্দে ভুলে এই চিঠিটা বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম, গিয়েছিলাম এটা আনতে। এই যে—(চিঠিখানি শরৎচন্দ্রের হাতে দিলেন। পরে, শান্তিকে বলিলেন) কি বৌদি, আজ কি বেঁধেছেন?

শান্তি ॥ কিচ্ছু রাঁধিনি। বললেন, হেঁসেলে ঢুকে থাকলে তোমাকে আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব কখন? আজ রাঁধতে হবে না।

খাবার আসবে এই বোটাটংয়ের সেই বামুনঠাকুরের হোটেল থেকে। ঐ যে খাবার নিয়ে ভোলানন্দ এসে গেছে।

[মিষ্টির বাক্স আর ফুল লইয়া ভোলার প্রবেশ]

শান্তি ॥ (ভোলাকে) খাবারগুলো আবার গরম করতে হবে। তুমি ততক্ষণ ব্যবস্থা করগে যাও। আমি আসছি।

ভোলা ॥ হোটেলের মালিক তোমাকে ফুল আর এই মিষ্টির বাক্স দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন দিদি। ধর।

[ফুল ও মিষ্টির বাক্স শান্তির হাতে দিয়া ভোলা ভিতরে চলিয়া গেল]

শান্তি ॥ (শরৎকে) এত ফুল দিয়ে আমি কি করব ?

শরৎ ॥ ভালই হল। ফুল দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে দাও।

শান্তি ॥ (মোক্ষদাকে) যাও-না ভাই, এই ফুলগুলো দিয়ে আমাদের ঐ ঠাকুরঘরটা আগে সাজিয়ে দাও।

[মোক্ষদা ফুলগুলি ও মিষ্টির বাক্স লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল]

শরৎ ॥ ঐ বামুন-ঠাকুরের হোটেলে আমি অনেককাল ছিলাম যে, বড্ড ভালবাসতেন আমাকে। তাই অত ফুল আর মিষ্টি দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন।

শান্তি ॥ এসবও তবে আমার ভাগ্যে ছিল! দেখছি, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছি আমি। (শরৎকে) কি, আপনি কথা কইছেন না যে ?

শরৎ ॥ (শান্তিকে) সুরেনের এই চিঠিখানা পড়ে বড় ভাবনায় পড়লাম।

শান্তি ॥ কেন, কি হয়েছে ?

শরৎ ॥ বেচারি বেকার হয়ে এতদিন বসে আছে। এক বন্ধু ওকে ডেকে পাঠিয়েছে 'নামটু গোল্ড মাইনে'। সেখানে গেলে ওর চাকরি হবে। কিন্তু ও যেতে চাইল না। বলল্—এখানকার দেনাপত্র শোধে করে সেখানে যেতে হলে ওর যা আছে তার উপরে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দরকার। আমি বলেছিলাম—সুরেন, এতকাল গান শুনিয়ে যে আনন্দ দিয়েছ, তোমার ঐ পঞ্চাশ টাকা আমি তোমাকে উপহার দেব। আজ সেখান থেকে চিঠি এসেছে, কাল ভোরে যদি ও নামটু রওনা না হয়, তবে ওর জায়গায় ওরা অন্য লোক নেবে। ওর চাকরিটা আর হবে না। এখন আমি পড়েছি বিপদে। হাতে যা ছিল, এই সব ব্যাপারে খরচপত্র করে ফেলেছি। ওকে এই পঞ্চাশটা টাকা আজ দেব কি করে ? —আচ্ছা দু-চারজন বন্ধুবান্ধব তো আজ আসছেন, দেখি ধার পাই কিনা! তুমি ভেব না সুরেন। দেখ তো, কারা বুঝি এলেন।

[সুরেন চলিয়া গেল]

শান্তি ॥ এই যাঃ, টাকা তো আমারও চাই। ঘরে মা-কালীর বেদীতে কয়েকটা টাকা দিয়ে আজ প্রণাম করব ভেবেছিলাম। আপনি তো আমাদের স্বস্তির ব্যাংক। আমার টাকার খামটা যে একবার চাই।

শরৎ ॥ দিচ্ছি। (ড্রয়ার খুলিয়া খামটি বাহির করিয়া শিরোনামা পড়িলেন) শ্রীমতী শান্তি দেবী।—নাও।

[শান্তিকে খামটি দিলেন। শান্তি তাহা হইতে পাঁচটি টাকার নোট বাহির করিয়া শরৎচন্দ্রের দিকে আগাইয়া দিলেন]

শান্তি ॥ (শরৎকে) ধরুন তো। ওঘরে মা-কালীর বেদীতে এই পাঁচ টাকা দিয়ে চলুন প্রণাম করে আসি। আর এই খামটাও ধরুন। এতে তো কম করে গোটা পঞ্চাশেক টাকা হবে। এই টাকাটা নিয়ে আপনার আজকের অশান্তি দূর করুন।

শরৎ ॥ শান্তি! না না, তোমার টাকা আমি নেব না।

শান্তি ॥ আমি কি আপনার নই?

শরৎ ॥ কিন্তু টাকাটা—

শান্তি ॥ টাকাটা কি আমার নয়? আমি যদি আপনার হই তো টাকাটাও আপনার। অবশ্য, আমি যদি আপনার না হই তবে টাকাটা আমার। [শরৎচন্দ্র শান্তিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

শরৎ ॥ তুমি আমার মান বাঁচালে—ধর্ম রাখলে—সুরেনটা বেঁচে গেল। এক ঢোক না খেলে এ আনন্দ আমার জমছে না।—এস তো—

[সুরেন মান্নার প্রবেশ]

সুরেন ॥ টাকার যোগাড় হবে দাদা। আমার হার্মোনিয়ামটা ষাট টাকায় কেনবার লোক পেলাম এখানে।

শরৎ ॥ সেকি! হার্মোনিয়ামটা তোমার প্রাণ। না—না, ওটা বেচা চলবে না। সুরেন, সমস্যার সমাধানটা গৃহলক্ষ্মীই করে দিলেন। এই নাও তোমার টাকা। [সুরেন মান্নাকে টাকা দিলেন শরৎচন্দ্র]

সুরেন ॥ লক্ষ্মীর এমন আশীর্বাদ যখন পেলাম, মনে হচ্ছে চাকরিটা আমার হবে। সত্যিই আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, তা বলতে পার। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে সত্যি আজ লক্ষ্মী এলেন।

সুরেন ॥ হ্যাঁ, সকল অশান্তির আজ শান্তি হল।

—কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে—

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

তৃতীয় কাণ্ড

[কাল : সকাল। ভোলা ও মোক্ষদার প্রবেশ। ভোলার হাতে কিছু রজনীগন্ধার গুচ্ছ ও পুষ্পমাল্য]

মোক্ষদা ॥ বাঃ, ফুলগুলি তো বেশ ভাল এনেছিস ভোলা!

ভোলা ॥ ভোলা মানেই জানবে ভাল। ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করে না তোমার ভোলা। এখন কি করতে হবে বলো?—আচ্ছা ছোটদি, ভোরবেলায় দেখছিলাম, তুমি বিছানা বাঁধছ—বাক্স-প্যাটরা গোছাচ্ছো। দেশে ফিরে যাবে বলেছিলে। তবে কি আজই চলে যাচ্ছ?

মোক্ষদা ॥ সঠিক কি কেউ কিছু বলতে পারে ভোলা? বিছানাপত্র আর বাক্স-প্যাটরা বাঁধা-ছাঁদা এর আগেও তো কতবার হয়েছে, আবার খুলে ফেলতেও হয়েছে। কিন্তু, বাবা এবার দেশে না গিয়ে পারছেন না। যেতে তাঁকে হবেই—আজই। ভাবনা ছিল, বাধা হবে এক—কর্তার অসুখ। তা তিনি আজ অনেকটা ভাল আছেন। আমি চলে গেলে তুই খুব খুশি হবি, না ভোলা?

ভোলা ॥ ছোটদি, ওসব কথা বলো না। বললে কিন্তু আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলব।

মোক্ষদা ॥ ওরে বাবা! না না, ভ্যাঁ করে কেঁদে তোমার দরকার নেই। এখন যা বলছি, চটপট করে ফেল্ দেখি। ইজিচেয়ারটা এখানে আন, আর তার সামনে সেই কাঠের চেয়ারটা বসিয়ে দিয়ে সেটা শান্তিদিদির বেনারসীটা দিয়ে মুড়ে দে।

ভোলা ॥ দিচ্ছি। কিন্তু এই সাতসকালে এত ফুল আনলে কেন ছোটদি?

মোক্ষদা ॥ কেন আনলুম, সে দেখবি এখন। নে, আর কথার সময় নেই।

ভোলা ॥ যাচ্ছি।

[ভোলা চলিয়া গেল এবং মোক্ষদার নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থাদি করিতে লাগিল। মোক্ষদার পিতা কৃষ্ণদাস অধিকারী আসিয়া দাঁড়াইলেন]

কৃষ্ণ ॥ কিরে মোক্ষ, কর্তা আজ কেমন আছেন?

মোক্ষদা ॥ অনেকটা ভাল বাবা। তবু ডাক্তারবাবুকে আজ সকালে আসতে বলা হয়েছে। আমার তো মনে হয়, এখন সেরে উঠছেন।

কৃষ্ণ ।। আজ আমরা জাহাজে উঠতে পারব তো রে ?

মোক্ষদা ।। মনে তো হচ্ছে, পারব। আমি আমার বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে রেখেছি। এইবার একফাঁকে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার জিনিসপত্র জড় করে বেঁধে-ছেঁদে দেব।

কৃষ্ণ ।। শরতের অসুখ। অসুখ দেখে যেতেও মন সরে না। কিন্তু ভাইয়ের যা চিঠি পেয়েছি, না গিয়েও উপায় নেই। এতকাল ব্রহ্মদেশে কাটিয়ে গেলাম, গোবিন্দের কি ইচ্ছা, কোন সুরাহা হল না। না-হল আমার চাকরি, না-হল তোর বিয়ে। ভাইটি আমার লিখেছে—ও দুটোই ঠিক করে ফেলেছি, তোমরা চলে এস দাদা। যাই, একবার হরিহরবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। বলতে গেলে, উনিই আমার এ বাড়িতে দুটি বছরের বন্ধু।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান। ইতিমধ্যে ভোলা চেয়ার ইত্যাদি সাজাইয়াছে। মোক্ষদা এক প্যাকেট ধূপশলা ভোলার হাতে দিল]

মোক্ষদা ।। এই ধূপশলাগুলো জালিয়ে দে।

ভোলা ।। এখানে কোন পুজো-টুজো হবে নাকি ছোটদি ?

মোক্ষদা ।। আনতো—দেখবি এখন।

[ভোলা ধূপশলা জালাইতে চলিয়া গেল। মোক্ষদা শান্তির একটি আচ্ছাদিত তৈলচিত্র ইজিচেয়ারের সম্মুখস্থ বেনারসি শাড়ি-মণ্ডিত চেয়ারে রাখিল। ভোলা ধূপশলাগুলি জালাইয়া আনিল]

মোক্ষদা ।। ধূপদানিগুলোতে এগুলো রেখে এ চেয়ারটাতে বসিয়ে দে।

[ভোলা বিস্মিতভাবে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিল। একটি পুষ্পপাত্রে দুইটি পুষ্পমাল্য রাখিয়া দিয়া ঐ আচ্ছাদিত তৈলচিত্র সমন্বিত চেয়ারটি পুষ্পসম্ভারে সাজাইয়া দিল]

ভোলা ।। ছোটদি, আমি বুঝেছি ওটা কার ছবি। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। (কাঁদিতে লাগিল)

মোক্ষদা ।। (ছবির আবরণ উন্মোচন করিয়া) হাঁরে, এই দেখ আমাদের সেই শান্তিদি। ভোলা, ভাইটি আমার! ছিঃ কেঁদ না। জান তো কর্তার অসুখ। কেউ কাঁদলে উনি সইতে পারেন না। এইবার চল তো আমার সঙ্গে। ওঁকে ধরে এনে এখানে বসিয়ে দিতে হবে। এস।

[ভোলাকে লইয়া অন্দরে মোক্ষদার প্রস্থান। বাহির হইতে কৃষ্ণদাস আসিয়া দাঁড়াইলেন]

কৃষ্ণ ।। মুখু!—কোথায় গেল ? (শান্তির ছবিটি দেখিয়া কাছে গিয়া

আরো ভাল করিয়া দেখিলেন) মুখখানিতে কি মায়া—কি মমতা! চোখ দুটিতে কি করুণা! গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম যেন দেখছি ঐ ছবিতে।

[কৃষ্ণদাস সময়োপযোগী একটি গান ধরিলেন। ঐ গানের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া এখানে আনিল মোক্ষদা ও ভোলা। তাঁহাকে চেয়ারটিতে বসাইয়া দিলেন। মোক্ষদা একটি পুষ্পমাল্য শান্তির চিত্রে পরাইয়া দিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া চিত্রটিকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণদাস থামিলেন]

শরৎ॥ ও, আজ সেই ১লা জুলাই। শান্তির মৃত্যু তারিখ। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল।

[মোক্ষদা দ্বিতীয় মালাটি শরৎচন্দ্রের হাতে দিল। শরৎচন্দ্র একটু ঝুঁকিয়া বসিয়া মালাটি শান্তির ছবিতে পরাইয়া দিলেন। তৃতীয় মালাটি মোক্ষদা ভোলাকে দিল। ভোলাও উহা ছবিতে পরাইয়া দিয়া হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণদাস পুনরায় গান ধরিলেন। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে এবং ভোলা মাটিতে বসিয়া কৃষ্ণদাসের বাকি গানটুকু শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের গান শেষ হইল। কৃষ্ণদাস শরৎচন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

কৃষ্ণ॥ আজ তুমি কেমন আছ বাবা শরৎ?

শরৎ॥ অনেক ভাল। মনে হচ্ছে, মরা আমার হল না।

কৃষ্ণ॥ ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই।

শরৎ॥ বলতে হবেই। জানেন, একবার আমার হৃদরোগ হল—হার্ট র‍্যাটাক্। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। শান্তি ছুটল দুর্গাবাড়ি। ফিরে এসে আমায় বলল—কোন ভয় নেই। মাকে আমি বলে এসেছি—খবরদার, ওঁকে তুমি নিতে পারবে না। বরং আমাকে নিও। জানেন অধিকারীমশাই, এরপরে সত্যিই আমি সেরে উঠলাম। আর, তার কিছুদিন পরে দুর্নিবার প্লেগে আক্রান্ত হল, শান্তি আর তার খোকা। একই রাত্রে—একই সঙ্গে—দুটি প্রাণী আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেল। উঃ, কী ভীষণ সেই রাত্রি! প্লেগের ভয়ে এই বস্তি থেকে সব লোকজন পালিয়ে গেছে। আপনার এই মোক্ষদা, শান্তির সুখদুঃখের একমাত্র সাথী আপনার এই মোক্ষদা কাছে ছিল, তাই ওর হাতেই ওরা শেষ-জলটুকু পেয়ে গেছে। মৃতদেহ দুটি সৎকারের জন্য লোক ডাকতে বেরিয়ে পড়লাম আমি। মৃতদেহ দুটি আগলে এই নিঝুম পুরীতে সেই কাল-রাত্রিতে একা বসে রইল আপনার মেয়ে এই মোক্ষদা। এক গিরিন সরকার ছাড়া মৃতদেহ সৎকারের জন্য সেই ভীষণ রাত্রিতে আর কাউকে ধরে আনতে পারলাম না। মৃতদেহ দুটি ঠেলাগাড়িতে

তুলে নিয়ে সৎকার করে ফিরে এলাম, গিরিন আর আমি ভোরবেলায়। তার পরেও তো আমি বেঁচে রয়েছি এই দুটো বছর! না না, আমার মৃত্যু নেই—মৃত্যু নেই। আমার মৃত্যু হরণ করে নিয়ে গেছে শান্তি—নিজের জীবনটি আহুতি দিয়ে—তার মা দুর্গার পায়ে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! সরিয়ে নিয়ে যাও—সরিয়ে নিয়ে যাও আমার পরম শত্রুকে, যে আমাকে এমন করে ঠকিয়ে পরলোকে বসে হাসছে। আর যেন বলছে—তোমাকে বাঁচিয়ে তুলে সিঁথির সিঁদুর বজায় রেখে কেমনটি চলে এসেছি আমি! ওকে সরাও—সরাও, আমার চোখের সামনে থেকে সরাও।

[শরৎচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী ভোলা শান্তির চিত্র-সম্বলিত চেয়ারটি অন্দরে রাখিয়া আসিল]

কৃষ্ণ ।। (মোক্ষদাকে) শোন্ মুখু, আমাদের একটু দেরিই হয়ে গেছে। আমি গাড়ি ডেকে আনছি। জাহাজঘাটে যাবার পথে দুর্গাবাড়িতে গাড়ি থামিয়ে মায়ের প্রসাদ নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন, ওখানকার পুরুতঠাকুর। যাত্রাকালে মায়ের প্রসাদ পেয়ে রেংগুনের পাট তুলে দিয়ে যাবে। এই সেই গোবিন্দের ইচ্ছা। (শরৎকে) কি বলো বাবা, আমি তাহলে গাড়ি ডাকি?

শরৎ ।। গোবিন্দের যখন ইচ্ছা, আমি আর কি বলব অধিকারীমশাই? —ডাকুন গাড়ি। [কৃষ্ণদাস চলিয়া গেলেন]

শরৎ ।। মুখু!

[মোক্ষদা নতমুখে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

শরৎ ।। তুমি তো চললে। আমাকে তবে বর্মিবন্ধু বাথিনের বাড়িই যেতে হবে। এমন অসহায় বোঝা বইবার লোক ওরা ছাড়া এখন আর আমার কেউ নেই। এইটেই বাথিন মনেপ্রাণে চাইছিল, আর ঠেকান গেল না। ওদের কাছে যেতে হলে, যা যা দরকার গুছিয়ে দাও। ভোলা এ বাড়িতে থেকে বাড়ি পাহারা দেবে। হ্যাঁ শোন, শান্তির ওই ফটোটা আমার সঙ্গে দিও।

মোক্ষদা ।। সে তো দেবই। আর কি দেব দাঠাকুর?

শরৎ ।। সে কি কোনদিন জেনেছি, সে জানত শান্তি। আর এই দু'বছর ধরে জেনেছ তুমি আর তোমার বাবা। আমি জানি, তোমার কোন ভুল হবে না মুখু।—ঐ তোমাদের গাড়ি আসার শব্দ পাচ্ছি। ভোলা! তোর ছোটদির জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিয়ে গাড়িতে তুলে দে।

ভোলা ।। সে সব ছোটদি আগেই গুছিয়ে-টুছিয়ে রেখেছে—বাঁধা-ছাঁদাও হয়ে আছে। তুলে দিচ্ছি।

[ভোলা চলিয়া গেল। মোক্ষদাও অন্দরে চলিয়া গেল। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া, চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া শরৎচন্দ্র বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদাস প্রবেশ করিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মাথার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে তাঁহার মাথায় হাত রাখিলেন।]

কৃষ্ণ॥ বাবা শরৎ! আমার সকল মন—সকল প্রাণ—সকল সাধনা দিয়ে তোমায় আশীর্বাদ করছি বাবা।—না না, তুমি বস—আমিও বসছি।

[শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়াই উপবিষ্ট কৃষ্ণদাসকে প্রণাম করিলেন]

কৃষ্ণ॥ শান্তি আমার মুখুর সব ভার নিয়েছিল। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, দু'বৎসরের মধ্যেই সে চলে গেল। তুমি ভবঘুরে আমাকে তোমার সংসারে এনে বন্দী করলে। দুটো বছর একসঙ্গে সুখে-দুঃখে বাস করে, এমন একটা মায়ায় জড়িয়ে এই বয়সে চলে যাচ্ছি—যে বয়সে লোকে বাঁধনে ধরা পড়তে চায় না। গোবিন্দের পায়ে আমরা বাপ-বেটি নিত্য তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করব—এ ছাড়া তো আমাদের কোন ক্ষমতা নেই বাবা।

[ভোলা অন্দর হইতে বিছানা এবং একটি স্যুটকেস লইয়া আসিয়া বাহির হইয়া গেল]

কৃষ্ণ॥ ভোলা, চল্ আমিও যাচ্ছি। গাড়িতে কোথায় কি রাখবি দেখিয়ে দিচ্ছি। (শরৎকে) না না, তোমাকে আর উঠতে হবে না, তুমি বস। (উচ্চকণ্ঠে) মুখু, আর দেরি করিসনে মা।

শরৎ॥ দেশে গিয়ে আমার অফিসের ঠিকানায় চিঠি দেবেন। যদি কখনো কিছুতে ঠেকে পড়েন, অসংকোচে জানাবেন। আমার যেটুকু সাধ্য, অবশ্যই করব। আর, (একটু থামিয়া) আর, মোক্ষদার বিয়ের আগে আমি যেন যথাসময়ে খবর পাই। আমার কিছু দেবার ইচ্ছা আছে। ও শুধু দিয়েই গেল—পেল না কিছুই।

কৃষ্ণ॥ না না, সে কি! ওর যদি বিয়েটা হয়—সে শান্তি আর তোমার আশীর্বাদেই হবে, এ আমি জানি।—আচ্ছা আসি।

[কৃষ্ণদাসের প্রস্থান। ধীরে ধীরে নতমুখে মোক্ষদা শরতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল]

মোক্ষদা॥ এই চাবির গোছাটা রাখুন। আর এই মনিব্যাগটা—ব্যাগে একশ দশ টাকা আট আনা আছে।

শরৎ॥ ও! কিন্তু এ টাকাটা তুমি পথে খরচ বাবদ নিয়ে যাও। ভেব না, আজই আমার মাইনে পাবার দিন।

মোক্ষদা ॥ পথের খরচ আপনি আগেই বাবাকে দিয়েছেন টিকিট কাটাবার সময়। ভোলার মাইনে, গোয়ালার পাওনা, ধোপার হিসাব, মুদীর বাকি যতদূর মনে পড়েছে, সব মিটিয়ে দিয়েছি।

শরৎ ॥ হ্যাঁ! হ্যাঁ। দেনাপাওনা সব ভবে চুকে গেল। কিন্তু আজ শুধু বারবার সেই কালরাত্রিটির কথাই মনে পড়ছে। যে রাত্রে তুমি এই নিঝুমপুরীতে একা—একলা রাতের অন্ধকারে দুটি মৃতদেহ নিয়ে বসে ছিলে। শান্তির দেহ তোমার পাশে—আর খোকার দেহটুকু তোমার কোলে।

[মোক্ষদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল]

শরৎ ॥ ঐ একটি রাত্রেই আমি চিনতে পেরেছিলাম তুমি আমাদের কে—আর কতখানি। যদি বেঁচে থাকি, আমি তোমার বিয়েতে যাব মুখু।

মোক্ষদা ॥ (আঁচলে বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া) এটা রাখুন।

শরৎ ॥ কি ওটা?

মোক্ষদা ॥ খোকাকে দুটো জামা আমি সেলাই করে দিয়েছিলাম। জামা দুটো তাকে পরিয়ে দিলে শান্তিদি ভারী খুশী হত—সেই জামা দুটো।

শরৎ ॥ ও! কিন্তু এ আমি কোথায় রাখব মুখু? ও তোমার কাছেই থাক্। আমি জানব, ঠিক জায়গাতে - ঠিক জিনিসটিই আছে। যেমন জানি, খোকা তার মায়ের কোলে শান্তিতেই রয়েছে।

[মোক্ষদা জামা দুটির পুঁটুলিটা পুনরায় তাহার আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল এবং বুক হইতে এইবার পিতলের তৈরি নাড়ুগোপালের একটি ছোট মূর্তি বাহির করিল]

মোক্ষদা ॥ শান্তিদির পেতলের সেই নাড়ুগোপালটি। শেষ নিশ্বাসে তাঁর এই গোপালকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—এর খাওয়া-পরার ভার আমি তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম মুখু। আপনার ভার তো বাখিনদা নিলেন, কিন্তু এঁর ভার আমি কাকে দিয়ে যাব বলুন?

[শরৎ স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় কৃষ্ণদাসের প্রবেশ]

কৃষ্ণ ॥ মুখু, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে?

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ শরৎচন্দ্র মোক্ষদার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন কৃষ্ণদাসের সম্মুখে]

শরৎ ॥ মোক্ষদাকে আপনি আমায় দিন। নইলে আমার শান্তির সংসার অচল হয়ে যাবে, অচল হয়ে যাব আমিও। হ্যাঁ, আপনার মোক্ষদাকে আমি ভিক্ষা চাইছি অধিকারীমশাই।

কৃষ্ণ। (আনন্দে অধীর হইয়া) ওরে—ওরে মুখু, এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি? গোবিন্দ, তোমার একি দয়া! তোমার এ দয়া আমার কল্পনারও যে বাইরে, গোবিন্দ! [ভোলা একটি বিছানা গাড়িতে তুলতে যাইতেছিল]

কৃষ্ণ॥ (ভোলাকে) না রে ভোলা, বিছানা যাবে না। গাড়ি থেকে আর সব জিনিসপত্র ঘরে তুলে নিয়ে আয়। গাড়োয়ানকে এই টাকাটা দিয়ে বল্—আমাদের যাওয়া হল না। [ভোলা নির্দেশ পালন করিতে গেল]

কৃষ্ণ॥ (শরৎচন্দ্রকে) এই দীনহীন দরিদ্র বৈষ্ণবের এই তুলসী-পাতাটি আমি তোমায় সম্প্রদান করছি শরৎ। মুখু, শরৎকে প্রণাম কর।

[মোক্ষদা শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিল। পিতাকেও প্রণাম করিল। শরৎচন্দ্র কৃষ্ণদাসকে প্রণাম করিলেন]

শরৎ॥ মুখু কি বলছেন অধিকারীমশাই? শাস্তি ওকে বলত খাঁটি সোনা। খাঁটি সোনা তো আর নাম হয় না। তাই, আমি বরং একটা সাহিত্যিক নাম দিচ্ছি—হিরণ্ময়ী।

কৃষ্ণ॥ বাঃ বাঃ, চমৎকার নাম! কিন্তু তোমার এই হিরণ্ময়ী আমার কাছে মোক্ষদাই থাকবে। ওই মেয়েই যে আমার মোক্ষ বাবা।

শরৎ॥ আপনারা ভেতরে যান। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কোথা থেকে কি হয়ে গেল! আমি একটু একলা থাকতে চাই।

[শরৎচন্দ্র তাঁহার ইজিচেয়ারে গিয়া বসিলেন, কৃষ্ণদাস মোক্ষদাকে লইয়া ভিতরে গেলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন শরৎচন্দ্র। হঠাৎ যেন দেখিলেন তাঁহারই রচিত 'বড়দিদি'র নায়িকা মাধবীর ছায়ামূর্তি]

শরৎ॥ (চমকিত হইয়া) কে, কে ওখানে?

মাধবীর ছায়ামূর্তি॥ আমায় চিনছেন না শরৎবাবু? আপনার বড়দিদি গল্পের নায়িকা—মাধবী আমি। বিয়ে করে মনের আনন্দে সব ভুলে গেলেন না কি? আপনারই কলমের খোঁচায় এই বালবিধবা মাধবীর সংসারে আপনভোলা অসহায় সুরেন্দ্রনাথকে স্নেহভরে আশ্রয় দিতে হল আমায়। সেই স্নেহ গোপনে তিলে তিলে বেড়ে এই বালবিধবার মনে প্রেমের ক্ষুধা জাগিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও কোন অনাচার হয়নি। আমার প্রেমের বিন্দু-বিসর্গও কোনদিন জানতে পারেনি সুরেন্দ্রনাথ। বরং একদিন তাকে তাড়িয়েই দিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু শরৎবাবু, সেই অসহায় লোকটা যেদিন বুঝল, সে বাঁচবে না—সেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এল তার এই বড়দিদির কোলে মাথা রেখে মরতে।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, তোমাদের দুঃখে আমার মনও কেঁদে উঠেছিল। জ্ঞান ফিরে এলে সুরেন্দ্রনাথ যখন জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? বড়দিদি?

মাধবী ॥ আমি বলেছিলাম—না, আমি মাধবী। আমি যে তার বড়দিদি নই—মাধবী, ওইটুকু বলার তৃপ্তি আপনি অবশ্য আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু তাকে মেরে ফেলে সে তৃপ্তি আমার কেড়ে নিলেন কেন শরৎবাবু?

শরৎ ॥ পাষাণ সমাজের বুকে ঘা মারতে। যদ্দিন বাঁচব, এই হবে আমার কাজ। হ্যাঁ, পাথরের বুকে হাতুড়ি মেরে পাথর ভাঙাই হবে আমার কাজ।

মাধবী ॥ নিজে মনের আনন্দে ঘর-সংসার করে, না?

শরৎ ॥ আনন্দে—মনের আনন্দে ঘর-সংসার…হাঃ হাঃ-হাঃ (শরৎচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) মনে আমার কত আনন্দ, সে জানি আমি আর জানেন আমার অন্তর্যামী!—শুনে রাখ মাধবী. আমার প্রথম জীবনে প্রেমের প্রথম যে ফুলটি ফুটেছিল—সে ফুটেছিল একটি বালবিধবার সাহিত্য-কাননে। পরস্পরের প্রতিই আমাদের ছিল পরম অনুরাগ। বিধবা-বিবাহের আইন ছিল—আইন আছে। কিন্তু হৃদয়হীন পাষাণ-সমাজের অন্ধ সংস্কারের বাধাতে মিলন হল না আমাদের। ঐ সংস্কার রয়েছে তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে। আমার ভালোবাসা গ্রহণ করা আর ধর্ম-ত্যাগ করা তাঁর কাছে এক হয়ে গেছে। তাই, দু' দুটি জীবন এই সুন্দর সংসারে অনন্ত হাহাকার হয়েই রইল।

মাধবী ॥ তাই নাকি!

শরৎ ॥ হ্যাঁ। আর তোমরা আমারই মানসসন্তান। রক্ষণশীল সমাজের অন্ধ সংস্কারের শিকার আমাকে যে দুঃখ—যে জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে সারা জীবন, তার অংশ তোমাদেরও ভোগ করতে হবে বৈ কি মাধবী। কারণ তোমরা আমারই উত্তরাধিকারী।

মাধবী ॥ কিন্তু তবে এই বিদেশে কেন? ফিরে যান দেশে, ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে—নারীমেধ-যজ্ঞের পীঠস্থানে—

শরৎ ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয় যাব—শীগগিরই যাব। শুধু নারীমেধ-যজ্ঞের পীঠস্থান নয়, নরমেধযজ্ঞেরও পীঠস্থান, পৃথিবীর বৃহত্তম কারাগার সেই ভারতবর্ষে—যেখানে নিজেদেরই তৈরি শৃঙ্খলে আমরা নিজেরা বন্দী। শুধু সামাজিক কারাগারই নয়, অর্থনৈতিক কারাগার, রাজনৈতিক কারাগার। এই কারাগার থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই যে মানসিক বিপ্লব, সেই বিপ্লবের কলম হাতে নিয়েই আমি চললাম দেশে—আমার ভারতবর্ষে।

॥ বিরতি ॥

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

প্রথম কাণ্ড

[১৯১৬ সালের মধ্যাংশ (জুলাই)। হাওড়ার ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে শরৎচন্দ্রের বাসা-বাড়িতে বৈঠকখানা। পশ্চাৎ দেওয়ালে দেখা যাইতেছে শরৎচন্দ্রের স্বহস্ত অঙ্কিত দুইটি রেখাচিত্র। প্রথমটি শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী, দ্বিতীয়টি শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। এই সারির নিম্নমধ্যে একটি রেখাচিত্র টাঙানো আছে, যাহার নীচে লেখা আছে 'মহাশ্বেতা']

শরৎচন্দ্র লিখিতেছিলেন।

[শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী হুগলী গভর্ণমেন্ট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার প্রবেশ করিলেন]

অক্ষয় ॥ সুপ্রভাত শরৎবাবু!

শরৎ ॥ আসুন—আসুন অক্ষয়বাবু! সুপ্রভাত—নমস্কার!

অক্ষয় ॥ প্রতিবেশী হওয়ায় সুবিধাও হয়েছে—অসুবিধাও হয়েছে। সুবিধা এই যে, আপনার মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিকে যখন-তখন দেখতে পাই। আপনি আমাদের বাজে-শিবপুরের গৌরব হয়েছেন।

শরৎ ॥ বাজে গৌরব। বুঝলেন অক্ষয়বাবু—বাজে গৌরব।

অক্ষয় ॥ না না, বাজে-শিবপুর নাম বলে অতটা বাজে ভাববেন না।

শরৎ ॥ আমার চিঠিতে বাজে-শিবপুর নাম দেখে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন—দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুরে বাসা নিয়েছেন কেন?

অক্ষয় ॥ না-না, আমি তবে বলব, ওটা কবিগুরুর ভুল ধারণা। বাজে-শিবপুর—বাজে নয়। এককালে এখানে খুব গান-বাজনার চল ছিল। প্রায় সব সময়ই এ পাড়ায় বাজনা বাজত। সেই থেকেই এপাড়ার নাম হয়—বাজে, অর্থাৎ—সব সময়েই বাজছে। তাই বাজে-শিবপুর। (শরৎচন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) না না হাসবেন না। এটা হল এখানকার ইতিহাস। বলেছিলাম বোধ হয়, আমি হুগলী গভর্ণমেন্ট কলেজ-এর ইতিহাসের অধ্যাপক। আমি আমার ছাত্রদের বলি, জায়গার নামকরণের মধ্যে জানবে ইতিহাস লুকিয়ে আছে। খুঁজে দেখ। হাওড়া বলুন, কলিকাতা বলুন, সব নামের পেছনেই একটা ইতিহাস আছে।

শরৎ ॥ সেটা ছাত্ররা গবেষণা করুক। কিন্তু যে কথাটা আমাকে চিন্তিত করেছে সেটা হচ্ছে, আমার প্রতিবেশী হওয়াতে আপনার অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

অক্ষয় ॥ সেটাও ইতিহাস। আপনি বাংলার কথা-সাহিত্যে এরই মধ্যে এক ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে। ছাত্ররা তাই প্রতিবেশী আমার কাছে আপনার ব্যক্তিগত জীবন জানতে চায়। অনেক কিছু দুর্নাম রটনা আছে আপনার সম্পর্কে, গুজবও সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। আমি বলেছি কারও ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার প্রবেশ ভালো নয়। ওরা মানতে চায় না। বলে প্রসিদ্ধ লোকেদের ব্যক্তিগত জীবনও ইতিহাস।

শরৎ ॥ অক্ষয়বাবু, আমার কেন, কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি করা অসংগত মনে করি। তবে কেউ যদি তা নিজে থেকে প্রকাশ করে, সেখানে কিছু বলার নেই।

অক্ষয় ॥ বটেই তো—বটেই তো! বেশ, ওদের আমি তাই বলব। তবে হ্যাঁ, আমাদের কলেজ এর লাইব্রেরিয়ান ছাত্রদের চাপে পড়ে এই ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আপনার যে-ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তা কেনবার উদ্দেশ্যে, তার একটি সম্পূর্ণ তালিকার জন্য আমাকে ধরেছে। আমার মনে হয়, এটা নির্দোষ কৌতূহল—অপরাধ নয়!

শরৎ ॥ না-না, অপরাধ হবে কেন, এটা আমার সৌভাগ্য। আমি বই-এর নামগুলি বলছি।

অক্ষয় ॥ আমি লিখে নিচ্ছি।

শরৎ ॥ ১৯১৩—বড়দিদি।

অক্ষয় ॥ আঃ কি চমৎকার বইটি! শেষটায় চোখে জল রাখা যায় না। হ্যাঁ, বলুন।

শরৎ ॥ ১৯১৪—বিরাজ বৌ।

অক্ষয় ॥ আশ্চর্য চরিত্র বিরাজ বৌ। সাধারণ বাঙালী ঘরের অশিক্ষিতা মেয়ে। কিন্তু কি তেজ—কি দুঃসাহস! হ্যাঁ, বলুন।

শরৎ ॥ ১৯১৪—বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প।

অক্ষয় ॥ তুলনা নেই—বাঙালীর পল্লীজীবনের মধ্যবিত্ত ঘরের এসব গল্পের তুলনা নেই। হ্যাঁ, বলুন—

শরৎ ॥ ১৯১৪—পরিণীতা গল্প—পণ্ডিতমশাই উপন্যাস।

অক্ষয় ॥ একটিও আমি পড়িনি, পড়তে হবে। হ্যাঁ, বলুন—

শরৎ ॥ ১৯১৫—মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প।

অক্ষয় ॥ পড়েছি, চমৎকার! কি সব চরিত্র! হ্যাঁ বলুন—

শরৎ ॥ ১৯১৬—পল্লীসমাজ উপন্যাস। চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, এ পর্যন্ত এই ক'খানি বই-ই বেরিয়েছে—

অক্ষয় ॥ কিন্তু এই ক'খানি বইয়েতেই বাংলার কথা-সাহিত্যে আপনার আসন—আমার নাম অক্ষয় বলে বলছি না, সত্যি সত্যিই অক্ষয় হয়ে থাকবে।

শরৎ ॥ আমার সাহিত্য যদি অক্ষয় হয়, তবে আপনিও তাতে বাদ যাবেন না। এ-ও জেনে রাখুন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয় ॥ কি যে বলেন, কোথায় আপনি আর কোথায় আমি! কিন্তু আরও যে আপনার দু'খানি বই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, তা নাকি বই হয়ে বেরুলে, দেশে আগুন জ্বলবে। ছাত্ররা তার নামও আমায় জানিয়ে দিয়েছে। শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, আর চরিত্রহীন। কাহিনীর আভাস আমাকে ওরা যা দিয়েছে তা অতি চাঞ্চল্যকর। বিশেষ করে ঐ চরিত্রহীন নামটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে যাঁরা ঘর করেন, তাঁরা চরিত্রহীনকে ঘরে তুলবেন কি করে ভাবছি। কিন্তু নিজে না পড়ে আমি আপনার চরিত্র সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসব না, সে-ও আপনি জেনে রাখুন শরৎবাবু। আচ্ছা, আজ আসি। কলেজ আছে। নমস্কার!

শরৎ ॥ নমস্কার। আবার আসবেন।

অক্ষয় ॥ নিশ্চয়। আমি ছাত্রদের বলেছি, বই-এর নাম চরিত্রহীন দিলেও গ্রন্থকারও যে চরিত্রহীন হবেন এর নিশ্চয়তা নেই। বিচার করতে হবে—সব কিছু বিচার করে দেখতে হবে।

[অক্ষয় সরকার প্রস্থান করিলেন।—কলেজের ছাত্র এবং শরৎচন্দ্রের পাশের বাড়ির অমরেন্দ্র মজুমদার-এর সঙ্গে আগত একটি তরুণী—নাম মন্দিরা প্রবেশ করিল]

অমর ॥ কাকাবাবু, আসব?

শরৎ ॥ আরে এস—এস অমর। আমার পাশের বাড়ির লোক তোমরা। বলা চলে একই বাড়ির লোক। আসবে, তার আবার এত জিজ্ঞাসাবাদ কি?

অমর ॥ না কাকাবাবু, আমার সঙ্গে আর একজন রয়েছেন কি না।

শরৎ ॥ কে?

অমর ॥ আমিও—মানে, এখনও আলাপ-পরিচয় হয়নি। ইনি আপনার খোঁজ করতে করতে আমাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। আমি বললুম—চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

শরৎ ॥ কই, এদিকে আসুন।

অমর ॥ (মেয়েটিকে হাসিয়া) আমি বলিনি, অবারিত দ্বার?

শরৎ ॥ (মেয়েটিকে) আসুন—বসুন।

[মেয়েটি শরৎচন্দ্রের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল]

শরৎ ॥ থাক্—থাক্।

মেয়েটি ॥ না না, থাকবে কেন? এই একটি প্রণাম করবার জন্য কদিন থেকে আপনাকে খুঁজছি।

অমর ॥ আমার আবার কলেজ আছে, তাই বলতে পারলাম না। (মেয়েটিকে) আবার এলে দেখা হবে। নমস্কার। চলি কাকাবাবু।

মেয়েটি ॥ নমস্কার। [অমরের প্রস্থান]

শরৎ ॥ তা প্রণাম-ই যখন করলে, তখন আর আপনি বলব না। বস'। তুমি কোথেকে আসছ ?

মেয়েটি ॥ আসছি শ্রীরামপুর থেকে।

শরৎ ॥ শ্রীরামপুর থেকে ! শ্রীরামপুর থেকে কয়েকদিন আগে আর একটি মেয়ে এসে দেখা করে গেছে। নামটা গোপন রাখতে বলে গেছে।

মেয়েটি ॥ আমারই বন্ধু। কিন্তু, আমি কিছু গোপন রাখতে চাই না। আমার নাম মন্দিরা—নামটা বড় মনে হলে, ইরা বলে ডাকতে পারেন। সমাজ-সেবার কাজ করি—বাপ-মার সঙ্গে থাকি। আপনার বই পড়ে সমাজ-সেবার অনেক প্রেরণা পেয়েছি। আপনার অনেক দুর্নাম শুনি, তবু আমার বন্ধুটির কাছ থেকে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে, আমিও অনেক আপত্তি ঠেলে আপনার সঙ্গে আজ একাই দেখা করতে এসেছি।

শরৎ ॥ সে মেয়েটিও একাই এসেছিল। ফিরে গিয়ে বলেছিল কি তুমিও একাই আসতে পার ?

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ, বলেছিল। বলেছিল, নির্ভয়ে তুমি একাই যেতে পার। বলেছিল, শরৎচন্দ্র দশ বছর আগে ভীষণ মদ-টদ খেতেন। এখন সব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন শুধু আফিম-এর নেশাটা আছে।

শরৎ ॥ আমি যে একটা মানুষ খুন করেছি, সেটা তোমাকে বলেছে ?

মন্দিরা ॥ না তো !

শরৎ ॥ এই দেখো, আমি তাকে বলেছি। কিন্তু আমার অতবড় পাপটা সে তোমার কাছে গোপন করে গেছে !

মন্দিরা ॥ মানুষ খুন করেছেন ! (চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি খুনী ?—মার্ডারার !

শরৎ ॥ হ্যাঁ। কি হয়েছিল জানো ? বসো বলছি। রেংগুনের ঘটনা। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। আমার এক ইয়ার বন্ধু, সেও এক চ্যাটার্জী। অনেক রাতে ঘুরতে ঘুরতে আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। তার মদ ফুরিয়ে গেছে—আমাকে বলে, মদ দাও। আমার যা ছিল তা বার করলাম—কিন্তু দু'জনের পিপাসা তাতে আরও বেড়ে গেল। অত রাতে মদ যোগাড় করতে মরিয়া হয়ে উঠলাম আমরা—আর খুনটা করে ফেললাম তখন।

মন্দিরা ॥ আচ্ছা আজ উঠি—নমস্কার।

শরৎ ॥ তা তোমার বন্ধুটি কিন্তু এটা শুনেও পালাতে চায়নি। কি করে খুনটা করলাম, জানবার জন্য জিদ করছিল।

মন্দিরা ॥ সব বাজে কথা। এখন মনে হচ্ছে, আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্য আপনি এই খুনের গল্পটা ফেঁদেছেন।

শরৎ ॥ তোমাকে তাড়াতে হলে সে তো আমি সোজাই বলতে পারি—তুমি এখন এস, আমি লিখতে বসব।

মন্দিরা ॥ রাখুন আপনার গল্প। আপনি খুন করলে, আপনার ফাঁসি হত না?

শরৎ ॥ খুনটা ধরা পড়েনি, তাই ফাঁসিও হয়নি—বেঁচেও গেছি।

মন্দিরা ॥ কি ডেঞ্জারাস্ লোক আপনি! না-না না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

শরৎ ॥ খুন আমি করেছি। বিশ্বাস করো আর না করো, আমাকে বলতেই হবে। শুনতে না চাও, চলে যাও। কিন্তু সেই রাতটার সাংঘাতিক স্মৃতি মনে হলেই আমাকে চেপে ধরে।

[মন্দিরা চট্ করিয়া উঠিয়া দরজার বাহিরে গেল। উঁকি দিয়া বাহির হইতে শরৎচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র যেন নেশার ঘোরে আপন মনে বলিয়া চলিয়াছেন]

শরৎ ॥ (একক সংলাপে) এই চ্যাটার্জী, এই যে আমাদের বর্মি-বন্ধুর বাড়ি। লোকটার হার্ট ডিজিজ। ডাক্তার বলেছে—মদ খেলে মরে যাবে। তবু বউকে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়। চ্যাটার্জী, কড়া নাড়ো। হ্যাঁ, ঐ যে দোতলার জানলা খুলে গেল। বর্মি-বন্ধুর বউটি নেমে আসছে। কি? স্বামীর হার্টের অবস্থা ভালো নয়, ঘুমুচ্ছে?—ঘুমুচ্ছে না হাতি।—ঐ তো আমাদের দেখে মদের বোতল হাতে তোমার পিছু পিছু তর্‌তর্ করে নেমে এসেছে। না-না, তুমি ভেব না লক্ষ্মী। ওকে আমরা মদ খেতে দেব না। না, না বন্ধু! তোমার হার্ট ড্যামেজড্, মদ খেলে তুমি মরে যাবে। তোমার হাতের বোতলটা আমাদের দাও।—কি? এখানে বসে গল্প-গুজব করতে করতে যদি খাই তবেই বোতলটা খুলবে। নইলে দেবে না? তা বেশ তো, সে তো আরও ভালো। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—তুমি মদ খাবে না।—সেই প্রতিজ্ঞাই তুমি করছ? বাঃ-বাঃ-বাঃ! দেখো চ্যাটার্জী, আমাদের বর্মি-বন্ধু কি লক্ষ্মী ছেলে! মদ খেতে দেওয়া হয় না বলে, মদ খাইয়ে-ই খুশী। চরিত্রটা কত মহৎ একবার ভেবে দেখো চ্যাটার্জী!—কি বলছ বোন? তুমি ওর কথা বিশ্বাস করছ না—এখানে বসে থেকে পাহারা দেবে?—তা বেশ তো, দাও। দেখো—দেখো, বর্মি-বন্ধু আমাদের কত উদার! নিজে খাচ্ছে না, কিন্তু আমাদের গ্লাসে সোডা ঢেলে দিচ্ছে। পাশের বাড়িতে কি সুন্দর বাজনা বাজছে। শ্রবণ করো—ঘুম-পাড়ানি মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যাও, বাটা-ভরা

পান দেবো গাল ভরে খাও। আমার ঘুম পাচ্ছে। চ্যাটার্জি দেখছ?—বর্মি বন্ধু, ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলছে—তোমার সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত বউ ঘুমিয়ে পড়েছে? এই ফাঁকে তুমি এক পেগ খেতে চাইছ? —না না, তুমি এক পেগ খেলেই তোমার পিপাসা আর রুখতে পারবে না।— একি চ্যাটার্জি! তুমি এক পেগ ওকে দিলে? না না, এ খুব অন্যায় হ'ল। কাজটা ভালো হল না।—আমার ভয় হচ্ছে, এখনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি বোনকে ডেকে তুলছি। বোন—বোন—ও—হো—হো—বর্মি বন্ধুটা বোতলটা খালি করে দিলে—বোতলটা খালি করে দিলে; বোন—বোন, ওঠো—ওঠো, দেখো তোমার স্বামী কি বিকট চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ও—হো—হো—সরো, আমাকে দেখতে দাও—আমি নাড়ি দেখতে জানি। ও—হো—হো—সব শেষ। লোকটা মরে গেছে—আমরাই মেরে ফেললুম। একটা ঘুমন্ত রোগীকে—ঘুম থেকে তুলে—মদ খাইয়ে—আমরা—খুন করলাম! ও—হো—হো, ও—হো—হো, ও—হো—হো—

[আর্তনাদে শরৎচন্দ্র ভাঙিয়া পড়িলেন। এই সংলাপের মধ্যাংশে হিরণ্ময়ী দেবী ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু স্বামীর ঐ তন্ময় অবস্থা দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মন্দিরা দরজার আড়াল হইতে উঁকি দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। শরৎচন্দ্র যখন শোকে ভাঙিয়া পড়িয়া আসনে বসিয়া পড়িয়া বিলাপরত, তখন হিরণ্ময়ী দেবী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে ধরিলেন। মন্দিরাও অপর পার্শ্বে বসিয়া শরৎচন্দ্রকে ধরিয়া রহিল। শরৎচন্দ্র সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন এবং ইহাদের দেখিতে পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ব্যাপারটি]

সেই রাতের সেই মর্মান্তিক বিভীষিকা এখনও যখন মাঝে মাঝে দেখি, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সেই চরম রাতটিতেই বর্মি-বন্ধুর সেই মৃত্যুশয্যাতেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মদ ছেড়ে দেব, জীবনে আর মাতাল হব না।—আমার সে প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করছি।

—কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে—

দ্বিতীয় কাণ্ড

(অভিনয়ে অপরিহার্য নয়)

[সেইদিন অপরাহ্ণে শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক বর্ষীয়ান্ জলধর সেন আলাপরত। জলধর সেন একটু কানে খাটো—গায়ে কোট—মুখে চুরুট—চোখে চশমা—হাতে লাঠি]

জলধর ॥ আমি শরতের দাদা—'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীজলধর সেন।—অনেকক্ষণ বসে আছি।

প্রকাশ ॥ আমি শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই—প্রকাশ।

জলধর ॥ আকাশ—আকাশ। তা, আকাশে শরৎচন্দ্র উদয় হবেন কখন ?

প্রকাশ ॥ (হাসিয়া) আকাশ নই—প্রকাশ, ছোট ভাই—

জলধর ॥ ছোট গাই—কিনেছেন ?—দুধ দিচ্ছে ?

[শরৎচন্দ্রের প্রবেশ]

শরৎ ॥ এই যে, সেরেছে! প্রকাশ, ওঁর সঙ্গে কথা বলা তোমার কর্ম নয়। জামাইবাবু এখনি এসে পড়বেন। তাঁর সঙ্গে তুমি যে কাপড়গুলো নিয়ে গোবিন্দপুর যাবে সেখানকার গরীব-দুঃখীদের দেওয়ার জন্য, সেই কাপড়গুলো প্যাক করে রাখো। আর বৌমাকে বল, সেই গরীব-দুঃখীদের দেবার জন্য সিকি দু'আনিগুলো একটা থলিতে পুরে রাখতে। যাও। (জলধরের কাছে, যাইয়া) এই যে দাদা, জলধর সেন নামটি আপনার সার্থক। জলধর মেঘ; দেখলেই ভয় হয়।

জলধর ॥ ভারতবর্ষের পাঠকদের তাগিদে আসি। নিষ্কৃতি পাব কবে ?

শরৎ ॥ আমিও তাই ভাবছি।

জলধর ॥ ভাদ্রের ভারতবর্ষে নিষ্কৃতি দেব। কপিটা শেষ করে দাও।

শরৎ ॥ শেষ করতে পারলে তো আমিও নিষ্কৃতি পাই।—শুনুন—ভারতবর্ষের মালিক খোদ হরিদাস চাটুজ্যেমশাইকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম, আসছে শুক্রবার আমার ভাগ্নীর বিয়ে। আমার চারশো টাকার অকুলান। লিখেছিলাম, এটা আমার চাই।

জলধর ॥ দিয়েছেন।

শরৎ ॥ দিয়েছেন ?

জলধর ॥ হ্যাঁ, এই যে—(পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া) নাও।

শরৎ ॥ এই দেখুন দাদা, পকেটে টাকা নিয়ে বসে আছেন। আমাকে

নিষ্কৃতি না দিয়ে আপনি নিষ্কৃতি চাইছেন। তা আমি যখন নিষ্কৃতি পেলাম, আপনারাও নিষ্কৃতি পাবেন।—হরিদাসবাবুকে বলবেন।

জলধর॥ বেশ—বেশ, বলব। আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকায় তোমার লেখা বেরুচ্ছে বলেই, গোটা ভারতবর্ষে এই শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। এটা মানো তো ভায়া, দিন দিন খ্যাতিটা কেমন বাড়ছে?

শরৎ॥ তা বাড়ছে। কি রকম বাড়ছে একটা ঘটনা শুনুন—সেদিন কোন কাগজে বেরিয়েছে, একটা চোর ধরা পড়েছে। তার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর যাবে কোথায়! এই বাড়িতে এসে সব লোক জানতে চাইছে—আমার জেল হয়েছে কিনা? এমন খ্যাতি যে, দুনিয়ায় এই শরৎ চাটুজ্যে ছাড়া আর শরৎ চাটুজ্যে নেই।

জলধর॥ (উচ্চহাস্য করিয়া) হ্যাঁ, তাহলে তুমি তো এখন 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্'। আচ্ছা ভায়া, আজ উঠি।

শরৎ॥ সে কি, জলখাবার না খেয়ে!—ঐ যে আপনার জলখাবার নিয়ে হাজির।

[হিরণ্ময়ী দেবী একটি রেকাবিতে জলখাবার ও জলের গ্লাস লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন]

জলধর॥ বৌমা আমাকে না খাইয়ে ছাড়েন না কোনদিন। কিন্তু আজ পেটটা ভালো নেই, আজ আর খাব না। তা বলব, বৌমাটি আমাদের বড় ভালো হয়েছে ভায়া।

শরৎ॥ তাহলেই দেখুন—আপনি কি ভুলটা করেছিলেন। আপনার স্ত্রী মারা যেতেই একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি তা করিনি—প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে আমি সন্ন্যাসী হইনি।

জলধর॥ (হাসিয়া) আমার ভুলটাও আমি সংশোধন ভালোভাবেই করেছি ভায়া। গেরুয়া বসন ছেড়ে দিয়ে, বিয়ের পিঁড়িতে আবার বসেছিলাম বলেই, আজ আমার এমন জমজমাট সংসার। এমন জমজমাট যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। [হিরণ্ময়ী মুখে আঁচল চাপা দিয়া পালাইয়া গেলেন]

জলধর॥ কিন্তু ভায়া, গোপনে বলি—মাঝে মাঝে—

শরৎ॥ একটু বড় করে বলুন দাদা, শুনতে পাচ্ছি না।

জলধর॥ (উচ্চকণ্ঠে) খুব গোপনে বলছি—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, আবার এখন সন্ন্যাসী হতেই মন চায়।

শরৎ॥ (হাসিয়া সমান উচ্চকণ্ঠে) তাতেও সুখ নেই দাদা। আমিও সন্ন্যাসী হয়ে দেখেছি, তাতেও সুখ নেই। মন না রাঙিয়ে শুধু কাপড় রাঙালে, তাতে কিছু হয় না।

জলধর ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—তা যা বলেছ ভায়া। কিন্তু কথাটা গোপন রেখ।—আচ্ছা, চলি।

[জলধর সেন চলিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে গেলেন এবং যখন ফিরিয়া আসিলেন, দেখা গেল তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অনিলা দেবীর স্বামী শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়]

পঞ্চানন ॥ বলো কি! উনিই ভারতবর্ষ-পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন!

শরৎ ॥ হ্যাঁ মুখুজ্যেমশাই। সাহিত্য-জগতে প্রবেশের ছাড়পত্রটা উনিই সর্বপ্রথম আমাকে দেন। ১৩০৯ সালে কুন্তলীন কোম্পানির একটা গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় আমার লেখা 'মন্দির' গল্পটি প্রথম স্থান লাভ করে ওঁরই বিচারে।

পঞ্চানন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তোমার মাতুল-বন্ধু সুরেন গাঙ্গুলীর নামে ওটা বেনামীতে লিখে দিয়ে তুমি রেংগুনে চলে যাও। সুরেন ওতে ২৫ টাকা পুরস্কার পেয়ে তোমার কাণ্ডকারখানা আমাদের জানায়। তা জলধরবাবু অত চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন কেন?

শরৎ ॥ কানে একটু খাটো, কিন্তু মনটা বড় উঁচু।—বসুন।

পঞ্চানন ॥ বসবার আর সময় কই! শুক্রবার মেয়ের বিয়ে—পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার—যোগাড়-যন্তর করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় কেনাকাটা এখনও শেষ হয়নি। তোমার দিদি বলে দিয়েছেন, আজ প্রথমে তোমার কাছে আসতে।—তাই এলাম। তুমি নাকি চারশো টাকা দেবে!

শরৎ ॥ হ্যাঁ মুখুজ্যেমশাই, দিদিকে কথা দিয়েছিলাম। আর সে কথা আজ রাখতে পারছি, এটা ভগবানের খুব দয়া। এই নিন—

[শরৎচন্দ্র পঞ্চাননকে টাকা দিলেন]

পঞ্চানন ॥ মেয়ের বিয়ে মানেই খরচ। সব টাকাটা এখনও হাতে আসেনি, এই হয়েছে বিপদ। তা দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাবে। আজকের বাজারটাই ছিল সমস্যা, তা তোমার এই টাকায় সেটা সমাধান হবে।

শরৎ ॥ আরও যদি কিছু দরকার হয় বলবেন—দেখব। তবে কি জানেন মুখুজ্যেমশাই, রেংগুন থেকে এই হাওড়ায় উঠে এসে নতুন করে সংসার পাততে না পাততেই ছোট ভাই প্রকাশের বিয়ে দিলাম। এই সব খরচের ধাক্কায় জেরবার হয়ে পড়েছি। এ দেখছি এমন শহর, যে কচু শাকটাও কিনে খেতে হয়। নইলে, দিদির মেয়ের বিয়ে, এ তো আমারও দায়। ছোটবেলায় এই দিদির কোলে-কাঁখেই মানুষ হয়েছি।

পঞ্চানন ॥ সেটা যে মনে রেখেছ—এই ঢের। তুমি আরও বড় হতে পারতে শরৎ, যদি বার্মায় না যেতে। সেখান থেকে যে-সব খবর মাঝে মাঝে আসত, তাতে তো তোমার আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। যাক্, তবু

দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছ, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করছ, এই তোমার সাত-পুরুষের ভাগ্য। আমাদের গাঁয়ের লোক এ-সব কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। যাক্ গে, এখন তবে উঠি। তা তোমরা বিয়েতে কে কে যাচ্ছ?

শরৎ॥ তা দিদি যখন বলে গেছেন, যাব বৈকি। প্রকাশকে পাঠিয়ে বৌমাকে পিত্রালয় থেকে আজই আনিয়েছি। আমরা কাল কি পরশু রওনা হব।

পঞ্চানন॥ আমরা মানে, প্রকাশ আর প্রকাশের বউ, আর—?

শরৎ॥ মেজ ভাই প্রভাস তো এখন রামকৃষ্ণ মিশনে বেদানন্দ স্বামী। ঠাকুরের ধ্যান-ধারণা নিয়েই আছে। বিয়েতে যেতে পারবে না—বলে গেছে।

পঞ্চানন॥ তাকেই বরং বলে-কয়ে প্রকাশ আর বউমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও হে। গাঁয়ের লোকেরা খুব খুশী হবে। তুমি আর তোমার স্ত্রী গেলে লোকে কি চক্ষে দেখবে—কেমনভাবে সেটা নেবে, সেই হয়েছে এখন আমার আর তোমার দিদির ভাবনা।

শরৎ॥ ও, তাই নাকি! বেশ, তাহলে আমরা দু'জন যাব না। এত ভাববার কি আছে?

পঞ্চানন॥ না না, যাবে না কেন? বিয়েটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে আমিই এসে তোমাদের নিয়ে যাব। বই-টই লিখে তুমি এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছ, এটা আমাদের কত গর্ব! আর বুঝলে কিনা, তাতেই হচ্ছে গাঁয়ের লোকের হিংসা। ভয় হয়, তোমার এই ঘর-সংসারের ব্যাপার নিয়েই বিয়ের আসরে একটা কেলেঙ্কারী না ঘটিয়ে দেয়।

শরৎ॥ আমার ঘর-সংসারের মধ্যে লজ্জার কি আছে—লুকোবারই-বা কি আছে? আপনাদের বাড়ির কাছে রূপনারায়ণের ধারে ঐ সমতাবেড়ের আমি বাড়ি করে বরাবরের জন্যে বাস করব ঠিক করেছি। জমিটা বায়না করাও হয়ে গেছে। ওসব লোকের মোকাবিলা আমি তখনই করব। তা বেশ, এখন না হয় খুকীর বিয়েতে আমরা না ই গেলাম। তবে হ্যাঁ, প্রকাশ আর বৌমাকে আমি পাঠাবই।

পঞ্চানন॥ তোমার দিদিও বিশেষ করে তা বলেছেন। তুমি নাকি তোমার ভাগ্নীর এই বিয়ে উপলক্ষে ওখানকার গরীব-দুঃখীদের কিছু কাপড়-চোপড় আর কিছু সিকি-দু'আনি দান করতে চেয়েছ?

শরৎ॥ হ্যাঁ, দিদির মুখে শুনেছিলাম—ওখানকার গরীব-দুঃখীদের বড়ই দুঃখ। প্রায় নাকি দুর্ভিক্ষ। ওসব দুঃখকষ্ট নিজেও এককালে ভোগ করেছি যে, তাই ভেবেছি, তাদের মধ্যে কাপড় আর পয়সা বিতরণ করলে আমার ভাগ্নীটি তার বিয়েতে অত লোকের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা পাবে। এই হয়েছিল আমার বাসনা। সেটা আমি এখনও বাদ দিতে চাই না। তার সব যোগাড়-যন্তর হয়ে গেছে। প্রকাশ আর বৌমাকে দিয়ে আমি কাল বা পরশু পাঠিয়ে দেব।

পঞ্চানন ॥ কিছু যদি মনে না কর শরৎ, তবে আমি বলি কি, এইসব দান-টানের ব্যাপারটাও এখন বরং থাক্। বিয়েটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে, তুমি বরং একদিন ওখানে গিয়ে নিজে হাতে বিলি ক'র। এখনি ওদের টনক কিছুটা নড়েছে। সেদিন এক মাতব্বর দলপতি আমায় বলেছেন—শরৎবাবু যদি আমাদের পানিত্রাস স্কুলের সাহায্যে দুশো টাকা দেন, আর গাঁয়ের লোকদের একটা ভোজ দেন, তবে ওঁকে জাতে তুলে নিতে পারি।

শরৎ ॥ দেখুন মুখুজ্যেমশাই, কুড়ি টাকা পরীক্ষার ফি দিতে না পেরে এফ এ পরীক্ষা দিতে পারিনি। আজ অবশ্য সে অবস্থা নেই। স্কুলের আর্থিক অবস্থা খারাপ দেখলে, আমি দুশো কেন দু'হাজার টাকাও দিতে রাজী হতাম। কিন্তু এই দুশো টাকা দিলে, আমি একঘরে হওয়ার মতো পাপ করেছি সেটা স্বীকার করা হবে। ওদের এই চালাকিটা দেখে আমি একটি পয়সাও দেব না! আমি একঘরে আছি, বেশ আছি। ওঁরা যা পারেন—করুন। আর ভোজ? বরং আমি কুকুর-বেড়ালকে ভোজ দেব, কিন্তু ওদের মতো মানুষের ছায়াও মাড়াব না। হাঁ, আপনি আমার এই সব ক'টি কথাই ওদের বলবেন।

পঞ্চানন ॥ শোন, শরৎ —

শরৎ ॥ না, আর কোন কথা শুনব না। কেন শুনব? আমি তো আর রক্ষিতা নিয়ে ঘর করছি না। যাকে নিয়ে ঘর করছি, সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে আমি বিধিমতে রেংগুনে বিয়েই করেছি। এখানকার লোক না জানলেও সেখানকার লোক তা জানে। সে দেশেও বিস্তর হিন্দু রয়েছে, তারাও বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করছে। আমার এই বিয়েতে যদি কারো কোনো সন্দেহ থাকে, তাদের আমি নমস্কার জানিয়ে বলছি—তারা যেন আমার ছায়া না মাড়ায়, আমিও তাদের ছায়া মাড়াতে চাই না।

পঞ্চানন ॥ শরৎ—শরৎ (শরৎচন্দ্রের হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। মেয়ের বিয়েতে যদি কোনো বিঘ্ন ঘটে এই আমার ভয়। আজ আমি যেমন ভীত—তেমনি অসহায়। সমাজে বাস করে সমাজপতিদের চটাতে সাহস পাচ্ছি না। তোমাদের ওখানে কোনো অসম্মান হয়, এ ভয়ও আমার রয়েছে। তোমাকে আর বড় বৌকে যে যেতে বলতে পারছি না, এ আমার আর তোমার দিদির বুকে কত বড় দুঃখ, কত বড় আঘাত, এটা তুমি বুঝে শান্ত হও—শান্ত হও ভাই। বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক্, তারপর আমিই ওদের দেখে নেব। আমাদের বড় ইচ্ছা, আমাদের শেষ জীবনটা যেন তোমারই ছায়ায় কেটে যায়। আর, তাই না সামতাবেড়-এর জমিটা উদ্যোগী হয়ে তোমার জন্য বায়না করে রেখেছি। কিন্তু আজ আমি সত্যিই তোমার কৃপার পাত্র। তুমি আমাদের ওপর রাগ কর না, খুকীকে আশীর্বাদ কর শরৎ। আসি, কেমন? এখন না বেরুলে, বাজার করে আজ রাত্রে আর বাড়ি ফেরা হবে না।

শরৎ ॥ আসুন, সাবধানে যাবেন। [শরৎচন্দ্র পঞ্চাননকে প্রণাম করিলেন]

পঞ্চানন ॥ জয়োস্তু!

[পঞ্চানন প্রস্থান করিলেন। ত্বরিত-পদে প্রকাশ শরৎচন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

শরৎ ॥ কিরে প্রকাশ, কাঁপছিস কেন?

প্রকাশ ॥ বড়দা, কখনও আপনার কোনো কথা অমান্য করিনি। কিন্তু আপনি যদি আমাকে গোবিন্দপুর যেতে বলেন, আপনার সে আদেশ আমি পালন করতে পারব না।

[প্রকাশ ভাবাবেগ দমন করিবার জন্য ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। হিরণ্ময়ী শরৎচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

হিরণ্ময়ী ॥ ওগো, এই অলক্ষ্মীকে ঘরে তুলেই আজ তোমার এত দুর্গতি।

শরৎ ॥ তুমি জানো না, তোমার মতো অলক্ষ্মীরাই আমার প্রাণ। তোমাদের মতো অলক্ষ্মীদের নিয়েই আমার সাহিত্য—আমার সত্তা—আমার সাধনা—আমার সংগ্রাম।

—কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে—

তৃতীয় কাণ্ড

[১৯২১ সাল, পূর্বদৃশ্যের পাঁচ বৎসর পরের ঘটনা। ইজিচেয়ারে বসিয়া শরৎচন্দ্র লিখিতেছেন, হিরণ্ময়ী দেবী মাটিতে বসিয়া শরৎচন্দ্রের একটি পা হাতে তুলিয়া লইয়া আঙুল দিয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখিতেছেন]

শরৎ ॥ (হাসিয়া) সেই ১৯১৬ সাল থেকে আজ ১৯২১ সাল। এই পাঁচ-পাঁচটি বছর পা-টা টিপে দেখছ। পা ফোলা ব্যারামটা সেরে গেছে বলে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে গো?

হিরণ্ময়ী ॥ কই আর সারল! দিন সাতেক আগেও তো দেখেছি—ফোলাটা আবার দেখা দিয়েছে।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ফোলে। আর মনে হয়, সেটা অমাবস্যা কি পূর্ণিমায়। একটু-আধটু ফোলা ভালো। ওটা দেখিয়ে সভা-সমিতিতে যাওয়ার অত্যাচারটা রোখা যায়।

হিরণ্ময়ী ॥ কিন্তু আমি ভাবছি, পা ফোলাটা সেরেও সারছে না কেন?

সত্যি, এটাতে আমি ভয় পাচ্ছি। কাল সারা রাত শুয়ে ভাবছিলাম, এমনটা হচ্ছে কেন? হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। হাওড়ায় এসে প্রথম যেদিন কালীঘাটে মা কালীকে প্রণাম করতে যাই, সেদিন মা কালীর পায়ে কেঁদে কেঁদে মনে মনে বলেছিলাম—মাগো, ওঁর পা ফোলাটা একেবারে সেরে গেলে জোড়া পাঁঠা দিয়ে তোমার পুজো দেব। আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু আমার সেই মানত রাখতে তো আমি ভুলে গেছি।

শরৎ ॥ (হাসিয়া) একেবারে সেরেও তো যায়নি।

হিরণ্ময়ী ॥ না না, একেবারে সেরেই গিয়েছিল বৈকি। ঐ মানতটা না দেওয়াতে ঐ অমাবস্যা- পূর্ণিমায় মা মানতটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

শরৎ ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ, মা-র তো আর কাজ নেই। কেবল বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে তাঁর মানত রাখল আর কে রাখল না?

হিরণ্ময়ী ॥ তুমি এসব মানতে না পার, কিন্তু মূর্খ্য মানুষ আমি, আমি এসব মানি। আর আমি যখন মানি, এটা তোমাকে সইতে হবে।

[বাহির হইতে প্রকাশচন্দ্রের প্রবেশ]

প্রকাশ ॥ বড়দা, কংগ্রেসের লোকেরা মদের দোকানে পিকেটিং করছিল, পুলিশ কয়েকজনকে ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। জনতার বিক্ষোভ দেখে মদের দোকানের মালিক আর তার লোকেরা ভয়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানটা লুঠ হয়ে গেল—পথটাও একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

শরৎ ॥ হুঁ! (ভাবিতে লাগিলেন) এই তো আমাদের দেশ!

হিরণ্ময়ী ॥ আচ্ছা, তোমাদের কংগ্রেস নাকি মাদকদ্রব্য বর্জন করতে বলেছে? কিন্তু আফিমের কথাটাও ভেবে দেখবে, ওটা তো তোমার ওষুধ। যদি ওটা ওষুধ হয়, তবে বোধহয় কারো আপত্তি নেই, কি বলো? (শরৎকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রকাশকে) চলো তো ঠাকুরপো, আজ মঙ্গলবারও পড়েছে—অমাবস্যাও রয়েছে, তোমাকে এখনি পুজো দিতে একবার কালীঘাটে যেতে হবে।

শরৎ ॥ যেতে হয় যাও। কিন্তু দোহাই, ঐ পাঁঠা বলিটি দিও না। ওটা আমার সয় না। হ্যাঁ, আর শোনো, আমার চরকাটা পাঠিয়ে দাও তো। লেখাটা শেষ করে কিছুক্ষণ চরকা কাটতে হবে।

হিরণ্ময়ী ॥ না না, চরকা তুমি আর কাটবে না। আমার ভয় হয়, যে দমে তুমি চরকা কাটো, তাতে তোমার হাত ফুলে উঠবে।

শরৎ ॥ না না, জানো তো—এত বড় এই অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম নির্দেশটিই হল, রোজ চরকা কাটতে হবে।

হিরণ্ময়ী ॥ তা আমিও তো কাটি, তোমার হয়ে না হয় ডবল করে কাটব।

শরৎ ॥ না না, তা হয় না। বিশেষ, আমি যখন এখন হাওড়া জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি।

হিরণ্ময়ী ॥ তুমি সভাপতি হলে, আমি তোমার স্ত্রী—আমিও সভাপত্নী। আমিও বলে যাচ্ছি, তোমাকে রোজ একটু আফিমও খেতে হবে, চরকা কাটাও চলবে না। আমি তোমাকে জলজ্যান্ত মেরে ফেলতে পারব না। এস ঠাকুরপো।

[হিরণ্ময়ীর প্রস্থান। গমনোদ্যত প্রকাশকে শরৎচন্দ্র ইঙ্গিতে বলিলেন—পাঁঠা বলি দিয়ো না। প্রকাশ হাসিমুখে সম্মতি জানিয়ে গেল। ভৃত্য ভোলা গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া লইয়া প্রবেশ করিল এবং লিখিতে তন্ময় শরৎচন্দ্রের সম্মুখে গড়গড়াটি রাখিল]

ভোলা ॥ তামাক দিয়েছি কর্তা।

শরৎ ॥ ও, হ্যাঁ। (গড়গড়ার নল মুখে দিয়া টানিলেন) খবর কিরে ভোলা।

ভোলা ॥ ছোটকর্তা পুজো দিতে কালীঘাটে যাচ্ছেন।

শরৎ ॥ মা যাচ্ছে না ?

ভোলা ॥ না, রান্না হয়নি। আপনার খেতে দেরি হবে বলে যাচ্ছেন না।

শরৎ ॥ যাচ্ছেন না তো, বেশ-বেশ। উনি পুজো দিতে গেলে, সত্যিই তো আমার খেতে খুব দেরি হয়ে যাবে। গিয়ে যদি দেখিস, তোর মা মত বদলে, যেতে চাইছেন—তবে আমার এই কথাটা ওঁকে বলতে পারবি তো ?

ভোলা ॥ হ্যাঁ, তা খুব পারব'খন।

শরৎ ॥ বেশ একটু জোর দিয়েই বলবি। মানে, ওঁর যাওয়াটা যেমন করেই হ'ক, আটকাবি। পারবি তো ?

ভোলা ॥ খুব পারব কর্তা।

শরৎ ॥ কি বলবি, বল্ দেখি ?

ভোলা ॥ বলব—মা, আপনি কালীঘাটে পুজো দিতে যাবেন না। গেলে বাবু মারা যাবেন।

শরৎ ॥ য়্যাঁ!

ভোলা ॥ হাঁ, ক্ষিধের চোটেই মারা যাবেন।

শরৎ ॥ যা, গিয়ে বল্। দেখি, কে মারা যায় ? [ভোলার প্রস্থান] এ আমি আছি বেশ।

[শরৎচন্দ্র তামাক টানিতে লাগিলেন। মন্দিরা দেবীর প্রবেশ]

এস এস মন্দিরা।

মন্দিরা ॥ (পায়ের ধূলা লইতে লইতে) আমার মন্দিরা নামটা বড় বলে

আত্মীয়-স্বজন ইরা বলে ডাকে। এটা আপনাকে প্রথম দিনই বলেছি। বলেছিলাম—আপনি আমাকে ইরা বলেই ডাকবেন। কিন্তু দেখলাম, যে ক'দিন এলাম, কোনদিনই ইরা বলে ডাকলেন না, ঐ মন্দিরাই বলেন। এবং কেন বলেন, তাও যে না বুঝি তা নয় কিন্তু। ভালো আছেন তো?

শরৎ॥ হ্যাঁ, ভালো। কিন্তু তোমাকে মন্দিরা বলে ডাকায় তুমি কি কি বুঝেছ, সেটা বল তো শুনি?

মন্দিরা॥ (একটু চপল দৃষ্টিতে হাসিয়া) মন্দির শব্দটি আপনার বড় প্রিয়।

শরৎ॥ মন্দির শব্দ সবারই প্রিয়। যাঁরা তোমাকে ইরা বলে ডাকেন, তাঁদেরও প্রিয় নয় কি?

মন্দিরা॥ তা হয় তো হবে। কিন্তু মন্দিরা কথাটা অন্যের চেয়ে আপনার বোধ হয় একটু বেশীই প্রিয়।

শরৎ॥ য়্যাঁ!

মন্দিরা॥ হ্যাঁ।

শরৎ॥ কিন্তু এত জোর দিয়ে এ কথাটা বলার কোন কারণ আছে কি তোমার?

[মন্দিরা ডেস্ক টেবিলে গিয়া একখানি বই তুলিয়া লইল]

মন্দিরা॥ খানকতক অন্য বই-এর সঙ্গে মাত্র একটি উপন্যাসই রয়েছে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত 'অন্নপূর্ণার মন্দির'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কোন উপন্যাস নেই—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কোন গ্রন্থও নেই।—রয়েছে মাত্র একখানি অভিধান—একখানি গীতা—মহাত্মা গান্ধীর একটি জীবনী—আর, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত অন্নপূর্ণার আশ্রম নয়—মন্দির। আর তাই বুঝি, আমি ইরা নই—মন্দিরা।

[শরৎচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন, একটু বিরক্তও হইলেন বোধ হয়]

শরৎ॥ তুমি বলতে চাও কি, খুলে বলো।

মন্দিরা॥ মনে হচ্ছে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। আমার যা বলবার ছিল, আমি তা বলেছি। একথা এখন থাক। আমি আজ আপনার কাছে জানতে এসেছি মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনে আমাদের মেয়েদের কি কর্তব্য। এই আন্দোলনে আপনি আমার পরিচিত একমাত্র নেতা। তাই, এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে এসেছি।

শরৎ॥ তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে! ঠিক ঐ বিষয়েই আমি একটি প্রবন্ধ সদ্য শেষ করেছি। এখনও কালি শুকোয়নি। তুমি প্রবন্ধটির এই জায়গাটা পড়—বড় করে পড়, আমি শুনতে চাই।

[শরৎচন্দ্র মন্দিরার হাতে লেখাটি দিলেন]

মন্দিরা ॥ (পাঠ) "আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছেন —আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্তেই আভাস দিচ্ছেন. এ হবার নয়। যে চেষ্টায় যে আয়োজনে মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য. উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুধুমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়েমানুষকে যে আমরা শুধু মেয়ে করেই রেখেছি মানুষ হতে দিইনি. স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই।"—আপনাকে আবার প্রণাম জানাচ্ছি। আমি আমার পথের সন্ধান পেয়েছি। আমি এই অসহযোগ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনি এ আন্দোলন-এর একজন নেতা বলেই বলছি—যদি কখনও দরকার মনে করেন—ডাকবেন। এই রইল আমার ঠিকানা।

[মন্দিরা ঠিকানা লিখিয়া শরৎচন্দ্রের হাতে দিল]

শরৎ ॥ আমি খুব খুশী হলাম মন্দিরা। তোমার জীবন সার্থক হ'ক।

[ভোলা একটা চরকা লইয়া আসিল]

শরৎ ॥ নারে, এটা এখন নিয়ে যা। যখন দরকার চাইব।

ভোলা ॥ হাঁ কর্তা। [চরকা লইয়া ভোলার প্রস্থান]

মন্দিরা ॥ আপনি চরকা বিশ্বাস করেন ?

শরৎ ॥ না। তবে এক হিসাবে করি-ও। মহাত্মাজীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি আসমুদ্রহিমাচলে মানুষের মনের ভেদাভেদ দূর করে তাদের সে অখণ্ড মুক্তিসংগ্রামের ভিত্তিতে প্ররোচিত করতে চেয়েছেন, সেই মিলন-সূর্যের প্রতীক হচ্ছে ঐ চরকা। ঐ মহাত্মা গান্ধীকে আরও মানি এইজন্য, একালে একমাত্র তিনি, শুধু ব্রিটিশ দুঃশাসন থেকে ভারতের মুক্তি কামনা করেন না—সর্বপ্রকার নাগপাশ থেকেই আপামর জনসাধারণের সর্বকালীন মুক্তি কামনা করেন।

মন্দিরা ॥ মহাত্মাজীর ঐ রচনাটি আমার মুখস্থ। "Swaraj for me means the freedom for the meanest of our countrymen. I am not interested in freeing India merely from the British yoke, I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever."

শরৎ ॥ থেম না,—থামলে কেন ? তারপরেই বলেছেন—I have no desire to exchange king Log for king stork. কিন্তু তুমি আমায় অবাক করেছ মন্দিরা ! তুমি এত কিছু জানো ? মহাত্মাজীর এই ভাষণটিতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বপ্ন দেখি, এ শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক অবিচার, সর্বপ্রকার অবিচার থেকে পরিত্রাণের সংগ্রামও এটা।

তোমাদের মেয়েদের কথাই ধর না—সতীদাহ যুগ অতীত হলেও, নারীমেধ-যজ্ঞ তো আজও সমাজে চলছে।

মন্দিরা ॥ সে তো আপনিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন—বড়দিদির মাধবী, বিরাজ বৌ, পরিণীতার ললিতা, পল্লী-সমাজের রমা, চন্দ্রনাথের সরযূ, শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী, দেবদাসের পার্বতী ও চরিত্রহীনের সাবিত্রী সবই তো ঐ নারীমেধ-যজ্ঞের আহুতি। আমি নিজেও জেনেছি, ১৪।১৫ বছর বয়সে বিধবা হলেও একটি মেয়েকে সারা-জীবন রক্ষণশীল সমাজের অচলায়তনে দেহমন বন্দী করে রাখতে হচ্ছে। অথচ সাহিত্যচর্চার কি বিরাট সম্ভাবনাই-না তাঁর ছিল, যদি তাকে সুযোগ দেওয়া হত।

শরৎ ॥ বলো কি! এ তুমি কি বলছ?

মন্দিরা ॥ জানি বৈ কি। আমার এক বৌদি বহরমপুরের মেয়ে, তিনিও বালবিধবা। কয়েক বছর আগে যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন ভাগলপুরের একটি বিধবা মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

শরৎ। ভাগলপুরের! তুমি বলছ কি! কে সে?

মন্দিরা ॥ তিনি একজন নামকরা লেখিকা। এই অন্নপূর্ণার মন্দির বইটিরও লেখিকা তিনি।—হ্যাঁ, নিরুপমা দেবী।

শরৎ ॥ শোনো—শোনো, ব্যাপারটা আর কিছু নয়—নিরুপমা দেবী আমার সাহিত্য-শিষ্যা। প্রথম জীবনে আমি যখন ভাগলপুরে ছিলাম, তখন ওর দাদা বিভূতি ভট্ট ছিল আমার পরম অনুরাগী বন্ধু। ওদের বাড়িতেই আমাদের একটা সাহিত্য-সভা বসত। নিরু তখন বিধবা। সে-ও ঐ সভায় তার দাদা বিভূতির হাতে লেখা পাঠাত। সে লেখা আমি দেখে-শুনে মেজে-ঘষে দিতাম।

মন্দিরা ॥ আমার বৌদিকে তিনি তা বলেছেন। তারপর আপনি রেংগুনে চলে গেলে যোগাযোগ হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু নয় বছর আগে, মানে—১৯১২ সালে আপনি একবার কলকাতা এসে বহরমপুরে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন, আমার বৌদি জেনে এসেছেন। শুধু তাই নয়, আপনি রেংগুন থেকে নিরুপমা দেবী আর তাঁর দাদাকে যে দু'টি দামী ফাউন্টেন পেন উপহার প্যাঠিয়েছিলেন, আমার বৌদি তা-ও দেখে এসেছেন। শিষ্যা নিরুপমা দেবী গুরুর দেওয়া সেই ফউণ্টেন পেনেই এখনো লেখেন।

শরৎ ॥ আমি হাঁ-না কিছুই বলব না। তোমার যা খুশী বলে যেতে পার!

মন্দিরা ॥ বলার তো দরকার নেই, আপনি তো লিখেইছেন।

শরৎ ॥ কি লিখেছি আমি?

মন্দিরা ॥ ১৩২০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকায়' আপনার 'অনুপমার প্রেম' নামে সেই গল্পটা। আমার বৌদি বলেন—ঐ গল্পটার সঙ্গে নিরুপমা দেবীর জীবনের অনেকটা মিল আছে।

শরৎ ॥ কি রকম মিল ?

মন্দিরা ॥ নায়িকার নাম অবশ্য নিরুপমা নয়, তবে কাছাকাছি—অনুপমা। গল্পের অনুপমার মত নিরুপমা দেবীও ধনী পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। অনুপমার প্রতিবেশী ললিত নামক ছেলেটি অনুপমাকে ভালবাসত। ললিত কিন্তু ঐ বয়সেই অসৎ সংসর্গে মদ ধরেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত মদ-টদ ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে অনুপমা তার প্রতি সদয় হল না। হ্যাঁ, আপনার গল্পে এটা রয়েছে। আমার বৌদি জেনেছেন—নিরুপমা দেবীর জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে। আপনার গল্পের অনুপমা অল্প বয়স থেকেই গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালবাসত—আর ভাগলপুরের নিরুপমা গল্প-উপন্যাস পড়তে শুধু ভালবাসতেন-ই না, তিনি গল্প-উপন্যাস লেখেনও। গল্পের অনুপমার স্বামী যক্ষা রোগে মারা যায়—ভাগলপুরের নিরুপমার স্বামীরও মৃত্যু হয় যক্ষা রোগে-ই! গল্পের অনুপমা বিধবা হয়ে বৈমাত্রেয় বড় ভাই-এর সংসারে বাস করে—ভাগলপুরের নিরুপমাও বিধবা হয়ে ভায়ের সংসারে থাকেন। গল্পের অনুপমা ভাই-এর সংসারে টিকতে না পেরে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গেলে প্রতিবেশী সেই প্রণয়ী ললিত তাকে জল থেকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে তোলে—ভাগলপুরের নিরুপমার জীবনে অবশ্য এরকম কিছু ঘটেনি। তবে আমি বলব—গল্পের ঐ অংশটা লেখকের বাঞ্ছিত চিন্তা। যাকে বলে—wishful thinking.

শরৎ ॥ তুমি কি কোন ডিটেকটিভ ? সত্যি কি আশ্চর্য তুমি মন্দিরা !

মন্দিরা ॥ আর আমি যে মন্দিরা—কেন ইরা নই, তা, ঐ অন্নপূর্ণার মন্দির ই বলছে। অনেক বিরক্ত করে গেলাম আজ আপনাকে। ভক্ত চিরদিনই ক্ষমার যোগ্য, তাই আপনার জীবন সম্পর্কে আমার এত কৌতূহল। দয়া করে মার্জনা করবেন।—একটা কৌতূহল অবশ্য রয়েই গেল।

শরৎ ॥ কি ?

মন্দিরা ॥ 'অনুপমার প্রেম' গল্পটা আপনি কেন লিখেছিলেন ?

শরৎ ॥ তোমার কি মনে হয় ?

মন্দিরা ॥ আপনি বোধহয় এইটেই বলতে চেয়েছিলেন—বাল-বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে না থেকে নিজের রুচিমতো আবার বিয়ে করার সাহস না দেখালে, ভুলই করে থাকে।

শরৎ ॥ (প্রথমে চটিয়া) মন্দিরা ! (আত্মদমন করিয়া) তুমি তুমি—তুমি একটা দস্যু মেয়ে !

মন্দিরা ॥ অন্নপূর্ণার মন্দির ছাপা হয়ে বেরিয়েছে ! কিন্তু আপনার শুভদা বইটা ভাগলপুরে আপনার প্রথম জীবনে লেখা হয়ে থাকলেও আজ পর্যন্ত সেটা আপনি ছাপেননি। কেন ছাপেননি বোধকরি সেটাও আমি জানি।

শরৎ ॥ কেন ছাপিনি ?

মন্দিরা। নিরুপমা দেবী নিজেই আমার বৌদিকে বলেছেন, আপনার শুভদার ছায়া তাঁর অন্নপূর্ণার মন্দিরে খুব বেশী পড়েছে। শুভদা ছাপলে অন্নপূর্ণার মন্দিরের অমর্যাদা হত নাকি। তাই আপনি অন্নপূর্ণার মন্দিরটিকে আর কলুষিত করেননি।

শরৎ ॥ কিন্তু এমন সব কথা ওঠে কেন ?

মন্দিরা ॥ জানবেন, সত্য কখনও গোপন থাকে না।

শরৎ ॥ কিন্তু সত্য নিয়ে সবাই এত মাথা ঘামায় না। সত্যের জন্য তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন ?

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ, একথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। উত্তর খুবই সোজা—আমি আপনার লেখার ভক্ত। একটু বেশী রকম ভক্তও বলতে পারেন।

শরৎ ॥ কিন্তু ভক্ত তুমি আমার সাহিত্যের। আবার জীবন-বৃত্তান্ত জানবার এই মারাত্মক কৌতূহলটা তোমার কেন ? ওটা তো আর আমার সাহিত্য নয়। না-না, ওসব আমি বড় ভয় করি।

মন্দিরা ॥ লেখক সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহলটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, আর তা নয় বলেই আমার খুবই জানতে ইচ্ছা হয়, রেংগুনে আপনি খুব সুন্দর একটা গান গাইতেন। সেটা কি আপনার নিজের রচনা ?

শরৎ ॥ কোন্ গানটা ?

মন্দিরা ॥ গানটা আমি পেয়ে গেছি, সুরটাও তুলে নিয়েছি। দেখুন তো ভুল হয়েছে কিনা ? (মন্দিরা গাহিল)

"নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চিরসুখময় প্রণয় ভরে।
জগতে কিছুই নাহিক একেলা,
সকলি বিধির বিধান গুণে,
একের সহিত মিশিছে অপরে
আমি-বা কেননা তোমার সনে ?"

শরৎ ॥ আবার বলছি তুমি আশ্চর্য,—এ গান তুমি পেলে কোথায় ?

মন্দিরা ॥ পাঁচকড়িবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন আমার এক কাকার বন্ধু। তিনি রেংগুন থেকে ফিরে টি-বি-তে মারা যান। রোগশয্যায় তিনিই আমার কাকাকে আপনার সব গল্প বলেছেন। আমার এ গানটাও তিনিই কাকাকে শেখান। কাকার কাছ থেকে আমি শিখেছি। গানটা কি আপনার রচনা ? গায়ত্রী দেবীকে গানটা আপনি শোনাতেন।

শরৎ ॥ শেলির একটা কবিতার ছায়া ওটা। পাঁচকড়ি! গায়ত্রী! তুমি তো সবই জানো তবে। আমার কত কলঙ্কই না-জানি শুনেছ!

মন্দিরা ॥ না না, পাঁচকড়িবাবু আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। আর একথাই-বা আপনি ভাবতে পারেন না কেন, বহু লোক আছে যারা চাঁদকে ভালবাসে এটা দেখেও যে, সে চাঁদে কলঙ্ক আছে? হ্যাঁ, জানবেন, আমি তাদেরই একজন।

শরৎ ॥ য়্যাঁ!

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ। (রহস্যময় কণ্ঠে) আপনি দেশের কাজ করছেন, আমিও দেশের কাজে নামতে চাই।

শরৎ ॥ বেশ তো, নেমে পড়।

মন্দিরা ॥ (শান্ত দৃষ্টিতে) আমাকে আপনার কাছে রাখুন। আপনার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির দরকার হয় না?

শরৎ ॥ ও!

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ—

[শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে এইবার বুঝিলেন এবং চিনিলেন। তার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন। ভোলা দুধের গ্লাস হাতে প্রবেশ করিল]

ভোলা ॥ কর্তা, আমি না—মা বলছেন—

শরৎ ॥ কি বলছেন?

ভোলা ॥ আপনি অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করছেন—গলা শুকিয়ে গেছে। দুধটা খেয়ে নিন।

[ভোলা দুধের গ্লাস শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়া চলিয়া গেল]

শরৎ ॥ কি জবরদস্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী আমার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?

মন্দিরা ॥ মানে আপনার স্ত্রী তো?

শরৎ ॥ হ্যাঁ, উনি একাই একশো। No vacancy, তবে হ্যাঁ, তুমি আমার য়্যাসিস্ট্যান্ট হতে পার। আমার একটা নভেলের এই পাতাটা বড় কাটাকুটি হয়েছে, এটা নকল করে দিতে পারবে?

মন্দিরা ॥ পারব না মানে! এত বড় সৌভাগ্য হবে আমার?—কিন্তু আপনার হাতের কাটাকুটি এই লেখাটা আমি চাই—আমি রাখব।

শরৎ ॥ য়্যাঁ—হ্যাঁ—তা—আচ্ছা—রেখ। যাও, ওই পাশের ঘরে গিয়ে বস। এখন এখানে আড্ডা বসবে।

[মন্দিরা পাশের ঘরে গেল। অক্ষয়কুমারের প্রবেশ]

অক্ষয় ॥ শেষে আপনার মতো সাহিত্যিকও সাহিত্য শিকেয় তুলে রেখে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শরৎবাবু!

শরৎ ॥ আসুন—বসুন। আমাদের দেশ হল পরাধীন দেশ, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন—মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদেরই তো সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই। সাহিত্যিকরা যদি বলেন—'আমি সাহিত্যিক, সাহিত্য নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দেব না, তাহলে উকিল-ব্যারিস্টাররাও তো বলতে পারেন—আমরা আইন-ব্যবসায়ী, মামলা-মোকদ্দমা নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে—আমরা ছাত্র, পড়াশুনো নিয়েই থাকব, রাজনীতির মধ্যে যাব না; তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা শুনি? স্বরাজ-আন্দোলনটা চালাবে কে?

[শরৎচন্দ্রের এই ভাষণের মাঝেই পাশের বাড়ির কলেজের ছাত্র অমরেন্দ্র মজুমদারও আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে]

এই যে অমরেন্দ্রনাথ! এস, বোস।

অক্ষয় ॥ আপনি সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে নেমেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, রাজনীতির ঘোলা-জলে পড়ে আপনার সাহিত্য-সাধনাটা ভেসে না যায়।

অমরেন্দ্র ॥ আমরা ছেলেরা বলব—Sahitya can wait, but Swaraj can not. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারীর মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমাদের বলেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই গোলামখানা ভেঙে ফেলো। আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে স্বরাজ সেবক-সংঘের ভলান্টিয়ার হয়েছি। আমার আনন্দ, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করবার ভার পেয়েছি কাকাবাবু।

অক্ষয় ॥ কিন্তু শরৎবাবু, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না—ছাত্ররা এমন করে লেখাপড়া বন্ধ রাখলে পরিণামে দেশের ক্ষতি হবে না কি?

অমরেন্দ্র ॥ আমাকে বলতে দিন স্যার।

অক্ষয় ॥ আমি তোমার কথা শুনতে আসিনি অমর।

শরৎ ॥ না না, আমিই বলছি—অসহযোগ-আন্দোলনটা আজ জাতীয় আন্দোলন। জাতিটা যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে, ছাত্ররা তার একটা বড় অংশ—সবচেয়ে শক্তিমান অংশ। দেশের যখন ডাক এসেছে, তখন তো আর তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। দেশসেবার হাতেখড়ির বয়সও এই ছেলেবেলাতেই। পথের দাবী তাদেরই বেশী। তারাই আনবে স্বাধীনতা—গড়ে তুলবে স্বরাজ—দেশ আর জাতির ভবিষ্যৎ।

অমরেন্দ্র ॥ (অক্ষয়ের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে) বন্দে মাতরম! মহাত্মা গান্ধীজি কি জয়! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কি জয়!

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা ॥ (অক্ষয় ও অমরের দিকে তাকাইয়া) কর্তার চানের সময় হয়ে যাচ্ছে বাবুরা। [অক্ষয় ও অমরেন্দ্রের নীরবে প্রস্থান]

শরৎ ॥ তোকে এসব কথা এমন করে কে বলতে বলেছে?

ভোলা ॥ মা বলেছেন কর্তা।

শরৎ ॥ তুই একটা আস্ত গাধা।

ভোলা ॥ হাঁ কর্তা। আমি না। মা।

শরৎ ॥ যা যাচ্ছি।

[ভোলা চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র পুঁথি-পুস্তক টেবিলে গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবেন এমন সময় বাহির হইতে একজন ভীতত্রস্ত যুবক ছুটিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল]

শরৎ ॥ একি, প্রবোধ, তুই?—এদ্দিন কোথায় ডুব মেরেছিলি?

প্রবোধ ॥ কথা বলবার সময় নেই শরৎদা, আমাকে পুলিশ তাড়া করেছে। ছিলাম এই জেলাতেই—শিবপুর, সালকিয়া ও ডোমজুড়। একপাল বিপ্লবী আত্মগোপন করে রয়েছে এই তিন কেন্দ্রে। রেস্ত ফুরিয়ে গেছে। বিপিন গাঙ্গুলি বললেন—ভাগ্নের সঙ্গে একবার দেখা কর, ও তো মাঝে মাঝে যা পারে দেয়।

শরৎ ॥ বিপিনমামা কোথায়?—না না, তোমাদের তো বলা নিষেধ। ভাল আছেন তো?

প্রবোধ ॥ আছেন—বেঁচে আছেন। কিন্তু দেরি ক'র না। মনে হল, আমার পেছনে একটা টিকটিকি লেগে আছে। যা পার—শীগগির দাও। আর কিন্তু সদর দরজা দিয়ে যাব না—পালাব অন্দরের পথে।

শরৎ ॥ আয়।

[প্রবোধ বসুকে লইয়া শরৎচন্দ্র অন্দরে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত পরেই সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। প্রথমে ছুটিয়া আসিল ভোলা। পশ্চাতে ত্বরিত পদে আসিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি ভোলাকে ইশারায় এখান হইতে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। ভোলা কিছুটা অবাক হইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র বাহিরে গেলেন। এবং পরক্ষণেই একজন সি. আই. ডি. অফিসারকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিলেন]

শরৎ ॥ আপনাকে যেন এর আগে, কোথায় দেখেছি?

অফিসার ॥ আমি শিবপুরের সি. আই. ডি. অফিসার। আপনি তো এখন প্রায়ই কংগ্রেসের মিটিং করছেন, সেই সব মিটিংয়েই হয়তো দেখে থাকবেন।

শরৎ ॥ বসুন। হ্যাঁ, বলুন কি বলবেন?

অফিসার ॥ আপনার বাড়িতে এখনি একটি ছেলে এসেছে। আমি তার নাম জানি—প্রবোধ বসু। একটা পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করে। দেখেছি, আপনার এখানে ঢুকেছে।

শরৎ ॥ না না, আমার এখানে পিস্তলধারী কেউ তো আসেনি!

অফিসার ॥ লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে পালাচ্ছিল। তবে হয়তো আপনার দেওয়াল টপ্‌কে উধাও হয়েছে। আপনি কংগ্রেসের কাজ করছেন বলে ঐ বিপ্লবীরা আপনার ওপর এখন খুব চটা। কখন্ কি করে বসে কে জানে! আপনি স্যার, খুব সাবধানে থাকবেন। অবশ্য এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি। আমার স্ত্রী আপনার সব নভেল পড়ে। আমার শালী তো আপনাকে দেখবার জন্য পাগল স্যার। বলে—জামাইবাবু, আপনার তো সর্বত্র অবারিত দ্বার। আমাকে একদিন নিয়ে চলুন-না!

শরৎ ॥ তা বেশ তো, আনবেন একদিন।

অফিসার ॥ আমার বড় ছেলেটা এবার ম্যাট্রিক দেবে। তা বই পড়ার চেয়ে আপনার নভেলগুলোই লুকিয়ে পড়ে বেশী। কাঁদছিল—

শরৎ ॥ কেন?

অফিসার ॥ মানে, সে-ও আসতে চায়।

শরৎ ॥ বেশ আনবেন।

অফিসার ॥ তবে স্যার, আমার মেয়েটাই-বা বাদ যায় কেন? রাবণের সুমতিটা ওর মুখস্থ।

শরৎ ॥ আপনার যাকে খুশী—যতজনকে খুশী আনবেন। আপনি পুলিস, আপনাকে আটকাচ্ছে কে? তবে আপনার মেয়েটাকে আনবেন না। বলবেন—রাবণের সুমতি বলে কোন বই আমি লিখিনি। আমি যেটা লিখেছি, সেটা রামের সুমতি।

অফিসার ॥ এই যাঃ! ভুলটা আমিই করেছি স্যার, মেয়েটা রামের সুমতি বলেছিল।

শরৎ ॥ তবে আপনারই সুমতি হ'ক। ওদেরই পাঠিয়ে দেবেন, আপনি আর আসবেন না।

অফিসার ॥ এই দেখুন, মানুষের মনের কথা এত-ও জানেন আপনারা—এই লেখকরা! আমার স্ত্রী রাত-দিন আমাকে বলছেন, ওগো তোমার সুমতি হ'ক।

শরৎ ॥ বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার স্নানাহার এখনও হয়নি।

অফিসার ॥ তাই নাকি? না না আমি যাচ্ছি। আবার বলে যাচ্ছি স্যার—ঐ প্রবোধ বসু লোকটা ডেঞ্জারাস—হাতে রিভলভার নিয়ে চলাফেরা

করে। আর ওরা আপনার উপর বড্ড চটে গেছে। খুব সাবধানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হল—বাড়ির সবাই কি খুশীই না হবে! আচ্ছা, আর একটা প্রাইভেট কথা!

শরৎ ॥ শীগ্‌গির বলুন।

অফিসার ॥ আপনার চরিত্রহীন গল্পটা আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি। স্ত্রী জানেন না, কিন্তু আপনাকে বলছি—আমিও যাকে বলে—চরিত্রহীন। নাইট ডিউটির নাম করে ঐসব খারাপ পাড়াতেই আমার ঘর। আপনার নভেলেও যা নেই, আমাকে নিয়ে সেই কাণ্ডই ঘটছে। মা মেয়ে আর নাতনী একসঙ্গে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি একটা নভেল লিখুন না স্যার!

শরৎ ॥ আপনি এখন আসুন। আপনার সুমতি না হলে, আমার কিন্তু ভীষণ দুর্মতি হবে। আর দুর্মতি হলে আমার কিন্তু জ্ঞান থাকে না।

অফিসার ॥ ও, না না—আমি যাচ্ছি।

[সি. আই. ডি'র প্রস্থান। কাগজ হাতে মন্দিরা দোর-গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। সি. আই. ডি. চলিয়া যাইতেই সে শরৎচন্দ্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল]

শরৎ ॥ এই যে মন্দিরা, নকলটা হয়ে গেছে?

মন্দিরা ॥ কখন্—। আপনার এই নভেলটার নাম হচ্ছে বুঝি—'পথের দাবী'?

শরৎ ॥ হ্যাঁ। দেখি—(হাত বাড়াইয়া কাগজখানি লইলেন ও লেখাটি দেখিতে লাগিলেন)।

মন্দিরা ॥ আমি নকল করছিলাম, আর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। এটা কোথায় ছাপা হবে?

শরৎ ॥ বঙ্গবাণীতে।

মন্দিরা ॥ কিন্তু এটা ছাপলে, ওঁদের জেল হবে না?

শরৎ ॥ ওরা বলে গেছে, হ'ক জেল, তবু ছাপব।

মন্দিরা ॥ (শরৎচন্দ্রের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কাগজটির একটি জায়গায় হাত দিয়া দেখাইয়া) উঃ, এই জায়গাটা! (উত্তেজিতভাবে পাঠ) 'মাঠে উপস্থিত পুলিস ঘোড়সওয়ারদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বিপ্লবী রামদাস তলোয়ারকর সমবেত জনতার উদ্দেশে বলিলেন—'

শরৎ ॥ (কাগজটি মন্দিরার হাতে দিয়া) ধরো। এ আমার মুখস্থ—'এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তোমরা তাদের কল চালাবার বোঝা বইবার জানোয়ার। অথচ তোমরাও যে তাদেরই মত মানুষ, তেমনি প্রাণখুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে

পেয়েচ এই সত্যটাই এরা সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবি কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাহলে এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু। এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই,—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,- জৈন শিখ কোন কিছুই নেই, আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।'

মন্দিরা ॥ (উত্তেজিতভাবে) শরৎবাবু—শরৎবাবু! আপনার 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে আপনি অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক-বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছেন। আর আপনার এই 'পথের দাবী'তে দেখছি, কারখানার মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বলেছেন। আপনার পথের দাবী শুধু আজকের উপন্যাস নয়—আগামী দিনের এক সশস্ত্র বিপ্লবের উপন্যাস। আপনাকে আবার প্রণাম করছি।—আপনার এই কাটাকুটি লেখাটা আপনি আমায় দিয়েছেন। এটা ফাউন্টেন পেন নয় জানি। কিন্তু আমার কাছে কমও নয়। হ্যাঁ, এটা আমার—যদ্দিন বাঁচব, আমার। —চলি।

[লেখাটি বুকে চাপিয়া শরৎচন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল]

—বিরতি—

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[১৯২৬ সালের প্রথম ভাগ রূপনারায়ণের তীরে শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-এর বাড়ির বারান্দা। সকালবেলা। ইজিচেয়ারে বসিয়া শরৎচন্দ্র লিখিতেছেন। শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাগান হইতে কিছু ফুল তুলিয়া আনিয়া শরৎচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

সুরেন ॥ আমরা স্বরাজ—স্বরাজ বলে চেঁচাচ্ছি। কিন্তু তোমার এই সামতাবেড়-এর নতুন বাড়িতে তুমি দেখছি স্বরাজ পেয়ে গেছ ভাগনে। এক নুন ছাড়া বোধহয় তোমাকে কিছুই কিনতে হয় না। লজ্জা নিবারণের জন্যও চরকায় সুতো কাটা হচ্ছে। স্বরাজের আর বাকী কী?

শরৎ ॥ বাকী সবই সুরেন। একলা আমিই তো আর দেশও নই,

সমাজও নই। দেশের নিরানব্বই ভাগ লোক নিরন্ন—নিরক্ষর—নিরানন্দ। তোমার আমার পেটের ভাত যদিও আজ জুটছে, দেশের সম্পদ কিন্তু লুণ্ঠন করে নিচ্ছে শুধু ব্রিটিশ রাজশক্তি নয়, সেই সঙ্গে রাজশক্তি পরিপুষ্ট কলকারখানার ধনী মালিকও। আমি যে স্বরাজ চাই, সেটা শুধু রাজনৈতিক স্বরাজ নয়,—সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্যও বটে।

সুরেন ॥ রাজরোষে সন্ত-নিষিদ্ধ তোমার 'পথের দাবী'তে বিপ্লবের এই মর্মবাণী উদ্ভাসিত। বই বাজেয়াপ্ত করে তোমাকে কেউ রুখতে পারবে না আমি জানি। কিন্তু তোমার বিপদটা আসছে অন্যভাবে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে, এটা অনেকেরই ধারণা। 'পথের দাবী' বই পড়ে তাদের সে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী হয়েও—

শরৎ ॥ দেখ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটা কথা বলতেন—যত মত তত পথ। যে যে-পথেই যাক না কেন, সবাইকে আমি ভালবাসি—সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি রবীন্দ্রনাথকেও তাই লিখছি—

সুরেন ॥ আবার তাঁরই কাছে চিঠি! উনিই-না তোমাকে লিখেছেন—আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই!

শরৎ ॥ কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমি এবার তাঁকে লিখছি আমার প্রশ্ন, ইংরেজ রাজশক্তির এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করবার জাস্টিফিকেশনও তেমনি আছে।··· দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকেই করতে হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে। হ্যাঁ, আজ আমি তাঁকে এই উত্তরই দিচ্ছি।

সুরেন ॥ হ্যাঁ, দাও। কিন্তু এসব কথা তাঁকে লেখা, উলুবনে মুক্তা ছড়ানো হচ্ছে না কি?

শরৎ ॥ (উত্তেজিত হইয়া) সুরেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা বলতে সংযত হয়ে বল।

সুরেন ॥ কিন্তু আমি খুব অন্যায় করেছি বলে মনে হচ্ছে না তো শরৎ! ভুলো না, তিনি আজ পর্যন্ত সমগ্র দেশব্যাপী অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করেননি। তাঁর উপর তোমার দুর্বলতাটা আমি বুঝি। দ্রোণাচার্যের শিষ্য যেমন একলব্য, এই সাহিত্য-গুরুটির সেই একলব্য তুমি।

শরৎ ॥ আমি তা অস্বীকার করব না সুরেন। কিন্তু জেনে রেখ, দেশপ্রেম দেশাত্মবোধে আজও তিনি অনন্য। জালিওয়ানাবাগ এ জেনারেল ডায়ার কর্তৃক সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি রাজশক্তির দেওয়া

'নাইট' উপাধি বর্জন করে সমস্ত পৃথিবীর সামনে উদ্‌ঘাটিত—উদ্ভাসিত করেছেন ব্রিটিশ বর্বরতা। তিনি শুধু আমাদের সাহিত্য-গুরু নন, জাতীয় জাগরণের মন্ত্র-গুরুও তিনি। সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হতে পারে, তাই বলে অশ্রদ্ধেয় নন তিনি কখনো।

সুরেন॥ যাক্, এসব বড় বড় ব্যাপার। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। মানে, বড়মা পায়েস করেছেন খবর পেয়েছি—জল দেওয়া দুধে নয়, তোমাদের বাড়ির কাজলী গাই-এর দুধ দুইয়ে। আমি সেই মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করতে চললাম।

[সুরেন্দ্রের অন্দরে প্রস্থান। সরকারী পোষাক পরিহিত গ্রামের দফাদার নিবারণ ঘোষাল শরৎচন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত]

শরৎ॥ আরে এস, এস নিবারণ-খুড়ো! ব্যাপার কি?

নিবারণ॥ একটু ওষুধ চাই ভাইপো।

শরৎ॥ ওষুধ. আমার কাছে?

নিবারণ॥ কেন ভাইপো, বিনা পয়সায় হমোপাথি ওষুধ দিয়ে ব্যারাম সারিয়ে, এ অঞ্চলের গরিবদের তুমি তো মা-বাপ হয়ে বসেছ।

শরৎ॥ না না, সব ব্যায়রাম কি আর আমি সারাতে পারছি। তবু. বলো না—তোমার কি হয়েছে খুড়ো?

নিবারণ॥ বামুনের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শিখিনি। শেষে করতে হচ্ছে, পুলিসের দফাদারি চাকরি। ঝক্‌মারির অন্ত নেই। কিন্তু এত করেও কর্তাদের মন পাই না। এমন সব হুকুম করে, মান-ইজ্জতও থাকে না।

শরৎ॥ তা এসব ব্যায়রামের চিকিৎসা তো আমার জানা নেই খুড়ো।

নিবারণ॥ কিন্তু অনবরত এই খাটা-খাটনিতে যদি মাথা ঘোরে, আর মাথা ধরে, সে ওষুধ তো তোমার আছে?

শরৎ॥ হ্যাঁ, তা আছে। আমি দিচ্ছি। এই ভোলা—

[ভোলার প্রবেশ]

নেপথ্যে ভোলা॥ যাই কর্তা।

শরৎ॥ ঘোষাল-খুড়োর চা— [ভোলা ভিতরে গেল]

নিবারণ॥ তা বলব ভাইপো—তোমার এখানে সকাল-সন্ধ্যায় চা-টা খাই বলে, এত ঝক্কি পোয়াতে পারি।

[ভোলা চা ও জলখাবার আনিয়া নিবারণকে দিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। নিবারণ বেশ 'স্টাইল' করিয়া উহা খাইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র তাহাকে কয়েক পুরিয়া ওষুধ দিয়া বলিলেন]

শরৎ॥ ক্যালি-ফশ্, টুয়েলভ্, এক্স। রোজ রাতে শোবার সময় এক পুরিয়া খাবে, আর ভোরে রোজ এক পুরিয়া খাবে। সাতদিন পর কেমন থাকো আমাকে জানাবে।

নিবারণ ॥ কালি—কালি কি বললে? ফস্ করে সারিয়ে দেবে! মা কালীর এতবড় ভক্ত তুমি! তুমি যখন বলেছ, ফস্ করে সারিয়ে দেবেনই মা কালী। ও আমি না খেলেও সারিয়ে দেবেন।

শরৎ ॥ আরে কি বিপদ! ক্যালি ফস্ হল ওষুধটার ইংরিজি নাম।

নিবারণ ॥ বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছো যে! কালীও ইংরিজি নয়, ফস্ও ইংরিজি নয়। কালী ফস্ করে সারাবেন—ও দুটোই হচ্ছে বাংলা কথা—ভক্তির কথা—ধর্মের কথা। লেখাপড়া না শিখলে কি হবে—নিবারণ ঘোষাল এইটুকু বোঝে। কিন্তু এ কি, এ যে আমার বড় দারোগা সায়েব আসছে! যামিনী পোদ্দার। ও বাবা, ওকে আমার বড় ভয়। শালা-বাঞ্চৎ ছাড়া কথা কয় না।

শরৎ ॥ তা তুমি খেতে খেতে উঠে দাঁড়ালে কেন? না আসতেই এঁঠো হাতে স্যালুট করছ! তুমি হচ্ছ আমার অতিথি। তুমি না খেয়ে উঠলে আমার অকল্যাণ হবে না খুড়ো? না না, তুমি যেমন খাচ্ছিলে খাও। আমি বলছি, উনি কিচ্ছু মনে করবেন না। ভদ্রলোক তো!

[বড় দারোগা যামিনী পোদ্দার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিবারণ ঘোষালের তখন সাংঘাতিক অবস্থা। একবার বড় দারোগার মুখের দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, একবার শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া খাবার মুখে দেয়। এমনি ওঠা-বসার মধ্যে নাকে-মুখে খাওয়া চলিতে লাগিল]

যামিনী ॥ একি, নিবারণ না?

নিবারণ ॥ হ্যাঁ স্যার—না স্যার—

যামিনী ॥ মানে!

নিবারণ ॥ খাচ্ছিলাম স্যার—খাওয়াচ্ছে স্যার—

যামিনী ॥ এ তো আচ্ছা বেয়াদব দেখছি!

নিবারণ ॥ এঁটো-হাতে স্যালিউট করতে পারছি না স্যার। নাকে-মুখে এখনি শেষ করে আসছি স্যার।

[যামিনী শরৎচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া]

যামিনী ॥ ওহে, শরৎ চাটুজ্যে বাড়ি আছে তো? লোকটাকে ডাকো।

শরৎ ॥ ডাকতে হবে না—

যামিনী ॥ ডাকতে হবে না মানে? তুমি কে? অত কলম নিয়ে বসে আছ, লোকটার কলমচি কেরানী বুঝি?

[নিবারণ ইতিমধ্যে তার খাওয়া কোনমতে শেষ করিয়া জল দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিয়াছে এবং দারোগা-সাহেবের সামনে গিয়া যথারীতি স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল]

যামিনী ॥ এই রাস্কেল, আমি এলাম তা দেখেও তুই খেতে লাগলি?

এত বড় তোর নোলা? দেখেছিস-না পথের ধুলোয় আমার পা ডুবে গেছে? পা ধোয়ার জল নিয়ে আয়—পা ধুয়ে দে—

[নিবারণ শরৎচন্দ্রের দিকে একবার তাকাইয়া দ্বিধাভরে দূরে রক্ষিত একটি জলের জাগ আনিতে যাইতেছিল]

শরৎ ॥ (নিবারণকে) দাঁড়াও। (যামিনীকে) মশাই তো দেখছি জুতো-মোজা পরে রয়েছেন। ধুলো যা লাগবার তা তো জুতো-মোজাতেই লেগেছে, পায়ে তো লাগবার কথা নয়।

যামিনী ॥ সাট্ আপ ইউ ইডিয়ট! আমি তোমাকে দেখে নিচ্ছি। এই ব্যাটা নিবারণ, জল আন্।

শরৎ ॥ (নিবারণকে) না। (যামিনীকে) দেখুন মশাই, কোন প্রয়োজনেই হয় তো আপনি এসেছেন। আপনি এ-বাড়ির অতিথি। আপনার জলের দরকার আমাকে বলুন, আমি আনিয়ে দিচ্ছি। তা আপনি এখানে এসে আর-এক অতিথিকে জল আনতে বলছেন কেন?

যামিনী ॥ এই নচ্ছার নিবারণ, আনলি জল?

শরৎ ॥ দেখুন, আপনি আমার বাড়িতে এসে, আমার ঐ আত্মীয়কে এমনভাবে অপমান করতে পারেন না। আপনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।

যামিনী ॥ মানে! এ বাড়ি তোমার?

[এখানকার গোলমালে সুরেন এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

শরৎ ॥ হ্যাঁ, আমার।

যামিনী ॥ ও, আপনিই তবে শরৎ চ্যাটার্জি? বই-টই লেখেন! মারবার দাবী বলে কি একটা বই লিখেছেন?

শরৎ ॥ মারবার দাবী! না লিখিনি, তবে লিখব।

যামিনী ॥ না মানে—(পকেট হইতে একখানি অর্ডার বাহির করিয়া) এই দেখুন, গভর্ণমেন্টের এই অর্ডারটা দেখুন—(শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়া) আমি আপনাকে চিনতে না পেরে একটু যা-তা বলেছি, সেটা ধরবেন না। কেমন, মারবার দাবী তো?

শরৎ ॥ বলেছি তো, ও বইটা আমি এখনও লিখিনি—লিখব। যে বইটার ব্যাপারে আপনি এসেছেন, সেটার নাম 'পথের দাবী'।

যামিনী ॥ ও মশাই 'পথের দাবী' মানেই, মারবার দাবী। তা না হলে সরকার বাজেয়াপ্ত করে?

শরৎ ॥ 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার অর্ডারটা আগেই পেয়েছি। কিন্তু আমার রিভলভারটি যে বাজেয়াপ্ত করতে এসেছেন, সেটা জানছি এই

অর্ডারে। বেশ, আপনি এই অর্ডারের কাগজে রসিদটা লিখুন, আমি রিভলভারটা আপনাকে এনে দিচ্ছি।

[শরৎচন্দ্র অন্দরে গেলেন, সুরেন তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যামিনী রসিদ লিখিতে লাগিল। নিবারণ অদূরে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল]

নিবারণ ॥ জয় মা কালি ফস্—জয় মা কালি ফস্—

যামিনী ॥ মা কালি ফস্!

নিবারণ ॥ (ডান হাতের অঙ্গুলি ঘুরাইয়া) মাথা ঘুরছে স্যার—(বলিয়াই পুনরায় দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল)

যামিনী ॥ মাথা ঘুরছে তো? থানায় চলো, সেখানে মুণ্ডুপাত হলেই তোমার মাথার ব্যারাম সেরে যাবে। হারামজাদা ইডিয়ট!

[শরৎচন্দ্র রিভলভার লইয়া আসিলেন, সুরেনও সঙ্গে আসিলেন। শরৎচন্দ্র বড় দারোগার হাতে রিভলভারটি দিলেন এবং সরকারী রসিদটি লইয়া তাহা ঠিক লেখা হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং পরে উহা সুরেনের হাতে দিলেন]

সুরেন ॥ নিন, এইবার কেটে পড়ুন দেখি।

যামিনী ॥ পা-টাও ধোয়া হল না! (নিবারণকে) ওহে থানায় চলো। তোমার দফাদারির দফা নিকেশ করছি। 'ডিস্ওবিডিয়েণ্ট'! চলো।

[যামিনী দারোগা চলিল, নিবারণ তাহার পিছনে চলিল, কিন্তু বারে বারে শরৎচন্দ্রের দিকে কাতর করুণ দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকাইয়া চলিয়া গেল]

সুরেন ॥ অর্ডারে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—আর্মস্ অ্যাক্টে তোমার রিভলভারটা গেল।

শরৎ ॥ তা ভালোই হয়েছে। নইলে, এ যা দেখছি—কাকে কখন্ খুন করে ফেলতাম কে জানে!

সুরেন ॥ এখন মনে হয়, সবার হাতে যদি অস্ত্র-শস্ত্র থাকত, তবে দেশ এমন পরাধীন হত না!

শরৎ ॥ কথাটা কি জানো? অস্ত্র-শস্ত্র আজই না-হয় নেই, কিন্তু হাজার বছর ধরে করছিলাম কি? তখন তো আর্মস্ অ্যাক্ট জারি হয়নি; আত্মকলহেই আমরা চিরকাল মরেছি। তাই বার বার মোঘল—পাঠান—ইংরেজের পায়ে আমাদের মাথা মুড়ানো গেছে। আজকের কথাই ধরো—আমাদের এই বাংলা দেশের কথাই ধরো—১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলা দেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই কি মারাত্মক দলাদলি শুরু হয়ে গেছে! একদিকে জে. এম. সেনগুপ্ত আর একদিকে সুভাষচন্দ্র। যেখানে আবশ্যক ছিল ঐক্য, সেখানে অনৈক্য এসে আমাদের শক্তি ক্ষয় করছে। অথচ কি কর্মী, কি নেতা, সকলেই কি অদ্ভুত আত্মত্যাগই-না করে এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন!

সুরেন ॥ তা তুমিও তো দলাদলির বাইরে নও। হাওড়া জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তুমি, কিন্তু তোমার দলটি সুভাষী দল।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, দলাদলি যখন কিছুতেই এড়ানো গেল না, তখন আমি সেই দলেই যোগ দিয়েছি, যে দল সশস্ত্র বিপ্লবেও বিশ্বাসী। মুক্তি-সংগ্রামে গোঁড়ামি চলে না—চলবে না। আমি বিশ্বাস করি না বাঁধা-ধরা পথেই স্বরাজ আসবে। আর এটাও আজ দেখছি, দেশে ধীরে ধীরে কেমন একটা নিষ্ক্রিয়তা এসে গেছে। "কেউ কিছু কোরব না। কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রার এক তিল বাইরে যেতে পারব না। আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ির উপর বাড়ি, গাড়ির উপর গাড়ি, আমার দোতলার উপর তেতলা এবং তার উপর চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত থাক—কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে, খালি-গায়ে খালি-পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে তো দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে-সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না।" এ রাজনীতি সুভাষেরও না, আমারও নয়।

সুরেন ॥ তা যে রাজনীতিই কর বাপু, রিভলভারটা গেল—এখন জেল না হয়। আমি ঘাটে গিয়ে রূপনারায়ণের হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসি।

সুরেন ॥ এস।

[সুরেনের প্রস্থান। হিরণ্ময়ী দরজায় দাড়াইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলিবার এই সুযোগ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাড়াইলেন]

হিরণ্ময়ী ॥ ওগো, এ বইটা লেখার জন্য তোমার জেলও হতে পারে নাকি ?

শরৎ ॥ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, হতেও পারে বা !

হিরণ্ময়ী ॥ একটা বই লেখার জন্যে জেল হবে ! বইটা কি বোমা, না বন্দুক ?

শরৎ ॥ ওরা তো মনে করে তার চেয়েও বেশী। পুলিস-কমিশনার কলসন সাহেব আমাকে ডেকে সেদিন বলছিলেন—'শরৎবাবু, আপনি পথের দাবী লিখে আমাদের কি ক্ষতি করেছেন জানেন ? আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরছি, সেখানেই দেখছি, তাদের সকলের কাছেই একটা করে গীতা ও একটা পথের দাবী। আপনার পথের দাবী বিপ্লবীদের কিভাবে মাতিয়েছে একবার দেখুন।'

হিরণ্ময়ী ॥ কিন্তু তবু এখনও তো তারা তোমাকে জেলে পোরেনি।

শরৎ ॥ ভাবছে—। রিভলভারটা কেড়ে নেওয়াতেই বুঝছি, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে।

হিরণ্ময়ী ॥ কিন্তু তুমি জেলে গেলে, রোগের ডিপো তোমার এই দেহটি টিকবে কি? এত নিয়মে রেখেও তোমাকে ভালো রাখতে পারিনে। খাওয়া-দাওয়ার অত অনিয়মে, জেলের অত জোর-জুলুমে বাঁচবে কি?

শরৎ ॥ ও, এইসব চিন্তা বুঝি তোমার মাথায় ঢুকে গেছে? তা কি করব বলো? (হিরণ্ময়ীর মন বুঝিতে) পথ অবশ্য আছে বড় বৌ।

হিরণ্ময়ী ॥ কি পথ?

শরৎ ॥ যদি বলি—পথের দাবী করে আর কোন বই লিখব না, তবে জেলের ল্যাঠা চুকে যায়।

হিরণ্ময়ী ॥ য়্যাঁ!

শরৎ ॥ হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আরও বড় এক কর্তা, প্রেনটিশ সাহেব আমাকে ডেকে বলেছেন—'তুমি সরকারের পক্ষ থেকে পথের দাবী-র মত একখানি বই লিখে দাও, ভালো টাকা পাবে।'

হিরণ্ময়ী ॥ সত্যি! উত্তরে—তুমি কি বলেছ?

শরৎ ॥ 'সাহেব, ছেলেবেলা আমার ঘুড়ি উড়িয়ে, লাট্টু-গুলি খেলে কেটেছে। যৌবনটা গাঁজা-গুলি খেয়ে। তারপর রেংগুনে গিয়ে হৈ হৈ আর চাকরি করেছি। আর ওসব লেখার বয়স নেই, আমায় ক্ষমা কর।'

হিরণ্ময়ী ॥ আর এর পরেই রিভলভারটা গেল। তবে এখন জেলটাই বাকী!

শরৎ ॥ না না, তুমি যদি চাও, প্রেনটিশ সাহেবের কথা রেখে আমি জেলে না গিয়ে, তোমার আঁচলের তলে বেশ বহাল-তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারি।

হিরণ্ময়ী ॥ তা যদি পার তবে বুঝব, তোমার সঙ্গে যোল বছর ঘর করেও তোমাকে আমি কিছুমাত্র চিনতে পারিনি।

শরৎ। য়্যাঁ?

হিরন্ময়ী ॥ হ্যাঁ, ওই ভগবানকেই আমি ডাকব আর মাথা খুঁড়ে বলব, ঠাকুর, জেলে গেলে ও আর বাঁচবে না। ওঁকে তুমি বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও, ওঁকে তুমি লিখতে দাও—প্রাণভরে লিখতে দাও, গোটা দেশ আজ ওঁর লেখা পড়বার জন্য পাগল হয়ে রয়েছে।

শরৎ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি লিখতে চাই—আমি লিখব—প্রাণভরে লিখব, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই—যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত—মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে—এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের

নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি দেখেছি কত অবিচার, কত কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার করবার শুধু এদের নিয়ে।" এই যুগ যন্ত্রণার কতটুকু আমি লিখতে পেরেছি! আমি লিখতে চাই। আমি বাঁচতে চাই। আমি লিখব। লিখতে লিখতেই মরতে চাই। জেনো বড় বৌ, তাতেই আমি বাঁচব।

———

সপ্তম দৃশ্য

[কলিকাতা। বালিগঞ্জের ২৪ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোড। শরৎচন্দ্রের স্বভবনে শয়ন-কক্ষ। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগ। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন ৬১ বৎসর ৪ মাস। হিরণ্ময়ী ঘরে ধূপ-ধুনা দিতেছিলেন এমন সময় পঞ্চানন মুখার্জীর প্রবেশ। কাল : সন্ধ্যা]

পঞ্চানন॥ বৌমা, আমি তো আর দেরি করতে পারছি না। এই ট্রেনটা ধরতে না পারলে গোবিন্দপুর পৌঁছতে রাত দুপুর হয়ে যাবে। শরৎকে প্রকাশ স্নানের ঘরে ধরে নিয়ে গেল দেখলাম। ওখানে মনে হচ্ছে কিছুটা দেরি-ই হবে।

হিরণ্ময়ী॥ হ্যাঁ ঠাকুরজামাই, ডাক্তারবাবু বলেছেন, সন্ধ্যার সময় ভালো করে তেল মালিশ করে গা-টা স্পঞ্জ করে দিলে সুনিদ্রা হতে পারে। কথাটা ওঁর মনে ধরেছে। প্রকাশও তাই উৎসাহ পেয়ে একজন্য ওঁকে ধরে নিয়ে গেল।

পঞ্চানন॥ আমারও মনে হচ্ছে এতে ভালো ঘুম হবে। শরতের সঙ্গে আমার কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। জলটল খেয়ে নিয়েছি। আমি কি বেরিয়ে পড়ব বৌমা? কাল-পরশু তো তোমার দিদিকে নিয়ে আবার আসছি। শরতের এই অসুখে তোমাদের দিদিও বড়ই উতলা হয়ে পড়েছেন।

হিরণ্ময়ী॥ হ্যাঁ, তাঁকে আনবেন। দিদি এলে ওঁরও ভালো লাগবে। আপনি যে ওঁর কোষ্ঠীটা দেখবেন বলেছিলেন, দেখেছেন কি? যদি দেখে থাকেন, এই ফাঁকে আমাকে বলুন না কি বুঝলেন?

পঞ্চানন॥ একটু ভোগ আছে বৈকি। আচ্ছা, এর পরে যেদিন আসব, সেদিন তোমায় সব বলব। এখনি না বেরোলে ট্রেনটা ধরা যাবে না বৌমা।

হিরণ্ময়ী॥ আপনি ভাববেন না ঠাকুরজামাই। সুরেনমামা আমাদের মরিস গাড়িটা নিয়ে ওঁর এক্স-রে রিপোর্ট আনতে গেছে। এখনি এসে পড়বে। ট্রামে না গিয়ে বরং ঐ গাড়িতেই স্টেশনে যাবেন। আপনি এই ফাঁকে আমায় বলুন না, ওঁর কোষ্ঠীতে কি দেখলেন?

পঞ্চানন ॥ হ্যাঁ, তবে একটু বলতে পারি। ওর কোষ্ঠীটা মনে হচ্ছে সঠিক। স্থরেনমামু ওঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা আর তারিখ বা নোট রেখেছে, তার সঙ্গে কোষ্ঠীটা মিলছে। এই যেমন দেখ—শরতের এই বালিগঞ্জের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয় ১৯৩৪ সালে। শরৎ নিজেই আমাকে বলেছে—১৯২৫ সালে সামতাবেড়-এর বাড়ি তৈরি করতে তার খরচ হয়েছিল ১৭০০০ (সতের হাজার) টাকা। আর এ বাড়ি তৈরি করতে খরচ পড়েছে হাজার ত্রিশ। অর্থাভাবে পড়াশুনা করে বি-এ, এম-এ পাস না করতে পারলেও, ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্থবর্ণ পদক দিয়েছে. আর ছত্রিশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সর্বোচ্চ ডি-লিট্ উপাধি দিয়েছে। আমি এইসব ঘটনার সঙ্গে কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছি, শরতের কোষ্ঠী নির্ভুল। এই তো, বুধ তুঙ্গী ও কেন্দ্রী। ফল—"সোচ্চারাশি-শতশ্চান্দ্রী কেন্দ্র—কোণসমন্বিতঃ। বিত্তাবাহন সম্পত্তিং করোতি বিপুলং ধনম্।"—কন্যা রাশিতে বুধের অবস্থান হেতু ফল :—"স্থবচনাহ্নরতশ্চতুরা নরো লিখনকর্মপরোহ্বিবরোন্নতিঃ।"—তাছাড়া, রাশিচক্রে শুক্র ও চন্দ্রের পূর্ণ দৃষ্টি একাদশ বা লাভস্থানে বর্তমান—ফলে শরৎচন্দ্রের আয় হয়েছে "স্ত্রীজন—কাব্য—নাটক—কলা সংগীত বিত্তাদিভিঃ" প্রভৃতি থেকে। নাটকেই কি কম নাম হল? ১৯২৭ সালে দেনা-পাওনার নাট্যরূপ 'ষোড়শী,' ১৯২৮ সালে পল্লীসমাজ-এর নাট্যরূপ—'রমা,' আর ১৯৩৪ সালে দত্তা-র নাট্যরূপ 'বিজয়া', শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় জাদুতে থিয়েটারে তো শরতের জয়জয়কার হয়েছে।—হতেই হবে। জাতকের রয়েছে বুধাদিত্য যোগ—মান-সম্মান, সাহিত্য-প্রতিভা জগৎ-বিখ্যাত হবে।—হয়েওছে। কিন্তু—(কিছু বলিতে গিয়া আর বলিলেন না)

হিরণ্ময়ী ॥ (উদ্বেগে) আপনি থেমে গেলেন যে ঠাকুরজামাই?

পঞ্চানন ॥ কেন্দ্র কোণে শুভগ্রহ, শনি স্বক্ষেত্রে (কুম্ভে) এবং ষষ্ঠে পাপগ্রহ (মঙ্গল ও কেতু) ও নিধন স্থানে অর্থাৎ অষ্টমে পাপগ্রহ রাহুর পূর্ণ দৃষ্টিহেতু শরৎচন্দ্রের মধ্যায়ু যোগ—পরাশর মতে ৬৪ বা ৭২ বছর বয়স পর্যন্ত মধ্যায়ু। তা শরতের তো মাত্র একষট্টি।

হিরণ্ময়ী ॥ ৬১ বৎসর ৪ মাস—

পঞ্চানন ॥ ৬৪-র ফাঁড়াটা কেটে গেলে ৭২ পর্যন্ত আর ভাবতে হবে না।

হিরণ্ময়ী ॥ (ব্যাকুল হইয়া) তা এখন এই ফাঁড়াটা কাটে তবে তো! আপনি আশীর্বাদ করুন।

পঞ্চানন ॥ আমাদের নিত্য আশীর্বাদ তো রয়েইছে। তা ছাড়া তুমি মা তোমার দিদির পূজার জন্য আমাদের গোবিন্দপুরে হাজার টাকারও বেশী ব্যয়ে যে শিবমন্দির গড়ে দিয়েছ, সেখানে শরতের কল্যাণের জন্য শিবের পায়ে তোমার দিদি মাথা খুঁড়ছেন।

[সুরেনের প্রবেশ। হাতে ওষুধের শিশি ও কাগজপত্র]

পঞ্চানন ॥ এই যে সুরেনমামু এসে গেছে। তা আমি ঐ গাড়ি নিয়েই তবে হাওড়া ছুটি, কি বলো মা? হিরন্ময়ী প্রণাম করিলেন) কল্যাণমস্তু। তুমি ভেব না, ঈশ্বরের কৃপায় কি না হয়? এ অমঙ্গল দূর হবেই হবে।

[পঞ্চানন ছুটিয়া চলিয়া গেলেন]

হিরণ্ময়ী ॥ (সুরেনকে) ডাক্তার কি বললে মামা?

সুরেন ॥ এক্স-রে রিপোর্টটা দেখলেন। বললেন একটু ভোগাবে দেখছি। আরও দু'একজন ডাক্তারের সঙ্গে ফোনেও কি আলোচনা করলেন। তারপর বললেন—সেবাশুশ্রূষা বাড়িতে যা হচ্ছে তা ঠিক-ই হচ্ছে। কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা আর নিয়মমত পথ্যাদির জন্য রোগীকে এখনই কোন ভালো নার্সিং হোমে রাখা উচিত।

হিরণ্ময়ী ॥ য়্যাঁ, হাসপাতালে!

সুরেন ॥ না বড়মা, হাসপাতাল নয়। হাসপাতালের থেকেও চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থার জন্য আজকাল কিছু নার্সিং হোম হয়েছে। ডাক্তার 'পার্ক নার্সিং হোম'-এর কথা বললেন।

[প্রকাশের প্রবেশ]

হিরণ্ময়ী ॥ (প্রকাশকে) এ কি! তোমার দাদা কোথায়?

প্রকাশ ॥ বললেন—একটু পূজার ঘরে বসব। আমাকে বসিয়ে দিয়ে তোর বৌদিকে আসতে বল্।

হিরণ্ময়ী ॥ (পরম উদ্বেগে) কেন, কি হয়েছে?

প্রকাশ ॥ না না, ভাববার কিছু নেই, ভালোই বোধ করছেন।

হিরণ্ময়ী ॥ না না, দেখতে হচ্ছে!

[হিরণ্ময়ী পূজার ঘরে ছুটিলেন]

সুরেন ॥ তুমি বলছ প্রকাশ, ভাববার কিছু নেই। আমি বলছি—এখন আমাদের ভাবনা ছাড়া কিছু নেই।

প্রকাশ ॥ কেন, কেন মামা? এক্স-রে রিপোর্ট দেখে ডাক্তার কি কিছু ভয়ের কথা বলেছেন?

সুরেন ॥ সেটা এখন থাক্। এখন চটপট অনেক কিছু কাজ করবার আছে। ওঁকে কাল সকালের মধ্যেই পার্ক নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হবে। ওখানে ওঁর অপারেশন হবে।

প্রকাশ ॥ অ—পা—রে—শ—ন!

সুরেন ॥ দেখছ না, অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? কিছু খেতে গেলে গলায় খুব কষ্ট হয়। পেটে কিছু পড়লেই উঠে আসতে চায়।

প্রকাশ ॥ কিন্তু আপারেশন ছাড়া কি আর কোন চিকিৎসা নেই ?

সুরেন ॥ এক্স-রে রিপোর্ট দেখার পর ডক্টর ম্যাকসাহেব, ডক্টর বিধান রায়, ডক্টর কুমুদশঙ্কর রায় সবাই একবাক্যে বলছেন—শরতের পেটে অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এবং তা করতে হবে এখনি।

প্রকাশ ॥ না না, অপারেশন, করলে দাদা আমার বাঁচবে না। অপারেশনে আমাদের সবারই বড় ভয়।

সুরেন ॥ আঃ প্রকাশ ! অপারেশন না হলে আরো ভয়। এই বিপদে শক্ত হও। শক্ত হতেই হবে তোমাকে।

প্রকাশ ॥ (প্রকৃতিস্থ হইয়া) বেশ, শক্তই হচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন, অপারেশন কেন ? আর, তা না হলেই বা ভয়টা কি ?

সুরেন ॥ লিভারে ক্যানসার। সেটা স্টমাকও ছুঁয়েছে।

প্রকাশ ॥ ক্যা—ন—সা—র ! ক্যা—ন—

[দরজার বাহিরে শরৎচন্দ্রের উচ্চ-হাসি শোনা গেল]

সুরেন ॥ চুপ, শরৎ আসছে।

[হো-হো করিয়া হাসিতে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ। সঙ্গে হিরণ্ময়ী]

সুরেন ॥ কি শরৎ, এক-জাহাজ হাসি কেন ?

শরৎ ॥ বলছিলাম, ডাক্তারের ইচ্ছে আমি হাসপাতালে যাই। তা উনি বলছেন, সত্যিকার হাসপাতাল আমাদের এই বাড়ি। একমাত্র এখানেই হাঁস আছে, আর তারা পাতালে—মানে, নিচে থাকে। আর কোনো হাসপাতালে নাকি এটা নেই। কথাটা ডাক্তারকে বলতে হবে।

সুরেন ॥ আজ কেমন বুঝছ ?

শরৎ ॥ তোমার বড়মা আজকে আমাকে স্পঞ্জ করিয়ে ছেড়েছেন। ভালোই বোধ করছি। তা দেখছি ওঁর কথা শুনলেই সুখ - না শুনলেই অসুখ। ভালো কথা, তুমি ডক্টর বিধান রায়-এর দেখা পেয়েছ ?

সুরেন ॥ দেখা করতে হয়নি। ডাক্তার ম্যাকসাহেব-ই বিধান রায় আর কুমুদশঙ্কর রায়-এর সঙ্গে তোমার এক্স-রে প্লেট নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের তিনজনেরই মত কাল সকালের মধ্যেই 'পার্ক নার্সিং হোম'-এ তোমাকে ভর্তি করতে হবে। আর, তার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

শরৎ ॥ হয়ে গেছে ?

সুরেন ॥ হ্যাঁ, তোমার বন্ধু কুমুদশঙ্কর-ই সব ব্যবস্থা করেছেন।

হিরণ্ময়ী ॥ কিন্তু—কিন্তু—(কাঁদিতে লাগিলেন)

শরৎ ॥ আমার নিজের শেষ প্রশ্নের উত্তর আজ পেয়ে গেলাম বড় বৌ। তোমরা আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও। (সকলে প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা সুরেন, তুমি একটু ব.স যাও। [হিরণ্ময়ীর প্রস্থান]

শরৎ ॥ তোমার সেই গানটা আমায় শোনাবে সুরেন? সেই—'কোথা ভবদারা দুর্গতি হরা',—আমি আগে গাইতাম—এখন ভুলে গেছি।

সুরেন ॥ (গাহিলেন) "কোথা ভবদারা! দুর্গতি হরা। কতদিনে তোর করুণা হবে; কবে দেখা দিবি কোলে তুলে নিবি সকল যাতনা জুড়োবে।"

[হিরণ্ময়ীর হঠাৎ প্রবেশ]

হিরণ্ময়ী ॥ না-না, এ গান নয়—এ গান নয়—এ গান নয়।

[সুরেন স্তব্ধ হইলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল]…

……[মঞ্চ পুনরালোকিত হইলে দেখা গেল শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিস্তব্ধ। নিচে বসিয়া হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন]

শরৎ ॥ নাঃ, ঘুম পাচ্ছে না।

হিরণ্ময়ী ॥ বিছানায় না শুলে ঘুম পাবেও না।

শরৎ ॥ আমার ঘুমুতে কোন ইচ্ছেই হচ্ছে না বড় বৌ।

হিরণ্ময়ী ॥ কেন বলো তো?

শরৎ ॥ কেন যেন প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে তা নষ্ট করতে পারব না। জানো বড় বৌ, বিয়ের আগে আমার মনে হত, এ বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্র যায় ততই ভালো। অসুখ হলে ওষুধ খেতাম না আমি। প্লেগ-এর রোগী দেখলে, আমিই যেতাম ছুটে সবার আগে শুশ্রূষা করতে। কিন্তু প্রথমে শান্তি, আর তারপর তোমাকে পেয়ে দেখলাম বেঁচে থাকা চলে। স্বর্গের চেয়ে মর্ত্যটাও কিছু কম নয়।

হিরণ্ময়ী ॥ বাঁচতে তোমাকে হবেই, দেশের জন্যেই বাঁচতে হবে। নইলে শুধু আমার জন্যে বাঁচতে বলছি না।—আমি কে! মুখ্যু মেয়ে, যে কোনদিনই তোমার সাধনার সঙ্গী হতে পারল না। রূপ নেই, গুণ নেই, কাঙালী এক বামুনের আইবুড়ো মেয়ে ছিলাম আমি—কেন যে তুমি আমাকে হঠাৎ বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলে আজও ভেবে পাই না আমি।

শরৎ ॥ প্রথম জীবনে যা চেয়েছিলাম, আমি তা পাইনি। যা চাইনি, তারই মধ্যে সেটা পাওয়া যায় কিনা, দেখার খেয়ালেই আমি করেছিলাম বিয়ে।

হিরণ্ময়ী ॥ কিন্তু কি করে তা আমার মধ্যে পাবে? কুৎসিত কুরূপা এই মুখ্যু মেয়ের মধ্যে?

শরৎ ॥ পেয়েছি—পেয়েছি। তুমি অসাধারণ এক সাধারণ মেয়ে। আর তা দেখে বোধ করি অবাকই হচ্ছে আমার মনের রঙ দিয়ে আঁকা ঐ নারীটি। (মহাশ্বেতার ছবিটি দেখাইয়া দিলেন) আনো তো ছবিটা। (হিরণ্ময়ী ছবিটি সামনে আনিয়া ধরিলেন) মহাশ্বেতা, অবাক হওনি কি তুমি? (শরৎচন্দ্র ছবিটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।)

হিরণ্ময়ী ॥ সত্যি করে বলো না—এই তাপসী মেয়েটি কে?

শরৎ ॥ না, তা বলব না। কিন্তু জেনো হিরন্ময়ী, কেমন আমার একটা জিদ চেপে গিয়েছিল, ওকে জব্দ করতে তোমার মতো লেখাপড়া না-জানা সাধারণ এক মেয়েকেও আমি বিয়ে করেছি।—আর দেখিয়ে দিয়েছি, তাতেও কত বড় সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়।

হিরণ্ময়ী ॥ কিন্তু তাতে ও মেয়েটি হারবে কেন? বরং আমি বলব, ওঁরই হয়েছে জয়। ওঁকে অবাক করে দেবার প্রতিজ্ঞা ছিল বলেই, আজ তুমি এত বড় হয়েছ।

শরৎ ॥ য়ঁ্যা!

হিরণ্ময়ী ॥ হঁ্যা!

শরৎ ॥ হতে পারে। হঁ্যা, হয়তো তাই। কিন্তু অবাক তো সে এখনো হয়নি। এখনো তো সে বলেনি সে ভুল করেছে—তার ভুল হয়েছে। হিরণ্ময়ী, আমার এত লেখা সব ব্যর্থ হয়েছে। আমাকে লিখতে হবে, আরো—আরো। তাই বাঁচতেও হবে আরো। তাকে হারিয়ে দিতে বাঁচতে হবে, তোমাকে পুরোপুরি পেতে বাঁচতে হবে। শোনো মহাশ্বেতা, ইনি আমার কিছু কম নয়। ইনি আমার মৃগনাভি কস্তুরী। স্নেহ—মায়া—মমতা—শ্রদ্ধা আর প্রেমে আজ যে এঁর কি সৌরভ, কি সৌন্দর্য তা ইনি নিজেও জানেন না। হঁ্যা বড়বৌ, তুমি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ, কিন্তু আমি তো কিছুই দিই নি। তোমার কাছে আমার অনেক দেনা। আমি কাল সকালে পার্ক নার্সিং হোম-এ ভর্তি হব। আমি বাঁচতে চাই। আমাকে তুমি বাধা দিও না হিরণ্ময়ী।

হিরণ্ময়ী ॥ তা ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। কিন্তু বকে বকে তুমি আরো দুর্বল হয়ে পড়ছো। নিতান্তই যদি না ঘুমোও, আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। চুপটি করে একটু বিশ্রাম করো—মাথাটা ঠাণ্ডা হোক্। বই-টই জল-টল সব রইল, আমি পাশে পুজোর ঘরেই থাকছি। কলিং-বেলটা টিপলেই চলে আসব।

শরৎ ॥ বই টই! কি হল ঐ বই-টই লিখে! কারো কি মন ভিজলো! কারো কি মন গললো! যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কার—আমি এক জন্মে দূর করতে পারি? না-না, আমি ব্যর্থ! বিধাতা! বিধাতা! তুমি এত বিরাট, কিন্তু মানুষের জীবনটা এতটুকু করেছ কেন? এ যে—এক জন্মে কিছুই হবার নয়! সাধনার ধন কিছু পাওয়ার নয়! ···কে?

———

*ক

[রহস্যালোকে উদ্ভাসিত কক্ষে হঠাৎ যেন শরৎচন্দ্রের সামনে কতগুলি অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটিল। [সিল্যুয়ড অথবা স্যাডো]। শরৎচন্দ্র সেই ভাব-রাজ্যে মগ্ন হইয়া চরিত্রগুলির সহিত আলাপরত হইলেন]

শরৎ ॥ এ কি—এ কি! কে তোমরা? খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, বুঝেছি—বুঝেছি—

সমবেত অমূর্ত কণ্ঠ ॥ আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।

শরৎ ॥ বুঝলাম, শেষ-দেখা দেখতে এসেছ। তা বেশ, কি বলবে বলো। তুমি বোধ করি পার্বতী?

অমূর্ত পার্বতী ॥ হ্যাঁ শরৎবাবু, আমি আপনার দেবদাসের পার্বতী।

শরৎ ॥ নালিশ আছে বুঝি কিছু?

অমূর্ত পার্বতী ॥ নালিশ বলবেন না—আমি বলব প্রশ্ন। দেবদাস-এর সঙ্গে আমার বাল্য-প্রণয়কে এমন করে ব্যর্থ করে দিলেন কেন? ওর সঙ্গে আমার বিয়েতে বড় কোন বাধা তো ছিল না! বাধা হল একমাত্র কে বড় ব্রাহ্মণ, কে ছোট ব্রাহ্মণ—বাধা হল শুধু শ্রেণী বৈষম্য। দু দুটি তরুণ জীবন এমনি করে কেন ব্যর্থ করে দিলেন আপনি?

শরৎ ॥ তোমায় কিন্তু আমি বিয়ে দিয়েছিলাম পার্বতী, বড়লোকের ঘরে।

অমূর্ত পার্বতী ॥ হ্যাঁ, এক দোজবরে বুড়ো জমিদার-এর সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমার, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারলেন। শরৎবাবু, দেবদাসকে যদি ভুলে যেতে পারতাম, কথা ছিল না। কিন্তু ভুলে যেতে দেননি আপনি। সারাজীবন আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারলেন।—কেন?

শরৎ ॥ অবিবেচক সমাজের অযৌক্তিক বিধি আর সংস্কার কিভাবে আমাদের জীবন ব্যর্থ করে দেয়, তোমাদের জীবনে আমি তাই দেখাতে চেয়েছিলাম পার্বতী।

অমূর্ত পার্বতী ॥ নাই-বা দেখাতেন! কেন এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন আপনি?

শরৎ ॥ সে প্রশ্ন এই নারীকে—আমার এই মহাশ্বেতা-চিত্রকে। আর নয়—সরে দাঁড়াও।—(অপরকে) তুমি?

অমূর্ত অচলা ॥ আমি আপনার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি 'গৃহদাহ'র অচলা। শরৎ-সাহিত্যে কয়েকটি বিবাহিতা বধূ সমাজ-নিষিদ্ধ সহজিয়া প্রেমের ফুল

★ অভিনয়ে অসুবিধা হইলে ক-অংশ বর্জনীয়।

হয়ে ফুটে উঠেছে—আপনার 'শ্রীকান্তে'র অভয়া, 'চতুর্থ পর্বে'র কমললতা, 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী আর 'শেষ প্রশ্নে'র কমল। অনেক তত্ত্ব আর মতবাদে অভিষিক্ত করেছেন ওদের চরিত্রগুলি: গৃহদাহের নিষিদ্ধ প্রেমের বাসরে আপনি সংযমের কোন বাধা-বন্ধনই রাখেননি। কিন্তু ওতে যে খেলাটি আপনি খেলেছেন, তাতে অন্তর্দ্বন্দ্বে আমরা কিন্তু অহরহ জ্বলে-পুড়ে মরছি।

শরৎ ॥ নীতিপুস্তক লিখিনি আমি, সাহিত্য সৃষ্টি করেছি।

অমূর্ত অচলা ॥ হ্যাঁ, সেটা বুঝেছি, তাই আমিই আপনার সুরেশবাবুকে বলেছি—সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও। যাকে ভালবাসি না, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না। সুরেশের সঙ্গে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গৃহদাহ সম্পূর্ণ হল। গৃহদাহের আগুন আমার স্বামীর সংযম আর ক্ষমাকে উদ্ভাসিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে অহরহ দগ্ধে দগ্ধে মারছে। আমারও প্রশ্ন, এত নিষ্ঠুর আপনি কি করে হতে পারলেন?

শরৎ ॥ ওর চেয়ে অনেক বেশী আঘাত নিজের জীবনেও পেয়েছি, তাই—

অমূর্ত অচলা ॥ ও!

শরৎ ॥ হ্যাঁ। ছিন্নমস্তা দেবীর ছবি দেখেছ? নিজের মুণ্ড ছিন্ন করে সেই রুধির উন্মত্ত উল্লাসে পান করছেন—এ জীবনটাও তাই। তুমি এখন এস।—ও কে? অভয়া না?

অমূর্ত অভয়া ॥ হ্যাঁ শরৎবাবু, আমি শ্রীকান্তের ২য় পর্বের অভয়া। আর এ-ও জানি, শ্রীকান্ত আর কেউ নন—আপনি স্বয়ং।—একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল,—সেই নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? স্বামীর এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই কি আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী, বিনা-দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাতে, সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে,—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু? রোহিনীবাবুকে তো আপনি দেখেছেন। তাঁর ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই। এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে, শরৎবাবু।

শরৎ ॥ চরিত্রহীন-এ আমার কিরণময়ী কামনার আগুন জ্বেলে অপরকে যেমন পুড়িয়েছে, নিজেকেও তেমনি পুড়িয়ে নিঃশেষ করেছে। কিন্তু অভয়া,

তুমি তার চেয়ে বড়। সমাজনিষিদ্ধ অথচ একনিষ্ঠ প্রেমের জয়পতাকা তুমি। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়—পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়তো একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় তো সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?… —এই রাজলক্ষ্মীর কথাই ধরো—শ্রীকান্তকে পেতে তার কোন বাধাই তো ছিল না, কিন্তু জন্মগত সংস্কারটাই তার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুমতে বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হলেও প্রচলিত নয়। বিধবা রাজলক্ষ্মী তাই বাঈজী হয়েও সামাজিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে শ্রীকান্তকে বরণ করতে পারল না কোনদিন। আমার পল্লীসমাজের 'রমা'র মত নারী, রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম-গ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করাও কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এতবড় দু'টি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল।

অমূর্ত চরিত্রগুলি ॥ (সমস্বরে) আমরা আপনার মানস-সন্তান। আমাদের এ দণ্ড আপনি কেন দিয়েছেন?

শরৎ ॥ শোন—শোন, আমি যে দণ্ড ভোগ করেছি, তারই উত্তরাধি-কারী হয়েছ তোমরা। তোমরাও শোন তবে আমার কাহিনী।—আমার আঁকা এই ছবিটি দেখ। আমি এর নাম দিয়েছি মহাশ্বেতা। এঁরই উদ্যানে একদিন ফুটেছিল আমার আর এঁর জীবনের প্রথম ফুল। ইনি ছিলেন সাহিত্যসাধিকা আর আমার সাহিত্যসাধনার অভিভাবিকা। এঁর পরিচয় জানতে চেয়ো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, এঁর কড়া তাগিদেই শুরু হয় আমার সাহিত্যের চাষ। হ্যাঁ, আমাদের সাহিত্য খাতার নামও ছিল—বাগান। এঁর ছিল যেমন কড়া তাগিদ,তেমনি কড়া সমালোচনা। এঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলোমেলো একটা ছত্রও এঁর কখনো দৃষ্টি এড়াত না।। কিন্তু, ষোল বছর বয়সে হঠাৎ বিধবা হয়ে এ যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল। এখন সাহিত্য-টাহিত্য সব ছেড়ে ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। এক অনড় অন্ধ সংস্কারের মোহে নিজের জীবনকে করলে অস্বীকার, আমার জীবনকে করলে ব্যর্থ। এই কুসংস্কার-আচ্ছন্ন, যুগ-জীবন-বিমুখ, হৃদয়হীন পাষাণ-সমাজের বুকে ঘা মারতেই আমি দেখিয়েছি তোমাদের জীবন-যন্ত্রণা—আর তারই মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বস্তরে সৃষ্টি করতে চেয়েছি এক ভাব-বিপ্লব। যদি না পেরে থাকি, পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন এঁকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা। আমি মিথ্যা বলেছি মহাশ্বেতা?

খ

[মহাশ্বেতা রেখাচিত্রটি আলোকিত হইল। চিত্রটির প্রদীপ্ত মুখে নিম্নোক্ত বাণী শোনা গেল—]

মহাশ্বেতা চিত্র ॥ আমি মহাশ্বেতা। কাদম্বরী নাটকের অন্যতম নায়িকা। আমার প্রেমও হয়েছিল ব্যর্থ। শিবমন্দিরে বসে আমি বাজাতাম বীণা, তার মুগ্ধ শ্রোতা ছিল আমার প্রণয়াস্পদ তরুণ পুণ্ডরীক। কিন্তু প্রেমের পথ মসৃণ নয়। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এল আমাদের মিলনে, প্রাণত্যাগ করল পুণ্ডরীক। কিন্তু প্রতীক্ষা আমার শেষ হল না। আমারই দুর্নিবার আকর্ষণে পুণ্ডরীক আবার জন্ম নিল—নাম হল তার বৈশম্পায়ন। আমাদের মিলন হল—সার্থক হল আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের অনির্বাণ প্রেম। সত্য প্রেমের মৃত্যু নেই। সবাই শোন, সবাই জেনো, এ জন্মে মনে মনে এত করে চেয়েও আমরা যা পেলাম না, তা আমরা জন্মান্তরে পাবই পাব।

[চিত্রালোক নির্বাপিত হইল]

শরৎ ॥ (চিৎকার করিয়া) তাই হ'ক—তাই হ'ক। তবে তাই হ'ক হ্যাঁ, তাই হ'ক—তাই হ'ক—তাই হ'ক।

[এই চিৎকারে ছুটিয়া আসিলেন হিরণ্ময়ী এবং আলো জ্বালিলেন]

হিরণ্ময়ী ॥ ওগো তুমি চিৎকার করছ কেন?—চিৎকার করে তুমি কি বলছ?

শরৎ ॥ তাই হ'ক—তাই হ'ক—নার্সিং হোমে আমার অপারেশন হ'ক। যদি বাঁচি, আবার লিখব। বিপ্লব আনব। কিন্তু যদি মরি, বড় বৌ?

হিরণ্ময়ী ॥ মৃত্যু তো একদিন সবারই হবে। আমারও হবে—তোমারও হবে। কিন্তু এ-ও জানি, আমরা কেউ কাউকে হারাবো না। এ জন্মে হারাবো—পরজন্মে পাব। তবে ভয়টা কি?

শরৎ ॥ হ্যাঁ, সেই আশা—সেই আশা—সেই আশা—। হ্যাঁ, কাল সকালেই আমি নার্সিং হোমে যাব। তুমি আমাকে তৈরি করে দাও, আমার মহাযাত্রার আয়োজন করে দাও। আমাকে পরজন্মের মহা-অভিসারে যেতে দাও। তুমি ঠিকই বলেছ হিরণ্ময়ী, আমরা কেউ কাকেও হারাবো না। এ জন্মে হারাবো, পরজন্মে পাব। জন্মান্তরের মহা-অভিসারে চলেছি আমরা। অনন্ত এ প্রেম, অনন্ত এ জীবন। আমাদের মৃত্যু নেই—আমাদের মৃত্যু নেই।

[মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া গেল......ক্ষণকাল করুণ যন্ত্রসঙ্গীত...... অন্ধকারে বেতারে একটি ঘোষণা শোনা গেল—]

বেতার ঘোষক ॥ অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ ঘোষণা : দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পার্ক নার্সিং হোমে একটি অস্ত্রোপচারের পর আজ ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী বেলা ১০টার সময় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন।

[বিয়োগান্ত বাদ্যধ্বনি]

বেতার ঘোষক ॥ ······এক শোকবার্তায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।"

॥ যবনিকা ॥

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়ের ১৯৪৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত
'যোগাযোগ' চিত্রের কাহিনী
অবলম্বনে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বঙ্গাব্দ
১৩৫৯—১৩৬০ সালে প্রকাশিত
মন্মথ রায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক :
মমতাময়ী হাসপাতাল

পরম পূজনীয়
ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী
শ্রীচরণকমলেষু
স্নেহধন্য
সেবক

মন্মথ রায়

১লা জানুয়ারী ১৯৫৫
২২৯সি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বৌবাজার স্ট্রীটে ছোট একটি বাসা বাড়ি। বাড়ির বাসিন্দা জয়ন্ত চৌধুরী বৌবাজারে অবস্থিত একটি হোমিওপ্যাথি কলেজের ছাত্র—সুদর্শন, বলিষ্ঠ যুবক; স্ফূর্তিবাজ ও দিলদরিয়া মেজাজ—সর্বোপরি ধনীর সন্তান বলিয়া সহজেই বন্ধু-মহলে 'কাপ্তেন' বনিয়া গিয়াছে। জয়ন্ত পিতার একমাত্র সন্তান, তদুপরি মাতৃহীন। শৈশব হইতেই পিতার অতিশয় আদরে প্রতিপালিত। পিতা ডাঃ দীনদয়াল চৌধুরী একজন নামকরা হোমিওপ্যাথ। কলিকাতা হইতে অনতিদূর মদনপুরে তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি। তিনি সেইখানে প্র্যাক্টিস করেন। জয়ন্ত এমনি দরাজ হাতে খরচ করে যে বাবা তাহার জন্য মাসে মাসে যে টাকা পাঠান—তাহাতে জয়ন্তের সাত দিনেরও খরচ কুলায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে ধার করিতে হয়। এ ভাবে ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই ঋণজাল হইতে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়—আজ সকালে উপবেশন-কক্ষে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে জয়ন্ত চৌধুরী তাহাই ভাবিতেছিল। উপবেশন কক্ষটিও সৌখিন রুচি অনুযায়ী সাজানো। একটি আলমারিতে হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই শোভা পাইতেছে। আলমারি পাশেই টেবিল-চেয়ার। জয়ন্ত সেখানে বসিয়া পড়া-শোনা করে আর এদিকে সোফা সেট।]

[জয়ন্তের সহপাঠী ও অন্তরংগ বন্ধু বিমান ও অনাদির প্রবেশ—তাহাদের হাতে পাঠ্য পুস্তক।]

বিমান॥ সওয়া সাতটা বাজতে চললো - হাসপাতাল ডিউটীতে যাবে না?

অনাদি॥ আর এই-বা কি। তুমি জয়ন্ত চৌধুরী—ষ্টেট এক্সপ্রেস কোম্পানির একজন এক নম্বর খদ্দের—তুমি কিনা বিড়ি টানছ?

বিমান॥ ব্যাপার কি বল তো? হাসপাতালে যাবে না?

জয়ন্ত॥ আর হাসপাতাল! কোন মুখে যাবো বলো? কাল দুই পাওনাদার একেবারে কলেজ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। দেনার দায়ে মান-ইজ্জৎ আর রইল না ভাই, বিমান।

অনাদি॥ আরে তোমার আবার দেনা। বাড়িতে অমন কামধেনু-বাপ রয়েছেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে একখানি চিঠি ছেড়ে দাও—হুড় হুড় করে টাকা এসে পড়বে।

জয়ন্ত॥ না ভাই অনাদি, সে পথ আর খোলা নেই। 'অসুখ হয়েছে'—'পকেট মারা গেছে'—'খান কতক দামী বই কিনতে হবে'—এ সব আর বাবা বিশ্বাস করবেন না। বাসাখরচ বাদে—পড়াশোনা আর হাতখরচ বাবদ মাসের

পয়লা তারিখে একশটি টাকা দেন। বাসাখরচ তো বাসাখরচেই যায়। বাদবাকী একশ টাকায় আমার কি করে চলে বল তো? বাবা বলেন—তিনি যখন কলেজে পড়েছেন, পঞ্চাশ টাকার বেশী তাঁর লাগেনি। বাবাকে তো জানো—একবার যা গোঁ ধরবেন—আর তা ছাড়বেন না।

অনাদি ॥ তাইতো—তাহলে তো বড় বিপদ, জয়ন্ত।

জয়ন্ত ॥ যাও ভাই—তোমরা কলেজে যাও। আমার আর কলেজ-টলেজ ভালো লাগছে না। দশজনের সামনে পাওনাদারের লাঞ্ছনা—ও ভাই আমি সইতে পারবো না।

বিমান ॥ তবে থাক—আমরাও যাব না। কি বলিস অনাদি?

[দুইবন্ধু বইগুলি ধপাস করিয়া টেবিলে রাখিল এবং সোফায় বসিয়া পড়িল]

অনাদি ॥ না,—ওকে ছেড়ে যাব না। ভাল লাগে না।

বিমান ॥ একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে।

অনাদি ॥ দাঁড়াও আগে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া যাক।

[এই বলিয়া নিজের পকেট হইতে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বাহির করিল]

জয়ন্ত ॥ (ম্লান হাসিয়া) দাও। Any port in the storm.

[পার্শ্বস্থিত শয়নকক্ষ হইতে গৃহ-কর্মরত ভৃত্য ভোলার প্রবেশ]

এই ভোলা—তিন পেয়ালা চা কর দেখি।

ভোলা ॥ করছি। কিন্তু দুধ-চিনি ছাড়া কবরেজী চা হবে।

বিমান ॥ সে কি বাবা। কবরেজী চা!

জয়ন্ত ॥ বুঝলে না। তার মানে গোয়ালা আর মুদী দুজনেই বেঁকে বসেছে। বকেয়া না পেলে আর বাকী দেবে না। ভাই, তোরা যদি কেউ পারিস—কিছু টাকা দিয়ে মাসের এই বাকী কটা দিন চালিয়ে দে না।

অনাদি ॥ তা যদি পারতাম—সে তোকে আর বলতে হ'ত না।

বিমান ॥ কি কপাল দেখ! আমিই তোর কাছ থেকে আজ কিছু নেব ভাবছিলাম।

জয়ন্ত ॥ তবে কবরেজী চা-ই খাও। যে ভোলা—তাই দে।

অনাদি ॥ না বাবা—চা-ই খেতে চাই। পাচন খাব না। এই টাকাটা নাও—দুধ চিনি আন। (এই বলিয়া অনাদি ভোলার হাতে একটি টাকা দিতে গেল। ভোলা টাকা না নিয়া বলিল)—

ভোলা ॥ (জয়ন্তকে) কেমন হ'ল তো? পরের পয়সায় চা খেতে হবে তোমাকে? যার বাপ লক্ষপতি, লক্ষ টাকা যার দান-খয়রাত! আমি আজই বাড়ি চলে যাচ্ছি—কর্তাবাবুকে গিয়ে বলছি, আমাকে দিয়ে হবে না। এখানকার সংসার চালাতে হ'লে হয় তিনি নিজে আসুন—নয় একটি জাঁদরেল দেখে বউ ঘরে আনুন। নইলে এ যা দাঁড়িয়েছে—এ একেবারে অচল।

[হনহন করিয়া ভোলা বাহিরের দিকে যাইতেছিল। জয়ন্ত ডাকিল]

জয়ন্ত ॥ আরে শোন, শোন। কোথায় যাচ্ছিস ?

ভোলা ॥ দুধ-চিনি আনতে যাচ্ছি। আবার কোথায় যাচ্ছি।

জয়ন্ত ॥ পয়সা ?

ভোলা ॥ পয়সা তোমার না থাকতে পারে—কিন্তু তোমাদের চাকরের আছে। কুড়ি টাকা মাইনে পাই। কীই-বা খরচ আর কেই-বা আমার আছে। ভেবেছিলাম একবার তারকেশ্বর যাব—তা যাব না।

[ভোলা কেটলি নিয়া চায়ের জোগাড়ে বাহিরে চলিয়া গেল]

জয়ন্ত ॥ তা সত্যি। ওর জন্যেই মাসের শেষে দুটো ডাল-ভাত জোটে।

আনাদি ॥ স্ত্রী আর ভৃত্য—এ ভাই ভাগ্যে না থাকলে হয় না।

বিমান ॥ যা বলেছ! ভৃত্য তো ভালই দেখছি। এবার স্ত্রী-ভাগ্যটা যাচাই করে দেখ না হে জয়ন্ত। ঐ তো বলে গেল—কর্তাকে গিয়ে বলবে—জাঁদরেল একটি বউ ঘরে আনো।

অনাদি ॥ কিরে—কী হ'ল ?

বিমান ॥ অমন করছিস কেন ? ক্ষেপে গেলি যে!

জয়ন্ত ॥ ধর তোর একটা বোন আছে।

বিমান ॥ বোন! আমার আবার বোন কোথায় ?

জয়ন্ত ॥ আঃ। ধর না—নিজের বোন না থাক—মামাতো কি মাসতুতো বোনই ধর। ধর তার বিয়ে হচ্ছে। ধর আমি বিয়েতে গিয়েছি। ধর—পণের পুরো টাকা না পেয়ে বর পিঁড়ি থেকে উঠে গেল। ধর—তোরা আমাকে সেই পিঁড়িতে বসিয়ে দিলি। ধর—তোর মতো বন্ধুর এই বিপদে আমি না বলতে পারলাম না। ধর—বিয়ে হয়ে গেল। ধর—বউ এনে আমি এ বাড়িতে তুললাম। দেশের বাড়িতে বাপের কাছে না নিয়ে এখানে কেন তুললাম ?

অনাদি ও বিমান ॥ তাইতো—কেন তুললে ?

জয়ন্ত ॥ ধর—তোর বোন পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আধমরা হয়েই ছিল—তারপর বিয়ের রাত্রে এই শক্—মানে প্রায় হার্টফেল হয় আর কি।

অনাদি। ঠিক—ঠিক।

বিমান ॥ না হওয়াই আশ্চর্য।

জয়ন্ত ॥ তবেই ধর—অক্সিজেন চাই। সে সব তো তোমার পাড়াগাঁয়ে হবে না। বাবার কাছেও না। কাজেই এই বাড়ি—

বিমান ॥ বেশ। বৌ এই বাড়িতেই তুললে। কিন্তু তারপর ?

অনাদি ॥ তুমি পার পাচ্ছ কিসে ?

জয়ন্ত ॥ কেন ঐ অক্সিজেন। তাছাড়া, ওষুধ আছে, পত্র আছে, বরফ আছে, ইন্‌জেকশন আছে। ধর—একটা নার্স আছে। আর তার ওপর বড়

একজন ডাক্তার নাড়ী ধরে বসেই আছেন। খরচা? খরচা খুব কম করেও পাঁচশটি টাকা। একটি রাত্রেই বেরিয়ে যাবে না!

অনাদি ॥ তা যাবে।

বিমান ॥ তাতো যাবে। কিন্তু সে টাকাটা আসছে কোত্থেকে? দিচ্ছে কে?

জয়ন্ত ॥ আমায় কল্পতরু বাবা—আমার দয়ালু বাবা—ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী।

বিমান ॥ কিন্তু তাঁকে এসব জানাচ্ছে কে? Who is to bell the cat?

অনাদি ॥ ও বাবা! তোমার ঐ বাঘা বাপের কাছে কে যাবেরে বাবা।

জয়ন্ত ॥ না, না—কেউ না। যাবে একটি চিঠি। আটদশ লাইনের একটি Express letter. যার শেষ লাইনে থাকবে—'যদি এই অভাগিনীকে বাঁচাতে চান—তবে অবিলম্বে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে পাঁচশটি টাকা পাঠান।

বিমান ॥ তোমার বাবার কথা তোমার মুখে যা শুনেছি—তাতে আমি জোর করে বলতে পারি—এমন হৃদয়ভেদী চিঠি পেয়ে পাঁচশ টাকা তিনি সংগে সংগেই T. M. O. করে পাঠাবেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে কি করে? একদিন না একদিন বৌটিকে সশরীরে তাঁর কাছে জমা দিতে হবে।

জয়ন্ত ॥ ইডিয়ট! আরে জমা দেওয়ার আগেই যে খরচ লিখে ফেলব। ধর টাকাটা পেলাম। সংগে সংগেই তখন আর একখানা চিঠি—'বাবা হতভাগিনী আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া গত রাত্রে আমাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।'

অনাদি ॥ মার্ভেলাস! সাবাস! সাবাস!

বিমান ॥ মেরে দিয়েছিস্—মেরে দিয়েছিস্—(হঠাৎ থামিয়া গিয়া) কিন্তু …

জয়ন্ত ॥ আবার কিন্তু কি?

বিমান ॥ ধর—চিঠি পেয়ে T. M. O. না করে তোমার দীনদয়াল বাবা নিজে চলে এলেন।

অনাদি ॥ কিংবা ধর—টাকাও পাঠালেন—আবার প্রাণের ব্যগ্রতায় পরের ট্রেনেই তিনি নিজে এসে হাজির হলেন।

জয়ন্ত ॥ তোরা আমার বাবাকে জানিস না বলে এসব কথা বলছিস। আমার মার স্মৃতিরক্ষার জন্যে বাবা নিজের গ্রামে—নিজের বাড়িতে যে হোমিওপ্যাথিক হাসপতাল গড়ে তুলেছেন—তার কাজ ফেলে—রোগীদের চিকিৎসা ফেলে তিনি একমুহূর্তের জন্যেও বাইরে আসবেন না। এই তো—সেবার আমার অসুখ হোল। এসেছিলেন? টাকা পাঠালেন, লোক পাঠালেন, বলে দিলেন—সুবিধে না বুঝলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

বিমান ॥ মানে, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছামি'। না! মেরে

দিয়েছিস। তা ওটা হাজারই করে দে না। আমারও কিছু দরকার—ভারি ঠেকে পড়েছি।

জয়ন্ত॥ না, না, ভাই। বাপকে ঠকানোরও একটা সীমা আছে। এই পাঁচশো টাকা পেলে দেনাগুলো সব শোধ করে—গংগাস্নান করে প্রতিজ্ঞা করব, আর রেস নয়, ফ্লাশ খেলা নয়, শখের থিয়েটার নয়। (বন্ধুদের মুখের চেহারা খারাপ হইতেছে দেখিয়া) না, না, তোদের নিয়ে ফারপোতে যাবো, সিনেমায় যাবো, পিকনিক করব—দু-দশ টাকা ধারও দেব · না, না, ভাই ওর বেশী আর পারবো না।

[এমন সময়ে বাহির হইতে কেটলিতে চা নিয়া ভোলা ভিতরে ঢুকিল]

বাঃ—এই তো চা ও সময় বুঝে এসে গেছে। Let us celebrate.

অনাদি॥ Celebrate তো করছ। কিন্তু (ভোলাকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া) ঐ শালটি সামলাবে কে? ধর—কর্তা ওকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, "ভোলা—বৌমা যে পটলটি তুললেন কেমন করে তুললেন।" তখনা বোঝ ঠেলা!

জয়ন্ত॥ হাঁ···তোর যেমন বুদ্ধি! আমি বুঝি তা ভাবিনি। আরে সে ছুটি তারিখের জন্যে ওকে বাবা তারকেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেব।

[ভোলা আসিয়া তিনজনকে চা দিল]

অনাদি ও বিমান॥ জয় বাবা! তারকেশ্বরের জয়।

ভোলা॥ হাঁ, বাবা তারকনাথই যদি এখন দয়া করেন! বলি একবার ঘুরে আসি—তাতো তুমি দেবে না। বাবার কাছে মাথা খুঁড়তাম—তবে যদি তোমার একটু সুমতি হত।

জয়ন্ত॥ তাই কর ভোলা। তুই যাবি। তে-রাত্রি থাকবি ওখানে—বুঝলি তে-রাত্রি।

ভোলা॥ এ্যাঁ··তবে বোধহয় এদ্দিনে একটা গতি হোল। জয় বাবা তারকনাথের জয়।

তিনবন্ধু॥ জয় বাবা—তারকনাথের জয়! [তারকনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মদনপুর গ্রামে ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরীর বিশাল ভবনের একাংশে মমতাময়ী হোমিও হাসপাতাল অবস্থিত। তাহারই অফিস কক্ষ—সকাল-বেলা। হাসপাতালের সেক্রেটারী এবং সহকারী ডাক্তার ভুজংগ মিত্র যুধিষ্ঠির দাস নামক একজন রোগীর সহিত কথা কহিতেছিলেন]

যুধিষ্ঠির॥ ভাগ্যিস দয়াল-ডাক্তারের এই হাসপাতাল ছিল, তাই এ-যাত্রা খুব বেঁচে গেলাম স্যার। বেঁচে উঠে আবার না মরি এবার সেইটা দেখুন স্যার।

ভুজংগ ॥ তার মানে?

যুধিষ্ঠির ॥ তার মানে—অসুখে ভুগে ভুগে কারখানার কাজটি তো গেছে। এখন নিজেই বা কি খেয়ে বাঁচি—আর একপাল পোষ্যকেই-বা কি খাওয়াই! এই হাসপাতালেই যদি দয়া করে একটা চাকরী দিতেন স্যার।

ভুজংগ ॥ বাঃ বেশ লোক তো তুমি! মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে বলো নি—এই রক্ষে! যত সব···

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে স্যার—তাহ'লে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন—একমাস এখানেই চিকিৎসায় ছিলাম। সেটা দেখিয়ে চাকরীটা যদি আবার ফিরিয়ে পাই।

ভুজংগ ॥ (কাগজ কলম লইয়া) কি যেন তোমার নাম?

যুধিষ্ঠির। আজ্ঞে শ্রীযুধিষ্ঠির দাস।

ভুজংগ ॥ যুধিষ্ঠির! ধর্মপুত্তুর!

[তাহার Cash sheet বাহির করিয়া দেখিয়া certificate লিখিতে লাগিলেন, এমন সময় নার্স বেলা বোসের প্রবেশ]

বেলা ॥ ডক্টর···

ভুজংগ ॥ ইয়েস্ নার্স ···

বেলা ॥ তিন নম্বর বেডের রুগী—

ভুজংগ ॥ খাবি খাচ্ছে তো! আঃ!

[চেয়ার ছাড়িয়া ভুজংগ উঠিলেন, এবং নার্সের সংগে চলিয়া গেলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া টেবিলের উপরে রক্ষিত ভুজংগের দামী পকেট ঘড়িটি যে মুহূর্তে তুলিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গেল—ঠিক সেই মুহূর্তে ভুজংগ পুনঃপ্রবেশ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার নিকট হইতে ঘড়িটি উদ্ধার করিলেন।]

ভুজংগ ॥ এক মিনিটের জন্যে ঘড়িটা ভুলে ফেলে গেছি—এরই মধ্যে—ব্যাটা যুধিষ্ঠির! ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! (চীৎকার করিয়া) ব্যাটা নেমকহারাম পাজি! চুরি করবার আর জায়গা পাওনি? ওষুধ-পথ্যি খেয়ে যে হাসপাতালে প্রাণ বাঁচলো—সেখানেই চুরি···

[ভুজংগের এই চীৎকারে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্তা ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন। হাসপাতালের চাকর-বেয়ারা ও নার্সও আশে-পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

দীনদয়াল ॥ ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভুজংগ?

ভুজংগ ॥ দেখুন তো ব্যাটার নেমকহারামী! কমাস ধরে ঔষধ-পথ্যি দিয়ে আমরা ব্যাটাকে চাংগা করে তুললাম, আজ ছাড়া পেয়েই ব্যাটা আমার ঘড়িটা চুরি করে পালাচ্ছিল!

বেলা ॥ ও, সেই লোকটা! পাশের বেডের রোগীর পথ্যি চুরি করে খেত!

ভুজংগ ॥ বেটা চোর —আবার নাম 'যুধিষ্ঠির'। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির!

দীনদয়াল ॥ অন্যায়--অন্যায়, এ তোমার ভারী অন্যায় যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির ॥ আর করবো না হুজুর—আমায় এবারটি মাপ করুন—হুজুর মা-বাপ।

দীনদয়াল ॥ মাফ করবো? চুরি করেছিস, তোকে মাফ করবো—মাফ করলে কি তোর চুরি শোধরাবে?

যুধিষ্ঠির ॥ (দীনদয়ালের পা জড়াইয়া ধরিয়া)—পেটের দায়ে করেছি হুজুর! হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কি খাবো -সেই ভাবনায় চুরি করছি হুজুর।

দীনদয়াল ॥ পেটের দায় তো বিশ্বশুদ্ধ লোকের রয়েছে। সবাই চুরি করছে?

ভুজংগ ॥ দিন বেটাকে থানায় চালান করে। জেলে পচুক, ঘানি টানুক। তবে শিক্ষা হবে।

দীনদয়াল ॥ বলছ কি ভুজংগ! সামান্য একটা ঘড়ি চুরি করার জন্যে ওকে জেলে পাঠাবো? ও তো তবে জেল থেকে ডাকাত হয়ে বেরুবে। না, না, জেল নয় ভুজংগ, জেল নয়।

ভুজংগ ॥ তবে?

দীনদয়াল ॥ যাও—তোমরা সব যে যার কাজে যাও। [চাকর-বেয়ারা ও নার্স চলিয়া গেল] জেল নয়—ভুজংগ—জেল নয়। ওর দরকার আরও চিকিৎসা—Treatment.

ভুজংগ ॥ চিকিৎসা! Treatment!

দীনদয়াল ॥ চুরিই বলো আর ডাকাতিই বলো আসলে সবই হচ্ছে রোগ হে—রোগ। ঠিক মত ওষুধ পড়লে সবই সেরে যায়। কি ব্যারামে ভুগছিল লোকটা? [ভুজংগ টেবিল হইতে যুধিষ্ঠিরের রোগের বিবরণ-পত্রটি দেখিয়া]

ভুজংগ ॥ হার্টের কলিক।

দীনদয়াল ॥ (বিবরণ-পত্রটি দেখিয়া) হৃৎশূল! প্রধান লক্ষণ অস্থিরতা, নড়িলে রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি তথাপি না নড়িয়া পারে না। গান করিবার প্রবল আবেগ। কি হে—

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে ও আমার অনেক কালের রোগ। গান যখন চাপে—তখন গান গেয়ে গলা না ভাঙা পর্যন্ত তার ক্ষান্তি নাই। হুজুর—দু-দুটো চাকরী এই জন্যেই গেছে।

দীনদয়াল ॥ হতেই হবে—হতেই হবে! এরপর তোমার আর একটি গুপ্ত লক্ষণ আজ ধরা পড়ল। অর্থাৎ অপরের দ্রব্য তার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করবার বা অপহরণ করবার প্রবল ইচ্ছা! যাকে বলে Kleptomania

চৌর্যোন্মাদ। ভুজংগ, It is a clear case of Tarentula Hispania. আয় হতভাগা—আয়! তোর রোগ আমি দুমাসেই ভালো করে দেবো।

[দীনদয়াল তাহাকে টানিতে লাগিলেন]

যুধিষ্ঠির ॥ (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে—আমায় ছেড়ে দিন হুজুর। হুজুর বাপ-মা। ছেড়ে দিন হুজুর।

দীনদয়াল ॥ তোর রোগ আমি জন্মের মতো সারিয়ে দেব। চল বেটা কাজ করবি। ভুজংগ, আজ থেকে ওকে হাসপাতালের বেয়ারা করে নাও। বুঝলি ব্যাটা—আজ থেকে তুই এখানে চাকরী করবি।

[যুধিষ্ঠির দীনদয়ালের পদধূলি চুম্বন করিয়া চলিয়া গেল]

ভুজংগ ॥ এই চোরটাকে আবার হাসপাতালের চাকরীও দিচ্ছেন?

দীনদয়াল ॥ শুধু ওষুধ দিলেও হবে না ভুজংগ! ওকে observation-এ রাখতে হবে বেশ কিছুদিন।

ভুজংগ ॥ বেশ, হাসপাতাল তাহ'লে যত ছোটলোক বদমাইসের আড্ডা হয়ে উঠুক! অবশ্য আপনার টাকায় এই হাসপাতাল। কিন্তু তবু বলব—একে যখন ট্রাষ্ট প্রোপার্টি করে এর পরিচালনার ভার পাঁচজনের হাতে রেজেষ্ট্রি দলিল করে ছেড়ে দিয়েছেন—তখন সেই ট্রাষ্টের সেক্রেটারী হিসাবে আমি না বলে পারছি না স্যার—হাসপাতাল দরিদ্র রোগীদের জন্যে—কারো খামখেয়াল মেটাবার এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে নয়, চোর বদমাইসের জন্যে নয়।

দীনদয়াল ॥ চোর বদমাইস! আমি বলছি—সেও এক ব্যাধি! তোমাদের কতবার বলেছি—ভগবানের সৃষ্টি ভগবানের মতই সুন্দর। তাঁর সৃষ্ট লোক কখনো খারাপ হতে পারে না। না—কক্ষনো নয়।

ভুজংগ ॥ (ব্যঙ্গে) হাঁ, দুনিয়ার সব লোকই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কেউ খারাপ নয়।

দীনদয়াল ॥ খারাপ হয়, খারাপ অবশ্যই হয়, কিন্তু যখনই খারাপ হয়—তখন বুঝতে হবে লোকটির কোন ব্যাধি হয়েছে। ব্যাধিগ্রস্ত হয়েই লোকে পাপ কার্য করে, অসৎ হয়, হিংস্রক হয়, কারো প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, খারাপ কাজ করে। ব্যাধিটি সমূলে বিদূরিত হলেই লোক তার স্বাভাবিক সুন্দর মনোবৃত্তি ফিরে পায়। চোর অথবা খুনী, কোন ব্যাধির প্রকোপেই চোর বা খুনী হয়েছে, নতুবা হতো না।

ভুজংগ ॥ তাহলেই আপনার এই থিওরী নিয়ে আপনি থাকুন স্যার কিন্তু না বলে পারছি না, লোকে আপনাকে সামনে বলে দেবতা, পেছনে গিয়ে বলে পাগল। যাক আপনি আমায় বিদায় দিন স্যার। চোর-বদমায়েস নিয়ে আমি হাসপাতাল চালাতে পারবো না স্যার।

দীনদয়াল ॥ তুমি—তুমি মমতাময়ী হাসপাতালের আদি কথাটাই ভুলে গেছ।

[দীনদয়াল এই বলিয়া ভুজংগকে টানিয়া লইয়া দেওয়ালে টাঙানো তাঁহার স্বর্গতা সহধর্মিণী মমতা দেবীর তৈল-চিত্রের নীচে গিয়া দাঁড়াইলেন]

ঐ আমার মমতাদেবী—ওঁর কাছে ছোটলোক, বড়লোক, সাধু-বদমাস বলে কিছু ছিল না ভুজংগ (তৈল চিত্রের দিকে তাকাইয়া) যেখানে যে দুঃখী, যেখানে যে রুগ্ন, যেখানে যে অসহায় সকলের প্রতি ছিল সমান মমতা। তাই তো তোমার স্মৃতি বাঁচিয়ে অমর করে রাখবার জন্য আমি মন্দির, মিনার, মঠ গড়ে তুলিনি —গড়ে তুলেছি এই হাসপাতাল—মমতাময়ী হাসপাতাল। তাজমহলের শুভ্র গম্বুজের দিকে চেয়ে বাদশা শাজাহানের বুকে তাঁর মমতাজের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকত। আর আমার কি হয় জানো? এখানে একটি দুঃখী একটি অসহায় রোগী যখন সেবায়, শুশ্রূষায় নীরোগ হয়ে ওঠে- তখন আমি বুঝতে পারি—তোমার অমর আত্মা চরম তৃপ্তি লাভ করে। আর তাই—তাই বুকের রক্ত দিয়ে আমি এই হাসপাতাল গড়ে তুলেছি, ভুজংগ।

[কিন্তু পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন ভুজংগ নাই। তাঁহার এই আবেগপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যস্থলে বিরক্তিভরে প্রস্থান করিয়াছে। দীনদয়াল বেদনা বোধ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে শুধু একটি কথাই নিঃসৃত হইল—]

যাক গে—

[দীনদয়াল ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিলেন এবং সম্মুখে রক্ষিত চিঠি পত্রগুলি খুলিতে লাগিলেন। প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া তাহাতে কি লিখিয়া বাস্কেটে ফেলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন। এ পত্রখানি জয়ন্তর। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবাবেগ দমন করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

ভুজংগ! ভুজংগ! তিনকড়ি! অবিনাশ! তোমরা সব শুনে যাও। আমার জয়ন্ত বিয়ে করেছে। গরীব বন্ধুর জাত রক্ষা করেছে। [পত্র পড়িতে লাগিলেন] "আমার বাবার হৃদয় কত উঁচু তা আমি জানি বলেই এ বিয়ে করতে আমি সাহসী হয়েছি। বৌ নিয়ে এক্ষুণি তোমার কাছে ছুটে যেতাম। কিন্তু শরীর তার ভাল নয় বাবা। যখন তখন হার্ট-ফেল করতে পারে। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।" (ইতিমধ্যে ভুজংগ প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।)

আরে দেখছ কি—জয়ন্ত বিয়ে করেছে। (আবার পত্র পড়িতে লাগিলেন—) "পাঁচশ টাকা টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে পত্র পেয়েই পাঠাবে বাবা। নতুবা অভাগিনীকে বাঁচানো যাবে না।" পড়ো—ভুজংগ, পড়ো। (পত্রখানি ভুজংগের হাতে দিলেন। ভুজংগ পত্র পড়িতে লাগিল।) একটা অসহায় পরিবারকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। জয়ন্ত আমার মুখ রেখেছে! পাঁচশ টাকা এখনি টেলিগ্রাম মণি-অর্ডারে পাঠাতে হবে- নাকি আমি নিজেই

যাবো! কি করে যাই! এতগুলো রোগী! (ইতস্তুতঃ করিতে লাগিলেন) তোমরা ভাই—হাসপাতাল একটা দিন চালিয়ে নিতে পারবে না? একটা দিন—মাত্র একটা দিন। হাঁ—হাঁ পারবে—পারবে। আচ্ছা, টাকাটা এখনি টেলিগ্রাম মণি-অর্ডার করে পাঠিয়ে তাতেই লিখে দিচ্ছি—আমি কাল ভোরেই কলকাতা পৌঁছচ্ছি। টেলিগ্রাম ফর্ম—টেলিগ্রাম ফর্ম—এই যে—

[দীনদয়াল পরম ব্যস্ততায় টেলিগ্রাম মণি-অর্ডারের ফর্ম লিখিতে বসিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

[জয়ন্তর উপবেশন কক্ষ। অপরাহ্ণ। ব্যস্তসমস্ত জয়ন্ত। সম্মুখে ভোলা]

ভোলা॥ 'যা' বললেই—যা! এখন বিকেল চারটে। তারকেশ্বরে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। রাত-বেরাতে কোথায় গিয়ে উঠবো?

জয়ন্ত॥ বাবার পায়ে পড়ে থাকবি। তা নইলে আর ভক্তি কি! ওরে—বাবা ভক্তিটাই দেখেন। কষ্ট না করলে তো কেষ্ট মেলে না, ভোলা।

ভোলা॥ তা তোমারি-বা এত বাড়াবাড়ি কেন বাপু? এ যেন—ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে! আমি যে যাব—একটা লোক এখানে দিয়ে যাব তো! নইলে তোমাকে দেখবে শুনবেই-বা কে—দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়েই-বা দেবে কে?

জয়ন্ত॥ সে হবে—সে হবে। সেজন্য তুই কিছু ভাবিসনে ভোলা। তিন-চারটে দিন আমি মাসিমার বাড়ি গিয়ে খাব। কত খুশী হবে বুড়ী ভেবে দেখ! নে—নে—আর দেরী করিসনে। মাহেন্দ্রযোগটা আবার পেরিয়ে যাবে।

ভোলা॥ কি যোগ?

জয়ন্ত॥ মাহেন্দ্রযোগ। এই তো পাঁজি দেখলুম। সওয়া চারটে পর্যন্ত রয়েছে। বাবা তারকনাথের কাছে যাচ্ছিস—মাহেন্দ্রযোগে যদি বেরুতে পারিস ভোলা, যে মনস্কামনা করে বেরুবি—আঠারো আনা ফলবে, ভোলা, আঠারো আনা ফলবে!

ভোলা॥ তা বলছ, যাচ্ছি। বাবার ওপর এত ভক্তি হঠাৎ যে কেন তোমার গজাল—

জয়ন্ত॥ গজাবে না? কি বিপদে পড়েছি—ভেবে দেখ! বাবার পায়ে গিয়ে—এখন তুই যদি উদ্ধার করতে পারিস ভোলা। [আবেগে ভোলার হাত ধরিল।]

ভোলা॥ ঠিক বলেছ। তুমি কিচ্ছু ভেবো না দাদাবাবু, বাবার দয়ায় সব উদ্ধার হবে। আমি তোমার কল্যাণে পুজো দিচ্ছি।

জয়ন্ত ॥ (পকেট হইতে দশটাকার নোট বাহির করিয়া ভোলার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল) দিস্-দিস্। এই নে দশটা টাকা।

ভোলা ॥ এ কি—আবার টাকা পেলে কোত্থেকে?

জয়ন্ত ॥ পেয়েছি রে পেয়েছি। বাবাই দিয়েছেন (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) ভোলা—মাহেন্দ্রযোগ আর পাঁচ মিনিট!

ভোলা ॥ যাচ্ছি—যাচ্ছি! (ভোলার অন্য ঘরে প্রস্থান।)

[পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া গুণিতে লাগিল। এমন সময় অনাদির প্রবেশ]

অনাদি ॥ ওরে বাবা—এ যে দেখছি টাঁকশাল!

জয়ন্ত ॥ (নোটগুলি পকেটে পুরিয়া) খুব লোক যা হোক। কখন্ খবর পাঠিয়েছি এখন এলে! মানুষের বিপদ-আপদ যদি কিচ্ছু বোঝ! (চীৎকার করিয়া) ভোলা—আর তিন মিনিট। (কাপড় গামছা একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া ভোলার প্রবেশ।)

ভোলা ॥ জয় বাবা—তারকনাথ। চললুম।

জয়ন্ত ॥ জয় বাবা—তারকনাথ। (ভোলার প্রস্থান। বাবা তারকনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া) জয় বাবা—তারকনাথ। শেষ রক্ষা কর—শেষ রক্ষা কর!

অনাদি ॥ ব্যাপার কি?

জয়ন্ত ॥ আর ব্যাপার! সর্বনেশে ব্যাপার! পড়—(পকেট হইতে টেলিগ্রাম মণি-অর্ডারের কুপন অনাদির হাতে দিল)।

অনাদি ॥ (বিস্ফারিত নেত্রে পড়িয়া)—"ব্রেভো মাই বয়! রিচিং টো-মরো ইভ্নিং—ফাদার।" (জয়ন্তর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া) মানে?

জয়ন্ত ॥ মানে বুঝছ না! পাঁচশ টাকা টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছেন। পিছু পিছু নিজেও এসে পৌঁচচ্ছেন—আজই সন্ধ্যায়। মানে—কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়েছে। মানে—আগুন নিয়ে খেলতে গেলে যা হয়—তাই। তখন তো সবাই খুব "হাঁ হাঁ" করলে! এখন ঠেলা সামলাও! বের কর বৌ।

[মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

অনাদি ॥ আহা-হা, অমন করে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। যাহোক—উপায় একটা কিছু করতেই হবে। বিমান কোথায়?

জয়ন্ত ॥ খবর দিতেই সে ছুটে এসেছে। তোমার মত দু'ঘণ্টা দেরী করে নি।

অনাদি ॥ কিন্তু কোথায় সে?

জয়ন্ত ॥ বৌ খুঁজতে বেরিয়েছে। তা ছাড়া এখন আর করবার কি আছে!

অনাদি ॥ বৌ খুঁজতে গেছে! বৌ আবার খুঁজে পাওয়া যায় নাকি!

জয়ন্ত ॥ পেতেই হবে। অন্তত একটা রাতের জন্যে—বৌ একটা পেতেই হবে। নইলে বাবা ছাড়বেন কেন! বাঘা বাবা! বৌ দেখাতে না পারলে আমার পিঠের চামড়া আর থাকবে না।

অনাদি ॥ কলকাতা শহরে বৌবাজার যখন একটা রাস্তার নাম রয়েছে—কোনো কালে হয়তো বৌএর বাজার বসতো। নাম থেকে মালুম হয় বটে। কিন্তু সে সব দিন কি আর আছে রে ভাই!

জয়ন্ত ॥ বিমান যাহোক একটু আশা দিয়ে গেছে। এখন বিমানই ভরসা! তাও তো দেরী হচ্ছে! হবে কিনা—কে জানে!

অনাদি ॥ বিমানের খোঁজে বুঝি এমন মেয়ে আছে?

জয়ন্ত ॥ তিনখানা বাড়ি ছাড়িয়ে ঐ যে পাঁচতলা লাল বাড়িটা—স্বপ্নসদন না কি নাম—তারই একতলার ফ্ল্যাটে···

অনাদি ॥ ও—মিলিটারী মেজাজের সেই মেয়েটা! সিনেমায় কি সব, পার্ট-টার্ট করে! বেণী দুলিয়ে ভ্যানিটী ব্যাগ হাতে নিয়ে হন হন করে যায়—পাড়ার ছেলেরা সব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। জয়া মিত্র—নাকি নাম?

জয়ন্ত ॥ ও বাবা! দেখছি, বিমানের চেয়েও মেয়েটার খোঁজ তুই-ই বেশী রাখিস। দেখছি তুই গেলেই ভালো হ'ত!

অনাদি ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না—না, বিমানই বেশী জানে। ও হোল গিয়ে গভীর জলের মাছ। তা ধরো—বৌ এলো, কিন্তু চাকর? ভোলাকে তো তারকেশ্বরে পাঠালে। এখন উপায়?

জয়ন্ত ॥ তারকেশ্বরে কি সাধে পাঠালুম! ভোলার পেটে এসব জাল জোচ্চুরী কথা থাকত! এখন শীগ্‌গির যা তো ভাই অনাদি—শিয়ালদা ইষ্টিশন থেকে অন্ততঃ দু-একদিনের জন্য একটা চাকর ধরে আন। যা মাইনে চায়—দেবো।

অনাদি ॥ আরে, তোমার বৌ আসবে—তবে তো চাকর! (বাহিরে বিমানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল)—"আসুন আসুন।"

জয়ন্ত ॥ চুপ! বোধহয় এসেছে।

[অনাদি-বর্ণিত জয়া মিত্রকে লইয়া বিমানের প্রবেশ। জয়া মিত্র—তন্বী সুদর্শনা অষ্টাদশী তরুণী। দেখিলেই মনে হয় ব্যক্তিসম্পন্না। বিমান তাহার হাতের ছোট সুটকেশটি নামাইয়া জয়ন্তের সঙ্গে জয়ার পরিচয় করাইয়া দিল—]

বিমান ॥ জয়ন্ত চৌধুরী। জয়া মিত্র। (উভয়ে নমস্কার বিনিময় করিল। অনাদি জয়ার সহিত পরিচিত হইবার জন্য বিমানকে ইংগিত করিল।)

ও! আর ইনি অনাদি দত্ত। আমরা তিনজনেই হোমিওপ্যাথী কলেজে

পড়ি! আর জয়া মিত্রের খানিকটা পরিচয় দু-একটা ছবিতে তোমরা এর আগেই হয়ত পেয়েছ। ছোটখাট পার্ট হ'লেও—অনেকেই বলেছে—ছাইচাপা আগুন। বেশীদিন চেপে রাখা যাবে না।

জয়া ॥ ওসব কথা থাক। এবার কাজের কথা বলুন!

বিমান ॥ ব্যাপারটা আপনাকে সবই খুলে বলেছি—জয়া দেবী।

জয়া ॥ এক রাত্রির জন্য বৌ সাজতে হবে। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী (বিমানকে) আপনার মাসতুত বোন। হার্ট আগেই খারাপ ছিল—বিয়ের রাতের এই সব ব্যাপারে হার্টের ব্যারাম বেড়েছে। জয়ন্তবাবুর বাবা—মানে শ্বশুর দেখতে আসছেন। বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে সেটা যেমন করেই হোক কাটাতে হবে। কেমন এই তো?

জয়ন্ত ॥ মনের কথা হুবহু বুঝে নিয়েছেন। আপনি যে দয়া করে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন—কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।

জয়া ॥ না, না—এতে কৃতজ্ঞতার কি আছে! অভিনয়কেই পেশা বলেই নিয়েছি। অভিনয় করে টাকা রোজগার করতে এসেছি। টাকাকড়ির ব্যাপারটা কিন্তু এখনও ঠিক হয় নি। ওটা আগেই মিটিয়ে ফেলুন।

জয়ন্ত ॥ বিমান!

বিমান ॥ আমি পঞ্চাশ টাকা বলেছি—তা উনি একশ' টাকার কমে রাজী হচ্ছেন না। আর সে টাকাও আগাম চাইছেন।

জয়ন্ত ॥ আমি কিছুতেই 'না' বলব না—জয়া দেবী। এই নিন। (একশ' টাকার নোট বাহির করিয়া জয়ার হাতে দিল।) আপনি যে দয়া করে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছেন—এর দাম অবশ্যি আমি কোনদিনই দিতে পারবো না।

জয়া ॥ আগাম টাকাটা নেওয়া অশোভন হলো—বুঝেছি। কিন্তু জীবনে এত ঘা খেয়েছি যে—মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না, জয়ন্তবাবু। সিনেমায় নির্ঘাত নামিয়ে দেবে—কথা দিয়ে আপনাদের মতই ভদ্রবেশী কত দালাল—আমার মতো অনাথা মেয়েরও টাকাকড়ি খেয়ে পালিয়েছে। কত ফিল্ম কোম্পানী যদিও-বা কাজ দিয়েছে—কিন্তু টাকা দেয় নি। এই বয়সেই জীবনে অনেক ঘা খেয়েছি, জয়ন্তবাবু। যাক্ সে কথা। তাহ'লে, সাজতে হবে এখুনি?

জয়ন্ত ॥ (ঘড়ি দেখিয়া) এই যা! তাই তো! আর তো সময় নেই। অনাদি, তুমি তো চাকর আনলে না। ভোলা তারকেশ্বর গেছে বেশ বলা যাবে। কিন্তু চাকর তো একটি চাই। না—না, তুমি যাও অনাদি। যাকে পাও অন্ততঃ এক রাতের জন্য নিয়ে এস।

অনাদি ॥ কোথায় যাব কাকেই-বা আনবো। এক রাত্রির জন্য ওঁর চাকর

সে না-হয় আমি হব। তোমার বাবা তো আর আমাদের দেখেন নি। ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।

জয়ন্ত ॥ করে নেবো নয় ভাই, করো। (তাহার পোশাক লক্ষ্যে) ওসব ছেড়ে-ছুড়ে—

অনাদি ॥ সে যা করবো, সে আর দেখতে হবে না। [পাশের ঘরে প্রস্থান।]

জয়া ॥ আমি তো এক রকম মোটমুটি তৈরী হয়েই এসেছি। এখন বলুন—এই সাজ চলবে কিনা। আপনাদের রুচি তো আমি জানি না।

বিমান ॥ আপনাকে যখন বলে-কয়ে ধরে এনেছি—তাতেও কি আমাদের রুচির পরিচয় পান নি? আর শাঁখা-সিঁদুর-আলতা যা কিনে আনতে বলেছিলেন—এনেছি। [সুটকেশ খুলিয়া বিমান তাহা এবং অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী বাহির করিল।]

জয়া ॥ বাজারশুদ্ধ কিনে এনেছেন দেখছি! কিন্তু আমি তো রোগী—এখন-তখন। ওষুধ কই—থার্মোমিটার কোথায়?

বিমান ॥ এই যা!

জয়ন্ত ॥ আমি আবার অক্সিজেনের কথা লিখেছি, নার্সের কথাও বলেছি।

বিমান ॥ অক্সিজেন! নার্স। সে যখন যায়-যায় অবস্থা, তখন আনা হয়েছিল। আবার যখন দরকার হবে—আনা হবে। কিন্তু ওষুধপত্র, থার্মোমিটার—সে তো চাই-ই। আমি এখনই যাচ্ছি। [জয়ন্ত একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।] ঠিক আছে।

জয়া ॥ আর একটা আইস্-ব্যাগ—পারেন তো আনবেন।

বিমান ॥ ঠিক আছে [প্রস্থান]

জয়া ॥ জানেন, জয়ন্তবাবু, এমন দিন গেছে মার অসুখের সময় একটা আইস-ব্যাগও আমি জোটাতে পারিনি। (চাকর সাজিয়া অনাদির প্রবেশ)

অনাদি ॥ দিদিমণি, দাদাবাবু, চায়ের জল চাপিয়ে দেব?

জয়ন্ত ॥ একি! এ যে একেবারে চেনা যায় না অনাদি?

অনাদি ॥ আরে থিয়েটার কি আমিও করিনি! নেহাত হোমিওপ্যাথী পড়তে এলাম—তাই।

জয়া ॥ কিন্তু চাকরের নাম—অনাদি—বড় একটা শুনিনি।

জয়ন্ত ॥ তা বটে! অনাদি, আজ থেকে তোমার নাম—বলুন, আপনি একটা বলুন···

জয়া ॥ ভোম্বল। আমাদের চাকরের নাম। সহজে মনে থাকবে।

জয়ন্ত ॥ বেশ—বেশ! বেশ নাম—ভোম্বল।

অনাদি ॥ ভোম্বল! না—না—

জয়ন্ত ॥ না, না, আর কিন্তু নয়। কথার সময় আর নেই।

জয়া ॥ কিছু খাবার-টাবার আনা উচিত। বিশেষ বাবা আসছেন।

জয়ন্ত ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়। অনাদি!

জয়া ॥ (সংশোধন করিয়া) ভোম্বল।

জয়ন্ত ॥ হাঁ—হাঁ—ভোম্বল। যা তো। এই নে। (দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিল। অনাদি যাইতেছিল) দাঁড়াও। (জয়াকে) আপনার জন্যে কিছু পথ্যি টথ্যি…

জয়া ॥ আমি তো রুগী—সাগু বার্লি বোধহয় খেতে হবে।

জয়ন্ত ॥ না, না, না। হার্টের অসুখ। হার্টকে সবল করার জন্য আপনাকে খাওয়াতে হবে—পেস্তা, বাদাম বেদানা, আঙুর—মাংসের সুপ, চিকেন ব্রথ্—

জয়া ॥ আসুন। আমি অবশ্য ওসব খাবো না। সাজানো থাকবে।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু কি খাবেন বলুন। সন্দেশ—রাজভোগ—কিছু লজেন্স—কিছু ডালমুট—

অনাদি ॥ আর কিছু তেঁতুলের আচার।

জয়ন্ত ॥ ঠিক বলেছিস। (আরেকটা নোট বাহির করিয়া দিয়া) যা অনাদি—

জয়ন্ত ॥ ভোম্বল।

জয়া ॥ ও। হ্যাঁ—ভোম্বল। যাও ভাই ভোম্বল—শীগ্‌গীর যাও।

[অনাদির প্রস্থান]

জয়া ॥ এক রাত্রির জন্যে কেন মিছিমিছি এত সব—

জয়ন্ত ॥ এক রাত্রি বলেই তো জয়া দেবী। না—না, বাধা দেবেন না। বরং বলুন আর কি বাকী রইল ?

জয়া ॥ তা যদি বলেন—অনেক কিছুই বাকী রয়েছে। শাঁখা—সিঁদুর—আলতা—

জয়ন্ত ॥ পরে নিন—পরে নিন্। আর সময় নেই।

জয়া ॥ সিঁদুর না হয় আমি পরছি। আপনি ততক্ষণ টয়লেটের জিনিস-গুলো সাজিয়ে ফেলুন।

[এই বলিয়া চট্ করিয়া আলমারীতে সেট করা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সিঁদুর পড়িল। জয়ন্ত প্রসাধন-উপকরণগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল]

জয়া ॥ সিঁদুর তো পরা হোল। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে!

জয়ন্ত ॥ না, না—বেশ মানিয়েছে! সুন্দর মানিয়েছে।

জয়া ॥ কিন্তু শাঁখা! সে তো একা পরতে পারবো না। আপনাকে পরিয়ে দিতে হবে।

জয়ন্ত ॥ অ্যাঁ—আমাকে পরিয়ে দিতে হবে! পারবো ?

জয়া ॥ দিতেই হবে। নতুন বউ! শাঁখা না হ'লে তো আর চলবে না।

জয়ন্ত ॥ তাই তো। তা—আসুন। (শাঁখা পরাইতে চেষ্টা করিল) ওরে বাবা! ভেঙে যাবে না তো! হাতটা আরেকটু নরম করুন দয়া করে।

জয়া ॥ আর কত নরম করব, বলুন! হাত তুলো তো আর নয়।

জয়ন্ত ॥ এই, এই যা—গেছে। (এক হাতে শাঁখা পরানো হইল) ও-হাত দিন। [অন্য হাতে শাঁখা পরাইবার চেষ্টা]

জয়া ॥ (চীৎকার করিয়া) উঃ।

জয়ন্ত ॥ থাক, থাক—তবে থাক।

জয়া ॥ না—না তা কি হয়? এক হাত কি খালি থাকবে।

জয়ন্ত ॥ তবে আপনি চীৎকার করবেন না। একটু সয়ে থাকুন।

[জয়ন্ত যতদূর সম্ভব সাবধানে শাঁখা পরাইতে লাগিল]

জয়া ॥ (হাসিয়া উঠিয়া) আপনি ঘেমে উঠলেন যে!

জয়ন্ত ॥ (রাগিয়া) না, না, আপনি হাসবেন না। হাসছেন—হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

জয়া ॥ (হাসি চাপিয়া) না, না,—হাসব না।

জয়ন্ত ॥ (সফল হইয়া) নিন। কেমন হোল তো! (ঘাম মুছিতে মুছিতে) এ যা হোল, এর চেয়ে সত্যিকার বিয়ে করা ছিল ঢের সোজা।

জয়া ॥ কেন বলুন তো?

জয়ন্ত ॥ সত্যিকার বউকে এত ভয় করতাম? আর এ হাঙ্গামাতেও পড়তাম না। বাড়িতে কত লোক ছিল—তারাই এসব করত।

জয়া ॥ বউএর হয়তো তা আবার পছন্দ হ'ত না। কিন্তু আলতা? আলতা পরিয়ে দিন।

জয়ন্ত ॥ ও বাবা! আবার আলতা!

জয়া ॥ আমি তো আলতা জীবনে পরিনি। কেমন করে পরতে হয়—তাও জানি না। আপনাদের বাড়িতে যদি আলতার চল না থাকে—থাক্।

জয়ন্ত ॥ (বিপন্ন বোধ করিয়া) না, না—খুব আছে। বাবার ওসব দিকে খুব নজর। মার ফটোতেও দেখেছি পায়ে আলতা এঁকে দিতেন বাবা। হাল-ফ্যাসান বাবা একেবারেই সইতে পারেন না। দিন পা এগিয়ে দিন।

জয়া ॥ না, না—থাক।

জয়ন্ত ॥ না, না—তা চলবে না। আসুন, আসুন—পা আসুন—

[জয়ন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া জয়ার পা টানিয়া আনিয়া আলতা পরাইতে লাগিল। জয়া মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল। ক্ষণপরে অনাদির প্রবেশ। দরজায় অপেক্ষমান ঝাঁকা মুটেকে আহ্বান]

অনাদি ॥ (ঝাঁকা মুটেকে লক্ষ্য করিয়া) আয়—আয়—ভেতরে আয়।

[জয়ন্ত লজ্জা পাইয়া চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝাঁকামুটে নানাবিধ জিনিস লইয়া প্রবেশ করিল] ঝাঁকা মুটে নির্দেশমত কাজ করিতে লাগিল]

নামা—সব নামা। [ঝাঁকা মুটে নির্দেশমত কাজ করিতে লাগিল]

(জয়ন্তকে) না, না—থামলে কেন? ওটা সেরে নাও—সেরে নাও।

জয়ন্ত ॥ ও হয়ে গেছে। ফিনিশিং টাচ্ দিচ্ছিলাম। কিন্তু বিমান তো এখনও এলো না অনাদি।

জয়া ॥ ভোম্বল।

জয়ন্ত ॥ ও হাঁ—ভোম্বল।

অনাদি ॥ কি লগ্নে জন্মেছিলাম রে বাবা! ছিলাম অনাদি—হলাম ভোম্বল। তা ভোম্বল—ভোম্বলই সই। এত সব খাবার-দাবার আমার চার্জে তো? [জয়া হাসিয়া উঠিল]

জয়ন্ত ॥ (জয়াকে) ভারী পেটুক, জানেন!

অনাদি ॥ Fools give feasts : wise men eat them! জানেন তো! (মুটেকে) নাও বাবা। (মুটেকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিল)। দেখি—এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গুছিয়ে ফেলি।

[খাদ্যাদি যথাস্থানে রাখিতে গিয়া মাঝে মাঝে দু-একটা মুখেও ফেলিতে লাগিল। এমন সময় ওষুধ-ব্যাগ ইত্যাদি লইয়া হন্তদন্ত বিমানের প্রবেশ]

বিমান ॥ এ কি! রুগী এখনও শুয়ে পড়ে নি? শুয়ে পড়ুন—শুয়ে পড়ুন। বাড়িতে ঢুকতেই একটা ট্যাক্সির আওয়াজ পেলুম মনে হলো।

[ভীষণ চাঞ্চল্য এবং কর্মব্যস্ততা]

জয়ন্ত ॥ শোবার ঘরে চলুন।

বিমান ॥ সময় নেই। সোফা—সোফা!

[সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া সোফাটাকে একটা রোগশয্যায় পরিণত করিল। তাহার আশে-পাশে ওষুধপত্রের সমাবেশ হইল]

জয়ন্ত। শুয়ে পড়ুন—শুয়ে পড়ুন!

জয়া ॥ আপনি নয়—তুমি! (জয়া শুইয়া পড়িল। জয়ন্ত অস্থির হইয়া একটা ব্যাগ আনিয়া জয়ার উপরে চাপা দিল)।

জয়ন্ত ॥ আইস-ব্যাগটা। অনাদি, অনাদি···

জয়া ॥ (শয্যা হইতে অর্ধোত্থিত হইয়া) আঃ ভোম্বল।

জয়ন্ত ॥ হাঁ—ভোম্বল। আপনি কিন্তু উঠবেন না।

জয়া ॥ আপনি নয় - তুমি।

[অনাদি আইস-ব্যাগটা আনিয়া জয়ন্তর হাতে দিল। জয়ন্ত আইস-ব্যাগটা জয়ার মাথায় চাপা দিয়া পাশে বসিল। দীনদয়ালের অপেক্ষা করিয়া বিমান ক্রমাগত থার্মোমিটার ঝাঁকাইতে লাগিল, এমন সময় বাহিরে দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" এবং প্রায়

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ-হস্তে তিনি ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটি দেখিলেন। ধীরে ধীরে রোগিণীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

জয়ন্ত ॥ অনাদি, একটা চেয়ার।

[কিন্তু তখনই তাহার ভুল বুঝিয়া জিভ কাটিল। অনাদি ছুটিয়া আসিয়া একটা চেয়ার দিল। দীনদয়াল বসিলেন। রোগিণীকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তৎসহ তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—চিন্তিত হইবার কিছু নাই।]

দীনদয়াল ॥ নাঃ, ভয়ের তো কিছু দেখছি না।

জয়ন্ত ॥ হার্ট—হার্টটা বড় দুর্বল বাবা।

দীনদয়াল ॥ তুমি একটি গাধা। হার্টের অবস্থা পাল্‌সেই বোঝা যায়। কি কষ্ট হচ্ছে, মা?

জয়া ॥ বুকে একটা ব্যথা। সব সময় নয়। এখন নেই।

দীনদয়াল ॥ দেখি। (ষ্টেথিস্কোপ দ্বারা বুক পরীক্ষা করিয়া) নাঃ, এমন কিছু পাচ্ছি না। বলতেই হবে, অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কে চিকিৎসা করছে?

জয়ন্ত ॥ ডাক্তার খাশনবিশ। জরুরী কল পেয়ে মাদ্রাজ চ'লে গেছেন।

দীনদয়াল ॥ অ্যালোপ্যাথ?

জয়ন্ত ॥ হাঁ বাবা।

দীনদয়াল। তার মানে, চিকিৎসাই হয় নি। তুমি যে মা একটু ভালো বোধ করছ—ভেবো না ওসব ছাইপাঁশ গিলে। তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে মা, তোমার ভেতর খুব একটা Vitality আছে—Vitality—যাকে বলে জীবনীশক্তি। (জয়ন্তকে) এই গাধা, ঐসব শিশিপত্র এখান থেকে সরিয়ে ফেল।

জয়া ॥ ভোম্বলকে বল।

জয়ন্ত ॥ ও—হাঁ—ভোম্বল! ভোম্বল! ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে আয় শিশিগুলো। (অনাদি আসিয়া শিশিপত্রগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল।)

দীনদয়াল ॥ নতুন লোক দেখছি। ভোলাকে দেখছি না যে!

জয়ন্ত ॥ ভোলা গেছে তারকেশ্বর—কি মানৎ ছিল।

বিমান ॥ নতুন হ'লেও এ-লোকটি বেশ। নাম বটে ভোম্বল কিন্তু বেশ কাজের।

দীনদয়াল ॥ তুমি কে?

বিমান ॥ (চট্ করিয়া দীনদয়ালের কাছে গিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া) আমি ঐ জয়ার দাদা।

দীনদয়াল ॥ (জয়ন্তকে) ও, তার মানে তোর শালা! তা ভাই-বোন দেখছি দুইই বেশ! You do not deserve it. (জয়াকে) কি মা, এখন কেমন বোধ করছ?

জয়া ॥ শীত করছে। বরফটা আর সইতে পারছি না।

দীনদয়াল ॥ (জয়ন্তর হাত হইতে আইস-ব্যাগটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার উদ্দেশ্যে) যাও ওটা তোমার মাথায় চাপাও, ইডিয়ট্ !

[জয়ন্ত সভয়ে সেখান হইতে সরিয়া আসিল। অনাদি তাড়াতাড়ি আইস-ব্যগটা তুলিয়া সকলের অলক্ষ্যে নিজের মাথায় চাপাইয়া পাশের ঘরে প্রস্থান।]

দীনদয়াল ॥ (জয়াকে) এখন ? ভাল লাগছে ?

জয়া ॥ ঘুম পাচ্ছে, বাবা।

দীনদয়াল ॥ Sleep means half the cure. ঘুমোও মা, ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই ?

জয়া ॥ তার আগে আমায় একটু উঠতে দিন, বাবা।

দীনদয়াল ॥ বাবা ! বাবা ! কি মিষ্টি তোমার কথা মা ! উঠবে ? ওঠো —ওঠো।

[দীনদয়াল তাহাকে উঠিতে সাহায্য করিলেন। জয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া দীনদয়ালের পায়ে প্রণাম করিল। দীনদয়াল ইহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।]

দীনদয়াল ॥ ওরে—ওরে—এ কি ! (জয়াকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা ভালো করিয়া দেখিয়া) লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! সুখী হও মা—চিরায়ুষ্মতী হও। কত বুদ্ধি ! কত বিবেচনা ! এত অসুখেও আমায় প্রণাম করল ! আর ঐ গাধা—(জয়ন্ত ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল) থাক—থাক। (জয়াকে) বসো মা, (জয়ন্তকে) বোস্।

[দীনদয়াল মাঝখানে বসিয়া জয়া ও জয়ন্তকে তাঁহার দুই পার্শ্বে বসাইলেন। হঠাৎ ঊর্ধ্বে তাকাইলেন। মনে হইল নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিবা স্বর্গতা সহধর্মিণী মমতাকে এই দৃশ্য দেখাইতেছেন।]

দীনদয়াল ॥ আমার কাছে তুমি অক্ষয়—অমর—চিরজীবন্ত।

[সকরুণ নেত্রে চাহিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন—শোনা গেল না—বোঝা গেল না—তাঁহার চোখে জল আসিল। প্রসারিত দুই হস্ত জয়া ও জয়ন্তর মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং রুদ্ধ ক্রন্দন কোনমতে দমন করিয়া নতমুখ হইলেন। হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া জয়াকে বলিলেন—]

মা, তুমি শোও। কিন্তু এখানে কেন ? (জয়ন্তকে) এই গাধা, খাট-বিছানা নেই নাকি ?

জয়ন্ত ॥ অনাদি ! অনাদি !

দীনদয়াল ॥ সেটা আবার কে ?

বিমান ॥ ঐ ভোম্বল। কিন্তু ভোম্বল নামটাতে ওর ভারি আপত্তি, তাই যখন যে নামে ইচ্ছা ডাকি।

দীনদয়াল ॥ তবে তোমার সহস্র নাম হে! যাও তো বাবা সহস্র-নাম ওঘরে বিছানা ঠিক ক'রে দাও!

জয়া ॥ না বাবা—ঘুম পাচ্ছে না। ইচ্ছে হচ্ছে—আপনার কাছে বসি—আপনার কথা শুনি—(চারিদিকে সকলকে দেখিয়া) একা।

দীনদয়াল ॥ এই—সব যাও। (সকলে যাইতেছে)

জয়া ॥ ভোম্বল, দাঁড়াও। (অনাদি দাঁড়াইল) বাবাকে হাতমুখ ধোবার জল দাও।

দীনদয়াল ॥ ঠিক—ঠিক। ভুলেই গিয়েছিলাম।

জয়া ॥ এখন যে কিছু খেতে হবে—তাও ভুলে গেছেন বাবা। (অনাদিকে) বাবার জন্ম খাবার সাজিয়ে আমার এখানে এনে দাও—সন্দেশ আর ফলমূল।

দীনদয়াল ॥ দু' থালা—একটা আমার, একটা মা'র।

জয়া ॥ আমাকে শুধু সাগুবার্লি খাইয়ে রেখেছে, বাবা।

দীনদয়াল ॥ (ক্ষেপিয়া গিয়া) হার্টের অসুখ – সাগুবার্লি খাইয়ে রেখেছে! এই গাধা! কোথায় গেল সব! ডাক্তারী পড়ছে সব—ডাক্তার!

[দীনদয়াল হাতমুখ ধুইতে গেলেন। পিছনে পিছনে গেল অনাদি। দীনদয়াল চলিয়া গিয়াছেন কিনা—জয়ন্ত তাহা উঁকি মারিয়া দেখিয়া পা টিপিয়া উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিল। পিছনে পিছনে ঐভাবেই আসিল বিমান]

জয়ন্ত ॥ আপনি যে রোগী—সেটা বোধহয় ভুলে গেছেন, জয়া দেবী। [প্রস্থানোদ্যম]

বিমান ॥ হাঁ, যা ঘরকন্না শুরু ক'রে দিয়েছেন—দেখছি ডোবাবেন।

[প্রস্থানোদ্যোম, কিন্তু দীনদয়ালের অকস্মাৎ আবির্ভাব]

দীনদয়াল ॥ কি—কি বলছিলে সব?

জয়া ॥ বলব ববা—কি বলছিল?

দীনদয়াল ॥ হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই বলবে? কি জ্বালাতন করছিল ওরা?

জয়া দুজনের মুখের দিকে তাকাইল। বলি বলি করিয়াও কিছু বলিল না

বল—বল, ভয় কি! গাধাটা কি বলছিল?

জয়া ॥ আমি ঘোমটা দিই নি ব'লে বকছিলেন।

দীনদয়াল ॥ না—না, মা। ঘোমটা কেন! তুমি আমার মা—আমি তোমার বুড়ো ছেলে। আমার কাছে তোমার ঘোমটা দিতে হবে না।

জয়া ॥ (জনান্তিকে—দীনদয়ালকে) আবার সব হাসছে! (তৎক্ষণাৎ দীনদয়াল মুখ ফিরাইয়া দেখেন, বিমান ও জয়ন্ত মুখ টিপিয়া হাসিতেছে)।

দীনদয়াল ॥ গেট্ আউট্—গেট্ আউট্—ইউ স্কাউন্ড্রেল্স্।

[বন্ধুদ্বয়ের পলায়ন। অনাদি খাবার লইয়া সবেমাত্র ঘরে ঢুকিয়াছিল। সেও এই গর্জনে খাবার সহ বাহিরে চলিয়া গেল। জয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে সোফাতে শুইয়া পড়িল]

দীনদয়াল ॥ না—মা, তুমি ভয় পেয়ো না। আর ওদের ভয় পাবার কিছু নেই।

জয়া ॥ (উঠিয়া বসিয়া) তাহ'লে বাবা—ঐ ভোম্বলকেও ডাকুন। ও আবার খাবারের থালা নিয়ে বোধ করি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।

দীনদয়াল ॥ আঃ, কি বিপদ! ওহে ভোম্বল! ভয় নেই। এদিকে এসো।

[সভয়ে খাবারের থালা হাতে নিয়া অনাদি প্রবেশ করিল এবং উভয়ের সামনে তাহা রাখিল]

শীগ্‌গির সেরে ওঠ মা। ভালো রান্না কতকাল খাই না! রাঁধতেন তিনি—মানে তোমার শাশুড়ী—জান তো তিনি নেই?

জয়া ॥ জানি বাবা।

দীনদয়াল ॥ বিশটি বছর আমি একা। সে যখন গেল, জয়ন্তর বয়স তখন পাঁচ। এই বিশটি বছর ওকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই। আজ তুমি এসেছ—আমি নিশ্চিন্ত হলাম, মা, নিশ্চিন্ত হলাম। জীবনের বাকি দিনগুলো—

জয়া ॥ (অস্ফুট আর্তনাদ) বাবা! (অব্যক্ত যন্ত্রণায়) উঃ…

দীনদয়াল ॥ কি হ'ল মা?

জয়া ॥ আমি বলতে পারছি না—আমি বলতে পারছি না।

দীনদয়াল ॥ ব্যথাটা?

জয়া ॥ না, বাবা।

দীনদয়াল ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ। তুমি লুকোচ্ছ। কি হয়েছে মা—আমায় তুমি বল! কোথায় ব্যথা?

জয়া ॥ না বাবা, সেরে গেছে।

দীনদয়াল ॥ অ্যাঁ—'বেদনা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়'! হুঁ। 'সুকেশী—নীলনয়না—সুদর্শনা—সুকুমার-ত্বকবিশিষ্টা নারী'। হুঁ। আচ্ছা, মা, ব্যথা-বেদনা সব ডানদিকেই বেশি—না?

জয়া ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, বাবা।

দীনদয়াল ॥ সহজেই সর্দি লাগে? যখন কাশি হয়—তখন ঘং ঘং করে কাশো?

জয়া ॥ হ্যাঁ, বাবা।

দীনদয়াল ॥ কড়া আলো—কড়া শব্দ সইতে পারছ না নিশ্চয়ই?

জয়া ॥ কি ক'রে জানলেন বাবা?

দীনদয়াল ॥ (গর্বমিশ্রিত হাস্যে) হাঃ হাঃ! আচ্ছা, বিশ্রামকালে, কিংবা সোজা হয়ে বসলে, কিম্বা গরম ঘরে ভালো বোধ কর?

জয়া ॥ হ্যাঁ, বাবা। আর ওরা আমার মাথায় ঠেসে ধরেছিল বরফ।

দীনদয়াল ॥ আচ্ছা মা, কখনো কি তোমার মনে হয় যে, তোমার চারপাশে যেন ভূতপ্রেত নেচে বেড়াচ্ছে? নানাবিধ কীট কিল্‌বিল করছে? কালো কালো সব জন্তু-জানোয়ার-কুকুর-নেকড়ে-বাঘ যেন তোমাকে তাড়া করছে?

জয়া ॥ (কপট ভয়ে) উঃ! সত্যি, বাবা, সত্যি। (দীনদয়ালকে জড়াইয়া ধরিল। জয়ার আর্তনাদ শুনিয়া জয়ন্ত, বিমান ও অনাদি ছুটিয়া আসিল)

জয়ন্ত ॥ কি হয়েছে?

দীনদয়াল ॥ হয়েছে তোমার মাথা। দেখছ না—'ক্লিয়ার পিক্‌চার অব্ বেলেডোনা'! হুবহু বেলেডোনা—পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেলেডোনা। বেলেডোনা ২০০ এক ডোজ, মা আমার লাফিয়ে উঠবে। এই, এর পর মদনপুরের ট্রেন কখন্?

জয়ন্ত ॥ ঠিক জানি নে বাবা, জেনে আসব? বিমান!

বিমান ॥ যাচ্ছি। (টাইমটেবিল আনিতে বিমানের প্রস্থান)

দীনদয়াল ॥ তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, খুব খাবে দাবে, খুব স্ফূর্তিতে থাকবে। কই—কিছু খেলে না তো?

জয়া ॥ আপনিও তো কিছু খেলেন না, বাবা।

দীনদয়াল ॥ হ্যাঁ—খাচ্ছি। খাও মা, তুমিও খাও।

[জয়া জয়ন্তর দিকে তাকাইল। স্বামীর সম্মুখে খাইতে নাই ইহা জানাইবার জন্য সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়া বলিল—]

জয়া ॥ আপনি খান বাবা, আমি পরে খাব।

[দীনদয়াল পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখেন, জয়ন্ত দাঁড়াইয়া আছে। তিনি স্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জয়ন্তর দিকে অগ্রসর হইতেই জয়ন্ত চলিয়া যাইতেছিল]

দীনদয়াল ॥ না—না, দাঁড়াও।

[জয়ন্ত দাঁড়াইল। দীনদয়াল সোজা গিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইলেন]

দীনদয়াল ॥ আমাদের হিন্দু মেয়েরা স্বামীর সামনে খায় না—খেতে পারে না। তোমার মা খেতেন না। স্বামীরাও তাই স্ত্রী যখন খাবে তখন হাঁ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। তুমি ছিলে। আর কখনও থাকবে না।

জয়ন্ত ॥ আর থাকব না।

[জয়ন্তর প্রস্থান। জয়া হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। কিন্তু দীনদয়াল ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই জয়া চট্ করিয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল]

দীনদয়াল ॥ (নিজের আসনে বসিয়া) নাও মা, এবারে খাও। বাপের সামনে খেতে—ছেলের সামনে খেতে লজ্জা নেই। (দুইজনে খাওয়া শুরু করিল) জয়ন্তর চিঠিতে জেনেছি, তোমার বাপ-মা কেউ নেই। থাকার মধ্যে ঐ একটি

ভাই। আর সব খবরও জয়ন্ত দিয়েছে। মনে হয়তো তোমার অনেক দুঃখই ছিল—কিন্তু আর রেখো না, মা। জগতে একদিক দিয়ে ক্ষতি হয়—আর একদিক দিয়ে পূরণ হয়। অনেক কিছু তুমি হারিয়েছ, আবার অনেক কিছু পেলে—এও যেমন সত্যি—অনেক কিছু আমরাও হারিয়েছি, আবার তোমাকে পেয়ে অনেক কিছু পেলাম—এও তেমনি সত্যি—তেমনি সত্যি মা।·· (ডাকিলেন) জয়ন্ত। জয়ন্ত! (জয়ন্তর প্রবেশ)

দীনদয়াল ॥ বৌমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দাও।

জয়ন্ত ॥ গুছিয়ে দেব? কেন বাবা?

দীনদয়াল ॥ 'কেন বাবা' মানে? এখানে রেখে ওকে কি মেরে ফেলবে? a clear case of Belladorna. মাথায় আইস-ব্যাগ—গায়ে রাগ চাপিয়ে মেয়েটাকে বধ করেছ। যত সব ইডিয়ট্‌। বৌমা, পারবে তো যেতে আমার সঙ্গে?

[দীনদয়ালের পশ্চাৎ হইতে জয়াকে যাইতে নিষেধ করিয়া মরিয়া হইয়া ইঙ্গিত করিতে করিতে লাগিল জয়ন্ত। জয়া তাহা দেখিল এবং নতমুখী হইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল]

দীনদয়াল ॥ (জয়ার ইতস্ততঃ-ভাব লক্ষ্য করিয়া) অবশ্য দু-চারদিন পরেও যেতে পার মা। বেশ—তাই হবে। (জয়ন্ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং বাবা তারকনাথের উদ্দেশ্যে বারে বারে প্রণাম করিল। টাইমটেবল লইয়া বিমানের প্রবেশ)

দীনদয়াল ॥ এই যে টাইমটেবল—দাও।

বিমান ॥ (টাইমটেবল হাতে দিয়া) আধ ঘণ্টা পরেই ট্রেন আছে।

দীনদয়াল ॥ তাই নাকি? বেশ বেশ। (টাইমটেবল না দেখিয়াই রাখিয়া দিলেন) বসো বিমান (জয়ন্তকে) এই হতভাগা, বোস্ না। এখনো তো আধঘণ্টা বাকি। তোদের সঙ্গে আমার এই আধ ঘণ্টার দাম—আমার জীবনে যে কতটা তা তোরা বুঝবি না। ইচ্ছে হচ্ছে—এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছে যে থেকে যাই। কিন্তু হাসপাতালের অতগুলো অসহায় রোগী—তাদেরও ছেড়ে থাকতে ভরসা হয় না। একটু সুস্থ-সবল হয়ে তুমি মা যখন যাবে, তোমাকেও ওদেরও মা হ'তে হবে। দেখবে মা—কত বড় বিরাট সংসার আমি তোমার জন্যে তৈরি করে রেখেছি—কত বড় বিরাট সংসার!

জয়া ॥ (আর্তকণ্ঠে) আপনি সত্যিই কি আজ যাবেন বাবা? একটা রাত—একটা রাত আপনি কি কোনমতেই থেকে যেতে পারেন না বাবা? আমার যে অনেক কিছু বলার ছিল···

দীনদয়াল ॥ বুঝছি—তোমার ভেতরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু আর কিছু বলতে হবে না মা, সবকিছু সেরে যাবে—ঐ এক ডোজ বেলেডোনা।

(ব্যাগ খুলিয়া বেলেডোনার শিশি হইতে এক ডোজ বেলেডোনা ঢালিয়া পুরিয়া করিয়া তাহা জয়ার হাতে দিলেন) নাও মা, কাল ভোরে খালি পেটে খাবে। আচ্ছা মা, এইবার তবে উঠি। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

জয়া ॥ কিন্তু ফিরতে অতটা রাত হবে—আর কিছু খেয়ে যাবেন না বাবা?

দীনদয়াল ॥ রাতে আমি কিছু খাই না, মা।

জয়া ॥ তা কি করে হয় বাবা! সারাটা রাত—

দীনদয়াল ॥ অন্নপূর্ণা ঘরে এলে খাব বইকি, মা। এটা খাবো—সেটা খাবো—দেখো আমার আব্দার! (জয়ন্তকে) তুমি থাকো। (বিমানকে) বিমান, তুমি এসো বাবা, আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে। কথাবার্তাও হবে। রোজই একটা চিঠি দিও জয়ন্ত! আসি মা।

[সকলে প্রণাম করিল। অনাদি ব্যাগটি মাথায় লইল। কিন্তু দীনদয়াল তাহা তাহার মাথা হইতে টানিয়া লইয়া—]

থাক—থাক। ভোম্বল-নামটাই তোমার ঠিক। দু'মাসের ওজনের ব্যাগ—উনি নিচ্ছেন মাথায়। তোমাদের মাথায় চাপানো উচিত আইস-ব্যাগ।

বিমান ॥ আমি একটা গাড়ি দেখছি। (বিমান বাহির হইয়া গেল)

দীনদয়াল ॥ দুর্গা! দুর্গা! আসি মা!

[সকলের দিকে একবার চাহিয়া দীনদয়াল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিদ্যুৎ-পৃষ্টবৎ জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তর সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া নিজে ব্যাগ হইতে নোটখানি বাহির করিয়া আর্তকণ্ঠে জয়ন্তকে কহিল—]

জয়া ॥ কথা ছিল—আমি যাব না। কথা আমি রাখতে পারলুম না, জয়ন্তবাবু। এই নিন আপনার টাকা। (জয়ন্তর হাতে নোটখানি গুঁজিয়া দিল) আমি যাব—আপনার জন্যে নয়—আমি আমার হারানো বাপ-মা ফিরে পেয়েছি।

[জয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

জয়ন্ত ॥ শুনুন—শুনুন! কি বিপদ! অনাদি, আমিও চললাম। যে ক'দিন না ফিরি সব ম্যানেজ করবি। (জয়ন্ত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

অনাদি ॥ ওরে বাবা। বৌ-ভাড়া এনে—এ যে দেখছি ভরাডুবি হ'ল—ভরাডুবি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দীনদয়ালের ভবনে ওঁর শয়নকক্ষ। রাত্রি দশটা। নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হইতেছে। দীনদয়াল, জয়া, জয়ন্ত, ভুজংগ এবং বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দা।]

দীনদয়াল ।। বুঝলে ভুজঙ্গ, ওই এক ঘণ্টাতেই আমার ওপর জয়ামা'র কি-রকম মায়া পড়ে গেল আমি বললাম, 'আচ্ছা দু'দিন পরেই মদনপুরে এসো' বলে, ট্রেন ধরতে ছুটলাম। ও বাবা—স্টেশনে পৌছতে না-পৌছতেই দেখি, মা-ও আমার চলে এসেছেন! জন্ম-জন্মান্তরের আকর্ষণ ছাড়া একে আর তুমি কী বলবে বলো। ওমা—তারপরেই কিনা দেখি, মা-ও আমার একা আসেন নি —সঙ্গে ওই গাধাটাও এসেছে। কান টানলেই মাথা আসে কিনা! (হাসিতে লাগিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ !

ভুজংগ ।। চমৎকার বৌ হয়েছে, স্যার।

দীনদয়াল ।। তা হয়েছে বইকি। দেখবার মত—দশজনকে দেখাবার মত—তাই-না রাত দশটায় ট্রেন থেকে নেমেই—এত রাত্রেও—তোমাদের বউ দেখাতে ডেকে এনেছি! বুঝলে ভুজঙ্গ, ওই গাধাটা আজ পর্যন্ত বুদ্ধির কোন পরিচয় যদি দিয়ে থাকে—তা হচ্ছে এই বিয়েটা।

ভুজংগ ।। আমাদের হাসপাতালেরও ভাগ্য যে, আমরা ওঁকে পেলাম।

দীনদয়াল ।। বটেই তো—বটেই তো! বুঝলে মা জয়া, এই যে—ইনি হচ্ছেন ডাক্তার ভুজঙ্গ মিত্র। মমতাময়ী হাসপাতালে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারী—মানে আমার ডান হাত।

ভুজংগ ।। (জয়ার প্রতি) নমস্কার।

জয়া ।। (প্রতি নমস্কার জানাইল) নমস্কার।

[এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।]

যুধিষ্ঠির ।। কত্তাবাবা, শাঁখের শব্দ শুনে পাড়ার লোকেরা এসে জড়ো হয়েছে তারা কেউ বউ না দেখে যাবে না! একটা মেলা বসে গেছে বাইরে!

দীনদয়াল ।। না না, এখন কী করে হয়! একে বউমার শরীর খারাপ। ওকে এখুনি শুইয়ে দিতে হবে। বউ-দেখা, মিষ্টিমুখ করা—এসব হবে কাল। আমি বলে দিচ্ছি সবাইকে। (যুধিষ্ঠির সহ দীনদয়ালের প্রস্থান)

[পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলা নিস্তারিণী—জয়ার কাছে গিয়া বসিলেন]

নিস্তারিণী ।। কী ভাই নতুন-বউ, চাঁদমুখখানি একটু তোল—একটু ভাল

করে দেখতে দাও। (জয়ার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া) বাঃ! খাসা বউ! কী বল ভাই জয়ন্ত!

জয়ন্ত ॥ হ্যাঁ, খাসা দই! জিভে জল আসছে তো দিদিমা?

নিস্তারিণী ॥ এলেই বা কী করব? এঁটো যে! (সকলে হাসিয়া উঠিল)

ভুজংগ ॥ দিদিমার নিষ্ঠা আছে!

[বাড়ির পুরাতন ভৃত্য সনাতনের চা লইয়া প্রবেশ]

জয়ন্ত ॥ বাঁচালি, সনাতন। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল!

নিস্তারিণী ॥ তার জন্মে চা কেন ভাই? তেষ্টার জল তো সামনেই ছিল!

জয়ন্ত ॥ নিষ্ঠা আমারও কম নয় দিদিমা—সবার সামনে আবার খেতে পারি না।

নিস্তারিণী ॥ (অন্য সবাইকে) শুনলে তো! চল ভাই, চল। বাড়া ভাতে ছাই দেবে না! (সকলে হাসিয়া উঠিল)। না, হাসির কথা নয়। রাতও অনেক হয়েছে। আসি ভাই—কাল আবার আসব। (ভুজংগ ও জয়ন্ত ঘরে রহিল—আর সকলে চলিয়া গেল)

ভুজংগ ॥ (জয়ন্তকে) মরুভূমিতে এতদিনে ফুল ফুটল। বাড়িটার দিকে তাকানো যেত না জয়ন্ত—খাঁ খাঁ করত। একেই বলে ভাগ্য। সারাজীবন তপস্যা করেও কেউ কিছু পায় না; আবার যে পায় সে পথ চলতেও মানিক পায়।

[যুধিষ্ঠির ছুটিয়া আসিল]

যুধিষ্ঠির ॥ (জয়ন্তকে) কত্তাদাদা, ওরা সব মিষ্টিমুখ হতে চাচ্ছেন। কত্তাবাবা আপনাদের ডাকছেন।

জয়ন্ত ॥ যাচ্ছি। (চা-এ শেষ চুমুক দিয়া জয়ন্ত বাহিরে ছুটিল)

যুধিষ্ঠির ॥ আপনি বুঝি যাবেন না?

ভুজংগ ॥ (যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) যাও, যাচ্ছি!

[যুধিষ্ঠির চলিয়া গেল]

ভুজংগ ॥ (চা খাইতে খাইতে হঠাৎ জয়াকে) আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব জয়াদেবী?

জয়া ॥ বলুন।

ভুজংগ ॥ আপনাকে এর আগে কোথাও দেখেছি?

জয়া ॥ আমাকে?

ভুজংগ ॥ হ্যাঁ আপনাকে।

জয়া ॥ কিন্তু আপনাকে তো আমি এর আগে কোথাও দেখি নি!

ভুজংগ ॥ কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, আপনাকে হাজার-হাজার লোকে দেখেছে কিন্তু আপনি তাদের কাউকে দেখেন নি।

জয়া ॥ তার মানে?

ভুজংগ ॥ মানে—আপনি কি কোনদিন সিনেমায় অভিনয় করেছেন?

জয়া ॥ না তো!

ভুজংগ ॥ তা হবে। 'অভিসার' ছবিতে রত্নার ভূমিকায় যে মেয়েটি নেমেছে, সে মেয়েটি সত্যিই একটি রত্ন। আশ্চর্য আপনাদের দু'জনের চেহারার মিল!

[নেপথ্যে দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আচ্ছা—আচ্ছা—সবাইকে বসতে বল।" দীনদয়ালের প্রবেশ]

দীনদয়াল ॥ বুঝলে ভুজঙ্গ, এরা সব নাছোড়বান্দা। বউমাকে একটিবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। রূপগুণের খ্যাতি এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এস মা, এস। এই এক মিনিট—

[জয়াকে লইয়া দীনদয়াল বাহিরে গেলেন। ভুজংগও তাহাদের সহিত যাওয়ার ভান করিল বটে—কিন্তু গেল না। দীনদয়াল ও জয়া চলিয়া যাওয়ামাত্র ভুজংগ খাটের উপরে জয়ার রাখিয়া দেওয়া ভ্যানিটি ব্যাগটি ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলল। তাহার মধ্য হইতে খানকতক চিঠিপত্র এবং কাগজ বাহির করিল। সেগুলির ভিতর হইতে একটি সচিত্র সিনেমা-সাপ্তাহিকের পাতা বাহির হইয়া পড়িল। ভুজংগের চোখে মুখে উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। সে পড়িল. "অভিসার চিত্রের একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে সখী রত্নার ভূমিকায় উদীয়মানা অভিনেত্রী জয়া দেবী।" ভুজংগ অন্য একটি চিঠি পড়িতে যাইতেছিল···এমন সময়ে নেপথ্যে দীনদয়ালের গলা শোনা গেল—"মা, জানবে, এরা সবাই আমার সুখে সুখী—দুঃখে দুঃখী। আজ ওদের আনন্দও কম নয়, মা।" এই বলিতে বলিতে দীনদয়াল এক হাতে জয়ন্তকে ও অন্য হাতে জয়াকে ধরিয়া এই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া ভুজংগ পত্রিকার পৃষ্ঠাটি পকেটে পুরিয়া এবং ব্যাগটি কোনমতে বন্ধ করিয়া খাটে রাখিয়াই সেই কক্ষস্থিত বৃহদাকার আলমারির আড়ালে আত্মগোপন করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জয়া ও জয়ন্তকে লইয়া দীনদয়াল কক্ষে প্রবেশ করিলেন]

দীনদয়াল ॥ এই ঘর ছিল এতকাল আমার—আজ থেকে হ'ল তোমাদের। (কক্ষে সযত্নরক্ষিত মমতাময়ীর তৈলচিত্রের দিকে তাকাইয়া) কী গো—তাই তো? হ্যাঁ—ওই মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। (জয়ন্ত ও জয়াকে লক্ষ্য করিয়া) ওরে, ও মরে নি—আমার জীবন যদিন বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে আমার মমতাময়ী সহধর্মিণী—তোমাদের করুণাময়ী জননী। অগ্নিসাক্ষী রেখে আমরা দু'জনে এক হয়েছিলাম জীবনে মরণে এক থাকব। অগ্নিসাক্ষী রেখে তোমাদের মিলন হয়েছে—জানবে, সে জন্ম-জন্মান্তরের মিলন। আচ্ছা মা, রাত হয়েছে—আমি আসি।

[দীনদয়াল চলিয়া গেলেন। জয়ন্ত দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া জয়ার মুখোমুখি দাঁড়াইল]

জয়ন্ত ॥ জয়াদেবী।

জয়া ॥ বলুন।

জয়ন্ত ॥ বাবার এই কথার পর—মা'র ওই দৃষ্টির সামনে—আপনার এখানে থাকতে সাহস হয় ?

জয়া ॥ না।

জয়ন্ত ॥ একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে অজস্র মিথ্যের জালে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।

জয়া ॥ দেখছি তাই।

জয়ন্ত ॥ ভেবেছিলাম আপনি একজন অভিনেত্রী, এক রাত্রির জন্য আমার বউ সেজে বাবাকে খুশি করে, তাঁকে গ্রামে ফেরত পাঠাতে পারবেন। অভিনয় আপনি ভালই করেছিলেন। এক ডোজ বেলেডোনা আপনাকে দিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছিলেন বাবা। হ্যাঁ, অভিনয় আপনার সার্থক হয়েছিল কিন্তু আপনার যখন বাড়িতে চলে যাবার কথা—তখন শর্তভেঙে আপনি চলে এলেন মদনপুরে—বাবার সঙ্গে। এখন এর শেষ কোথায়, জয়াদেবী।

জয়া ॥ জানি না।

জয়ন্ত ॥ গোপন করব না, জয়াদেবী আপনি যদি চুক্তি রক্ষা করে নিজের বাড়ি ফিরে যেতেন আপনি একলা যেতেন না—আপনার সঙ্গে সঙ্গে যেত আমার মন।...ওই এক ঘণ্টার পারচয়েই তুমি আমাকে জয় করেছিলে জয়া। তুমি এখানে না এলেও, তোমাকে ঘিরে থাকত আমার মন—আমার স্বপ্ন—আমার কামনা—আমার প্রার্থনা।

জয়া ॥ অভিনেত্রী আমি—এসব শুনতে অভ্যস্ত আছি, জয়ন্তবাবু। দেখেছি, ভাল ভাল কথা যারা বলেছে, তারাও করেছে অভিনয়। কিন্তু এ জগতে সব কিছুই যে অভিনয় নয়—অকপট স্নেহের উদার সমুদ্রও যে এ জগতে থাকতে পারে তা আবিষ্কার করলাম কেবল তখন—যখন আপনার বাবা আমাকে বুকে টেনে নিলেন। জীবনে প্রেম পাইনি এমন নয়, কিন্তু পাই নি—পাই নি কখনো অপকট স্নেহ। আমি সব কিছু ভুলে গেলাম—অমন স্নেহ হারাবার ভয়েই সব কিছু ফেলে ছুটে এলাম।

জয়ন্ত। তা তো এলেন। কিন্তু জগতে কোন ছলনাই গোপন থাকে না জয়াদেবী। একদিন-না-একদিন আমাদের এ ছলনা বাবার কাছে ধরা পড়বে। সে আঘাত তিনি সইতে পারবেন না। বাবা সব সইতে পারেন সইতে পারেন না শুধু প্রতারণা—প্রবঞ্চনা।

জয়া ॥ আর তাই জেনেই বুঝি—তাঁকে প্রতারণা করার—প্রবঞ্চনা করার আয়োজনটা করেছিলেন!

জয়ন্ত। বিপদে পড়ে করেছিলাম, জয়াদেবী—বিপদে পড়ে। বুঝতে পারি নি যে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে এখন, ধরা পড়ে গেলে যে এক নিমিষে তাঁর এই স্বর্গের স্বপ্ন—স্বপ্নের স্বর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

এ আঘাতের পর তিনি আর বাঁচবেন না। আর যদি বেঁচে থাকেনও—উন্মাদ হয়ে বাঁচবেন।

জয়া ॥ আমি বুঝিনি—বুঝিনি জয়ন্তবাবু। সত্যি আমি ভুল করেছি। উঃ, কী ভুল করেছি! চললাম—আমি চললাম জয়ন্তবাবু—জন্মের মত চললাম। (মমতাময়ীর তৈল-চিত্রের দিকে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) মা, আমায় ক্ষমা কর মা!

[জয়া দরজার দিকে ছুটিয়া গেল। জয়ন্ত ছুটিয়া যাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। আলমারির আড়াল হইতে ভুজংগ মুখ বাড়াইয়া দৃশ্যটি লক্ষ্য করিতে লাগিল]

জয়ন্ত ॥ শুনুন, এ আপনি কি করছেন জয়াদেবী? আপনি চলে গেলে, আপনি বাঁচবেন সত্যি—কিন্তু বাবা বাঁচবেন না। আপনি এখন এমনভাবে চলে গেলে, এ মিথ্যে ঢাকবার কোনও পথ থাকবে না।

জয়া ॥ এ মিথ্যে ঢাকবার কোনও পথ কি আছে জয়ন্তবাবু?

জয়ন্ত ॥ হয়তো আছে। বসুন—আপনি স্থির হয়ে বসুন। একটু ভাবতে দিন। হ্যাঁ, ধরুন—আপনার সঙ্গে আজ রাত্রে আমার ভীষণ ঝগড়া হ'ল। স্বামী-স্ত্রীতে তা হতেই পারে। ধরুন—রাগ করে আমি রাত বারোটার ট্রেনেই কলকাতা চলে গেলাম। জানাজানি হ'লেই বাবা রাগ করে চেঁচামেচি করবেন, বলবেন—'এত বড় পাঁঠা দুনিয়ায় জন্মায়নি' এবং দেখবেন, তাতে আপনার আদর বেড়ে যাবে। কিন্তু আমি চলে যাওয়াতে, ধরুন·· আপনার মন ভীষণ খারাপ হবে। দয়া করে একটু কান্নাকাটি করবেন···মানে, এই দুটো দিন! আমি গিয়েই 'আপনার ভাই' বিমানকে পাঠিয়ে দেবো। বিমান এসেই আপনাকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাইবে। আপনার মন খারাপ দেখে বাবা তাতে কিছুতেই আপত্তি করবেন না। তারপর বিমানের সঙ্গে আপনি যেদিন চলে এলেন কলকাতায়, সেদিন রাত্রে আপনার কলেরা···এসিয়াটিক কলেরা—ব্যস এক রাত্রেই সব শেষ। পরদিন সকাল বেলা বাবাকে ছোট্ট একটি হৃদয়-বিদারক টেলিগ্রাম—'শেষ—সব শেষ'। হ্যাঁ—হ্যাঁ জয়াদেবী, এমনি করে আপনাকে শেষ না করলে, এ মিথ্যের আর শেষ নেই। (ঘড়ি দেখিয়া) রাত এগারোটা। বারোটার ট্রেন ধরতে হ'লে আমাকে এখনি বেরোতে হবে। এ ট্রেনে না গেলে আজ রাত্রে আর ট্রেন নেই। আর, সকাল হ'লে, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাওয়া—সে বাবা থাকতে চলবে না।

[সুটকেশটি হাতে লইয়া জয়ন্ত চলিয়া গেল। জয়া মুহূর্তকাল পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া রহিল, তারপর দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার আসিয়া দেখে, তাহার ব্যাগটি আধখোলা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে]

জয়া ॥ (অস্ফুট কণ্ঠে) একী! এটা কে খুলল!

[ব্যাগটি সে পরীক্ষা করিতে লাগিল, আলমারির আড়াল
হইতে ভুজংগের আত্মপ্রকাশ]

ভুজংগ ॥ নমস্কার, জয়াদেবী।

জয়া ॥ (চমকিয়া) কে! আপনি? এখানে—এ ঘরে?

ভুজংগ ॥ (শয়তানি হাসি হাসিয়া) চেঁচাবেন না। এই নিন—আপনার কাগজ। আপনি অস্বীকার করলে কী হবে, কাগজটা মৃত্যুর ভূমিকায় আপনার অভিনয়-প্রতিভার খুব সুখ্যাতি করেছে জয়াদেবী। আচ্ছা, চলি। (হঠাৎ ফিরিয়া) এসিয়াটিক কলেরায় মরা বললেই মরা যায় না জয়াদেবী—অন্তত, আমি আপনাকে মরতে দেবোনা। আপনাকে আমার চাই। আচ্ছা নমস্কার।

[ভুজংগ চলিয়া গেল। জয়া বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাসপাতালের অফিস ঘর। সকালবেলা। ভুজংগ খাতাপত্র দেখিতেছে। হঠাৎ সে
চিৎকার করিয়া ডাকিল "নার্স নার্স।" ক্ষণপরে নার্স বেলা ঘোসের প্রবেশ]

ভুজংগ ॥ আমি তোমাকে বলে এলাম—এখনি আসবে, এত দেরী করলে যে?

বেলা ॥ ইয়েস্ ডক্টর। কারণ ছিল। ডাক্তার চৌধুরী তাঁর বউমাকে হাসপাতাল দেখাচ্ছেন। তিনি যদি আমাকে না ছাড়েন—আমি কি করতে পারি বলুন?

ভুজংগ ॥ বউমাকে হাসপাতাল দেখানো—এটা হ'ল গিয়ে একটা প্রাইভেট ব্যাপার। তার জন্য হাসপাতালের duty suffer করবে—এসব আমি সইব না নার্স। এই Diet Bill-টা চেক্ করে আমাকে এ-বেলাই দেবে।

বেলা ॥ (কাগজটা লইয়া) ইয়েস্ ডক্টর! (বেলা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আবার ফিরিল। ভুজংগের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)।

বেলা ॥ প্রাইভেট ব্যাপার আপনারও অনেক কিছু দেখলাম ভুজংগবাবু।

ভুজংগ ॥ What do you mean?

বেলা ॥ জয়া চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে হাসপাতালের ডিউটি করছিলেন বুঝি?

ভুজংগ ॥ How do you dare?

বেলা ॥ আমি দেখলাম। আর বলতে পারবো না?

ভুজংগ ॥ বেলা, don't be sily. যাও—কাজে যাও।

বেলা ॥ যাচ্ছি। কিন্তু তিনি কি ভাবলেন!

ভুজংগ ॥ তুমি যাও। তিনি কিছু ভাবেন নি।

বেলা ॥ হাঁ যাচ্ছি। কিন্তু এক রাত্রের পরিচয়েই মানুষ যে এত নির্লজ্জ হতে পারে—এ জানা ছিল না।

ভুজংগ ॥ বেলা—মুখ সামলে কথা বলবে।

বেলা ॥ (রুখিয়া উঠিয়া) কেন? কিসের ভয়?

[ভুজংগ তাহার এই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া খানিকটা দমিয়া গেল]

মেয়েদের সর্বনাশ করা আপনার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।

ভুজংগ ॥ ছিঃ বেলা। কাজে যাও, Please কাজে যাও।

বেলা ॥ না, আমি যাব না। কেন আপনি আমাকে ওখানে ও-ভাবে অসম্মান করলেন?

ভুজংগ ॥ তোমাকে অসম্মান করলাম ওখানে! মানে?

বেলা ॥ আপনি আমাকে বিয়ে করবেন—একদিন ধর্মসাক্ষী রেখে বলেছিলেন। তবেই বাপ-মা ঘর-বাড়ি ছেড়ে আপনার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম—এই মদনপুরে। আমার সামনে জয়া চৌধুরীর সঙ্গে চোখ টিপে আর মুখ টিপে হাসা—এ সাহস আপনার এলো কোত্থেকে তাই ভাবছি!

ভুজংগ ॥ মেয়েটিকে আমি জানি—তাই। সে অনেক কাহিনী। আমি তোমাকে বলবো—আমি তোমাকে বলবো বেলা। Please কাজে যাও।

[বেলা চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণ সান্যালের প্রবেশ]

ভুজংগ ॥ আসুন, আসুন নিবারণবাবু।

নিবারণ ॥ কি ভায়া—হঠাৎ জরুরী তলব যে? বুড়ো তো শুনলাম কাল রাত্রে ছেলে-বউ নিয়ে এসেছে। শুনলাম—বাড়িতে কাল রাত্রে খুব মাতামাতি হয়েছে। ছেলের বউ এনে বুড়োর হৈ-হল্লা আরো বেড়ে গেছে নিশ্চয়ই।

ভুজংগ ॥ বসুন। বলছি। ছেলে তো কাল রাত্রেই উধাও। বউএর সঙ্গে নাকি ঝগড়া হয়েছে।

নিবারণ ॥ আসতে না-আসতেই ঝগড়া!

ভুজংগ ॥ বাপেরই তো ছেলে! ছিট তো একটু থাকবেই।

নিবারণ ॥ আমাদের ব্যাপারটা কদ্দুর? জজ সাহেবের হুকুম হলো?

ভুজংগ ॥ আজ সকালে এসেছে।

নিবারণ ॥ এসেছে!

ভুজংগ ॥ সেই জন্যই তো আপনাকে ডেকেছি। এই নিন্—দেখুন।

[নিবারণবাবু চশমাটি চোখে আঁটিয়া জজসাহেবের আদেশ পড়িতে লাগিলেন। উপুড় হইয়া আদেশটি দেখিতে দেখিতে ভুজংগ মন্তব্য করিতে লাগিল]

ভুজংগ ॥ হতে পারে ওঁর টাকাতেই এই হাসপাতাল। কিন্তু একবার যখন এই হাসপাতালটা ট্রাস্টি:দের হাতে তুলে দিয়েছেন—তখন এই হাসপাতালের উপর ওঁর নিজস্ব অধিকার আর কিছু নেই। আপনার-আমার মত উনিও ট্রাস্টি:দের একজন সভ্যমাত্র। দেখছেন—জজসাহেব বলেছেন—গভর্ণমেণ্টের বাঁধা-ধরা নিয়মে এই হাসপাতাল চালাতে হবে—ওঁর খাম-খেয়াল মত নয়।

নিবারণ ॥ তা তো দেখছি। কিন্তু এই যে এইখানটা—আমি তখনই বলেছিলাম, দীনদয়াল চৌধুরীর অসাক্ষাতে, অনুপস্থিতিতে তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে বোর্ড থেকে সরিয়ে দেবার প্রস্তাব—হাসপাতালের প্রধান-ডাক্তারের পদ থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব—আমরা পাশ করলেও, জজসাহেব সরাসরি তা মেনে নেবেন না। মানেনও নি—এই যে—

ভুজংগ ॥ হাঁ, পাকাপাকিভাবে মেনে নেন নি বটে—কিন্তু আপাতত তো রাজী হয়েছেন। এই যে এখানটায় বলেছেন—"বহু লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে একটি হাসপাতালের নানাবিধ বিধিব্যবস্থা ও চিকিৎসার উপর। এই গুরুদায়িত্ব বহন করার মতো প্রকৃতিস্থতা ডাক্তার চৌধুরীর আদৌ আছে কিনা তাহা একটি মেডিকেল কমিশন দ্বারা এই মাসের শেষেই পরীক্ষা করা হইবে। এই পরীক্ষা হইয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার চৌধুরী হাসপাতালের কোন দায়িত্বসম্পন্ন পদেই থাকিবেন না। ট্রাস্ট বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীভুজংগ মিত্র এই সময়ে ডাক্তার চৌধুরীর দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করিবেন।"

নিবারণ ॥ হাঁ, তা দেখছি বটে। কিন্তু তুমি কি ভাবছো ভুজংগ—যে দীনদয়াল জজসাহেবের এই আদেশ মানবে? লোকটা তো আর সত্যিই পাগল হয়নি?

ভুজংগ ॥ পাগল হওয়ার যেটুকু বাকী ছিল—জজসাহেবের এই অর্ডার দেখলেই সেটুকু আর বাকি থাকবে না। জজসাহেবের অর্ডার। মানব না বললে তো আর চলবে না। হাঁ চেঁচামেচি খানিকটা করবে। কিন্তু শায়েস্তা করতেও আমি জানি।

নিবারণ ॥ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু মেডিকেল কমিশন—এই মাসের শেষেই আসছে। সেখানে তো আমাদের ধাপ্পা চলবে না ভুজংগ। তার কি করছ?

ভুজংগ ॥ এখনো পনের দিন বাকী? জজসাহেবের এই এক অর্ডারের ঘা খেয়েই বদ্ধ পাগল হয়ে দাঁড়াবে তিন দিনেই। তে-রাত্রি আর পোহাবে না। সে আপনি ভাববেন না নিবারণবাবু। শুধু একটা কথা, ওকে পাগল সাব্যস্ত করতে পারলে, আপনারা যেন আপনাদের কথা রাখেন।

নিবারণ ॥ নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তুমি হবে এই হাসপাতালের চীফ-

মেডিকেল অফিসার, আর আমার ছেলে হবে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু পারবে তো?

ভুজংগ ॥ পারি কি না দেখুন…কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে।

নিবারণ ॥ আমাদের সকলের স্বার্থ রয়েছে ভায়া—শুধু তোমার একলার নয়। আমি চলি। বুড়োর সামনে পড়লে আমি যেন কেমন হয়ে পড়ি। কি হয়—খবর দিও।

[নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির ॥ স্যার, কর্তাবাবু বউদিদিমণিকে হাসপাতাল দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। রোগীরা স্যার—মহাখুশি হয়েছে। কর্তাবাবু আপনাকেও ডাকছেন স্যার।

ভুজংগ ॥ ডাকছেন? আমাকে? গিয়ে বল—আমি তাদের ডাকছি এখানে। পাগলামি করার জায়গা হাসপাতাল নয়।

যুধিষ্ঠির ॥ আপনি বলছেন কি স্যার?

ভুজংগ ॥ (স্বপদদাপে) বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বলছি…

[যুধিষ্ঠির ধমকের চোটে চট করিয়া বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া পলাইল। দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "আরে—আরে—আরে। ওটা কে? যুধিষ্ঠীর না। হামাগুড়ি দিয়ে পালালো।" জয়াসহ দীনদয়ালের প্রবেশ]

দীনদয়াল ॥ ব্যাপার কি ভুজংগ? যুধিষ্ঠির অমন করে হামাগুড়ি দিয়ে পালালো কেন? মাথা খারাপ হলো নাকি!

ভুজংগ ॥ তা হয়তো হবে। পাগলামি ব্যাধিটা অনেক সময় সংক্রামক হয়ে ওঠে। কারো হয়ত ছোঁয়াচ লেগেছে। নমস্কার জয়া দেবী—বসুন।

দীনদয়াল ॥ না, যুধিষ্ঠির দেখছি আমাকে ভাবিয়ে তুললো। হামাগুড়ি দেওয়া দেখছি নতুন লক্ষণ। রোগী মনে করে সে যেন একটি শিশু—হামাগুড়ি দেয়। তবে কি "সাইকুটা ভিরুসা"—আচ্ছা সে দেখব এখন। বুঝলে ভুজংগ, জয়া-মাকে হাসপাতাল দেখিয়ে আনলাম। এদিকে শুনেছ তো—গাধাটা বউমার সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করে কাল রাত্রেই কালকাতা চলে গেছে।

ভুজংগ ॥ শুনেছি।

দীনদয়াল ॥ বুঝলে ভুজংগ, 'শোণিত-প্রধান, ক্রোধ-প্রবণ, পরিবর্তনশীল স্বভাব। সে যে স্থানে রহিয়াছে সে তাহার গৃহ নহে এইরূপ বিশ্বাস। শয্যা হইতে উঠিয়া পলায়ন। ভগ্ন-প্রেমের কুফল স্ত্রী বা স্বামীর চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা—' "হায়াসায়ামাস।" (জয়াকে) না, না, বোধহয় সে রকম কোন চেষ্টা করেনি—কি বল মা?

ভুজংগ ॥ করে থাকলেই কি উনি তা বলবেন?

দীনদয়াল ॥ আচ্ছা, আচ্ছা মা, সে সব তোমার সঙ্গে আমি পরে আলোচনা করব। তবে এটা ঠিক—জয়ন্তর এখন দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

ভুজংগ ॥ দস্তুর মত চিকিৎসা আরও অনেকের দরকার।

দীনদয়াল ॥ বিশেষ করে তোমার। আজকাল তো তোমাকে কখনো হাসতে দেখি না ভুজংগ। রুক্ষ মেজাজ, রূঢ় আচরণ, সশংকভাব···আচ্ছা তোমার কি কখনো ষড়যন্ত্র করবার ইচ্ছা হয়? প্রিয়জনের বিরুদ্ধে?

ভুজংগ ॥ নিজের যে ব্যাধি—সেটা বুঝতে না পারাই কি সব চেয়ে বড় ব্যাধি নয় স্যার?

দীনদয়াল ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার লক্ষণটা আমাকে আগে বলো নি কেন? আচ্ছা, সে পরে শুনবো। মাকে হাসপাতালের কাজকর্ম সব বোঝাচ্ছি। এই যে মা, এই জিনিসটি দেখ—। (বেদীর উপরে রক্ষিত তাজমহলের একটি মর্মর-নির্মিত মডেলের কাছে লইয়া গিয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন) দেখেই বুঝছ—তাজমহলের মডেল। এই মডেলটি আমার জীবনের প্রেরণা, শক্তির উৎস। মমতাজের স্মৃতিকে অমর করবার জন্য সাজাহান গড়েছেন এই তাজমহল—আর আমার মমতার স্মৃতিকে অক্ষয় করবার জন্য আমি গড়ে তুলেছি এই মমতাময়ী হোমিও হাসপাতাল।

ভুজংগ ॥ (ঈষৎ শ্লেষে) হ্যাঁ—উনি হলেন আমাদের এ যুগের সাজাহান।

দীনদয়াল ॥ সাজাহান! সাজাহান! আমি এক নতুন সাজাহান। কিন্তু সাজাহান ছিলেন সম্রাট। আর আমি হচ্ছি সেবক! সত্যিকার প্রভু হচ্ছেন তাঁরা—যাঁদের হাতে এই হাসপাতাল পরিচালনার ভার আমি ছেড়ে দিয়েছি—সেই "Board of Trustees"। দেখি খাতাপত্রগুলো। (আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং খাতা টানিয়া বাহির করিয়া জয়াকে বলিলেন) বুঝলে মা, এই হচ্ছে ট্রাস্ট বোর্ডের খাতা। এতে ট্রাস্টিরা হাসপাতালের পরিচালনা সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব পাশ করেন—তা লেখা থাকে। এর নকল পাঠাতে হয় জজসাহেবের কাছে। তিনি অনুমোদন করলে তবে সে প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হয়। (পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) এই যে আমাদের শেষ মিটিং-এর সব প্রস্তাব।···একি! গত ৪টা মিটিং হয়েছে? আমাকে না জানিয়ে। আমাকে বাদ দিয়ে? একি! একি! আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে প্রস্তাব পাশ করেছ!

ভুজংগ ॥ পাগলকে পাগল বলা ছাড়া উপায় নেই স্যার।

দীনদয়াল ॥ রাস্কেল! আমারই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আমাকে তোমরা বলবে পাগল? তোমরা—যাদের আমি বড় বিশ্বাস করে—আমার যা কিছু পবিত্র, যা কিছু মূল্যবান—সব - সব·· যাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মানি না—আমি তোমাদের এই প্রস্তাব মানিনা—যাচ্ছি আমি জজসাহেবের কাছে।

ভুজংগ ॥ দাঁড়ান। জজসাহেবের কাছে আর যেতে হবে না। তাঁর অর্ডার এসে গেছে।

দীনদয়াল ॥ কি অর্ডার? দেখি (ভুজংগ অর্ডারটি সতর্কতার সঙ্গে সামনে ধরিল, ধীর স্থিরভাবেই অর্ডারটি পড়িতে লাগিলেন) "বহুলোকের জীবন মরণ নির্ভর করে একটি হাসপাতালের নানাবিধ বিধিব্যবস্থা ও চিকিৎসায় ওপর।" ঠিক। ঠিক বলেছেন জজসাহেব (আবার পড়িতে লাগিলেন) "এই গুরুদায়িত্ব বহন করিবার মত প্রকৃতিস্থতা ডাক্তার চৌধুরীর আদৌ আছে কিনা —তাহা একটি মেডিকেল-কমিশন দ্বারা এই মাসের শেষেই পরীক্ষা করা হইবে। এই পরীক্ষা হইয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার চৌধুরী হাসপাতালের কোন দায়িত্বসম্পন্ন পদেই থাকিবেন না। ট্রাস্ট বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীভুজংগ মিত্র এই সময়ে ডাক্তার চৌধুরীর দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করিবেন।" জাল। এ অর্ডার জাল। আমি বিশ্বাস করি না!

ভুজংগ ॥ এই তাঁর সই—এই তাঁর শীল্। তবু যদি বিশ্বাস না হয়—আপনি গিয়ে দেখা করুন জজসাহেবের সঙ্গে!

জয়া ॥ এ একটা ষড়যন্ত্র—বাবা এ একটা দারুণ ষড়যন্ত্র। (ভুজংগকে) এ কি অন্যায় ভুজংগবাবু!

ভুজংগ ॥ ন্যায় কি অন্যায়—গিয়ে জজসাহেবকে বলুন। তখনি আমি বলেছি—"স্যার আপনার ঐ লাফালাফি, দাপাদাপি, হৈ হৈ দুপদাপ এসব একটু কমান।" তা উনি দিন দিন সপ্তমে উঠলেন। ওঁকে ঠেকানো দায় হয়ে উঠলো —আমি কি করব বলুন?

দীনদয়াল ॥ ভুজংগ! তোমার মনে এই ছিল? তুমি—যাকে আমি··· (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া)···না, না, ভুজংগ! আমি হয়তো স্বপ্ন দেখছি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ স্বপ্ন—এ স্বপ্ন। (জাগ্রত হইবার চেষ্টা·· হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া) না, না,—একি স্বপ্ন, না সত্য! তুমি! তুমি!

ভুজংগ ॥ শুধু আমি নই স্যার। আমি তো বলেছি—সবাই আপনাকে সামনে বলে দেবতা—পেছনে গিয়ে হাসে আর বলে 'বদ্ধ পাগল'। যাক—জজসাহেবের অর্ডার আপনি দেখেছেন। আমি হাসপাতালের নোটিশ-বোর্ডে একটি কপি টাঙিয়ে দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি।

জয়া ॥ ভুজংগবাবু। শুনুন! দিনে-দুপুরে এ ডাকাতি চলে না, চলতে পারে না। ও নোটিশ আপনি দেবেন না।

ভুজংগ ॥ দিনে-দুপুরে ডাকাতি! আমি করছি? চুপ করে থাকাই কি আপনার উচিত নয় জয়াদেবী! আমার মুখ বন্ধ রাখতে চান? (ভুজংগ চলিয়া গেল)

দীনদয়াল ॥ সংসারে এও ছিল। এও দেখতে হ'ল। হয়তো আরো কত দেখতে হবে। লোকে সামনে বলেছে দেবতা। পেছনে গিয়ে হেসেছে আর

বলেছে—বদ্ধ পাগল। সত্যিই কি তাই? মানুষের সেবা—রোগীর শুশ্রূষা—সারা জীবন করেছি—তার কি এই পুরস্কার! কি জানি—আমি হয়তো লোক চিনতে পারিনি। মানুষকে কি আমি এত ভুল বুঝেছি?

জয়া॥ আপনি ভাববেন না—বাবা। পনের দিনের মধ্যেই মেডিকেল কমিশন আসছে। তারা তো আর পাগল নয়-যে আপনাকে পাগল বলবে। কিন্তু আমি ভাবছি—আপনার মত দেবতা এই পনের দিনই-বা কেন এই দুর্গতি সইবেন! কেন সইবেন এই মিথ্যা অপবাদ! আপনি আমার সঙ্গে চলুন। প্রতিটি লোককে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব···

দীনদয়াল॥ না, না, না—মুখোমুখি জিজ্ঞেস করলে বলবে দেবতা, কিন্তু মুখ ফিরিয়েই হাসবে। মুখে না বলুক—মনে মনে বলবে পাগল। হাঁ—আমি পাগল সেজেই থাকব জয়া এই পনের দিন। তবেই জানতে পারব লোকের মনের কথা—আমি কি সত্যই পাগল।

তৃতীয় দৃশ্য

[হাসপাতালের আফিস কক্ষ। যুধিষ্ঠির মায়াতত্ত্ববিষয়ক একটি বাউল গান গাহিতে গাহিতে আসবাবপত্র ঝাড়িতেছে ও জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে]

(গান)

(মর্ম) এ সংসার মায়ার ঘাঁটি।: তুমি কার—কে তোমার।
তবু বেশ আছে পারপাটি। ইত্যাদি

[গানের মধ্যস্থলে দীনদয়াল দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুধিষ্ঠির গানে এবং কাজে এতই মত্ত যে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। যুধিষ্ঠির ছুরি-কাঁচি পরিষ্কার করিতে করিতে এদিক ওদিক চাহিয়া, তাহার দুই ট্যাঁকে পুরিল। তাহার অলক্ষ্যে দীনদয়াল ইহা লক্ষ্য করিলেন। মনে হইল উপভোগই করিলেন। যুধিষ্ঠির ঘর হইতে চলিয়া যাইবার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিল, দীনদয়াল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ধরা পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার চোখমুখের অবস্থা যাহা দাঁড়াইল—দীনদয়াল তাহাও উপভোগ করিলেন]

যুধিষ্ঠির॥ আজ্ঞে, কর্তা! আমি···আমি···মানে ব্যারামটা সেরে গিয়েও সারছে না। মাঝে মাঝে এমন মোচড় দেয় যে, মাঝে মাঝে এমন দু'একটা ছোটখাটো জিনিস···

দীনদয়াল॥ বেশ তো—বেশ তো খুব চালাও। কিন্তু নজরটা এত ছোট কেন? মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার—না হয় পুকুর চুরি করো।

যুধিষ্ঠির॥ কী যে বলেন কর্তা! এমন করে অধমকে লজ্জা দিবেন না, স্যার। আচ্ছা কর্তা, কথাটা ঠিক? আপনার নাকি মাথায় একটু দোষ হয়েছে?

দীনদয়াল ॥ (চটিয়া গিয়া) মাথার দোষ হয়েছে আমার ?

যুধিষ্ঠির ॥ ভুজংগবাবু তাই বলছেন, কর্তা। নোটিশ মেরে দিয়েছেন।

দীনদয়াল ॥ ভুজংগবাবু! সে আবার কে ?

যুধিষ্ঠির ॥ কেন—ভুজংগবাবু ?

দীনদয়াল ॥ চিনি না তো। যাঁকে চিনি তিনি কোথায় ?

যুধিষ্ঠির ॥ কার কথা বলছেন, কর্তা ?

দীনদয়াল ॥ দীনদয়াল চৌধুরী।

যুধিষ্ঠির ॥ কী বললেন কর্তা ?

দীনদয়াল ॥ দীনদয়াল চৌধুরী। ডাক্তার, ডাক্তার, তোমাদের হাসপাতালের ডাক্তার।

যুধিষ্ঠির ॥ সে তো আপনি স্যার।

দীনদয়াল ॥ আমি! আমি দীনদয়াল চৌধুরী ? হাঃ—হাঃ—হাঃ। (হাসিয়া উঠিলেন)। আমি এলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—আর এ লোকটা বলছে কিনা আমিই ডাক্তার দীনদয়াল চৌধুরী ? (হঠাৎ চটিয়া গিয়া) বলবি নে—কোথায় সে ? (রুদ্রমূর্তিতে তাহার দিকে তাকাইলেন)

যুধিষ্ঠির ॥ ওরে বাবা !

[বলিয়াই চাকতে হামাগুড়ি দিয়া দীনদয়ালের দুই পায়ের মধ্য দিয়া গড়াইতে গড়াইতে বাহিরে চলিয়া গেল এবং বাহিরে গিয়াই চিৎকার শুরু করিল, "কে কোথায় আছ ? কর্তা পাগল হয়ে গেছেন। কে কোথায় আছ ? কর্তা পাগল হয়ে গেছেন।" বলতে বলতে দূরে চলিয়া গেল। দীনদয়াল উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনতে লাগিলেন এবং মুখে তাঁহার হাসি ফুটিল। হঠাৎ আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—"হাঃ হাঃ হাঃ।" পরক্ষণেই নেপথ্যে ভুজংগের গলা শোনা গেল—"কোথায় ? কোথায় ?" যুধিষ্ঠীরের উত্তর শোনা গেল—"আপিস ঘরে, স্যর—আপিস ঘরে।" পরমুহূর্তেই যুধিষ্ঠীর-সহ ভুজংগ, নিবারণবাবু এবং আরও কয়েকজন ট্রাস্টির প্রবেশ। ক্রমশঃ বেলা বসু, জয়া দেবী এবং অন্যান্য রোগীরা আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ভিড় জমিয়া গেল]

যুধিষ্ঠির ॥ এই দেখুন, স্যার। উনি নাকি আমাদের দয়াল-ডাক্তার নন।

ভুজংগ ॥ আপনি দয়াল-ডাক্তার নন ?

দীনদয়াল ॥ আরে, মশাই, তার সঙ্গেই দেখা করতে আমি এসেছি।

ভুজংগ ॥ দেখা করতে এসেছেন! কোত্থেকে আসছেন ?

দীনদয়াল ॥ খাশ কলকাতা থেকে—আবার কোত্থেকে আসব! সে লোকটা কোথায় ? তাকে আমি এখুনি চাই। ভাল চান তো আপনারা মশাই তাকে বের করে দিন। নইলে আমাকে চেনেন না!

ভুজংগ ॥ (হাতজোড় করিয়া) কে আপনি, মশাই ?

দীনদয়াল ॥ আমার নাম শোনেন নি ?

ভুজংগ ॥ না, মহাত্মন! সে সৌভাগ্য তো এখনো হয়নি।

দীনদয়াল ॥ নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠবে—পিলে ফাটবে—ফট্ ফটাস!

ভুজংগ ॥ ওরে বাবা! থাক্—থাক্, শুনে তবে কাজ নেই। কী বলেন নিবারণবাবু?

নিবারণ ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

দীনদয়াল ॥ ভালো চাও তো—সব বলো—সেই পাপিষ্ঠ কোথায়?

ভুজংগ ॥ আজ্ঞে—শুনেছি, তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

দীনদয়াল ॥ পাগল হয়ে গেছেন! (উৎকট হাস্য) হতেই হবে—হতেই হবে। (আনন্দে দীনদয়াল নৃত্য করিতে লাগিলেন)

জয়া ॥ ভুজংগবাবু, আজ বাবার এ অবস্থার জন্য আপনারা দায়ী—আপনারা ট্রাস্ট বোর্ডের মেম্বাররা—গ্রামের নেমকহারাম লোকেরা।

ভুজংগ ॥ দায়ী আমরা?

জয়া ॥ ষড়যন্ত্র করে দেবতার মতো একটা মানুষকে মাথা-খারাপ অপবাদ দিয়ে তাঁর নিজের মন্দির থেকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছেন পথের ধুলোয়। কে সইতে পারে এ আঘাত? মানুষ পারে না—দেবতা পারেন না—উনিও পারেন নি। এক রাত্রে আজ ওঁর এই দশা। বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি আপনারা—দীনদয়াল চৌধুরী কী সত্যিই পাগল? দীনদুঃখীর দুঃখ দূর করতে তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন। জীবনপণ করেছিলেন। এ কী পাগলের কাজ? বলুন—বলুন, আপনারা বলুন—

ভুজংগ ॥ বলব? তবে আমাকেও অনেক কিছু বলতে হয়। বলব, জয়াদেবী?

দীনদয়াল ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ! কেউ কিছু জানে না—কেউ কিছু জানে না—কেউ কিছু শোনে নি। (চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে গুপ্ত তথ্য ফাঁস করিবার ভঙ্গিতে) লোকটা ছিল আসলে একটা জোচ্চোর। লোকটার এই ধনদৌলত—এইসব ভালমানষি—সবই একটা ফাঁকি। মেকী—মেকী—মেকী! (উপস্থিত রোগীদের মধ্যে একজন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) বোকার মত হাসছে! হাসো—হাসো—হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়? (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) তোমাদের ওই দীনদয়াল ঠাকুর আমার সঙ্গেই পড়তো। জানো তোমরা?

১ম রোগী ॥ না, না, স্যার। আপনি বলুন।

দীনদয়াল ॥ কেমিস্ট্রির একটা ফরমুলা ছিল আমার—সোনা তৈরী করার ফরমুলা। কিন্তু ওই শালা দীনদয়াল আমার ফরমুলাটা চুরি করে পালিয়ে যায়। চুরি করে নিয়ে যায় আমার সব কিছু। আমার স্ত্রী—আমার টাকাকড়ি আর আমার সেই পরশপাথর—সোনা তৈরী করার পরশপাথর—(সকলে হাসিয়া

উঠিল) হাসছ ? তোমরা হাসছ ? (মমতাময়ীর ফটো দেখাইয়া) উনি আমার স্ত্রী। আমারই টাকায় এখানকার এতবড় সম্পত্তি—এতবড় হাসপাতাল আমারই পরশপাথরে গড়া এখানকার সবকিছু। সব আমার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছে ওই শালা দীনদয়াল। শুধু চোর নয়—জোচ্চোর নয়—কতবড় লম্পট, বলো।

ভুজংগ ॥ তা যা বলেছেন। (উপস্থিত রোগীদের মধ্যে একজন আসিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল)

১ম রোগী ॥ (ভুজংগকে) তা যা বলেছেন মানে? দীনদয়াল চৌধুরী চোর ছিলেন? জোচ্চোর ছিলেন? লম্পট ছিলেন?

ভুজংগ ॥ উনি নিজেই বলছেন।

জনৈক রোগী ॥ (ভ্যাংচাইয়া) উনি নিজেই বলেছেন! উনি তো পাগল। ওঁর কথার দাম কী। কিন্তু আপনি কেন বলছেন? (আর এক ব্যক্তি রুখিয়া আসিল)

২য় রোগী ॥ হ্যাঁ—আপনি কেন সায় দিচ্ছেন? (তৃতীয় ব্যক্তি চিৎকার করিয়া রুখিয়া আসিল)

৩য় রোগী ॥ বউমা ঠিকই বলেছেন। এই লোকটার ষড়যন্ত্রেই আমাদের দয়াল-ডাক্তার আজ পাগল, মারো শালাকে—মারো।

ভুজংগ ॥ বটে! আমারই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ? দারোয়ান—দারোয়ান! (দারোয়ান ছুটিয়া আসিল) এদের সব বের করে দাও।

১ম রোগী ॥ কার হাসপাতাল?

২য় রোগী ॥ দয়াল-ডাক্তারের হাসপাতাল।

৩য় রোগী ॥ আমাদের হাসপাতাল।

ভুজংগ ॥ Get out—Get out you scoundrels.

রোগীরা ॥ বটে রে। তবে রে শালা—

[হাতাহাতি শুরু হইল। দারোয়ান রোগীদের ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। ভুজংগ নিবারণবাবু প্রভৃতি বাহির হইয়া গেলেন—শুধু রহিলেন দীনদয়াল ও জয়া]

দীনদয়াল ॥ (আনন্দে অট্টহাসি করিয়া উঠিলেন)

জয়া ॥ বাবা—বাবা!

দীনদয়াল ॥ কী, মা?

জয়া ॥ দুনিয়ার সবাই কিন্তু ভুজংগ নয় বাবা। মানুষ আপনাকে ভুল বোঝে নি। দরকার হলে ওই অমানুষদের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে ওরা প্রাণও দিতে পারে। আপনি শুধু একবার চেঁচিয়ে বলুন—আপনি পাগল নন। মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে ওরা আপনাকে পাগল সাজিয়েছে।

দীনদয়াল ॥ না—না, পাগল সেজে থেকে আরো কটা দিন দেখি—মানুষ কত নীচে নামতে পারে—কত ওপরে উঠতে পারে। আমায় দেখতে দে, জয়া মা আমায় দেখতে দে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হাসপাতালের পূর্বোক্ত অফিস কক্ষ। রাত্রি। জয়া ও দীনদয়াল]

জয়া ॥ রাত অনেক হোলো, বাবা নিজের ঘরে গিয়ে শোবেন চলুন।

দীনদয়াল ॥ না মা, এই ঘরেই আমি থাকব। মাসের ভেতর ক'দিন আমি শুই নিজের ঘরে? বছরের বেশির ভাগ রাত হাসপাতালের এই টেবিলই আমার শয্যা। এখানে থাকলে রোগীগুলো মনে সাহস পায়। বাড়িতে শুলে কেমন আমার ঘুমই হয় না। ওই যে তোমার শাশুড়ী—উনিও কত রাত জেগেছেন এখানে—আমার সঙ্গে—রোগীদের শুশ্রূষায়।

জয়া ॥ আমিও আপনার কাছে থাকব, বাবা। চলুন খেয়ে আসবেন।

দীনদয়াল ॥ না মা, তুমি বরং বাড়ি যাও—খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার খাবারটা নিয়ে এসো। (জয়া প্রস্থানোদ্যত) আর, হ্যাঁ শোন।

জয়া ॥ কী, বাবা?

দীনদয়াল ॥ গাধাটার খবর কি? চিঠি-টিঠি কিছু দিয়েছে?

জয়া ॥ (সলজ্জ ভঙ্গিতে) না, বাবা!

দীনদয়াল ॥ এই দেখো—আমাকেও এমনি করে চিরকাল জ্বালিয়েছে।

জয়া ॥ আমি তাঁকে চিঠি দিয়েছি বাবা—এখানে চলে আসতে।

দীনদয়াল ॥ তা ভালোই করেছ—ভালোই করেছ।

[জয়া চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় বেলা বসুর প্রবেশ।
বেলা জয়াকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল]

বেলা ॥ (জয়ার প্রতি) আপনি যাবেন না। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

জয়া ॥ উনি বাড়ি যাবেন না।

বেলা ॥ এখানে থাকবেন! সারারাত কে ওঁকে সামলাবে?

জয়া ॥ আমি থাকব।

বেলা ॥ ভুজংগবাবুও বোধহয় থাকবেন?

জয়া ॥ সে জানেন ভুজংগবাবু।

[জয়ার প্রস্থান। বেলা একবার জয়ার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া দীনদয়ালের কাছে আসল। দীনদয়াল তখন তাজমহলের মডেলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।]

বেলা ॥ হ্যালো, ডাক্তার You have forgotten yourself! আপনি যে দীনদয়াল চৌধুরী—এ কথা কি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না?

দীনদয়াল ॥ সরে যাও—সরে যাও। দেখছ না—কত বড় একটা স্বপ্নের

প্রাসাদ আমি গড়ে তুলেছি? যাও—বিরক্ত কোরো না। (মতেলে মগ্ন হইলেন)

বেলা ॥ I pity you doctor. স্বপ্নের প্রাসাদ সত্যিই তুমি গড়েছিলে, কিন্তু তা ভেঙে গেছে। তাই যায়—সবারই যায়।

দীনদয়াল ॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ—ঠিক বলেছে! শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়েছে!

বেলা ॥ সত্যিই তাই। তাই ডাক্তার। আমার জীবনটাও তাই। কত আশা করেছিলাম, কত স্বপ্ন দেখেছিলাম,—আজ দেখছি, সব মিথ্যে! ভুজংগ—সত্যি সত্যিই ভুজংগ।

দীনদয়াল ॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ! সাপকে ভুজংগ বলছে! লেখাপড়া শিখেছে।

বেলা ॥ পাগল হয়ে তুমি বেঁচে গেছ ডাক্তার। নইলে ওই সাপের বিষের জ্বালায় তুমি আত্মহত্যা করতে। ও তোমার ঘর ভেঙেছে, আমার ঘর ভেঙেছে, এবার তোমার ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে। (দীনদয়াল চমকিয়া উঠিলেন)

দীনদয়াল ॥ তুমি কি বলছ? ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে কে? —ভুজংগ?

[দীনদয়ালের মুখে এই স্বাভাবিক কথা শুনিয়া বেলা খানিকটা বিস্মিত হইল। হঠাৎ আবেগে বলিয়া উঠিল]

বেলা ॥ ডাক্তার! ডাক্তার! তুমি কি আমার কথা শুনছ? আমার কথা বুঝছ?

[দীনদয়াল বুঝিলেন যে তাঁহার পাগলামির ভান ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি পুনরায় পাগলের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন]

দীনদয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! বলছে আমি ডাক্তার। বিষ খাবি—বিষ? সাপের বিষ? তোর ওই ভুজংগের বিষ? সাপের বিষ? আমার কাছে আছে—খাবি?

বেলা ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) না—না—না! Doctor, be quiet—চুপ করো ডাক্তার—নইলে ভুজংগবাবু এসে অনর্থ করবেন! (জয়ার প্রবেশ)

জয়া ॥ কী হয়েছে?

বেলা ॥ আপনার শ্বশুরকে ঘরে নিয়ে যান।

জয়া ॥ কেন?

বেলা ॥ আমার ডিউটি এখনি শেষ হচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি আমার কোয়ার্টারে।

জয়া ॥ বেশ তো, যাবেন। আমি আছি।

বেলা ॥ কিন্তু এখানে সাপ আছে।

জয়া ॥ (হাসিয়া) আপনি থাকলেন, আর আমি থাকতে পারব না ?

বেলা ॥ সাপের কামড় খেতে যদি এত শখ হয়—থাকুন।

[বেলার প্রস্থান]

জয়া ॥ আপনি কিছু খেয়ে নিন বাবা।

দীনদয়াল ॥ কী আর খাব। মনে হচ্ছে, বিষ খেয়েছি মা—সাপের বিষ। ভুজংগ যে এত খল, এত শঠ—এ আমি জানতাম না, জানতাম না। মেয়েটা বলে গেল, "ডাক্তার, ও তোমার ঘর ভেঙেছে, আমার ঘর ভেঙেছে, এবার তোমার ছেলের বউএর ঘরে হাত দিয়েছে।" অসহায়ের মতো আমাকে এসব দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে। (গভীর হতাশায়) যে-দুনিয়ায় এত ব্যাধি, এত বিষ —সে-দুনিয়ায় আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না, চাই না জয়া-মা।

জয়া ॥ না বাবা, এত সহজে আমরা আপনাকে হারাতে পারব না। ওদের প্রবঞ্চনা—ওদের ষড়যন্ত্র একদিন ধরা পড়বেই। (ভুজংগের প্রবেশ)

ভুজংগ ॥ কার ষড়যন্ত্র—কার প্রবঞ্চনা ধরা পড়বে, জয়া দেবী ? (হাসিয়া) কাচের বাড়িতে বাস করে আমার বাড়িতে ঢিল ছুঁড়বেন না, জয়া দেবী। দু'জনেই চুরমার হয়ে যাব।

দীনদয়াল ॥ কাচের বাড়িতে বাস ? তবে কি 'থুজা' ? থুজার রোগী মনে করে, তার দেহ যেন কাচ-দ্বারা নির্মিত—সে যেন স্বচ্ছ—মনে করে, আঘাত পেলেই সে ভেঙে পড়বে—ছড়িয়ে পড়বে—টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে। ভুজংগ, 'থুজা'র লক্ষণযুক্ত কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি ভুগছ। আর তা ভুগছ বলেই আজ তুমি এত শঠ—এত খল। দোহাই তোমার, এক ডোজ 'থুজা' সি-এম্ এখনি খেয়ে ফেল।

ভুজংগ ॥ পাগলামি সেরে গেছে দেখছি।

দীনদয়াল ॥ পাগল নই—পাগল নই ভুজংগ, আমি পাগল নই। দুনিয়াটাকে স্বরূপে দেখতে আমি পাগল সেজেছিলাম—পাগলের ভান করেছিলাম। দেখলাম, দুনিয়াটা ঠিকই চলছে—তুমি বাদে। তুমি যদি ভালো হও ভুজংগ—তোমার ব্যাধিটা যদি সেরে যায় ভুজংগ—আমার এ সংসার আবার সোনার সংসার হবে। আমি তোমাকে এক ডোজ 'থুজা' দিচ্ছি—তুমি সেরে যাবে, তুমি ভাল হবে।

[ঔষধের বাক্সের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উহা লইয়া ঔষধ খুঁজিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া আসিল]

ভুজংগ ॥ জয়া দেবী, এ-হাসপাতালে পাগলের জন্য কোন বেড নেই। ওঁকে আপনি বাড়ি নিয়ে যান।

জয়া ॥ উনি যাবেন না।

ভুজংগ ॥ যাবেন না বললে তো চলবে না। ওঁকে যেতে হবে। ওঁকে হাসপাতালে রেখে আর দশজন রোগীর অসুবিধা ঘটাতে পারি না। এই, কে আছিস ? দরোয়ানদের ডেকে দে।

দীনদয়াল ॥ বটে ! অতদূর স্পর্ধা। আমারই হাসপাতাল থেকে আমাকে তাড়াতে চায় ? দেখি কার সাধ্য ?

জয়া ॥ (দীনদয়ালের কাছে ছুটিয়া গিয়া) শয়তানের অসাধ্য কিছু নেই। আপনি চলুন বাবা।

দীনদয়াল ॥ না, আমি যাব না। এই ঘর ছেড়ে আমি যাব না। এই ঘরে বসে আমি হাসপাতাল চালাই। (ছুটিয়া তাজমহলটির কাছে গিয়া) এই তাজমহল দেখে আমি প্রেরণা পাই। কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে সরায় ?

ভুজংগ ॥ বটে ! (উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন) এই, কে আছিস ?

[যুধিষ্ঠির দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া আসিল]

যুধিষ্ঠির ॥ হুজুর !

ভুজংগ ॥ (তাজমহলটি দেখাইয়া) ওটা নিয়ে যা। হাসপাতালের আপিস ঘরে যত সব খেলনা ! পাগলামি আর কাকে বলে !

দীনদয়াল ॥ খবরদার !

ভুজংগ ॥ শুনুন, আপনার এইসব খেল্না-টেল্না নিয়ে মানে-মানে বাড়ি যাবেন কিনা বলুন ?

দীনদয়াল ॥ খেল্না ! তাজমহল হোল খেল্না ! অক্ষয় প্রেমের প্রতীক। আমার প্রেরণা—শক্তির উৎস আমার—

ভুজংগ ॥ (যুধিষ্ঠিরকে) কী শুনছিস্ পাগলের পাগলামি ? ভালো চাস তো নিয়ে যা ওটা।

যুধিষ্ঠির ॥ ভালো আমি চাই নে বাবু—আমাকে মাপ করুন।

ভুজংগ ॥ হুঁ ! ব্যাটা চোর !

যুধিষ্ঠির ॥ চোর হতে পারি কর্তা—কিন্তু পুকুর-চুরি করি না ! ডাকাত নই।

ভুজংগ ॥ Shut up—shut up !

যুধিষ্ঠির ॥ রাখুন আপনার ষাট-সত্তোর। ভাত মারবেন তো ? তা, সকলের ভাত যিনি দিচ্ছিলেন তাঁকেই যখন মারলেন—আমি কোন্ ছার।

ভুজংগ ॥ Get out—দূর হয়ে যা।

যুধিষ্ঠির ॥ সেই ভালো। চোখে আর এসব দেখতে পারি না।

দীনদয়াল ॥ (স্থানকালপাত্র ভুলিয়া গিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া

উঠিলেন) ট্যারেন্‌টুলা—ট্যারেন্‌টুলা—হিস্‌প্যানিয়া ! যুধিষ্ঠির সেরে উঠেছে—আর হামাগুড়ি দিচ্ছে না। বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে চলছে। Hahnemann can never fail! Hahnemann can never fail! (জয়ার প্রতি) মা, তুইও চলে যা, তুইও চলে যা মা, ওর সঙ্গে—কলকাতায়।

ভুজংগ ॥ উনি যাবার জন্যে আসেন নি—থাকবার জন্যই এসেছেন! কী বলেন জয়া দেবী ? (একজন গুর্খা অনুচরকে তাজমহলটি দেখাইয়া) এই, লে যাও—খাশ কামরামে।

দীনদয়াল ॥ খবরদার !

[দীনদয়াল গুর্খাকে রুদ্রমূর্তিতে রু'খলেন। অন্য অনুচর তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া দীনদয়ালকে সরাইয়া দিল। দীনদয়াল ভূপতিত হইয়া চেতনা হারাইলেন]

জয়া ॥ (আর্তনাদ করিয়া কাছে ছুটিয়া গেল) বাবা ! বাবা !

[এই ফাঁকে তাজমহল কক্ষান্তরে অপসারিত হইল]

(সাড়া না পাইয়া) বাবা ! বাবা ! (ভুজংগের প্রতি চাহিয়া) ভুজংগবাবু ! ভুজংগবাবু !

ভুজংগ ॥ নার্স ! নার্স ! ফার্স্ট এড্‌···বিশেষ কিছু হয়নি জয়া দেবী। মাথায় একটু চোট লেগে থাকবে। নার্স আসছে ! ফার্স্ট এড্‌ দিলেই জ্ঞান ফিরে আসবে। না—না, ভাববেন না। অত সহজে উনি যাবেন না। আমি যাচ্ছি—ওঁর খাস-কামরায় একটা বেড দিচ্ছি। (নার্স আসিলে তাহার প্রতি) একে attend কর।

[ভুজংগ চলিয়া গেল। নার্স দীনদয়ালের কাছে গিয়া তাঁহার পরিচর্যায় রত হইল। ক্ষণপরে দীনদয়ালের চৈতন্য সঞ্চার হইল। সকলে তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। দীনদয়াল চারি দিকে চাহিয়া কী খুঁজিতে লাগলেন। এবার তিনি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছেন]

দীনদয়াল ॥ আমার তাজমহল ! আমার তাজমহল ! তাজমহল তো দেখছি না ! (হঠাৎ জয়ার প্রতি নজর পড়িল) কে তুমি ? জাহানারা ? তুই কাঁদাছস্‌ মা ?···কাঁদো—কাঁদো—হতভাগিনী কাঁদো। কাঁদবারই কথা। পুত্র যখন পিতাকে বন্দী করে—জগৎসংসার কাঁদে—তুমি কাঁদবে না জাহানারা !

জয়া ॥ আমায় চিনতে পারছেন না বাবা ! আমি জয়া—আপনার জয়া-মা।

দীনদয়াল ॥ ভেবেছিস নাম বদলালে ঔরংজেবের হাত থেকে মুক্তি পাবি ? ভুল—ভুল জাহানারা। ঔরংজেবকে তবে তুই এখনও চিনিস নি। সর্পের মত কুটিল ব্যাঘ্রের মত হিংস্র—শৃগালের মত চতুর—ওই শয়তান ঔরংজেবের হাত থেকে কারও মুক্তি নেই। পালা—পালা—

নার্স। Behave doctor, behave—শান্ত হোন।

দীনদয়াল ॥ কে তুই বাঁদী ? (গুর্খা অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া) কে তুই বান্দা ? তোরা এখানে কেন ? জাহানারা, ওদের মতলব ? আমার তাজমহল চূর্ণ করেছে। এবার বুঝি এসেছে আমাকে হত্যা করতে ? বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে রেখেও বুঝি ঔরংজেবের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি ?

[এমন সময় জয়ন্ত প্রবেশ করিয়া পিতার কাছে ছুটিয়া গেল। পশ্চাতে আসিল ভুজংগ]

জয়ন্ত ॥ বাবা ! বাবা !

দীনদয়াল ॥ কে ? দারা ? তুই এসেছিস ? আয়—আয়, বৎস—আমার বুকের ভেতর আয়।

ভুজংগ ॥ দারা ! এরা আছে বেশ। হাঃ হাঃ হাঃ।

দীনদয়াল ॥ (ভুজংগের শয়তানী হাসিতে চমকিত হইয়া) না—না, আমাকে হত্যা না করে দারাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। হই না কেন বন্দী—তবুও আমি ভারতসম্রাট সাজাহান।

ভুজংগ ॥ ভারতসম্রাট সাজাহান ! (পৈশাচিক হাস্য) হাঃ···হাঃ···হাঃ···

দীনদয়াল ॥ বটে ! এই, কে আছিস ? আমার চাবুক—

ভুজংগ ॥ (কপট অভিনয়, যেন ভয় পাইয়া হঠাৎ নতজানু হইল) ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন, সম্রাট ! আপনার সাম্রাজ্য অক্ষয়, অমর হোক। খোদা, ভারতসম্রাট সাজাহানকে দীর্ঘজীবী করো।

দীনদয়াল ॥ (সানন্দে) এই তো আমার পুত্র ! বৎস, তোমাকে আমি আমার সমগ্র সাম্রাজ্য দান করলাম। তুমি শুধু আমায় ফিরিয়ে দাও—দান করো—আমার চোখের আলো—বুকের ধন—তাজমহল—আমার তাজমহল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দীনদয়ালের পূর্বতন শয়নকক্ষ। জয়া ও জয়ন্ত]

জয়ন্ত ॥ তারপর ?

জয়া ॥ ভুজংগবাবুর হুকুমে তাজমহলটাকে গুর্খা চাকরটা যেই সরাতে গেছে, বাবা ছুটে গেলেন তাকে বাধা দিতে। অন্য গুর্খাটা তখন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাথায় খুব চোট পেয়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখেন তাজমহলটা নেই। চারদিকে তাকিয়ে তাজমহল খুঁজতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা হয়ে গেল—তিনিই সম্রাট সাজাহান। ভুজংগ হচ্ছে ঔরংজীব—তার হস্তে বন্দী তিনি ! আমি জাহানারা, আর আপনি দারা। উন্মাদ তিনি ছিলেন না—কিন্তু এর পর থেকেই তিনি উন্মাদ হয়েছেন।

জয়ন্ত ॥ সে তাজমহলটা ফিরে পেলে হয়তো—কোথায় সেটা ?

জয়া ॥ ভুজংগবাবুও ওর মূল্য বুঝেছেন। সরিয়ে ফেলেছেন। সারা হাসপাতাল আমি খুঁজেছি—পাইনি।

জয়ন্ত ॥ ভুজংগ তা হলে তা শুধু সরায় নি—চুরমার করেছে—হয়তো-বা পুকুরে ফেলে দিয়েছে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল!

জয়া ॥ হতাশ হলে চলবে না জয়ন্তবাবু। বাবা পাগল হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রকৃত ঘটনা জজসাহেবকে জানাতে হবে। তাঁকে বোঝাতে হবে কত-বড় একটা ষড়যন্ত্রে এত-বড় একটা মহৎ-প্রাণ কেন আজ অকারণ নষ্ট হতে চলেছে।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু জজসাহেব তো আর পাগল ভালো করতে পারবেন না। বরং আমি কলকাতায় যাচ্ছি—এখন সবচেয়ে বড় দরকার ওঁর চিকিৎসা, কিন্তু ভয় কী জানেন জয়াদেবী? চিকিৎসার সময়ও হয়তো পাব না।

জয়া ॥ কেন? কেন, বলুন তো?

জয়ন্ত ॥ যে কোন মুহূর্তে হয়তো শুনবেন—"পাগলটা হাসপাতালে ছিল—ভুল করে বিষ খেয়ে মারা গেছে।" বাবাকে হাসপাতালে রাখার মতলবটাই তাই।

জয়া ॥ আপনি ভাববেন না। সে আমি দেখব।

জয়ন্ত ॥ এক সময় মনে হয়েছিল, আমার জীবনে যে আপনি এলেন—সে ছিল শুধু আমার একটা খেয়াল। এখন দেখছি তা নয়। আমার জীবনে—বাবার জীবনে তোমার আবির্ভাব বিধাতার বিধান। (জয়ন্ত চলিয়া গেল)

জয়া ॥ কিন্তু জানিনা—জানিনা, জয়ন্তবাবু, এর শেষ কোথায়?

[দরজার বাহির হইতে যুধিষ্ঠিরের গলা শোনা গেল—"বউদিদিমণি"।]

জয়া ॥ কে?

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির ॥ আমি যুধিষ্ঠির—আসব?

জয়া ॥ এসো।

[একটি বোঁচকা লইয়া লাঠি হাতে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ। লাঠি ও বোঁচকা নামাইয়া রাখিয়া সে গড় হইয়া জয়াকে প্রণাম করিল]

যুধিষ্ঠির ॥ কর্তাদাদা চলে গেলেন বউদিদিমণি?

জয়া ॥ হ্যাঁ, কলকাতায় গেলেন। কিন্তু তুমিও চললে দেখছি।

যুধিষ্ঠির ॥ হ্যাঁ দিদিমণি। ওই কলকাতায়—অধমতারণ কলকাতায়।

জয়া ॥ কেন, যুধিষ্ঠির? তুমি আমার কাছে থাক।

যুধিষ্ঠির ॥ আর কোন্ মুখে এখানে থাকব দিদিমণি? চুরি করা আমার একটা বদরোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরি করতাম—ধরা পড়তাম—তবু কর্তাবাবার দয়ায় মারধর হত না। অসুখটা বেড়েছে বলে আদর যেন আরো বেড়ে যেত।

এখন? এখন চুরি করব কি মারের চোটে পিলে ফাটবে। যুধিষ্ঠিরকে আর কে দেখবে, দিদিমণি?

জয়া ॥ তা ঠিক। যে তোমাকে দেখত—সবাইকে দেখত—সেই হয়ে গেল পাগল। (হঠাৎ যুধিষ্ঠিরকে) তুমি তাঁকে ভালো না করে—তাঁর ভালো হওয়া না দেখে—তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে, যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির ॥ তাও তো বটে! কিন্তু কোন্ সাহসে থাকি দিদিমণি? যে বদরোগটিতে ভুগছি—ধরা পড়লে—ক্ষেমাঘেন্না কেউ তো করবে না, দিদিমণি। ধরবে আর পিলে ফাটাবে।

জয়া ॥ বেশ—চলেই যেও তুমি যুধিষ্ঠির; কিন্তু যাবার আগে—শেষ একটা চুরি করবে?

যুধিষ্ঠির ॥ সে কী, দিদিমণি? তুমি আমাকে চুরি করতে বলছ?

জয়া ॥ হ্যাঁ যুধিষ্ঠির, বলছি। চুরি নয়—চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যুধিষ্ঠির ॥ ওটা হল গিয়ে ভারি মজার কাজ। বলুন, দিদিমণি। মরা দেহে যেন আবার প্রাণ এল। বলুন—বলুন—

জয়া ॥ তোমার কর্তাবাবার বড় সাধের ধন ছিল ওই তাজমহলটা।

যুধিষ্ঠির ॥ তা আর জানি না। সেদিন কত কাণ্ড হল ওটা নিয়ে। ওটা সরালাম না বলেই তো আমার জবাব হল।

জয়া ॥ কর্তাবাবার ওই সাধের জিনষটা ভুজংগবাবু লুকিয়ে রেখেছেন—চুরি করেছেন। অথচ ওটা হারিয়েই তোমার কর্তাবাবা আজ পাগল। গোটা হাসপাতাল আমি খুঁজে দেখেছি—নেই। ভুজংগবাবু হয়তো বাড়িতে সরিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির ॥ না—না, সেটা তাঁর বাড়িতেও নেই।

জয়া ॥ কোথায়—কোথায়, সেটা?

যুধিষ্ঠির ॥ আমার এই বোঁচকায়, আবার কোথায়?

[যুধিষ্ঠির বোঁচকা খুলিল। দেখা গেল, অন্যান্য অপহৃত দ্রব্যের মধ্যে তাজমহলটি রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাজমহলটি জয়ার হাতে দিল। জয়া তাহা আবেগে বুকে চাপিয়া ধরিল]

জয়া ॥ যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!!

যুধিষ্ঠির ॥ এইজন্যেই তো যাবার আগে আমার এখানে আসা। যার জন্যে আমার চাকরি গেল—আমার কর্তাবাবা পাগল হল—ভুজংগবাবুর সাধ্য কী তা গাপ করেন! উনি সরালেন বাড়িতে—আমি সরালাম বোঁচকায়। নাও—আমার কাজ ফুরোল। কর্তাবাবু ভাল হলে আমার নাম করে ওটা তাঁকে দিও। বোলো—দয়া করে এই অধমকে যেন মনে রাখেন। আসি, দিদিমণি—আমার আবার ট্রেনের সময় হল।

জয়া ॥ দাঁড়াও।

[জয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে এক খানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া যুধিষ্ঠিরের হাতে দিল]

যুধিষ্ঠির ॥ তা দিচ্ছ, দিদিমণি—নিচ্ছি। কিন্তু এমন নেওয়ায় সুখ পাই না, দিদিমণি—এমনি আমার বদরোগ। তা পিলেটা যদি না ফাটে—আবার আসব।

[বোঁচকা বাঁধিয়া লইয়া জয়াকে প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান। জয়া তাজমহলটি একটা সুটকেসের ভিতর রাখিল। ভৃত্য সনাতন আসিল]

সনাতন ॥ বউদিদিমণি, আপনার সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চায়। বড্ড কান্নাকাটি করছে।

জয়া ॥ কে, সনাতন ?

সনাতন ॥ এই হাসপাতালের একজন রোগী।

জয়া ॥ রোগী ? এখানে কেন ?

সনাতন ॥ আপনার কাছে চুপি চুপি কিছু বলতে চায়।

জয়া ॥ ডাকো। (সনাতন বাহিরে গিয়া অপেক্ষমান রোগী হলধরকে লইয়া আসিল)

হলধর ॥ প্রণাম হই মা। আমি হলধর—এই হাসপাতালের রোগী। ম্যালেরিয়ায় ভুগছি।

জয়া ॥ কী বলবে—বল—

হলধর ॥ যা বলব, তা আমার একার কথা নয়। হাসপাতালের সকল রোগীর পক্ষ থেকেই আমি বলছি মা। দয়াল-ডাক্তারের হাতে দড়ি দিয়ে ভুজংগ ডাক্তার আমাদের মেরে ফেলছে—এ কি আপনি দেখেও দেখছেন না ? ওষুধের টাকা—পথ্যের টাকা—সব নিজে খেয়ে, আমাদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই মা ?

জয়া ॥ এ অঞ্চলের লোকেরা সবাই তো সবই দেখছে ; কিন্তু কেউ তো এগিয়ে আসছে না, হলধর। কেউ যখন কিছু করছে না আমি কী করতে পারি ?

হলধর ॥ তোমাকে কিছু করতে হবে না মা। তুমি শুধু আমাদের বল—দয়াল-ডাক্তার সত্যি পাগল—না, তাঁকে জোর করে পাগল করা হয়েছে।

জয়া ॥ তোমরা রোগী—তোমরা অসুস্থ। এর ভেতরে তোমরা এসো না হলধর।

হলধর ॥ ও! ভাবছ, মা—আমরা রোগী—আমরা অসুস্থ—আমাদের গায়ে শক্তি নেই—কেউ হয়তো উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যাই—কারো হয়তো উঠবার শক্তি নেই। কারো হয়তো এখন-তখন! কিন্তু, মা, জেনো—'মরণকামড়'বলে একটা কথা আছে—'মরণকামড়'। ওকে আমরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। (উত্তেজনায় হলধর কাঁপিতে লাগিল)

জয়া ॥ ছিঃ, হলধর, তুমি থামো। দুষ্কৃতের শাস্তি দেন ভগবান—তোমার-আমার শক্তি কতটুকু! তাঁকে ডাক, হলধর—তাঁকে ডাক। এমনি মরিয়া হয়ে তাঁকে ডাকলে—দয়া তাঁর হবেই। সনাতন, ওকে রেখে এস।

[সনাতন তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই সনাতন ফিরিয়া আসিল]

জয়া ॥ কি সনাতন ?

সনাতন ॥ ছোটকর্তা।

জয়া ॥ কোথায় ?

সনাতন ॥ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

জয়া ॥ একটু অপেক্ষা করতে বল—আমি শাড়িটা বদলে নিই।

[সনাতন চলিয়া গেল। জয়া ক্ষিপ্রতার সহিত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর সুটকেসটি রাখিয়া আলমারি বন্ধ করিল এবং নিজেই পর্দা সরাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল]

জয়া ॥ আসুন, ভুজংগবাবু। (ভুজংগের প্রবেশ) নমস্কার।

ভুজংগ ॥ নমস্কার।

জয়া ॥ বসুন। (দুজনে দুইটি আসনে বসিল)

ভুজংগ ॥ হলধরকে দেখলাম। কী দুঃসাহস দেখুন—শেষকালে আপনাকে পর্যন্ত জালাতন করতে এসেছে!

জয়া ॥ আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি কোন প্রশ্রয় দেই নি! স্পষ্ট বলে দিয়েছি—আমি হাসপাতালের কেউ নই।

ভুজংগ ॥ মিথ্যা কথা।

জয়া ॥ মিথ্যা কথা ?

ভুজংগ ॥ মিথ্যা নয়তো কী। আজ হাসপাতালের সকলে আপনার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

জয়া ॥ কেন, বলুন দেখি ?

ভুজংগ ॥ দয়াল-ডাক্তারের আর কিছু না থাক—উৎসাহ ছিল, উদ্দীপনা ছিল। সে উৎসাহের, সে উদ্দীপনার উৎস ছিল প্রেম—সহধর্মিণী মমতার প্রেম। মমতার মৃত্যুতে তাই গড়ে উঠল এই মমতাময়ী হাসপাতাল—প্রেমের তাজমহল। আজ আমার ওপর হাসপাতালের ভার পড়েছে—কিন্তু কোথায় আমার উৎসাহ—কোথায় আমার উদ্দীপনা—কোথায় আমার প্রেরণার উৎস!…যদি তুমি দয়া না কর, জয়া।

[আকস্মিক এই 'আক্রমণে' লজ্জায়, ঘৃণায় জয়া রক্তিম হইয়া উঠিল। কী বলিবে—কী করিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া ভুজংগ পুনরায় বলিতে লাগিল—]

তুমি যদি কারো বিবাহিতা বধূ হতে—এ আশা, এ সাহস আমার হত না।

এসব কথা বলাও হত পাপ। আজ তোমার ওপর জয়ন্তের যে দাবি—আমার হৃদয়ের দাবি তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। (আবেগে) জয়া—জয়া—

জয়া ॥ আপনি থামুন। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি—এ কথা এক শুধু আপনিই জানেন। এখানে আর কেউ তা জানে না। আপনার এ কথা শুনলে—তারা কী ভাববে ?

ভুজংগ ॥ যে শুনলে ভাবনার কথা ছিল—সে আজ জগতের সব কথার বাইরে জয়া। আর কে কী ভাববে—তার জন্যে আমি ভাবিনা। তুমিও ভেবো না জয়া।

জয়া। কিন্তু এও তো হতে পারে, দীনদয়াল চৌধুরী আবার ভাল হতে পারেন।

ভুজংগ ॥ শুধু এই তোমার ভয়, জয়া ?

জয়া ॥ কী অগাধ স্নেহই-না তাঁর কাছে আমি পেয়েছিলাম! ভাল হয়ে যদি তিনি শোনেন—তিনি দেখেন যে, আমি—

ভুজংগ ॥ আমি বলছি—ভাল হবার তাঁর কোন আশা নেই জয়া।

জয়া ॥ উন্মাদরোগের তবে কোন চিকিৎসা নেই বলুন !

ভুজংগ ॥ কেন থাকবে না ? চিকিৎসা আছে। কিন্তু যা দিয়ে চিকিৎসা হবে—দয়াল-ডাক্তারের তা নেই।

জয়া ॥ আপনি বোধহয় ওই তাজমহলটার কথা বলছেন ?

ভুজংগ ॥ রূপেই তোমার মুগ্ধ ছিলাম—এখন মুগ্ধ হলাম তোমার বুদ্ধিতে।

জয়া ॥ না—না, শুনুন- তাজমহলটা তো আছে।

ভুজংগ ॥ আছে ! কোথায় আছে ?

জয়া ॥ কেন, হাসপাতালে ?

ভুজংগ ॥ নেই—নেই।

জয়া ॥ নেই ? কেন সেদিন যে ওই গুর্খাটা—

ভুজংগ ॥ গুর্খাটা—হ্যাঁ গুর্খাটা—তবে শোন জয়া। গুর্খাটা ভেবেছিল—তাজমহলটাকেই আমি সইতে পারছি না। তাই আমি সরাতে বলছি। মনিবকে খুশি করবার জন্য গুর্খাটা তাজমহলটাকে শুধু ঘর থেকে সরায় নি—পৃথিবী থেকেই সরিয়েছে—চুরমার করে ফেলেছে।

জয়া ॥ (কপট আর্তনাদে) অাঁ !

ভুজংগ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওই তাজমহলটা সরিয়েছিলাম বলে দয়াল-ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়েছে। ফিরে পেলে আবার হয়তো ভাল হত। সে আশা আর যখন নেই—আমি কেন তোমাকে আশা করব না জয়া! বল—বল ?…না না, চুপ করে থেকো না জয়া। ডাক্তার বোসের রিপোর্ট পেয়ে এক মেডিকেল কমিশন আসছেন। তাতে থাকবেন ডাক্তার বোস—আরো দুজন

বড় ডাক্তার। সেই মেডিকেল-কমিশন আজই এখানে এসে দয়াল-ডাক্তারকে পরীক্ষা করবেন।

জয়া ॥ আজই?

ভুজংগ ॥ হ্যাঁ, আজই। ভাগ্যের এই জুয়াখেলায় দয়াল-ডাক্তরের পরিণাম কী আমি জানি। কিন্তু আমার পরিণাম তোমার হাতে।…আমি উত্তর চাই জয়া।

জয়া ॥ উতলা হবেন না ভুজংগবাবু। একটা তাজমহল গেছে। আর একটা তাজমহল আমরা গড়ব। চিন্তা কী?

ভুজংগ ॥ সত্যি সত্যি এ আশা তবে আমি করতে পারি?

জয়া ॥ ধৈর্য ধরুন ভুজংগবাবু। মেডিকেল-কমিশন আসছে বিকেলে। কয়েক ঘণ্টা বাদে। তাজমহল গড়তে সময় লাগে। এই কয়েক ঘণ্টা অন্তত অপেক্ষা করুন।

ভুজংগ ॥ হুঁ! জীবনে অনেক মেয়ে নিয়ে খেলেছি; কিন্তু তোমার মত সুচতুরা-সুদর্শনা মেয়ে আমার জীবনে এসেছে দেখছি এই প্রথম। শোন জয়া, তাজমহলটা চুরমার হয়নি, চুরি গেছে। কেন চুরি হয়েছে, কে চুরি করেছে, এখন বুঝছি—তোমার ওই হেঁয়ালিভরা কথায়। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। ভাগ্যের এই জুয়াখেলায় যদি আমি হারি—তাজমহল ফিরে পেয়ে সম্রাট সাজাহান যদি আবার দীনদয়াল হন—তোমার প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার কথা তাঁকে জানিয়েই বিদায় নেব। দীনদয়াল যত দয়ালই হোন—তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন না। বিদেয় হতে হবে তোমাকেও - সংগে সংগে। একবার ভেবে দেখ জয়া. দীনদয়াল যদি সম্রাট সাজাহান-রূপে বন্দী থাকেন, তাতে বোধহয় মঙ্গল—শুধু আমার নয়, তোমারও। আচ্ছা আসি।

তৃতীয় দৃশ্য

[হাসপাতালের আপিস ঘরে মেডিকেল কমিশন বসিয়াছে। মেডিকেল কমিশনে আছেন—ডাঃ বোস, ডাঃ গাঙ্গুলী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ চক্রবর্তী। কমিশনের সামনে পরীক্ষার জন্য দীনদয়ালকে আনা হইয়াছে। তাঁহার হাতের হাতকড়া খোলা। জয়ন্ত, জয়া ও ভুজংগ উৎসুকভাবে কমিশনের অভিমত জানিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহা ছাড়া রহিয়াছেন—হাসপাতালের ট্রাষ্টিগণ, কয়েকজন নার্স এবং হলধর প্রভৃতি কতিপয় রোগী। জয়া যেখানে বসিয়াছে তাহার পাশে একটি সুটকেশ রহিয়াছে। দীনদয়াল সাজাহানরূপে ভাবস্থ রহিয়াছেন। সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন]

দীনদয়াল ॥ মুঘল-দরবারে সম্মানিত উজীর আমির সভাসদগণ! বিদ্রোহী পুত্র ঔরংজীবের হস্তে—আমি ভারতসম্রাট সাজাহান—আজ বন্দী। দুনিয়ায় এত বড় অনাচার—এত বড় অবিচার তোমরা স্বচক্ষে দেখেও

নীরবে সহ্য করছো? একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে না? এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও উত্তেজিত হচ্ছে না। খোদা—দীন-দুনিয়ার মালেক—তুমিও চুপ করে বসে আছ? কোথায় তোমার বজ্র, কোথায় তোমার ভূমিকম্প—কোথায় তোমার জলপ্লাবন? ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—এই অভিশপ্ত পৃথিবীকে তুমি ধ্বংস কর।

জয়া॥ বাবা! বাবা!

জয়ন্ত॥ আপনি শান্ত হোন বাবা!

দীনদয়াল॥ কে? জাহানারা! শান্ত হ'তে বলছিস্! জীবনে এখনো তোদের লোভ! মিথ্যা আশা দারা—বৃথা আশা জাহানারা! (ভুজংগকে দেখাইয়া) ঐ ঔরংজীব—ও যে কত ভীষণ, কী নির্মম—কী নৃশংস—কত বড় শয়তান—তা আজও বুঝতে পারিস নি দারা, বুঝতে পারিস নি জাহানারা। নইলে পুত্র দারা হয়ে স্নেহান্ধ পিতাকে বন্দী করে? ভ্রাতৃ-রক্তের পিপাসায় উন্মাদ হয়? মাতার স্মৃতি - অক্ষয় প্রেমের পুণ্যপ্রতীক পবিত্র তাজমহল উৎসাদন করে? আজ কোথায় আমার তাজমহল? (বাতায়ণের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে) যমুনার পরপারে কোথায় আমার তাজমহল? নাই—নাই—যতদূর দৃষ্টি চলে—কই? কোথায়? দেখি—(নিরীক্ষণ)

ডাঃ বোস॥ (চেয়ারম্যানকে) হি হ্যাজ কম্প্লিটলি গন অফ্ হিজ হেড্—মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

ডাঃ গাঙ্গুলী॥ যে পরিবেশে উনি থাকতেন, সেই পরিবেশটি পুরোপুরি সৃষ্টি করতে পারলে—একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যেত।

ডাঃ চক্রবর্তী॥ সেই পরিবেশেই তো উনি রয়েছেন ডাঃ গাঙ্গুলী।

ডাঃ গাঙ্গুলী॥ হ্যাঁ, সবই রয়েছে—কিন্তু তাজমহলের সেই মডেলটা—সেটা কি কোন মতেই খুঁজে পাওয়া যায় না?

ভুজংগ॥ বলেছি তো স্যার—সেই গুর্খাটা সেটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলেছে।

জয়া॥ কিন্তু—

ভুজংগ॥ হ্যাঁ জয়াদেবী—আমি কমিশনকে সব বলেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী॥ হ্যাঁ—আপনি বলেছেন। (জয়াকে) তবে আপনি যদি কিছু বলতে চান বলুন।

[জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে দীনদয়াল বাতায়ন হইতে পুনরায় প্রলাপ বকিতে বকিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

দীনদয়াল॥ নেই—নেই—তাজমহল নেই। যমুনার পরপারে যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু পড়ে রয়েছে ধূসর বালুকারাশি। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

কোথায় আমার তাজমহল ? ওরে শয়তানের দল—ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—আমার তাজমহল আমায় ফিরিয়ে দে—আমার তাজমহল আমায় ফিরিয়ে দে।

জয়া। (অভিনয়ের সুরে, বাবা—বাবা। কার সাধ্য তোমার তাজমহল ধ্বংস করে? (ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুটকেশ হইতে তাজমহল বাহির করিয়া দীনদয়ালের সামনে ধরিল) এই নাও তোমার তাজমহল—তোমার অমর প্রেমের অক্ষয় কীর্তি তাজমহল।

[দীনদয়াল স্তব্ধ হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাজমহলটি দেখিতে লাগিলেন।
সকলে স্তব্ধ হইয়া এই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিল]

দীনদয়াল ॥ তাই তো! সেই তাজমহল! কিন্তু তোমার হাতে কেন? (ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। হঠাৎ মাথায় হাত দিয়া) আমি পড়ে গিয়েছিলাম?

জয়া ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা—একটা গুর্খা আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

দীনদয়াল ॥ মনে পড়েছে। ভুজংগ ওটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিল। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। গুর্খাটা আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কিন্তু তারপর? (চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এরা কে? এখানে কেন? এ যে দেখছি ডাঃ বোস! ও—(কি যেন মনে পড়িল) হ্যাঁ—আপনিও এসেছিলেন। কিন্তু ডাঃ চক্রবর্তী? আপনি কবে ফিরেছেন? ভাল আছেন?

ডাঃ চক্রবর্তী ॥ হ্যাঁ ডাক্তার চৌধুরী। বিলেত থেকে গত সেপ্টেম্বরে ফিরেছি। আপনার অসুখের খবর পেয়ে আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।

দীনদয়াল ॥ হ্যাঁ—পড়ে গিয়েছিলাম—মাথায় বড্ড চোট লেগেছিল। হ্যাঁ মনে পড়েচে—আমার এখন সব মনে পড়েছে। কিন্তু আপনারা আমার হাসপাতালে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—এ আমার কি সৌভাগ্য! জয়া মা—জয়ন্ত—ওঁদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করো। (জয়া ও জয়ন্ত সানন্দে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

ডাঃ চক্রবর্তী ॥ না—না—থাক।

দীনদয়াল। না-না, ডাঃ চক্রবর্তী—আপনারা যখন দয়া করে এসেছেন—আমার হাসপাতাল না দেখে কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমাকে আর দেখতে হবে না, আমি সেরে গেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী ॥ সত্যিই আপনি সেরে গেছেন। স্পষ্ট বুঝছি—একটা ষড়যন্ত্রের ফলেই আপনার এত দুর্গতি হয়েছে। যাক সে-কথা—সে আমরা রিপোর্টে লিখবো। সত্যি বড় আনন্দ হচ্ছে। চলুন—আপনার হাসপাতাল দেখবো। *(সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

দীনদয়াল ॥ কি আনন্দ! কি আনন্দ! ভুজংগ, ভুজংগ—ভুজংগ কোথায়? ওই দেখো—হতভাগাটা কাজের সময় কোথায় সরে পড়েছে। আপনাকে বলিনি, ডাঃ বোস! সত্যিই ওর মাথার দোষ হয়েছে। আসুন—আপনারা—আমার সঙ্গে।

ডাঃ চক্রবর্তী ॥ All's well that ends well. চলুন।

[এমন সময় নার্স আসিয়া দাঁড়াইল]

দীনদয়াল ॥ এই যে নার্স—ভুজংগ কোথায়?

নার্স ॥ তিনি সাইকেলে উঠে চলে গেলেন। আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বলেছেন। (নার্স একটি খাম সামনে ধরিল)

দীনদয়াল ॥ মাথা খারাপ! নইলে কেউ এমন সময় চলে যায়? (তিনি না পড়িয়া খামখানা পকেটে রাখিলেন) আসুন ডাঃ চক্রবর্তী আসুন আপনারা।

[দীনদয়ালের সহিত সকলে চলিয়া গেলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

[দীনদয়ালের পূর্বতন শয়নকক্ষ। জয়া ও জয়ন্ত]

জয়া ॥ না জয়ন্তবাবু—তা হয় না। আপনি আজই এই ট্রেনেই কলকাতা চলে যান। ধরুন—আমার সংগেই ঝগড়া করে কলকাতা চলে গেলেন। গিয়ে আজই পাঠিয়ে দিন বিমানবাবুকে। আজ রাতেই আমি তাঁর সঙ্গে চলে যেতে চাই কলকাতায়—যাতে আপনি কাল সকালেই বাবাকে টেলিগ্রামে জানাতে পারেন—আমি কলেরায় মারা গেছি।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু শুনুন জয়া দেবী—এর কি আর কোন প্রয়োজন আছে?

জয়া ॥ আছে—আছে। এ-মিথ্যা আর চলতে পারেনা, জয়ন্তবাবু।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু ভেবে দেখুন—এ মিথ্যার আর কোন সাক্ষী নেই। কাজেই এ মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিতে আর তো কোন বাধা নেই।

জয়া ॥ লোকে তাই ভাবে বটে। কিন্তু মিথ্যার সাক্ষী থাকে পদে পদে। সে সাক্ষী এখানেও আছে—ঐ ভুজংগবাবু।

জয়ন্ত ॥ সেদিন রাত্রে ঐ আলমারির আড়ালে লুকিয়ে ভুজংগ সব শুনেছে—আপনি বলেছেন জয়া দেবী। কিন্তু সে ভুজংগও আজ নেই—হাসপাতালের কয়েক হাজার টাকা চুরি ক'রে মেডিকেল-কমিশন চলে যাবার আগেই সে পালিয়েছে। এখানে আর সে জীবনেও আসবে না, জয়া দেবী।

জয়া ॥ কিন্তু ভুজংগই আমাদের মিথ্যার একমাত্র সাক্ষী নয়, জয়ন্তবাবু। সাক্ষী আমার অন্তরাত্মা। (মমতাময়ীর তৈল-চিত্র দেখাইয়া) সাক্ষী আপনার

সতী সাধ্বী মায়ের অমর আত্মা। না—না—জয়ন্তবাবু। এ ঘরে—এই বাড়িতে বাপ মায়ের পুণ্য মন্দিরে—এই মিথ্যার বোঝা আমি বইতে পারবো না—এ পাপ আমি সইতে পারবো না।

জয়ন্ত ॥ বেশ। তবে আর কলকাতা যাব না। এক মিথ্যা ঢাকতে নতুন মিথ্যার জালে আর আমরা জড়িয়ে পড়বো না। আসুন—আমরা বাবাকে সব খুলে বলি।

জয়া ॥ (ভীতভাবে) না—না—তাও পারবো না। আমরা তাঁকে প্রতারণা করেছি—এ আঘাত তিনি সইতে পারবেন না। আপনিই একদিন বলেছিলেন—তিনি সব সইতে পারেন—সইতে পারেন না শুধু প্রবঞ্চনা—সইতে পারেন না শুধু প্রতারণা।

জয়ন্ত ॥ তবে তোমাকে আমি কলেরায়ও মারতে পারবো না জয়া। তোমাকে আমি চাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে বোধ হয় তোমাকেই আমি চেয়েছি। তাই বিধাতা সেদিন অমন করে ঘটিয়েছিলেন—এই অদ্ভুত যোগাযোগ। কলেরায় একবার তোমাকে মেরে ফেলে, আবার তোমাকে বাঁচাবো কি করে বাবার কাছে? অনেক বুদ্ধিই অনেকবার খাটিয়েছি কিন্তু এ আমার বুদ্ধির বাইরে। কলেরায় মরতে চাইছো—সে কি আমার জীবনে আর তুমি আসবে না বলে জয়া?—বল—বল—

জয়া ॥ (নীরব রহিল)

জয়ন্ত ॥ চুপ ক'রে রইলে যে? ও! তবে এতদিন যা তুমি করেছো—সবই তোমার অভিনয়! শুধু অভিনয়! অভিনয় শেষ হয়েছে—থিয়েটার ভেঙে গেছে—অভিনেত্রী বাড়ি যাবে—সাজপোশাক খুলে ফেলছে—মুখের রঙ তুলে ফেলছে। সে রঙ তুলে ফেলা—এ তো সোজা। মনে তো তার রঙ লাগেনি।

[জয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। দীনদয়ালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জয়ন্ত! জয়ন্ত! কোথায় যে সব গেল। বউমাই-বা কোথায়!" এই বলিতে বলিতে দীনদয়ালের প্রবেশ]

দীনদয়াল ॥ ও! তা থাকো—থাকো। আমিই যাচ্ছি।

জয়া ॥ না বাবা! আপনি একটু দাঁড়ান।

দীনদয়াল ॥ কেন, কি হয়েছে? কেমন একটা থমথমে ভাব দেখছি. বউমার মুখখানা বড্ড বেশি গম্ভীর মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত ॥ উনি আজই কলকাতায় চলে যেতে চাচ্ছেন।

দীনদয়াল ॥ কলকাতা দেখছি গোঁসাঘর হয়ে দাঁড়াল! ঝগড়া-ঝাঁটি হলেই কলকাতা! শুনলুম যুধিষ্ঠির কার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কলকাতা ছুটেছে। আমার উপর রাগ করে ভুজংগ কলকাতা ছুটলো। ওহো—ভুজংগ কি একটা চিঠি দিয়ে গেছে—এই দেখ পকেটেই রয়ে গেছে—দেখা আর হয়নি।

[খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠিটা পড়িতে লাগিলেন]

দীনদয়াল ॥ "শেষ পর্যন্ত আমাকে হার মানিতে হইল। আমি চিরদিনের মত চলিলাম। আপনি পুত্র-পুত্রবধূসহ সুখে শান্তিতে আপনার তাজমহলেই বাস করুন। তহবিলে কয়েক হাজার টাকা কম দেখিয়া উতলা হইবেন না। দয়া করিয়া পুলিশ হাঙ্গামাও করিবেন না। আমাকে ধরিতে গেলে আপনার পারিবারিক কলঙ্ক আমি গোপন রাখিতে পারিব না।

[দীনদয়াল থামিয়া গেলেন। জয়া ও জয়ন্তকে চাহিয়া দেখিয়া বাকি অংশ রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ করিলেন]

দীনদয়াল ॥ (জয়ন্তকে) বিয়ে করোনি ?

জয়ন্ত ॥ না বাবা…(জয়ন্ত মুখ নত করিল)

দীনদয়াল ॥ গাধা ! একটা অনাথা মেয়েকে বউ সাজিয়ে এনে তার সঙ্গে খেলা করছো ? তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো ? এত দূর অধঃপাতে গেছ তুমি ? আজই এই ট্রেনে চলো কলকাতায়। এর পরেই যে লগ্ন আছে—সেই লগ্নেই হবে তোমাদের বিয়ে। না দাঁড়াও—(জয়াকে) এমন একটা হতভাগার সঙ্গে বিয়েতে তোমার মত আছে তো মা ?

[জয়া দীনদয়ালকে আসিয়া প্রণাম করিল। জয়ন্তর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

আছে—তবে আছে। যাক হতভাগার একটা গতি হল। বিয়ে হোক। কিন্তু দুজনের এই লক্ষণগুলো ভালো নয়-গোপন করার প্রবৃত্তি—পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ—অকারণ ক্রন্দন—'ইগোনেশিয়া'—দুজনেই খাবে—বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে। কিন্তু আর দেরী নয় - তোমাদের বিয়ে হয়নি—এ আর আমি সইতে পারছি না। আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বিয়ে করে পাগল হয়েছি—এরা বিয়ে না ক'রে পাগলামি করেছে। না—না বিয়ে যদি আজ দিতে পারি তবে কাল নয়। এখনি ট্রেন ধরতে হবে। (বিষম তাড়ায়) চলো—চলো…

[জয়া ও জয়ন্ত নত মুখে ছুটিল। পশ্চাতে ছুটিলেন দীনদয়াল]

—যবনিকা—

মহুয়া

পঞ্চাঙ্ক নাটক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী ১৬ই পৌষ, ১৩৩৬

উৎসর্গ পত্র

আমাদের পিতা-পুত্রের জীবনে যিনি পুরাতনের প্রতি প্রীতি সঞ্চার
করিয়াছেন, বাঙলার পুরাতত্ত্ব-রস-রসিক প্রত্নতত্ত্ব আচার্য্য
পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি-আই-ই

শ্রীচরণকমলেষু—

৮ই জানুয়ারী—১৯৩০
"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট, পোষ্ট—টাউন ;
দিনাজপুর

স্নেহধন্য
মন্মথ রায়

লেখকের কথা

—"মনোমোহন থিয়েটারের বর্তমান পরিচালক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের উপর্য্যুপরি দুইখানি টেলিগ্রাম পাইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯২৯) "মহুয়া" রচনায় হস্তক্ষেপ করি। প্রায় এক পক্ষ কাল মধ্যে মহুয়া-রচনা সমাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের অপরিসীম উদ্যোগে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২৯) মঙ্গলবার "মহুয়া" মহাসমারোহে "মনোমোহন" থিয়েটারে সর্বসমক্ষে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

"মহুয়া"র প্রথম সন্ধান পাই পরম শ্রদ্ধাভাজন ডঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত মৈমনসিংহ গীতিকায়। মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্বপ্রথমে তাঁহারই প্রশস্তি উচ্চারণ করি, কেননা, তাঁহার পুরাতন-গীতি-সংগ্রহের এরূপ প্রচেষ্টার কল্যাণেই আমাদের জেলার এই লুপ্তপ্রায় মহুয়া-মধু আজ শুধু বাঙালী নয়, লর্ড রানাল্ড্‌সে, ষ্টেলা ক্রেমরিস প্রভৃতি অবাঙালী কলারসিকেরও মনোহরণ করিয়াছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর মনোমোহনের পাদপ্রদীপের সম্মুখে আমার কল্পলোকের "মহুয়া" যখন পরিপূর্ণরূপে আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহাকে চিনিয়া ওঠা ভার। মহুয়া, তাহার পালঙ্ক-সই, বেদে-বেদিনী সাথীরা এমন কি আমার সেই রাধুপাগলি যে গান গাহিল সে গান আমার নয়। যে দৃশ্যপটে যে সাজসজ্জায় তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাও শুধু স্বপ্নেই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমার দীনতায় আত্মপ্রকাশেই কুণ্ঠিত ছিল আজ তাহারা সগর্বে পাদপ্রদীপের সম্মুখে তাঁহারই গান গাহিতেছে যাঁহার গানে সারা বাঙলা মত্ত-মাতাল, তাঁহারই পরিকল্পিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাঁহার রূপ পরিকল্পনায় সারা দেশ মুগ্ধ। আমার লেখনীর অক্ষমতাকে এমনি করিয়াই সার্থক সুন্দর করিয়াছেন আমার গীত-সুন্দর বন্ধু কবি নজরুল ইসলাম এবং আমার রূপকল্পনার দীনতাকে এমনি করিয়াই শ্রী দিয়াছেন রূপদক্ষ পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত চারু রায়। যে ভালোবাসায় তাঁহারা আমাকে এই পরমসম্পদ দান করিয়াছেন তাহা আমার ধন্যবাদের বহু ঊর্ধ্বে। গানহীন জীবন যখন গান পায়, রূপহীন মন যখন রূপ পায়, তখন আর কি হয় জানি না, আমার চোখে জল আসে।

মহুয়া রচনায় যাঁহাদের নিকট আশা উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণা পাইয়াছি মুগ্ধচিত্তে আজ তাঁহাদেরও সবাইকে স্মরণ করি। রংপুর কার্মাইকেল কলেজের বাঙলার ভূতপূর্ব অধ্যাপক সাহিত্য রসিক শ্রীযুক্ত কমলেন্দু চক্রবর্তী এম-এ,

বি-এল, কাব্যরসিক শ্রীমান শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, নাট্যরস-রসিক আত্মীয়প্রতিম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন নাটকের পরিকল্পনায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়াছেন। নাটক রচনায় নাট্য-নিপুণ নট-বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন আমার "মহুয়া" কোন দিনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। নট-সূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, নাট্যনায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নট-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরম স্নেহে আমার পরিকল্পনাকে তাঁহাদের রূপদক্ষ কল্পনায় সমার্জিত করিয়া মহুয়ায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "মহুয়া" তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে।

মহুয়ার প্রচ্ছদপটটি তরুণজগতের সুপ্রিয় চিত্র-শিল্পী আত্মীয়-প্রতিম শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর ভালোবাসার দান। তাঁহার রং এবং তুলি জয়যুক্ত হউক।

সকলের কথাই আজ মনে পড়িতেছে। সকলের প্রীতিই আজ প্রিয়তম মনে হইতেছে। কিন্তু যাঁহার প্রীতি, যাঁহার স্নেহ জীবনের প্রিয়তম সম্পদ ছিল, যিনি এই "মহুয়া"কে দেখিলে সবার চাইতে বেশী সুখী হইতেন তাঁহাকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যায়ও ছিল, গীতা নয়, মহাভারত নয়, আমার "চাঁদসদাগর", আমার "শ্রীবৎস"। কিন্তু···আজ এই "মহুয়া ?" কোন দেবতার ইহা প্রীতিসাধন করিবে ?······

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

৮ই জানুয়ারী —১৯৩০
"বরদা-ভবন"
পোষ্ট—টাউন, বালুরঘাট
দিনাজপুর

ভাগ্যহীন
মন্মথ রায়

ইঙ্গিত

নদের চাঁদ	...	...	৺রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরজী বিগ্রহের সেবাইত।
হুমড়া বেদে	...	...	বেদের সর্দার।
সুজন	...	...	ঐ পালিত পুত্র।
মানিক	...	...	ঐ ভ্রাতা।
সন্ন্যাসী	...	...	
ধনপতি সাধু	...	...	৺লক্ষেশ্বর সওদাগরের ভ্রাতা।
কোতয়াল	...	...	
মহুয়া	...	...	হুমড়াবেদের পালিতা কন্যা।
পালঙ্ক	...	...	ঐ সই।
চন্দ্রাবলী	...	...	দেবদাসী।

পূর্বাভাষ

মহুয়া ॥ নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ঘুরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥
নদের চাঁদ ॥ কইন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ॥
মহুয়া ॥ কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥
কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ॥
নদের চাঁদ ॥ কঠিন আমার পিতা মাতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥
মহুয়া ॥ লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে ভয়।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥
নদের চাঁদ ॥ কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি ॥

॥ "মৈমনসিংহ গীতিকা" ॥

মহুয়া

প্রথম অঙ্ক

বেদে বেদেনীদের গান

বেদের দল :—

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো।
খোঁপা খু'লে কেশ হ'ল বাউল লো॥
পথে কে বাজাল মোহন বাঁশী,
(তোর ঘরে ফিরে যেতে হইল ভুল লো॥
কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচি চুড়ি,
বৈঁচি-মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো॥

বেদেনী দল :—

ও সে বুনো পাগল, পথে বাজায় মাদল।
পায়ে ঝড়ের নাচন, শিরে চাঁচর চুল লো॥
দিল নাকে সে নাকছাবি বাব্‌লা ফুলি,
কুঁচের চুড়ি আর ঝুম্‌কোফুল দুল্ লো॥
নিয়ে লাজ-দুকুল দিল ঘাগরী সে,
আমার গাগরী ভাসাল জলে বাতুল লো॥

বেদেনীগণ॥ ঠাকুর মশাই, এইবার বক্‌শীস্—

নদেরচাঁদ॥ বক্‌শীস্ হবে বৈকি। বক্‌শীসের ভাবনা নেই।…ভাবনা হচ্ছে তোদের জন্য।…[প্রথমাকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া] গান তো গাইলি, নাচও দেখলাম…লাগ্‌লও বেশ।… কিন্তু দেখ, খানিক আগে ঐ যে দড়ির উপর উঠে নাচ্‌লি… যদি পড়ে যেতিস্? (বেদেনীগণ হাসিয়া উঠিল) পড়্‌তিস্ না? কিন্তু দড়িটা তো ছিঁড়ে যেতে পারতো?…তবে হাঁ, তোদের ডিগ্‌বাজি খেলাটি হয়েছে বেশ। দেখ্‌ছিলাম আর অবাক্ হচ্ছিলাম—তোরা বেদেনী, না—ডাইনী!

চন্দ্রাবলী॥ ওরা দুই-ই!

নন্দেরচাঁদ ॥ ঠিক বলেছিস্ চন্দ্রাবলী।—ওরা দুই-ই।…(বেদেনীদের প্রতি) না?

বেদেনীগণ ॥ বক্‌শীস্, ঠাকুরমশাই, বক্‌শীস্?

নন্দেরচাঁদ ॥ আরে, বক্‌শীসের ভাবনা নেই। ঐ যে দেখছিস শ্যামসুন্দরজী …কৃপণ ন'ন। ওঁর দৌলতে…কি বক্‌শীস চাস—?

বেদেনীগণ ॥ টাকা—মাথা-পিছু এক এক টাকা—

নন্দেরচাঁদ ॥ চন্দ্রাবলী, এক থাল্ মোহর নিয়ে আয় তো—

নন্দেরচাঁদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ (চন্দ্রাবলী মোহর আনিলে) চন্দ্রাবলী, দেখেছিস কত বড় হাঁ করেছে ওরা? (শোনামাত্র সব বেদেনী মুখ বুজিল) না—না… আর একবার…আর একবার—(বেদেনীগণ অসম্মত হইল) আরে শোন—শোন—সব চাইতে বড় করে যে হাঁ করতে পারবে পাঁচ মোহর তার বক্‌শীস—

হুমড়া ॥ হুম্।…ও সব হচ্ছে কি? কি হচ্ছে ও সব?

নন্দেরচাঁদ ॥ (সেদিকে দৃকপাত না করিয়া মহা উৎসাহে বেদেনীদের প্রতি) আরো বড়—আরো বড়—

হুমড়া ॥ আরে এ আবার কি?

নন্দেরচাঁদ ॥ কে, সর্দার? ওদের মধ্যে কার হাঁ-টি সব চাইতে বড় বল দেখি—(বেদেনীগণ সর্দারকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জায় ছুটিয়া যাইতেছিল) আরে দাঁড়া দাঁড়া। বক্‌শীস নিয়ে যা—

হুমড়া ॥ কি বক্‌শীস?

নন্দেরচাঁদ ॥ নাও সর্দার…এই বক্‌শীস ওদের হাতে দাও—

হুমড়া ॥ হুম্…এক থাল মো-হ-র! (মন্দিরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল সে থালা) ও দিয়ে কি হবে!

নন্দেরচাঁদ ॥ (বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল)

হুমড়া ॥ হাঁ করেছ দেখছি তুমিই সবার চাইতে বেশী। হুম্।…

নন্দেরচাঁদ ॥ একথালা মোহরে মন উঠল না?…আচ্ছা চন্দ্রাবলী, নিয়ে এস আর এক থালা—

হুমড়া ॥ থাক্ ঠাকুর, থাক্। কিইবা খেলা দেখিয়েছে…তার বক্‌শীস… টাকাটা সিকিটেও নয়, তুমি দিচ্ছ মোহর! পরের সম্পত্তি হাতে পেয়েছ কি না ঠাকুর, কিছুই গায়ে লাগছে না! তা বেশ, বক্‌শীস এখন থাক্। ভানুমতীর খেল্ দেখেছ? ভানুমতীর খেল্?

নন্দেরচাঁদ ॥ ভানুমতীর খেল্! নাম শুনেছি বটে…কিন্তু…কই কেউ দেখায় নি তো!

হুমড়া ॥ আরে তা কি সবাই দেখাতে পারে? না সবাই দেখতে পারে?

সাধ খেলার এক খেলা ঐ ভানুমতীর খেল—তার বক্‌শীস ঐ মোহর-টোহর নয়—হুম্‌···

নদেরচাঁদ ॥ মোহর নয়!—তবে?

হুমড়া ॥ মতির মালা। সেই সাবেক-কালে এই বামনকান্দাতেই রাজা কীর্তিধ্বজ চকোর্তিকে এই খেলা সর্দারনী দেখিয়ে মতির মালা বক্‌শীস পেয়েছিল। আজ সে রাজাও নেই, আমার সে সর্দারনীও নেই—

নদেরচাঁদ ॥ আরে সর্দার, রাজা কীর্তিধ্বজ চকোর্তি নেই, কিন্তু তার শ্যামসুন্দরজীর সেবাইত নদেরচাঁদ গোঁসাই তো আছে।

হুমড়া ॥ হুম্‌। তা তো আছেন ঠাকুর। সে তো দেখছিই। আর শুনেওছি রাজকন্যা যদ্দিন সম্পত্তি হাতে না নেন, ততদিন এ সম্পত্তিও আপনারই, না?

নদেরচাঁদ ॥ না···না ঠিক্‌ তা নয়। রাজকন্যা একজন ছিলেন বটে···কিন্তু তিনি তো আর নেই! ডাকাতরা ডাকাতি করতে এসেছিল। আমার বাবা বাধা দিতে গিয়ে মারা যান। ডাকাতরা তাঁর বাধা পেয়ে আর কিছু নিতে না পেরে রাজার সেই সবে-ধন-এক মানিক শিশু-কন্যাকে নিয়েই সরে পড়ে। রাজা মেয়ের খোঁজ না পেয়ে সব সম্পত্তি আমার হাতে দিয়ে মারা গেলেন—মেয়ের শোকে। সে যাক্‌। কিন্তু ভানুমতীর খেল্‌?

হুমড়া ॥ হুম্‌। রাজা মারা গেছেন রাজকন্যাও নেই···!

নদেরচাঁদ ॥ আঃ কিন্তু আমি তো রয়েছি!

হুমড়া ॥ তা তো রয়েইছেন,···রয়েছেন বলেই তো এসেছি। ভানুমতীর খেল্‌ দেখবার মতো লোক লাখে একটি মেলে। সেবার দেখেছিলেন রাজা কীর্তিধ্বজ চকোর্তি, এবার দেখবেন আপনি—

নদেরচাঁদ ॥ কিন্তু ভানুমতীকেই যে দেখছি নে!

হুমড়া ॥ রাজা যে ভানুমতীকে দেখেছিলেন সে ছিল আমার সর্দারনী! সেও মারা গেছে। এবারকার ভানুমতী আমার মেয়ে মহুয়া—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! নামটি তো বেশ! কিন্তু লোকটি কই?

হুমড়া ॥ মতির মালাটিই-বা কই?

নদেরচাঁদ ॥ এই কথা! (গলার মালায় হাত দিয়া) এই তো রয়েছে মতির মালা। এইবার তোমার মহুয়া?

হুমড়া ॥ হুম্‌!

আয় মহুয়া আয়!
নেচে নেচে আয়!
মতির মালা আয়।
ঐ মহুয়া আসে—

মতির মালার আশে!
নেচে নেচে আসে!
হেসে হেসে আসে!
ঐ মহুয়া আসে!

[নাচিতে নাচিতে মহুয়ার প্রবেশ। কিশোরী তন্বী মহুয়া, চপলবর্ণা মহুয়া, আলোকের বন্যার মত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসে। বেদের মেয়ে মহুয়া, বেদেনীর সকল যাদু তাহার চোখে, বেদেনীর সকল মধু তাহার মুখে।]

নদেরচাঁদ ॥ সর্দার! সর্দার! এই তোমার মহুয়া—?

হুমড়া ॥ হুম্। আমার মহুয়া! আমার মহুয়া। (দুই বাহু মহুয়ার স্নেহালিঙ্গন আশে বাড়াইয়া দিল, মহুয়া ছুটিয়া আসিয়া সে ব্যগ্র বাহুবন্ধনে ধরা দিল।)

মহুয়া ॥ বাপুজি! বাপুজি! আমি ঘুমিয়ে ছিলাম আর তোমরা সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছ, আমায় কেন ডাকোনি? কেন ডাকোনি? এ কোথায় এসেছ? এ-সব কি দেখছি!…ওটা কি? (মতির মালায় চোখ পড়িল) বা—বা—বা! আমার—(ছুটিয়া গিয়া নদেরচাঁদের গলার মালা ধরিল) কি সুন্দর! (বলিয়াই নদেরচাঁদের মুখের দিকে তাকাইল)

নদেরচাঁদ ॥ তুমিও!

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদের দিকে যাদুকরীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া) আমি নেব (নদেরচাঁদ মালা লইয়া তাহার হাতে দিল) আমি নিলাম। কেমন মানিয়েছে? খুব ভালো, না? (ছুটিয়া অন্যান্য বেদেনীর নিকট গিয়া) তোরা কি বলিস্? ‥বল্‌বি না? হিংসে হয়েছে বুঝি? (একজনকে) ওরে পালঙ্ক-সই বল শীগ্‌গীর—আমায় কেমন মানাল? বল্‌বি না?…বটে?…দে, আমার কানের ফুল ফিরিয়ে দে—দে—দে—দে—(তাহার এক কানের একটি ফুল কাড়িয়া নিল, যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল)।

পালঙ্ক ॥ উহু-উহু উহু—(ব্যথায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল)।

মহুয়া ॥ এক কানে একটি ফুল
আর এক কানে নেই!
ন্যাংটো কানে নাচে সই
ধেই—ধেই—ধেই!

[নিজেই ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল]

হুমড়া ॥ (ক্রোধে) মহুয়া—

মহুয়া ॥ (ছুটিয়া হুমড়ার কাছে আসিয়া) বাপুজি!

হুমড়া ॥ বড় বেয়াড়া হয়েছিস্ তুই, বড় বেয়াড়া। চাবুক পিঠে পড়ে না কতকাল?

মহুয়া ॥ কালও পড়েছে বাপুজি! কিন্তু আমার কি দোষ বল?…এ মালাটায় আমায় মানিয়েছে কেমন এ কথা ও বলবে না কেন?

সুজন ॥ ও না বলে আমরা বলব। তোর গলায় উঠে ঐ মালাটার

ঝিলিকই বেড়ে গেছে মহুয়া, এতক্ষণ ওটা যেন নিভে ছিল। মনে হচ্ছে যেন তুই পৌর্ণমসির চাঁদ। তারার মালা তোর গলা ঘিরে আছে।

বেদেনীগণ॥ বহুৎ খুব—বহুৎ খুব।

পালঙ্ক॥ (ব্যঙ্গে) আ—হা—হা! কি বলাই বল্‌লে!

নদেরচাঁদ॥ (ব্যগ্রভাবে) আমায় বল্‌তে দাও মহুয়া, আমায় বল্‌তে দাও—

মহুয়া॥ না—না—না, আর কারো কথা না, সুজনের কথা আমার ভারী মনে ধরেছে। সুজন ভাই, সত্যি তোর চোখ আছে। আমি খুশী হয়েছি, খুব খুশী হয়েছি।

সুজন॥ খুশী হয়েছিস্‌?

মহুয়া॥ খু—ব!

সুজন॥ তবে আমার বকশীস—?

মহুয়া॥ তোর বকশীস তুই পাবিনে। পাবে ঐ পালঙ্ক সই। (হাসিয়া) ওদের দুজনে খুব ভাব কি না! (মুক্তোর মালাটা পালঙ্কের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আদেশসূচক স্বরে) কান্না রাখ্‌। হেসে ওঠ্‌।...মালা তোল্‌—

পালঙ্ক॥ চাই নে...ও ছাই আমি চাই নে—

মহুয়া॥ বটে! শোন্‌ ভাই সুজন, ও মালা তবে আমি তোর গলায় পরিয়ে দি—আর তুই তোর মালাটা আমার গলায়—

পালঙ্ক॥ (চকিতে পালঙ্ক মুক্তার মালা তুলিয়া লইয়া) নিলাম...আমি নিলাম—

মহুয়া॥ (প্রাণখোলা উচ্চহাসি) হাঃ হাঃ হাঃ—

[সকলে সেই হাসিতে যোগ দিল। হাসিতে হাসিতে হুমড়ার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।]

হুমড়া॥ শোন্‌ বেটি। ভারী বেয়াড়া হয়েছিস্‌ তুই।...এসব আমি ভালোবাসিনে—

মহুয়া॥ কি ভালোবাসো তুমি বাপুজি—?

হুমড়া॥ আমি ভালোবাসি কাজের খেলা, যে খেলায় রুটির যোগাড় হয়—

মহুয়া॥ রুটি! রুটি!—সত্যি তো, কাল সারাদিন তুমি না খেয়ে রয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে না খেয়ে রয়েছি। সে কথা ভুলেই গেছি! ওরা খেয়েছে নদীর জল আর গাছের ফল, আমরা তা-ও না। তা আজ এখনো পয়সা মেলে নি?

হুমড়া॥ ওরে বোকা মেয়ে, সারা বছরের চিরকালের খোরাক জোটাতে হবে তো। হুম্‌। শোন্‌, তুই খেলা না দেখালে তা আর হয় না—

মহুয়া॥ কি খেলা দেখাব আমি—?

নদেরচাঁদ॥ ভানুমতীর খেলা—

হুমড়া ॥ ঐ শোন্।—ভানুমতীর খেল্।

মহুয়া ॥ বাপুজী!···সে কি? (আশ্চর্য হইল)

হুমড়া ॥ কি মহুয়া?

মহুয়া ॥ ভানুমতীর খেল্ দে্খবে কে?

নদেরচাঁদ ॥ আমি।

মহুয়া ॥ [চকিতে নদেরচাঁদের দিকে চাহিয়া) না—না—না, দেখো না, দেখো না। ও খেলা দেখলে মাথায় বাজ পড়ে, ঐ সর্দারই বলেছে।···সর্দার, সেই যে কোন্ রাজা—

হুমড়া ॥ হুম্।···রাজা কীর্তিধ্বজ চক্কোর্তি। তা আমি কি করব, দেখতে চাইলেন, নাছোড়বান্দা হয়ে দেখতে চাইলেন। দেখলেন—দেখে মজে গেলেন। শেষে আমাদের আর ছাড়েন না। বাড়িতে ঠাঁই দিলেন—

মহুয়া ॥ তার পরই তো রাজার মাথায় বাজ পড়ল। তাতেই রাজা মরে গেল, তুমিই বলেছ—

নদেরচাঁদ ॥ না—না, ডাকাতরা তার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেল। সে শোক তিনি সইতে পারলেন না। শ্যামসুন্দর, আর শ্যামসুন্দরের নামে তাঁর সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি মারা গেলেন—

হুমড়া ॥ হুম্।··তবে তাই?··তার মাথায় তবে বাজ পড়েনি? হুম্। বাজ পড়লে বুঝি ওর চাইতেও বেশী কষ্ট পেতেন।··সে ভালোই হয়েছে। হুম্···কিন্তু আমরা আর একটা কথাও যে শুনেছিলাম, সেটাও কি সত্যি নয়?

নদেরচাঁদ ॥ আবার কি কথা?

হুমড়া ॥ রাজা মরবার সময় শ্যামসুন্দরজীর নাম নিয়ে সবার কাছে বলে যান···যে তার মেয়েকে ফিরে এই রাজবাড়িতে এনে দিতে পারবে সে—ই এই সম্পত্তির মালিক হবে, শুধু সম্পত্তির মালিক নয়, ঐ মেয়েরও মালিক—

নদেরচাঁদ ॥ ঠিক্ তা নয়, ঠিক্ তা নয়। তবে, হাঁ, কতকটা ঐ রকমই বটে। তা সে কথাই উঠছে না যখন—আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি যে সে রাজকন্যা বেঁচে নাই, ডাকাতরা তার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে গলা টিপে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে—

হুমড়া ॥ অতি সহজেই এ সন্ধানটা পাওয়া গেল, না ঠাকুর? (নদেরচাঁদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ। নদেরচাঁদ শিহরিয়া উঠিল)

নদেরচাঁদ ॥ কেউ কেউ বললে ডাকাতরা তাকে বনে ফেলে গিয়েছিল, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে···(মাথা চুলকাইতে লাগিলেন)।

হুমড়া ॥ আর এ কথাটা বিশ্বাস না হয়েই যায় না, কি বল?···হুম্। ··তাহলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই সম্পত্তি তোমাকে ভোগ করতে হচ্ছে, না ঠাকুর?

নদেরচাঁদ ॥ তা আর কি করবো? আমিই না হয় তাকে উদ্ধার করতে না পারলুম, কিন্তু, আর দশজনে? কেউ না কেউ তাকে উদ্ধার করে এনে সম্পত্তি আর তার উভয়েরই মালিক হতে পারতো—!

হুমড়া ॥ (হুঙ্কার দিয়া উঠিল) ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! ওরে মহুয়া, ভানুমতীর খেল্—

মহুয়া ॥ (একখানা বড় আয়না দেখিয়াছে, দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে) বাপুজী! বাপুজী!…দেখেছ?

হুমড়া ॥ ভানুমতীর খেল, মহুয়া, ভানুমতীর খেল্!

মহুয়া ॥ দেখেছ বাপুজী দেখেছ? (আয়না নির্দেশ)

হুমড়া ॥ কি?

মহুয়া ॥ এই যে—

[ছুটিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। জীবনে প্রথম এই আয়না দেখা, কাজেই তাহার কার্যকলাপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। হাত পা তুলিয়া দেখিতে লাগিল,—অবাক্ হইয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া ঐ রহস্যের সমাধান কি বুঝিতে চেষ্টা করিল। আবার হাত পা ছুঁড়িয়া দেখিতে লাগিল। নাচিয়া দেখিল। মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দেখিল। সকলে হাসিয়া খুন।]

হুমড়া ॥ আয়না ও এই প্রথম দেখ্‌ল। প্রথম দেখেছে কি না—প্রথম দেখেছে কি না—হেসো না কেউ, তোমরা হেসো না—

মহুয়া ॥ (হুমড়াকে টানিয়া লইয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেখিল। তাহাকে কিল মারিয়া দেখিল। তাহাকে চুমা খাইয়া দেখিল। দেখে আর অবাক্ হয়, অবাক্ হয় আর দেখে, শেষে—) এটা কি?

হুমড়া ॥ ওর নাম আয়না।

মহুয়া ॥ ওর মধ্যে যে আমরা সবাই রয়েছি, বাপুজি, বাপুজি, তুমি যে আমাদের সবার সর্দার, তুমি-ও?

নদেরচাঁদ ॥ সবাই! তোমাদের সবাইকে আমি ওতে বেঁধে রেখেছি। কেউ আর পালাতে পারছো না—ছাড়ান চাও তো ভানুমতীর খেল্ দেখাও—

মহুয়া ॥ বটে!… কিন্তু কেন বাঁধবে?

নদেরচাঁদ ॥ তোমরা যে ধরা দাও না, এসেই আবার চলে যাও—।

মহুয়া ॥ বটে! সত্যি সত্যিই কি তবে আমাকে বেঁধে রেখেছে? কয়েদ করেছে?—দেখি

[আবার আয়নাতে তাকাইল। মহুয়া মহা মুস্কিলে পড়িল। কিছুতেই প্রতিবিম্ব এড়ান যায় না। মহুয়া আয়নাতে তাকাইয়া নৃত্য সুরু করিল পরে আত্মবিহ্বলা হইয়া নাচিতে লাগিল। মহুয়া নাচিতেছিল। সুজন মাদল বাজাইতেছিল। বাজাইতে বাজাইতে সুজনের খেয়াল হইল কোথায় যেন তাল ভঙ্গ হইতেছে। প্রথমটা ঠিক বুঝিতে

পা পারিয়া সে বাজাইয়া চলিল…কিন্তু বেশীক্ষণ নয়…আবার সেই তাল ভঙ্গ। মনে হইল বোধ করি মহুয়ার পা তাল ভঙ্গ করিতেছে। তাহার পায়ের দিকে তাকাইল। চাহিয়া দেখিল, হাঁ, তাহাই। তখনি তাহার দৃষ্টি পা হইতে মহুয়ার মুখে পড়িল। তাকাইয়া দেখে মহুয়া অপলক চোখে নদেরচাঁদের মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে তখনি মহুয়াকে সাবধান করিয়া দিল। মহুয়া লজ্জিত হইয়া তখনি সপ্রতিভভাবে ভুল সংশোধন করিয়া পুনরায় নাচিতে লাগিল।]

সকলে ॥ সাবাস—সাবাস—সাবাস।

মহুয়া ॥ (ছুটিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে আসিয়া) দেখ্‌লে—?

নদেরচাঁদ ॥ দেখলাম!

মহুয়া ॥ কেমন দেখ্‌লে?

নদেরচাঁদ ॥ এ রকমটি আর কখনো দেখিনি। ময়ূরের নাচ দেখেছি, রাজহংসীর নাচ দেখেছি, আজ মনে হচ্ছে সে নাচ নাচই নয়। আজ বুঝলাম নাচে মানুষকে পাগল করে, মাতাল করে। মহুয়া, তুমি আমায় পাগল করেছ, তুমি আমায় মাতাল করেছ!…কিন্তু ভানুমতীর খেল্?

হুমড়া ॥ হুম্!…মহুয়া, এদিকে আয়—

মহুয়া ॥ দাঁড়াও বাপুজি। (নদেরচাঁদকে) যা বললে সব সত্যি?

নদেরচাঁদ ॥ সত্যি! সত্যি! এ যদি সত্যি না হয়, আমি মিথ্যা, আমার জীবন মিথ্যা, আমার যৌবন মিথ্যা, আমার সব মিথ্যা—!

মহুয়া ॥ অত বুঝি নে। শুধু এই বুঝতে চাই, খুশী হয়েছ?

নদেরচাঁদ ॥ কি করে তা তোমায় বোঝাব?

মহুয়া ॥ (আয়নাটি দেখাইয়া) আমায় ওইটি দিয়ে—!

নদেরচাঁদ ॥ (আয়নাটি লইয়া মহুয়াকে দিলেন) নাও—কিন্তু ভানুমতীর খেল্?

মহুয়া ॥ দাঁড়াও। (আনন্দে) ওটা এখন আমার…ওটা এখন আমার …ওটা নিয়ে আমি যা খুশী তাই করতে পারি—(নদেরচাঁদকে) পারিনে?

নদেরচাঁদ ॥ একশবার।

মহুয়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—তবে—(চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে) একখানা পাথর…একখানা পাথর—

নদেরচাঁদ ॥ পাথর দিয়ে আবার কি হবে?

মহুয়া ॥ সে হবে এক নতুন খেলা। দেখবে তো দাও।…এখানে কি পাথরের কিছুই নেই?

নদেরচাঁদ ॥ (হাসিয়া) পাথরের কিছুই নেই, বল কি মহুয়া? এই মন্দিরই যে পাথরের তৈরী। এই মন্দিরের দেবতা ঐ শ্যামসুন্দরজীই যে পাথরের দেখছ না ঐ শ্যামসুন্দরজী…শ্বেত-পাথরের ঐ যে মূর্তি-বিগ্রহ?

মহুয়া ॥ (শ্যামসুন্দরের মূর্তি দেখিয়া যেন তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল।

সোপানের উপর গিয়া বসিল) আহা—হা—হা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! এমনটি তো আর কখনো দেখিনি ! আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। বাপুজী আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কি সুন্দর,ওগো কি সুন্দর ! (প্রণাম)

হুমড়া ॥ হুম্। ভানুমতীর খেল্! ভনুমতীর খেল্! (প্রণতা মহুয়া লক্ষ্যে] হতেই হবে !

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদের প্রতি মায়াময়ী দৃষ্টিতে) কি সুন্দর ওগো কি সুন্দর ! ওটিও কিন্তু আমার চাই···একদিন না একদিন নেবই নেব।

নদেরচাঁদ ॥ দেখলে আমার কেমন পাথর আছে ?

মহুয়া ॥ না—না, ও পাথর নয়। আছে বেদেনীর ছুরি [আয়নার প্রতি] মর···তুই মর···

[কটিদেশ হইতে একটির পর একটি ছুরিকা খুলিয়া লইয়া আয়নার উদ্দেশ্যে সজোরে নিক্ষেপ। আয়না ভাঙ্গিয়া গেল। মহুয়া গিয়া দেখিল তাহাকে আর উহাতে সম্পূর্ণ দেখা যায় না। দ্বিগুণ উৎসাহ এবং দ্বিগুণ উত্তেজনায় তাহাতে পুনরায় ছুরি নিক্ষেপ। আয়না ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। সকলে নির্বাক্ বিস্ময়ে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল ?]

হুমড়া। এ কি করলি বেটি ?

নদেরচাঁদ ॥ ও কি করলে মহুয়া ?

মহুয়া ॥ [হুমড়ার প্রতি] কি করলাম ? [নদেরচাঁদের প্রতি] বেদের মেয়েকে ধরে রাখবে ? বেদের সর্দারকে বাঁধবে ? বেদে জাতকে কয়েদখানায় পুরবে ? [ব্যঙ্গে] হয় না—তা হয় না, ওরে আমার নদেরচাঁদ···ওরে আমার সোণারচাঁদ, হয় না তা হয় না ! [অন্য স্বরে, অন্য দিকে ছুটিয়া গিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে] ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! কে দেখবে এস শীগ্‌গীর চলে এস ? এখানে নয়, ঐ মাঠে ; খোলা মাঠে, খোলা মাঠে, ছাদের নীচে নয় ভাই—আকাশের নীচে, ঘরের মেজেতে নয় ভাই···ঘাসের বুকে !

[ছুটিয়া প্রস্থান সঙ্গে সঙ্গে 'চল চল দেখিগে চল' রব উঠিল। দর্শকগণ ছুটিয়া বাহিরে গেল। বেদেনীগণও চলিয়া গেল। নদেরচাঁদও ছুটিয়া যাইতে ছিলেন। হুমড়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং বেদে বেদেনীগণকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল ! বেদেবেদেনীগন সে ইঙ্গিতাদেশ পালন করিল।]

হুমড়া ॥ মানিক—

মানিক ॥ [হুমড়ার ছোট ভাই।] দাদু !

হুমড়া ॥ দাঁড়াও—(মানিক দাঁড়াইয়া রহিল।) দেখো, এখন যেন এখানে কেউ না আসে।

মানিক ॥ (পথের সম্মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া) আচ্ছা।

নদেরচাঁদ ॥ (বিস্মিতভাবে হুমড়ার)···তুমি কি চাও ?

হুমড়া ॥ আমি চাই রুটি। (হস্তধারণ)

নদেরচাঁদ ॥ দেব। হাত ছাড়—

হুমড়া ॥ (হাত ছাড়িয়া দিয়া) হাত আমি ছাড়ছি।…হুম্…এও দেখেছি যার হাত ধরেছি, সে-ই আবার পায়ে ধরেছে। হাঁ, আমি রুটি চাই।

নদেরচাঁদ ॥ যত চাও দেব। আমায় যেতে দাও…ভানুমতীর খেল্।

হুমড়া ॥ ভানুমতার খেল্ ওখানে নয়, ভানুমতীর খেল্ এখানে।… কত রুটি দিতে পার? আমার একটি পেটের নয়, হাজার হাজার বেদে বেদেনী ক্ষুধার জ্বালায় দেশে দেশে সারাজীবন কুকুরের মতো ফেরে। আমি চাই এই হাজার হাজার বেদে-বেদেনীর চিরজীবনেরও নয়, চিরকালের রুটি!

নদেরচাঁদ ॥ তা আমি কোথায় পাব? তুমি তো বেশ লোক সর্দার!

হুমড়া ॥ ভানুমতীর খেল্। ভানুমতীর খেল্! সেই রুটি এখানে আছে, আজ আমি তা চাই। তোমাকে দিতে হবে—

নদেরচাঁদ ॥ এখানে আছে সেই রুটি? তুমি বল্‌ছ কি সর্দার? তুমি কি ক্ষেপেছ?

হুমড়া ॥ ক্ষেপিনি। হুম্। আমি ক্ষেপিনি। শোন ঠাকুর, এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে সেই রুটির যোগাড় হ'তে পারে, হয়না মাণিক?

মানিক ॥ খুব হয় দাদু। শুধু রুটি কেন? ডাল তরকারী হয়, দুধ হয়…দই হয় সন্দেশও হয়। দাদুও তো কাল থেকে সারাদিন না খেয়ে আছ! ঐ দুধের মেয়েটাও তো তোমার সঙ্গে উপোস করেছে!

হুমড়া ॥ শুনলে? তাই এই দেবোত্তর সম্পত্তি চাই। এ সম্পত্তি আমার।

নদেরচাঁদ ॥ বল্‌লেই হ'ল?

হুমড়া ॥ হাঁ, বল্‌লেই হ'ল। শুধু মুখ দিয়ে এই গ্রামবাসী ঐ জনতাকে বললেই হল। শুধু এই বলতে হবে রাজা কীর্তিধ্বজ চকোত্তির মেয়ে নদেরচাঁদ ঠাকুরের কল্পনায় মরেছে, কিন্তু বাস্তবে সে বেঁচে আছে। আমি তাকে— আজই এখনি…এখানে সবার সম্মুখে বের করতে পারি।

নদেরচাঁদ ॥ (সভয়ে) চুপ! চুপ! (কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হইয়া) কিন্তু তোমার সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?…তার প্রমাণ?

হুমড়া ॥ তার প্রমাণ রয়েছে। সেই মেয়ের দেহেই রয়েছে। জানো সেই উল্কি চিহ্ন?

নদেরচাঁদ ॥ চুপ! চুপ।

হুমড়া ॥ ঐ শ্যামসুন্দরের পা' দুখানি তার পিঠে রাখ…রেখায় রেখায় সেই উল্কিচিহ্ন মিলে যবে—

নদেরচাঁদ ॥ যদিই বা যায়, তাতেই কি এসে যায়?

হুমড়া ॥ কাজীর বিচারে, রাজার মৃত্যুকালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যদি আমি সেই মেয়েকে এই রাজবাড়িতে ফিরিয়ে এনে দিই, আমিই হব এ সম্পত্তির মালিক, সেই মেয়েরও মালিক—

নদেরচাঁদ ॥ জানি না তুমি কে। শুধু এই জানি··তুমি ঐ মহুয়ার পিতা। তাই এখনো তোমার রক্ষা—তোমার কথা যদি সত্যিই হয়, যদি তুমি সেই রাজকন্যাকে সত্যসত্যই ফিরিয়ে এনে থাক, তবে তুমি···তুমিই সেই রাত্রির ডাকাতির সর্দার, তুমিই আমার পিতাকে হত্যা করেছ—সম্পত্তি নিতে হয় নাও, কিন্তু তার পূর্বে আমি তোমার শির নেব।

হুমড়া ॥ হুম্। স্বীকার করছি আমিই সেই ডাকাতির সর্দার। কিন্তু তাই হয়েছে কি?···ঐ ছুরি? আমি জানি, আমি জানি—শ্যামসুন্দরের উপাসক যাঁরা তাঁরা জীবনে কখনো জীবহিংসা করেন না. দীক্ষার সময় ঐ হয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা। তোমার বাবা মৃত্যুকালে ঐ কথা বলে আমায় মার্জনা করেছেন, রাজা তাঁর মৃত্যুকালে ঐ কথা ব'লে ডাকাতদের মার্জনা ক'রে গেছেন। তিনি শুধু ফেরত চেয়ে গেছেন তাঁর কন্যা. পরিবর্তে দান করবেন বলে গেছেন রাজত্ব! এরপরও যদি তুমি চাও আমার শির··· নাও—

নদেরচাঁদ ॥ পিতা মার্জনা করেছেন. করুন, রাজা মার্জনা করেছেন করুন, কিন্তু আমি মার্জনা করতে পারবো না (হঠাৎ হুমড়ার ছুরি কাড়িয়া লইয়া) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ঘাতক!

হুমড়া ॥ ওঃ (একহাতে চোখ ঢাকিয়া অন্য হাত শ্যামসুন্দরের দিকে প্রসারিত করিল।) শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর!

নদেরচাঁদ ॥ শ্যামসুন্দর? শ্যামসুন্দর?

[মহুয়ার প্রবেশ]

মহুয়া ॥ শ্যামসুন্দর! চোখে কি মায়া মুখে কি মমতা! (নদেরচাঁদের উপর দৃষ্টি পড়িল) এ কি! (নদেরচাঁদের হাত হইতে ছুরি মাটিতে পড়িয়া গেল। অবাক্ হইয়া গিয়া) এ আবার কি খেলা! এ বুঝি শ্যামসুন্দর-খেলা!

নদেরচাঁদ ॥ শ্যামসুন্দরের খেলা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন) শ্যামসুন্দরের খেলা!

মহুয়া ॥ (হুমড়াকে) বাপুজী, এ কি! ও কাঁদে কেন?

হুমড়া ॥ ও ভেবেছিল এ-দেশের রাজকন্যা মরে ওর রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক করেছে। এখন জানা যাচ্ছে রাজকন্যা মরেনি।··এখন সেই রাজকন্যা এসে এই সম্পত্তি দাবী করছে···তাই ওর কান্না—

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদকে) তাই তুমি কাঁদছ? কোথায় সে রাজকন্যা? সে কি পাথর নাকি? এই কান্না দেখেও চুপ করে সে বসে আছে?

হুমড়া ॥ সে এসে কি করবে ?

মহুয়া ॥ (এগিয়ে) বলবে তুমি কেঁদো না। আমি হ'লে আরো বেশী বলতাম।

হুমড়া ॥ কি বলতিস্ ?

মহুয়া ॥ বলতাম···না বলবো না। আমার লজ্জা করে!

হুমড়া ॥ তোর আবার লজ্জা! কি বলতিস্ তুই ?

মহুয়া ॥ বল্‌তাম আমায় বিয়ে কর, তোমায়ও আমি পাব, তুমিও রাজকন্যা পাবে—

হুমড়া ॥ বটে! বটে হুম্। (মুহূর্ত-কাল কি ভাবিয়া হঠাৎ নদেরচাঁদের প্রতি)···ঠাকুর, তোমার রাজ্য তোমারি থাক। সেই রাজকন্যাকেই তোমার বিয়ে করতে হবে—

নদেরচাঁদ ॥ (অগ্নিময় দৃষ্টিতে হুমড়ার পানে তাকাইলেন—মুখে কোন কথা বাহির হইল না।)

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদকে) কথা কইছ না যে ?···বুঝেছি, বাপুজি তবে ও রাজী।

হুমড়া ॥ রাজী না হ'য়ে যায় কোথায় ? সম্পত্তির লোভ বড় লোভ। কি, তবে বাবাজী রাজী ?

নদেরচাঁদ ॥ তোমার এ প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—

হুমড়া ॥ বটে! তবে সম্পত্তিতেও পদাঘাত করছ ?

নদেরচাঁদ ॥ হাঁ, করছি। সম্পত্তির লোভ করিনা। নিয়ে এস কোথায় তোমার রাজকন্যা। দাও তাকে সর্ব-সম্পত্তি। সেখানে আমার কোন ভিক্ষা চাইবার নেই, চাইতে ঘৃণা বোধ করি, চাই না। কিন্তু···(স্বর কাঁপিয়া উঠিল) তবু আমি ভিক্ষুক। তুমি যে দুনিয়ার ঘৃণ্যতম ভিক্ষুক সেই তোমারি দুয়ারে আজ আমি ভিক্ষুক। তোমারি কাছে···সেই রাজনন্দিনী নয়, ঐ বেদেনী! পিতার শির নিয়েছ, মুমূর্ষু পিতার মার্জনা পেয়েছ, শ্যামসুন্দরের করুণা পেয়েছ, ভাগ্যদেবতার হে প্রিয়তম ব্যাধ, আমার আরো যা আছে সব লুণ্ঠন কর ·· আমার জাতি নাও···কুল নাও···মান সম্ভ্রম সব নাও··· পরিবর্তে আমায় সম্প্রদান কর তোমার ঐ পঙ্কতিলক নন্দিনী!

মহুয়া ॥ বাপুজি, ও কি বলে ? ওর একটা কথাও তো আমি বুঝলাম না!

হুমড়া ॥ ও তোকে বিয়ে করতে চায়। করবি ওকে বিয়ে ?

মহুয়া ॥ সেই রাজকন্যা ?

হুমড়া ॥ ও সে রাজকন্যাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে!

মহুয়া ॥ রাগটি তো কম নয়! কোনদিন-বা আমাকেই···

নদেরচাঁদ ॥ (সকাতরে) মহুয়া! মহুয়া!

মহুয়া ॥ ওতে আমি ভুলছি না। আমি ঐ শ্যামসুন্দর পাবো? এই মন্দির? ঐ বাগান-বাড়ি?

নদেরচাঁদ ॥ না মহুয়া, এসব আর আমার নয়। আমার বলতে আজ আর কিছু নেই। আমার আজ আছে শুধু আকাশ, শুধু বাতাস, শুধু ঐ নদীর জল, গাছের ফল! এ বাড়ি ঘর, এ নাটমন্দির, এ সম্পত্তি, এখন সব এক রাজকন্যার—

হুমড়া ॥ (আপন মনে বিড়বিড় করিয়া ভাবিতে ভাবিতে) রাজকন্যা!

রাজকন্যা ॥ (হঠাৎ মহুয়াকে) আয় বেটি ··আয় তোর পিঠের কাপড়খানি তোল দেখি একবার···অনেকদিন চাবুক মারিনি, আজ শেষ এক ঘা পড়ুক পিঠে—

মহুয়া ॥ (সকৌতুকে নদেরচাঁদের কাছে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে) তুমি চাবুক মারতে মানা কর না—!

হুমড়া ॥ (হাসিয়া) বহুৎ খুব। ওরে মানিক···আর দেখছিস্ কি··· বিয়ের বাজনা বাজা। (নদেরচাঁদকে) তবে এই বেদেনীকেই বিয়ে করবে?

নদেরচাঁদ ॥ হ্যাঁ—

হুমড়া ॥ জাত···কুল···মান?

নদেরচাঁদ ॥ (মহুয়ার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া) এই আমার জাত···এই আমার কুল···এই আমার মান।

হুমড়া ॥ (ব্যঙ্গে) জাত? কুল? মান? একে অন্তঃপুরে ঠাঁই দিতে পার?

নদেরচাঁদ ॥ প্রমাণ চাও? এসো মহুয়া—(মহুয়াকে টানিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেলেন।)

হুমড়া ॥ হুম্। (দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। যখন আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, তখন) মানিক!

মানিক ॥ (ছুটিয়া আসিয়া) কি দাদু?

হুমড়া ॥ কি হ'ল?

মানিক ॥ ভালোই হ'ল। সম্পত্তি নিজেরা দাবী করলে ফ্যাসাদ ছিল বিস্তর···কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ উঠতো। কাজীর বিচারে সেই ডাকাত··· সেই খুন-জখম সব ধরা পড়ে যেতো। তার চাইতে নদেরচাঁদ-ঠাকুর বেদেনীকে করল বিয়ে···আমাদের কুল উজ্জল হ'ল। যদি কখনো বেদেনী ব'লে তাকে ঘৃণা করে, তখন প্রকাশ ক'রে দেবো এ বেদেনীই রাজকন্যা।

হুমড়া ॥ না—না—সে কতক্ষণ গেছে! নদেরচাঁদ-ঠাকুর হয়ত তাকে বোঝাচ্ছে সেই তার সব···আমি কেউ নই, বোঝাচ্ছে সে তার স্বামী, স্বামীর চাইতে বড় কেউ নয়, যে তাকে পিতার স্নেহে লালন করেছে সে কেউ নয়, যে

তাকে মাতার মমতায় পালন করেছে সে কেউ নয়। কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে…নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ওকে বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছি। কত দুঃখ—কত দারিদ্র্য এসেছে আর চলে গেছে, ওকে তার এতটুকু আঘাত সইতে দিই নি। নিজে না খেয়ে ওর মুখে রুটি দিয়েছি, পিপাসার জলটুকুও ওরই মুখে ধরেছি, তাতেই আমার ক্ষুধা মিটেছে, পিপাসা মিটেছে, কিন্তু আজ? আজ যে ওকে হারিয়ে রাজরাজেশ্বর হলেও কে মেটাবে এই বুকের ক্ষুধা, প্রাণের পিপাসা! না—না আমার সেই পোড়া-রুটিই ভালো, আমার সেই ছেঁড়া-তাঁবুই ভালো, আমার সেই দুঃখই সোনা, দারিদ্র্যই মধু, শুধু তুই আয় মহুয়া—মহুয়া— (সোপানের প্রথম ধাপে ছুটিয়া আসিল মহুয়া)

মহুয়া॥ বাপুজি! বাপুজি! তুমি আমায় ডাকছ?

হুমড়া॥ (চাপা গলায় ইঙ্গিতে) আয়!

মহুয়া॥ (সোপান-পথে তর্ তর্ করিয়া নামিয়া আসিয়া হুমড়ার বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়া) কি বাপুজি?

হুমড়া॥ চল্—

মহুয়া॥ (সবিস্ময়ে) কোথায়?

হুমড়া॥ আমার সেই মাটির ঘরে আমার সেই ছেঁড়া-তাঁবুর তলায়—

মহুয়া॥ না—না, আমি যাব না। আমি যে এখানে শ্যামসুন্দর পাব! আর কোথাও আমি যাব না—

হুমড়া॥ ছিঃ বেদের মেয়ে শ্যামসুন্দর নেয় না,—ছিঃ!

মহুয়া॥ না—না, আমি নেব—(সিঁড়ির দিকে ছুটিল)

হুমড়া॥ রক্তে টানে! রক্তে টানে! ওরে, না—না, শোন্…তোর পায়ে পড়ি মা শোন্—

মহুয়া॥ (সর্দার তাহার পায়ে পড়িবে—শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তখনি আবার ছুটিল) না—

হুমড়া॥ (ছুটিয়া সোপানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সোপানের উপরে অবস্থিতা মহুয়ার একখানি হাত চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া) তোকে যেতেই হবে!

মহুয়া॥ শ্যামসুন্দর! আমার শ্যামসুন্দর! (কাঁদিয়াই ফেলিল।)

মানিক॥ তুমি কি করছ সর্দার? ওকে নিয়ে পালালে…এই ঘর-বাড়ি —এই ধন-দৌলত—

হুমড়া॥ (যেন মৃত্যুকাল উপস্থিত) না-না—আমি চাই না। ওকে পর করতে আমি পারব না…তবে আমি বাঁচবো না—বাঁচবো না—(মহুয়াকে বুকে নিয়া ছুটিল)

মহুয়া॥ শ্যামসুন্দর! আমার শ্যামসুন্দর!

হুমড়া॥ না-না—[পলায়ন]

মানিক ॥ শোনো সর্দার—শোনো—

হুমড়া ॥ (নেপথ্য হইতে) না—না—(মানিক তাহার অনুসরণ করিল। সোপানের ঊর্ধ্বে প্রথম ধাপে নদেরচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইলেন।)

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! (নীচে ছুটিলেন) মহুয়া! (নীচে নামিয়া আসিয়া) মহুয়া! সর্দার!—কেউ নেই! কোথায় গেল? (দেবদাসীগণ শ্যামসুন্দরের আরতি দিতে আসিল ও মন্দিরে প্রবেশ করিল।) তবে কি সবই স্বপ্ন? সবই মায়া? সবই মোহ? (দূর হইতে ভাসিয়া আসিল গৃহ-গামী বেদের দলের চীৎকার—"ভানুমতীর খেল! ভানুমতীর খেল্! "ভানুমতীর খেল্!" (নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন।) ঐ মহুয়াই কি ভানুমতীর খেল্? সেই আলো …সে কি আলেয়া? সেই চোখ সেই মুখ সে কি মরীচিকা? মহুয়া! মহুয়া! (মহুয়ার উদ্দেশে ছুটিলেন। তখনি সাঁঝের শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নদেরচাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।) আরতি! আরতি! জীবনের কর্তব্য! কর্তব্যের জীবন! (বেদের মাদলধ্বনি ভাসিয়া উঠিল) কিন্তু ঐ বেদের মাদল! ঐ বেদের মাদল! ও যে আমায় পাগল করে!…মহুয়া! শ্যামসুন্দর!… শ্যামসুন্দর! মহুয়া!

[প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[হুমড়া বেদের বাড়ি। চৌচালা ঘর। সম্মুখে প্রাঙ্গণ। চারিদিকে মানুষ-প্রমাণ বালঞ্চের বেড়া। এক পার্শ্বে একটি মাত্র দরজা। মহুয়া ও পালঙ্ক।]

মহুয়া ॥ আবার বিয়ে কি রে? বিয়ে তো আমার হয়েই গেছে!

পালঙ্ক ॥ তোর কথায় তো তাই বুঝেছিলাম। কিন্তু সর্দার আজ ঘুম থেকেই উঠে হুকুম দিয়েছে আজ এই পূর্ণমাসীর চাঁদে তোর বিয়ে হবে!

মহুয়া ॥ আর সেই নদেরচাঁদের সঙ্গে আমার যে বিয়েটি হ'ল…সেটি বুঝি বিয়েই নয়? আমি যাচ্ছি এখনি সর্দারের কাছে—

পালঙ্ক ॥ গিয়ে লাভ নেই। বিয়ের সব আয়োজন শেষ হয়ে গেছে, আর জানিস্ তো সর্দারের রোখ—

মহুয়া ॥ আর এদিকে যে আমি নদের-ঠাকুরের কাছে খবর পাঠিয়েছি আজ যেন সে এখানে এসে আমায় নিয়ে যায়; তার কি হবে?

পালঙ্ক ॥ কি যে হবে তা জানি নে।

মহুয়া ॥ ওরে, ঠিক ধরেছি। আচ্ছা, তা কার সঙ্গে সর্দার আমার বিয়ে দেবে ঠিক করেছে? বোধ করি সুজন, না?

পালঙ্ক ॥ না—না—সুজন নয়। কে যে তোর বর তা কাউকেই জানায়

নি। বর যে কে, সে শুধু জানে সর্দার। বরের নাম ভারী গোপনে রেখেছে। ঐ সুজনও বলতে পারে না। কে যে বর এইটে জানবার জন্ত ও আজ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে. বেশ হয়েছে—!

মহুয়া ॥ তুইও দেখছি হাঁপিয়ে উঠেছিস্। তা দেখ, আমি ঠিক ধরেছি আমার কথায় রাখাল নদেরঠাকুরের কাছে গিয়ে বলে এসেছে, সে যেন আজ এখানে এসে তার বৌ নিয়ে যায়।

পালঙ্ক ॥ তা কি সে আসবে ?

মহুয়া ॥ আসবে। রাখাল সেখান থেকে ফিরে এসেই আমায় বলে গেছে।

পালঙ্ক। তবে আবার বিয়ের যোগাড় কেন ?

মহুয়া ॥ সর্দার খুব একটা খেলা দেখাবে তাই। নিশ্চয় সর্দার রাখালের কাছে খবর পেয়েছে নদেরঠাকুর আসবে। বরের নাম যে সর্দার গোপন রেখেছে এখন বুঝলি তার মানে ? ঠিক বিয়ের আগে আমার সেই ঠাকুরকে বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবে! সকলে হো-হো করে হেসে উঠবে! তা আমিও ভাব দেখাব যেন আমি কিছুই জানিনে। তুইও তাই, বুঝলি ?

পালঙ্ক ॥ তা যদি হয়, সোনায় সোহাগা হবে। তোদের দুটিতে যা মানাবে যেন ঠিক মানিকজোড় !

মহুয়া ॥ আর তোদের দুটিতে ? তুই আর সুজন ? যেন চখা-চখি !

পালঙ্ক ॥ চোখ নেই ভাই, কারো চোখ নেই। তোর যে ঐ দুটি চোখ ·· চোখ নয় তো যেন দুটি নীলকুমুদ!

মহুয়া ॥ (পালঙ্কের ফুলের সাজি হইতে খপ্ করিয়া নীলকুমুদ তুলিয়া লইতে গেল) তবে দে আমার চোখ আমায় দে···

পালঙ্ক ॥ (যেন তাহার সর্বনাশ হইয়া যায়) না—না—ও দুটি আমি দিতে পারব না! তোকে তো কতবার বলেছি, সারা বিলে আজ ঐ দুটি নীলকুমুদই ফুটেছিল, আর একটিও নেই। ও দুটি নীলকুমুদ যে ভাই আমি সুজনের নামে মানত্ করেছি। মানতের ফুল, ওতো ভাই কাউকে দিতে পারি না! তুই বরং একটা নাগকেশর নে—

মহুয়া ॥ বটে! নীলকুমুদ নয়, নাগকেশর ? কে চায় তোর নাগকেশর ? একে তো তোর নাগরের জ্বালায় জ্বলছি তার ওপর নাগকেশর! শুনবি তবে তোর নাগর আমায় কি বলেছে আজ ?

পালঙ্ক ॥ বল দেখি—বল দেখি—

(মহুয়ার গান)

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।

সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী ॥
সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল,
এল পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী।
আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখি, 'পিউ কাঁহা',
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী ॥

পালঙ্ক ॥ এ কথা সে বলেইনি—

মহুয়া ॥ একশবার বলেছে। না—না, একশ একবার।

পালঙ্ক ॥ তবে ভুল করে বলেছে। আমি জানি ও এমনি ভুল করে। কথাগুলো বলতে চায় আমাকে, এমনি ওর ভুল, বলে' ফেলে তোকে!

মহুয়া ॥ এ কথা আমি মানতে রাজী আছি যদি—

পালঙ্ক ॥ যদি?

মহুয়া ॥ (যেন সোনারূপা বা অমনি আর কিছু চাহিবে ভাব দেখাইয়া, হঠাৎ) ঐ দুটি নীলকুমুদ আমায় দিস্—

পালঙ্ক ॥ কতবার বলব ভাই? ও যে আমার মানতের!

মহুয়া ॥ বটে? আচ্ছা—(প্রস্থানোদ্যোগ)

পালঙ্ক ॥ নেই ভাই আর কোথাও নেই, গিয়েও পাবি নে—

মহুয়া ॥ দে—খি…। [প্রস্থান]

["মহুয়া" "মহুয়া" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্য দিক দিয়া সুজনের প্রবেশ]

সুজন ॥ মহুয়া—

পালঙ্ক ॥ কি ভাই?

সুজন ॥ তোকে নয়।

পালঙ্ক ॥ ঐ আমাকেই। তোমার মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়!

সুজন ॥ আঃ তুই যা। তোকে বাপুজি ডাকছে—

পালঙ্ক ॥ ঐ হ'ল। বাপুজি আর ব্যাটা একই কথা—

সুজন ॥ তোকে ডেকেছে সর্দার…

পালঙ্ক ॥ ঐ হ'ল—বাপ আর বেটা একই কথা!

সুজন ॥ জ্বালাস্নে বলছি—দেরী করিস্নে, শীগ্গীর যা—

পালঙ্ক ॥ না ভাই, আমায় তাড়াস্নে, ঐ যে পূর্ণমাসীর চাঁদ উঠেছে, কংসাইএর জলে সোনা ফুটছে, তুই বসে বাঁশী বাজাবি, আমি তোর মালা গাঁথব …কেমন হবে ভাই কেমন হবে?

সুজন ॥ ভারী ভীষণ হবে। জানিস তো সর্দারের রাগ, আজ দেখলুম ভারী গরম। তোকে খুঁজছে।

পালঙ্ক ॥ তোর ভুল হয়েছে। খুঁজছে মহুয়াকে। আমায় খুঁজবে কেন?

সুজন ॥ কেন, জানিনে। সেইটে জেনেই না-হয় আয়—

পালঙ্ক ॥ বেশ, তাই না হয় আসছি। এই ফুলগুলি নে, কত কষ্ট করে তুলেছি, পায়ে কত কাঁটা ফুটেছে, এখনো রক্ত ঝরছে—

সুজন ॥ বেশ ফুল তো! বাঃ—এ দুটি নীলকুমুদ পেলি কোথায় রে?

পালঙ্ক ॥ আর কোথাও একটি নেই। মহুয়া খুঁজে মরছে, সারা বন আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজছে, কিন্তু আর পেতে হয় না, মাত্র এই দুটিই ছিল, আমি তোর জন্য তুলে এনেছি—

সুজন ॥ বটে! তা আমি নিলুম, তোর নীলকুমুদ ফুল নিলুম—

পালঙ্ক ॥ শুধু নীলকুমুদ কেন, সব নাও—আমার যা আছে, সব নাও—

সুজন ॥ কিন্তু তুই বড্ড দেরী করছিস্, শীগগীর যা, সর্দার তোকে অনেকক্ষণ খুঁজছে—আজ কত কাজ আছে! আজ যে মহুয়ার বিয়ে!

পালঙ্ক ॥ যাই। মালা গাঁথতে পারলাম না, এই দুঃখ রয়ে গেল··· (হঠাৎ ফিরিয়া) না—মালাও তো রয়েছে! আজ আমার ফুল তোর ভালো লেগেছে, চোখে ধরেছে, আজ কি তোকে মালা না দিয়ে পারি? নে, আমার এই মালাটি আজ তুই নে—(গলদেশ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া) আঃ কি সুন্দর মানিয়েছে! পূর্ণমাসীর চাঁদ যদি কেউ হয়, তবে সে তুই, তারার মালা তোকে ঘিরে আছে—ঐ আকাশে চাঁদ উঠেছে···ঐ—ঐ—আমার ঠিক মনে হচ্ছে ওখানেও তুই ই। তুই-ই!···তুই-ই!

[পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়াছিল। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।]

সুজন ॥ আমি নই, আমি নই, ও আমাদের মহুয়া! এই মুক্তোর মালা ·· সেদিন তার গলায় দেখেছিলুম, বলেছিলুম সে যেন পূর্ণমাসীর চাঁদ, তারার মালা তার গলা ঘিরে আছে। শুনে সে ভারী খুশী হয়েছিল। কিন্তু আজ কি সে খুশী হবে যদি সর্দার এই রাত্রে ঐ মহুয়া-মালা আমারি গলায় পরিয়ে দেয়···ঐ (মহুয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল—"কত খুঁজিলাম নীলকুমুদ তোরে!") সে গান গেয়ে আসে, জানিনা আজ রাত্রে এ ভাগ্যে কি লেখা আছে! কিন্তু··· কিন্তু যদি আমার ভাগ্যাকাশেই ও-চাঁদ ওঠে, তবে ও-চাঁদ কি জ্যোৎস্না শতদলেই ফুটে উঠবে, না—মেঘের অন্তরালে মুখ লুকিয়ে কাঁদবে? (গাহিতে গাহিতে মহুয়ার প্রবেশ, কিন্তু সুজনকে দেখিয়াই গান বন্ধ করিল।)

সুজন ॥ থামলে যে?

মহুয়া ॥ আমার খুশী। গান তো আর গাবই না, তোর সঙ্গে কথা কইব

না, তোর দিকে চাইব না, তোর মুখ দেখব না। (সুজনের দিকে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।)

সুজন ॥ আমি কি করলাম মহুয়া!

মহুয়া ॥ (ভেংচাইয়া) আমি কি করলাম মহুয়া!

সুজন ॥ বা—রে!

মহুয়া ॥ (চট্ করিয়া ঘুরিয়া তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) বা—রে! তা—না—না না—না—রে! ভেঁ—পু কেন বাজে রে?

সুজন ॥ আজ যে তোর বিয়ে রে!

মহুয়া ॥ কার সাথে রে?

সুজন ॥ (এই রঙ্গরসের মধ্যে মহুয়ার এই প্রশ্নে সুজন কাঁপিয়া উঠিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল) তা তো জানিনে মহুয়া…

মহুয়া ॥ তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়…

সুজন ॥ নিশ্চয় নয় কেন মহুয়া? যদি ভাগ্যবশে তাই-ই হয়?

মহুয়া ॥ যদি তাই-ই হয়! সাধ দেখ! আমায় গাল দিচ্ছিস? বটে! (তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে আবার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ক্রন্দন স্বর মিশ্রিত ঝগড়াটে কণ্ঠে) তোকে যেন ভূতে পায়, পালঙ্ক-পেত্নী যেন তোর বৌ হয়, একটা হুলো-বেড়াল যেন তোর ছেলে হয়, একটা নেংটে ইঁদুর যেন তোর মেয়ে হয়, আর একটা নেকড়ে বাঘ যেন তোদের ঘাড় মটকায়—হাঁ…

সুজন ॥ ওরে—থাম্—থাম্ (শ্লেষে) তবে কি বিয়ে হবে ঐ নদেরচাঁদের সঙ্গে?

মহুয়া ॥ (তখনি আবার তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) তাই বল।

সুজন ॥ খুব খুশী হয়েছ?

মহুয়া ॥ কি মিষ্টি তোর কথাগুলি! আচ্ছা ভাই সুজন, তুই মিছিমিছি বাঁশী বাজাস্ কেন? বাঁশ কাটতে হয়, চাঁচতে হয়, ফুটো করতে হয়, ফুঁ দিতে হয়, তবে বাঁশী বাজে। এত কষ্ট করবার দরকার কি? তোর কথাই যে বাঁশী রে! বললি তুই "বিয়ে হবে নদেরচাঁদের সঙ্গে" বললি তো নয়…যেন বাঁশী বেজে উঠল!

সুজন ॥ খুব খুশী হয়েছ মহুয়া, না?

মহুয়া ॥ খুশী? ও আমার বাঁশী-ভাই, ঐ পালঙ-সই তোকে বিয়ে করতে না চাইলে আমিই তোকে বিয়ে করতাম, এত খুশী হয়েছি! কিন্তু কি করব, ঐ পালঙ-সই, সে কি আমায় কম দাগা দিয়েছে?

॥ গান ॥

কত খুঁজিলাম নীলকুমুদ তোরে।
আছে নীল জলে ওনো সরসী ভ'রে॥

উঠেছে আকাশে চাঁদ, ফুটেছে তারা,
আছে সব, একা মোর কুমুদ-হারা।
অভিমানে সে কি গিয়াছে ঝ'রে॥
বিল ঝিল খুঁজি, নাই সে যে হায়,
হৃদয় শুধায় চোখে, কোথায় কোথায়!
ঘুমায়ে আছে সে কি আছে লুকায়ে,
সোঁদামাখা এলোচুল গেল শুকায়ে
নদীরে শুধাই—জল যায় যে স'রে॥

মহুয়া॥ কত খুঁজলাম কুমুদফুল, বনের ঐ বিলের মাঝে, নদীর ঐ নীল জলে, পেলুম না, পেলুম না!

সুজন॥ এই নাও, এই নাও! (পালঙ্কপ্রদত্ত কুমুদফুল সুজন তাহার হাতে তুলিয়া দিল) আরো যা আছে, সব নাও! আমার যা-কিছু আছে সব নাও (ফুলে ফুলে মহুয়ার সাজি ভরিয়া দিল)

মহুয়া॥ (হাসিয়া) ও কার ফুল?

সুজন॥ যারই হোক, তোমার। যার যত ফুল আছে, যার যত রূপ আছে, যার যত মধু আছে, সব তোমার! তোমার বলেই; ফুল হয়েছে ফুল, রূপ হয়েছে অপরূপ, মধু হয়েছে মধুর!

মহুয়া॥ কত যে কি বল মনেও রাখতে পারিনে ছাই!

সুজন॥ কিছু মনে রাখতে হবে না। তুমি শুধু আমায় বলতে দিয়ো, তুমি শুধু নিয়ো···

মহুয়া॥ কি দিবি?

সুজন॥ কি চাও?

মহুয়া॥ কি চাই, কি চাই (ভাবিয়া লইয়া হঠাৎ) তোর গলার ঐ মালা—

সুজন॥ নাও—নাও মালা। বরের গলায় মধুরাতে যে মালাটি তুমি দেবে, সেই মালাটি আমার হাতে নাও। এ মালা যার গলায়ই দাও···দিয়ো, কিন্তু তার আগে তোমার গলায় ঐ মালাটি দাও। মহুয়া, একটিবার দেখতে দাও আমার পূর্ণমাসীর চাঁদ—তারার মালা গলায় পরে আমার পূর্ণমাসীর চাঁদ! (গলায় পরাইয়া দিল)

মহুয়া॥ হাঁ পূর্ণমাসীর চাঁদ···উঠেছে। (নিকটেই মাদল বাজিয়া উঠিল) মাদল! মাদল! তারি সঙ্গে বাজে ঐ মাদল! ওরে সুজন, কোথায় তোর বেণু? কোথায় আমার বাঁশী? পূর্ণমাসীর চাঁদ উঠেছে, সোনার-চাঁদ রথে আসছে—আজ আমার বর আসছে···

॥ গান ॥

ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥
স্বপন মাখিয়া সোনার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥
হিজল-বিছানো বনপথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া।
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥
চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো-ছায়ায়,
বহিছে পবন গন্ধ-চোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥ [গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

সুজন ॥ বর আসছে! বন্ধু আসছে! কেই-বা বর? কেই-বা বন্ধু? স্বপন মেখে আসছে! সোনার পাখায় আসছে! কোথা থেকেই-বা আসছে? কে বুঝবে খেয়ালী মেয়ের ঐ হেঁয়ালী? ও কে? সর্দার! এইবার বুঝি ভাগ্যপরীক্ষা। কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

[হুমড়া সর্দার ও পালঙ্কের প্রবেশ]

হুমড়া ॥ কে, সুজন? এখানে? বাইরে মিছিলের আয়োজন হচ্ছে, আর তুই এখানে?

সুজন ॥ আমি—আমি—এই হ'ল গিয়ে—তার মানে—এই ধর সর্দার—আমি বরং মিছিলেই ঢুকে পড়ছি—(লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

হুমড়া ॥ হুম্। দাঁড়াও, যখন এতক্ষণই ঢোক নি, তখন···

সুজন ॥ বল সর্দার—

হুমড়া ॥ হাঁ তখন শীগ্‌গীর বিলে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এস।

সুজন ॥ আমি ডুব দিয়েই এসেছি সর্দার। বরং আমি রংমশালগুলো জ্বালাই।

হুমড়া ॥ না, এখন নয়। সেগুলো বিয়ের সময় জ্বলবে। তুমি বরং··· আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়িয়েই যাও।

সুজন ॥ হাঁ সেই ভালো সর্দার, সেই ভালো।

হুমড়া ॥ কিন্তু মহুয়া গেল কোথায়? দেখছি একেই বলে,

"যার বিয়ে তার হুঁস নাই
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!"

গেল কোথায়? মহুয়া? [ছুটিয়া মহুয়ার প্রবেশ]

মহুয়া ॥ কি বাপুজি?

হুমড়া ॥ আজ যে তোর বিয়ে—

মহুয়া ॥ নাচি বাপুজি?

হুমড়া ॥ আঃ খালি নাচ আর নাচ। নাচতে নাচতে পা দুটো ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষকালটায় হাঁটু দুটোই থাকবে—[মহুয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। এবং হাঁটু দুইটিই নাচাইতে লাগিল] শেষে ও-হাঁটু দুটোও যাবে ক্ষয়ে—[মহুয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল] থাকবে শুধু ঐ মাথাটা—[মহুয়া শুইয়া শুইয়া মাথাটি নাচাইতে লাগিল] শেষে দেখছি, মাথাটাও যাবে—

মহুয়া ॥ তখন চুলগুলো—তখন চুলগুলো—

হুমড়া ॥ [চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে] ওঠ্, বেটি ওঠ্—ওঠ্—[মহুয়া "উ—উ—উ" করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।] কেমন, আর নাচবি?

মহুয়া ॥ উ-উ-না—

হুমড়া ॥ শোন এইবার। আজ তোর বিয়ে—আর এই তার গয়না··· দেখেছিস্?

মহুয়া ॥ দেখি। [পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা]

হুমড়া ॥ পালঙ। [পালঙ্ক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।] মহুয়াকে এই সব দিয়ে কনে সাজিয়ে দে। বৈচির চুড়ি, বাজু, কামরাঙা শাঁখা, উদয়তারা শাড়ি, চন্দ্রহার, আংটি, নূপুর, দুল···

[এক একটি গয়নার নাম করিয়া তা উচু করিয়া তুলিয়া ধরিল, যাহাতে মহুয়া হাতে পাইয়া কাড়িয়া না লয়। নাম বলিয়া উহা পালঙ্কের থালায় রাখিতে লাগিল। এদিকে মহুয়া প্রথম গয়নাটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেও শেষে গয়নার নাম শুনিয়া ও দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা। এক একটি গয়না দেখে আর এক-এক রকম উল্লাস প্রকাশ করে। কোনটি দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, কোনটি দেখিয়া বিস্ময়ে প্রকাণ্ড 'হাঁ' করিয়া বসিল, কোনটি-বা দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে হাত-পা ছুড়িতে লাগিল—]

মহুয়া ॥ এ স—ব আমার?

হুমড়া ॥ স—ব তোর—

মহুয়া ॥ পালঙ-সই, চেয়ে কি দেখছিস, ওগুলোও কি [সুজনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া] মানত্ করছিস নাকি? দোহাই তোর—

পালঙ্ক ॥ বাপুজি, এই নাও থালা। এ আমি বইতে পারব না। মিছিমিছি কথা শুনবে কে?

মহুয়া ॥ মিছিমিছি ?

হুমড়া ॥ আরে থাম্—থাম্। বিয়ের রাতে ঝগড়া করলে ছেলেপিলেগুলো কুকুর বেড়াল হয়! যা পালঙ্, যা—সইকে কনে সাজিয়ে আন—

মহুয়া ॥ [পালঙ্ককে] মিছিমিছি ? ব'লো! [হুমড়াকে] কি দিয়ে আমি কনে সাজব ? আমি সাজব না।

হুমড়া। কেন বেটি ? ঐ যে গয়না-কাপড় দিলুম—

মহুয়া ॥ শুধু গয়না-কাপড়ে সাজা হয় ?

হুমড়া ॥ তবে ?

মহুয়া ॥ ফুল লাগবে না ?

হুমড়া ॥ ফুল! ওরে পালঙ ফুল তুলিস নি ?

পালঙ্ক ॥ তুলেছি। সেই ফুল দিয়েই তো সাজাব!

মহুয়া ॥ আমি চাই নীলকুমুদ না পেলে আমি সাজব-ই না।

হুমড়া ॥ পালঙ, ওকে নীলকুমুদ এনে দিস্—

সুজন ॥ হাঁ—হাঁ তা দেবে বই কি! তা দেবে বই কি!

মহুয়া ॥ [সুজনকে] পেলে দেবে বই কি! তুমি তো আর দেবে না, তা ও কোত্থেকে দেবে বাপুজী ? সারাটি বিলে দুটিমাত্র নীলকুমুদ ছিল। [পালঙ্ককে] সত্যি ভাই সই! সারা বিলে আর একটিও নেই। যে দুটি মাত্র ছিল, পেয়ে গেছি আমি। [ফুল দুটি বাহির করিল] কিন্তু এ দিয়ে তো আমি সাজতে পারব না: [পালঙ্ককে ভেংচাইয়া] এ যে ভাই আমার মানতের। [বলিয়াই ফুল দুইটি পালঙ্কের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।]

পালঙ্ক ॥ [সুজনের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল] তোর মনে এই ছিল! আর আমার মালা ? আমার মালা ?

মহুয়া ॥ [পালঙ্ককে জড়াইয়া ধরিয়া] আরে, ও না দেয়, আমি দেব, আয় না তুই—[তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল]

হুমড়া ॥ হুম্। কিছু একটা ঘটেছে, না ? যাক্ গে। পালঙ, শোন্ আমরা মিছিল করে বর নিয়ে আসছি—

সুজন ॥ বর ঠিক হয়ে গেছে ?

হুমড়া ॥ আঃ থামো না। পালঙ, তুই মহুয়াকে বিয়ের ক'নে সাজা। আমরা বর নিয়ে এলুম বলে—

মহুয়া ॥ কে বর ?

হুমড়া ॥ সে দেখবি এখন। বর নিয়ে এলে এখানে হবে বাক্‌দান। তারপর শেষরাত্রে হবে বিয়ে। আয় সুজন—

পালঙ্ক ॥ কিন্তু বরটি কে ?

হুমড়া ॥ [চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল] ঐ সুজন। [প্রস্থান]

[সুজন ছিল তাহার পশ্চাতে। চমকিয়া উঠিল। মহুয়া ও পালঙ্ক একসঙ্গেই মর্মাহত হইল। পালঙ্কের হাত হইতে অলঙ্কারের থালা পড়িয়া গেল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মহুয়া পার্শ্বস্থ বেড়াতে হেলিয়া পড়িল। প্রথমে সুজনের নিকট সর্দারের এই বিধান আশাতীত সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, আশাতীত আনন্দে তাহার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়াছিল, কিন্তু যখনি মহুয়ার দিকে তাকাইল, তখনি তাহার অবস্থা দেখিয়া আশাহত হইল]

সুজন ॥ মহুয়া! [তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল]

হুমড়া ॥ [নেপথ্য হইতে] সুজন—

[সুজন চমকিয়া উঠিয়া একবার মহুয়া আর একবার হুমড়ার দিকে
চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।]

[ক্ষণকাল গভীর নিস্তব্ধতা। উভয়েরই এক ব্যথা। মহুয়া প্রথমে পালঙ্কের দিকে তাকাইল—কি ভাবিল—ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল—তাহাকে সস্নেহে এবং সমবেদনায় হাত ধরিয়া তুলিল। পালঙ্ক কাঁদিতে লাগিল।]

মহুয়া ॥ কাঁদিস কেন সই? সুজনকে আমি বুঝিয়ে বলব। তাতে যদি না শোনে, তার হাতে ধরে বলব, তাতেও যদি না শোনে তার পা ধরব।

পালঙ্ক ॥ না—না—(কাঁদিতেই লাগিল]

মহুয়া ॥ কেন কাঁদিস? তার চেয়ে সই তুই ওঠ, শীগগীর ওঠ, ঐ দেখ পূর্ণিমার চাঁদ কি জ্যোৎস্নাই ছড়িয়েছে! জ্যোৎস্নার ঐ রংএ কেন যেন শুধু আমার সেই সোনারচাঁদের কথাই মনে পড়ছে! আজই তো তার আসবার কথা, তুই দে সই, আমায় সাজিয়ে দে, দে ভাই দে—

পালঙ্ক ॥ [নীরবে, কিন্তু চোখে মুখে ব্যথা লইয়া মহুয়াকে সাজাইতে লাগিল। অন্যান্য বেদেনীগণ আরো নানারূপ ফুলাভরণ লইয়া গাহিতে গাহিতে আসিল।]

॥ বেদেনীদের গান ॥

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে
মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়াছে ভ'রে।
সাজাব কেমন ক'রে।
কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না-সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে॥
কেতকী ভাদর-বধূ ঘোম্‌টা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণী-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনীফুল মানে-মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে॥

গন্ধ-মাতাল চাঁপা ঢুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজী টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে ॥

[বেদিনীগণের প্রস্থান। রহিল শুধু মহুয়া এবং পালঙ্ক]

মহুয়া ॥ আমার মালা? আমার বকুলমালা? যে মালা আমি তার গলায় দেব সে মালা?

পালঙ্ক ॥ সে-মালা আজ তোমাকেই গাঁথতে হয়। আমি ফুল এনে দি, তুমি গাঁথো—

মহুয়া ॥ তুই গেঁথে দে পালঙ, তুই গেঁথে দে। আমার মন উতলা হয়ে উঠেছে, আমার চোখ কাঁপছে, আমার হাতে সুঁচ বিঁধবে।

পালঙ্ক ॥ মহুয়া-সই—মহুয়া-সই, তোমার হাতে বিঁধবে আর আমার বুকে বিঁধেছে—[ঘরে যাইতেছিল এমন সময় দূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল।]

মহুয়া ॥ ও কার বাঁশী? সই ও কার বাঁশী?

পালঙ্ক ॥ [চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল] তবে কি সে এসেছে?

মহুয়া ॥ এসেছে—সে এসেছে! চল, ওরে পালঙ, চল···

পালঙ্ক ॥ কোথায় যাবে? এখনি যে তারাও সবাই মিছিল নিয়ে এখানেই আসবে। এসে যদি তোমায় না পায়, একশ একটা ছুরি তখনি ক্ষেপে উঠবে। [দরজার দিকে অগ্রসর হইল]

মহুয়া ॥ কি হবে? সে কি এসে তবে ফিরে যাবে? আমি যাব সই আমি যাব—[দরজার দিকে অগ্রসর হইল]

পালঙ্ক ॥ সই! সই! যেতে হবে না সই, তিনি দুয়ারে—

[নদেরচাঁদের প্রবেশ]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ সোনারচাঁদ! সোনারচাঁদ! আমার শ্যামসুন্দর!

[ছুটিয়া তাহার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে যাইতেছিল—এমন সময় পালঙ্ক বাধা দিল]

পালঙ্ক ॥ ওরে সর্বনাশ, তারা যে এখনি এখানে ফিরে আসবে!

মহুয়া ॥ এসে খুশীই হবে। দেখবে আমার বর এসেছে—আমার শ্যামসুন্দর এসেছে!

নদেরচাঁদ ॥ আমি তোমার বর?

পালঙ্ক ॥ বড় গণ্ডগোলের কথা। তারা এসেই ওকে দেখলে তখনি ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে—

মহুয়া ॥ দেবেই তো! কেন দেবে না? তুই দেখ, ওরা কদ্দুর?

[পালঙ্ক বাহিরে গেল]

[নদেরচাঁদকে] তুমি কি আমার কম সর্বনাশ করেছ?

নদেরচাঁদ ॥ কি করেছি আমি ?

মহুয়া ॥ সারাদিন তুমি আমায় ভাবিয়ে মারো। সারাদিন মনে পড়ে তোমার মুখ—তোমার চোখ—তোমার কথা। কেন পড়ে ?

নদেরচাঁদ ॥ কেন পড়বে না ?

মহুয়া ॥ এই তো গেল সারাদিন। রাতেও কি কিছু কম? সারারাত তুমি আমায় ঘুমুতে দাও না। গাছের পাতা মর্মর করে, মনেহয় তুমি বুঝি এসেছ, ঝিঁঝিঁর রব শুনি—মনে হয় ওরা বুঝি তোমার সাড়া পেল। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি শ্যামসুন্দরের কথাও ভুলে যাই। এ সব কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ কেন ? কেন না ? কেন তোমার হাতে বাঁশী, পায়ে নূপুর, চোখে মায়া, বুকে মধু, মুখে মমতা ? ও তো আমার নয়, ও যে তোমার ! নাচলে, মন নেচে উঠল। ঐ কাজল-কালো আঁখিতে আমার পানে চাইলে, আমার চোখ ক্ষেপে উঠল ! আর সবার শেষে, যখন পালালে, মনে হল আমার মৃত্যুকাল এল। তখন শুনলাম তোমার বাঁশী। তারপর কি হ'ল জান ?

মহুয়া ॥ কি আবার হ'ল ?

নদেরচাঁদ ॥ কি হ'ল ? শ্যামসুন্দর তুমিও ভুলেছ, আমিও ভুললাম, মন্দিরের আরতি ভুললাম, পূজা ভুললাম। শুধু কি তাই ? "কিসের গয়া, কিসের কাশী, কিসের বৃন্দাবন, মনে হ'ল ত্রিভুবনে খুঁজব সেই বেদের মেয়ে।" লোকে বলে তোমার জাতি গেল।—যাক জাতি। বলে, কুল গেল। — যাক কুল। মান লজ্জা সেও যাক।…সব যাক, আমার সব যাক, সব গেছে। আজ আমার আর কিছু নাই। শুধু বল তুমি কি আছ ?

মহুয়া ॥ ছি—ছি, এতদূর ! লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর তোমার লজ্জা নাই। দড়ি কলসীও কি নাই ? জলে ডুবে মরলে না কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ "কোথায় পাব কলসী, কোথায় পাব দড়ি, তুমিই হও গহীন গাঙ" তাতেই আমি ডুবে মরি ! [দূর হইতে শোভাযাত্রার বাদ্য ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মহুয়া চমকিয়া উঠিল।] ও কি ?

মহুয়া ॥ তারা আসছে। তারা ছুটে আসছে।

নদেরচাঁদ। কেন ?

মহুয়া ॥ আমার বিয়ে দিতে—

নদেরচাঁদ ॥ বিয়ে দিতে ?

মহুয়া ॥ বলি দিতে। সেই সুজনের সঙ্গে !

নেপথ্যে পালঙ্ক ॥ সই—সই—তারা ছুটে আসছে !

নদেরচাঁদ ॥ বিয়ে দেবে !

মহুয়া ॥ বলি দেবে! বিয়ের নামে তারা আমায় বলি দেবে! [নদের-চাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল] বলি দেবে গো তারা আমায় বলি দেবে!

পালঙ্ক ॥ [ভিতরে ছুটিয়া আসিয়া] তারা এসে পড়েছে—তারা এসে পড়েছে—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

মহুয়া ॥ যাবো—যাবো—

পালঙ্ক ॥ কিন্তু এখন যাবে কেমন করে? তারা যে দুয়ারে এসে পড়েছে! [মাদলধ্বনি অতি কাছে শোনা গেল]

নদেরচাঁদ ॥ তবে!

পালঙ্ক ॥ আপনি ঐ বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে থাকুন। একটু ফাঁক পেলেই আমি ওকে আপনার হাতে দিয়ে আসবো! ঐ বুঝি তারা এলো—[ছুটিয়া দরজার বাহিরে প্রস্থান]

নদেরচাঁদ ॥ কিন্তু যদি সে সুযোগ না মেলে? মহুয়া, তবে—? তবে?

মহুয়া ॥ আমার এই মালাটি নাও, ওতে আমায় মনে পড়বে!

নদেরচাঁদ ॥ এ যে আমারি সেই মালা!

মহুয়া ॥ তোমার বলেই তো আজ আমার। তাই তো তোমায় দিতে পারলাম—[মাল্যদান। ছুটিয়া পালঙ্কের প্রবেশ। দরজা বন্ধ করণ]

পালঙ্ক ॥ তারা এসে পড়েছে—তারা এসে পড়েছে! যদি সইকে পেতে চান, তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।

মহুয়া ॥ হাঁ থেকো—

[বেদের-দল দরজায় করাঘাত করিয়া "দরজা বন্ধ কেন? খোল দরজা—খোল"—]

পালঙ্ক ॥ [বেদের-দল লক্ষ্য করিয়া] সইকে সাজাচ্ছি! [নদেরচাঁদকে পালাইতে ইঙ্গিত, নদেরচাঁদ বেড়া ডিঙাইয়া পলায়ন করিল। বেদেরা ঘন ঘন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল] এই খুলছি—[মহুয়াকে] তুমি সই শীগগির—ঘরে যাও। ঘরে গিয়ে ক'নে সাজ। যাও সই শীগগির যাও [মহুয়া যাইতেছিল] হাঁ, আর সেই বকুল-মালা ভুলো না—[মহুয়া ঘরে গেল। সেই মুহূর্তেই বরসাজে সজ্জিত সুজনসহ বেদের দল মহা উৎসাহে গান ধরিয়া প্রবেশ করিল।]

বেদে-বেদিনীদের গান ॥ মহুল গাছে ফুটেছে ফুল
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।
গুনগুনিয়ে ভোমর এল
গুণ ক'রে ওর ভোলালো মন ॥

—১৪

আউ'রে গেছে মু'খানি ওর,
কয়লো বাতাস খুলে আঁচোর,
চাঁদের লোভে এল চকোর
মেঘে ঢাকিসনে লো নয়ন ॥
কেশের কাঁটা বিঁধে পাথায়
র থ লো ওরে বেঁধে শাখায়,
মৌটুসী-মৌ-মদের মিঠায়
কপটে কর্ নিকট আপন ॥

হুমড়া ॥ আরে থাম—থাম্—
"যার বিয়ে তার হুঁস্ নেই
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই" !—

মহুয়া কই ?

পালঙ্ক ॥ সে ঘরে বসে বকুলমালা গাঁথ:ছ।

হুমড়া ॥ এখনো কি বকুলমালাই গাঁথা হয়নি? এতক্ষণ কি সব ঘুমিয়ে ছিলি নাকি? নাড়াবান্ধা হবে কখন? আর হিজলতলায়ই-বা যাবি কখন? মহামুস্কিলেই পড়েছি দেখছি—(সোজা ঘরে চলিয়া গেল)

(বেদেবে.দনীগণের নৃত্যগীত)
"মহুল গাছে ফুটে.ছ ফুল—
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।"

[নৃত্যগীতের মধ্যে পালঙ্ক নাচিয়া নাচিয়া সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল। সুজন তাহারি মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের দরজায় উঁকি মারিতে লাগিল এবং পালঙ্কের চোখে চোখ পাড়তেই অপ্রস্তুত হইতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষে বধূসাজে সজ্জিতা মহুয়াকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।]

হুমড়া ॥ নে আবার নাড়া-বেঁধে হিজলতলায় চল—

[নাড়াবান্ধার উৎসব। সুজন ও মহুয়া এক জায়গায় বসিল। মহুয়ার পশ্চাতে পালঙ্ক।]

বেদেগণ ॥ আজ আমাদের সুজনের সঙ্গে—

বেদেনীগণ ॥ আমাদের মহুয়ার—

হুমড়া ॥ বিয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ!

বে:দগণ ॥ হোঃ হোঃ হোঃ!

বে:দনীগণ ॥ হিঃ হিঃ হিঃ! (সকলের মদ্য পান)

বে:দনীগণ ॥ একটা ছিল হাতি—

বেদেগণ ॥ ভালো মানুষ অ.তি!

বে:দনীগণ ॥ আর যে ছিল ইঁদুর—

বেদেগণ ॥ ডুর-ডুর-ডুর-ডুর !

বেদেনীগণ ॥ দু'জনে হ'ল বিয়ে !

বেদেগণ ॥ গলায় দড়ি দিয়ে !

বেদেনীগণ ॥ নাচে মোদের মনটা !

বেদেগণ ॥ হাতির গলায় ঘণ্টা—

হুমড়া ॥ শোন্—শোন্—এইবার তোরা আমার ছড়া শোন্—

এক যে ছিল নদের ঠাকুর
কপালে তার ঘণ্টা।
যত ছিল বেদের দল
নাচে তাদের মনটা ॥

আরো শোন—

কাঁচকলা খায় ন'দে—
আর মদ খায় বেদে !

বেদের দল ॥ বল—বল— (মহা উৎসাহে)
কাঁচকলা খায় নদে
আর মদ খায় বেদে ! (মদ্যপান)

[এইরূপেই 'স্ত্রীআচার' হইতে লাগিল। সকলে মদ খাইতে লাগিল, কিন্তু মহুয়া ও পালঙ্ক না খাইয়া, খাইবার অভিনয় করিল মাত্র। অন্যান্য বেদে-বেদেনীগণ পূর্বোক্ত ছড়াগুলি মাতলামিতে বলিতে বলিতে মদ লইয়া কাড়াকাড়ি, নিজেদের মধ্যে প্রেমাভিনয় ইত্যাদিতে ক্রমে ক্রমে প্রায় বেহুঁস হইয়া পড়িল। মহুয়া ও পালঙ্ক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল। পালঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিল অনেকেই তখনো একেবারে জ্ঞান হারায় নাই। বিশেষ, সুজন তখনো মাঝে মাঝে "মহুয়া মহুয়া করিতেছিল। হঠাৎ বাহিরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া অধীর হইয়া উঠিল।]

সুজন ॥ (নেশার ঘোরে)
আমার মহুয়া বৌ
বাঁশী বাজায়…
দাঁড়িয়ে ঐ বকুল তলায়,
হাঁ-গো…আমার
বকুল মালা—(হাত বাড়াইল—)

পালঙ্ক ॥ দাও সই, বকুলমালা দাও (মহুয়া বকুলমালা সুজনের হাতে দিল)

সুজন ॥ (সেই মালা গলায় পরিতে পরিতে সুরে)
হাতির গলায় ঘণ্টা—নাচে আমার মনটা—নাচেরে—

[ঢলিয়া পড়িল। তখনি আবার বাইরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া আবার চমকিয়া উঠিল। মহুয়া ব্যাকুল হইল। পালঙ্ক তাহাকে বহুকষ্টে শান্ত করিয়া সুজন ও মহুয়ার বাঁধন খুলিয়া দিল। এবং নিজে মহুয়ার ওড়না পড়িয়া তাহার স্থল গ্রহণ করিয়া মহুয়াকে তাহার ওড়না পরাইয়া দিল। অদূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহুয়া তাহারি তালে তালে চলিল। বাঁশীর সুরে সুরে সে আত্মহারা হইয়া বাহির হইয়া গেল। পালঙ্ক বধূর আসনে বসিল]

সুজন ॥ [মত্ততায়] মহুয়া পরী নাচে! আকাশ পরী গান গায়! পালঙ পেত্নী হাসে—দাঁত বের করে হাসে!

[আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। হঠাৎ একটি বজ্রপাত হইল। সকলের নেশা ছুটিয়া গেল। মেঘগর্জন, পুনরায় বিদ্যুৎ]

সুজন ॥ মহুয়া! মহুয়া। (পালঙ্ক ভয়ে দূরে সরিয়া গেল)

হুমড়া ॥ (চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) ওরে মেঘ ডাকছে···বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সামাল! ওরে তোরা ওঠ—তোরা ওঠ—

সুজন ॥ মহুয়া! মহুয়া! (ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে ধরিল)

পালঙ্ক ॥ আমি পালঙ—

সুজন ॥ (আশ্চর্য্যে) পালঙ! তুই! মহুয়া কৈ?

হুমড়া ॥ মহুয়া—মহুয়া—

সুজন ॥ নাই সে এখানে নাই—(চতুর্দিকে অনুসন্ধান)

হুমড়া ॥ নাই, তবে সে কোথায়?

সুজন ॥ (পালঙ্কের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল) সে কোথায়?

পালঙ্ক ॥ আমি বলব না—

হুমড়া ॥ তবে কি সে পালাল?

সুজন ॥ (পালঙ্ককে) পালিয়েছে?

পালঙ্ক ॥ পালিয়েছে—

হুমড়া ॥ [স্তম্ভিত হইল] কোথায় পালাল?

সুজন ॥ আমি ধরব, আমি—[দরজার দিকে ছুটিল]

হুমড়া ॥ (পালঙ্ককে) কার সঙ্গে পালাল?

পালঙ্ক ॥ নদেরচাঁদ—

সুজন ॥ (নদেরচাঁদের কথা শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল) নদেরচাঁদ!

হুমড়া ॥ ওরে সুজন—ধর—ধর সেই দুষমনকে ধর, তীর নে। ধনুক নে, বর্শা নে, ছোট্—ওরে সুজন—তোরা ছোট্—

সুজন ॥ ধরতে ওদের এখনি পারি—এখনি—এখনি। এখনি নিতে পারি দুষমনের শির। এখনি ধরে আনতে পারি সেই বেইমানকে। কিন্তু না-না—

হুমড়া ॥ না? কেন?

সুজন ॥ ধরে এনে লাভ? (কাঁদিয়া ফেলিল।) হাত বাঁধতে পারি, পা বাঁধতে পারি, কিন্তু মন বাঁধব কেমন করে?

হুমড়া ॥ (অন্যান্য বেদেদের প্রতি) ওরে, তবে তোরা ছোট্—ক্ষেপে ওঠ—নেচে ওঠ্—রক্ত-পাগল হয়ে হিংসা-মাতাল হয়ে ছুটে যা—

বেদেগণ ॥ আর তুমি?

হুমড়া ॥ (যেন কি বিভীষিকা দেখিল) না—না—আমি না। আমি বুঝছি সে দুর্নিবার। তার বাপের বুকে অকাতরে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু, না—না—এ অসি ধরে না, এ শুধু বাঁশী বাজিয়ে এসে তার অপরূপ রূপে আমার রূপসী কন্যাকে আমারি বুক থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়! যদি সে লড়াই করতো আমিই তার শির নিতুম, কিন্তু সে যে যুদ্ধ করে না—সে শুধু ভালোবাসে—সে শুধু কাঁদে!

বেদেগণ ॥ তবে?

হুমড়া ॥ হাঁ তবে শেষ চেষ্টা—বেদের প্রতিজ্ঞা।—সেই প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা সকলের সকল দুর্বলতাকে তলিয়ে দেয়। কর্ প্রতিজ্ঞা, ধর্ ছুরি—(সকলে একসঙ্গে ছুরি বাহির করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিল) ধরবো—আমরা ওদের দুজনকেই ধরবো, ধরে ওদের দুজনের বুকেই—

[বলিয়াই বেদের দল একসঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, বসিয়াই প্রত্যেকের ছুরি যুগপৎ মাটির বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। পারিল না শুধু সুজন, তাহার উত্তোলিত ছুরিকাখানি কাঁপিতে কাঁপিতে হাত হইতে খসিয়া পড়িল।]

৩য় অঙ্ক

[বনের মাঝে বেদের দলের তাঁবুর ছাউনি। রাত্রি অনেক হইয়াছে, মশাল নিভাইয়া বেদের দল তাঁবুর ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চাঁদের আলোয় দেখা গেল তাঁবু হইতে গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া আসিল পালঙ্ক।

গান।

খোলো-খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এল চাঁদের জোয়ার ॥
সঙ্কেত-বাঁশরী বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দুলে সাগর-পাথার।

জেগে উঠে কাননে ডেকে ওঠে পাখি
চোখ গেল, চোখ গেল চোখ গেল!
অসহ রূপের দাহে ঝলসি' গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
ঘুমন্ত যৌবন, তনু, মন, জাগো!
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো।
চল বিরহিনী অভিসারে বঁধুয়ার ॥

[সুজনের প্রবেশ]

সুজন ॥ এ সব কি হচ্ছে?

পালঙ্ক। যা হচ্ছে, তাই হচ্ছে!

সুজন ॥ যা নয়, তাই হচ্ছে। এখন তো চেঁচামেচির সময় নয়, সকলকে ঘুমুতে হবে, শেষরাত্রে উঠে আবার সবাইকে ছুটতে হবে,—তোরা নিজেরা ঘুমোচ্ছিস না, যারা ঘুমিয়েছে তাদের ঘুম ভাঙাচ্ছিস!

পালঙ্ক ॥ ঘুম এলে তো ঘুমুব?

সুজন ॥ সর্দার যে এই সবে ঘুমিয়েছে, নইলে কথাটা তাকে এখনি গিয়ে শোনাতুম। তোর চোখ দু'টো উপড়ে ফেলত!

পালঙ্ক ॥ তা বেশ হতো! আমি কানা হতুম, তুই আমাকে বেঁধে-বেড়ে খাওয়াতিস, আর বুকে পিঠে নিয়ে পথ চলতিস।

সুজন ॥ তবু কথা?

পালঙ্ক ॥ বেশ, তবে আর কথা নয়, এবার তবে—(অন্যান্য বেদেনীদের ডাকিল) আয় ভাই আমরা নাচি! এমন চাঁদিনীরাতে—আজ সারারাত জেগে আমরা নাচব!

[বেদেনীরা নাচিতে নাচিতে বাহির হইতে লাগিল। সুজন বিরক্ত হইয়া নিরুপায়ে একটি গাছের গুঁড়িতে বসিয়া পড়িল এবং বেদেনীদের নৃত্যগীত মধ্যে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।]

নৃত্যগীত। আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি' নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন ॥
প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনীদলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো নিঁদ-মহল-আবরণ ॥

ঘুরে ঘুরে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে
নাচিছে নাচুনী ঘূর্ণীর ছন্দে।
লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা-মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া-সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমু ঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল-আভরণ ॥ [প্রস্থান।

[ক্ষণপরে হুমড়া সর্দার সুজনকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল]

হুমড়া ॥ সুজন! সুজন! এই যে, এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে!…থাক্, ডাকবো না। সারাদিন ছুটেছে, ও যেন ক্ষেপে গেছে, যেন পাগল হয়েছে—মহুয়াকে যে ও বড়ই ভালোবাসতো! একবার যদি তাকে পাই, একবার যদি তাদের ধরতে পারি, একবার যদি…

[প্রতিহিংসা লইবার আবেগে আর কথাই বাহির হইল না…কিন্তু সুজন জাগিয়া উঠিল।]

সুজন ॥ [ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] সর্দার!

হুমড়া ॥ হাঁ, সর্দার। তুই একটু ঘুমিয়ে নে সুজন। [সুজন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সস্নেহে] বড় হয়রানি—বড় দিকদারি—না? আ-হা—এখনো কপালে ঘাম ঝরছে! সেই রাক্ষুসী, সেই শয়তানের এই কীর্তি! আ—হা—তুই যা, গিয়ে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে নে—

সুজন ॥ তুমি ঘুমুলে না সর্দার?

হুমড়া ॥ ঘুম পাচ্ছে না, যদিই-বা পায়, স্বপ্ন দেখে জেগে উঠছি, চীৎকার করছি, কাঁদছি (তৎক্ষণাৎ) না—না—ক্ষেপেই যাচ্ছি, কিন্তু আর কয় রাত্রি না ঘুমিয়ে থাকব? আমি যে এখনো পাগল হয়ে যাইনি কেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি!

সুজন ॥ চল বাপুজি, তুমি ঘুমুবে চল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব—

হুমড়া ॥ (মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার কথায় হঠাৎ মহুয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল) মহুয়া! মহুয়া! সে দিত, আমি ঘুমুতুম। সে চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মহুয়া কেড়ে নিয়ে গেছে আমার ঘুম। (এই কোমলতায় নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া) যাক্ গে ঘুম। সে গেছে, সঙ্গে লুটে নিয়ে গেছে আমার মান, বেদের সম্মান! তাই তার শির চাই, তাই তাকে চাই, আর চাই তাকে—যে তাকে লুট করেছে। কিন্তু, ওরে সুজন, তা কি হবে? তাদের কি পাব? কবে পাব? কবে? কবে?

সুজন ॥ না বাপুজি, এখন ক্ষেপে উঠলে সব মাটি হবে। তুমিই যদি পাগল হয়ে যাও, তাদের ডুবমনি বোল আনায় পূর্ণ হবে। ডুবমনি বহুৎ

হয়েছে, আর তাকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, তোমাকে ঘুমুতে হবে, তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমার যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, তুমি চল—ঘুমুবে চল—

[তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল]

হুমড়া ॥ হাঁ, আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, যতদিন তাদের ধরতে না পারছি, যতদিন তাদের বেইমানির শোধ নিজে হাতে, এই হাতে, না নিতে পারছি ততদিন বেঁচে আমাকে থাকতেই হবে···

সুজন ॥ তাহলে একটু ঘুমুতেও হবে। তুমি চল, তুমি চল সর্দার—

হুমড়া ॥ তুই ?

সুজন ॥ আমিও। আমিও ঘুমুব। ঘুম আসে না কেন? যেই ভাবি, অমনি মনে হয় মহুয়ার মুখ—

হুমড়া ॥ ওরে, আমারো—আমারো! বুক ভেঙে যায়, বুক ভেঙে যায়—

সুজন ॥ মনে হয় সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন হাসছে, তখনি ক্ষেপে উঠি, ভাবি, আমাদের দশা দেখেই সে হাসছে!

হুমড়া ॥ বটে? দশা দেখে হাসছে! দশা দেখে হাসছে ?

সুজন ॥ তাই তাকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমরা তাকে ছেড়েও ঘুমুতে পারি, বেশ সুখেই আমাদের দিন কাটে, জীবনও বেশ চলে যায়! চল সর্দার—চল—(একরূপ জোর করিয়াই সুজন হুমড়া সর্দারকে লইয়া চলিল)

হুমড়া ॥ তুই ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস—জীবন তো বেশ চলে—জীবন তো বেশ চলে যায়! (দুজনে চলিয়া গেল)

[গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ দূরে দেখা গেল দুইটি মূর্তি—দূরে। ক্লান্ত শ্রান্ত—অবসন্ন নদেরচাঁদকে ধরিয়া ত্রস্ত ভাবে মহুয়ার প্রবেশ। নদেরচাঁদ নিতান্ত অবসন্ন, দুই পা চলিয়াই পড়িয়া যায়, মহুয়া তাহাকে আবার তোলে। আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিতে থাকে। এমনি করিয়া নদেরচাঁদকে মহুয়া ছাউনির সীমানায় আনিয়া একটি বৃক্ষের তলে বসাইল। বৃক্ষগাত্রে হেলান দেওয়াইয়া বসাইল। তাহার মাথাটি হেলিয়া পড়িতেছিল, তাহা বৃক্ষগাত্রে আরামে রাখিবার ব্যবস্থা করিল।]

মহুয়া ॥ তুমি এইখানে ব'সো। মনে হচ্ছে আমাদেরই জাত-ভাই কোন বেদের দলের ছাউনি। দেখেই আমি চিনেছি। আর আমি ভয় করি নে। আমাদের জাত-ভাইরা ভারি দরদী, জাতের কারো বিপদ দেখলে ওরা অমনি তার সকল বিপদ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বুকে ঠাঁই দেয়।

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, ভারি তেষ্টা পেয়েছে—আর যে পারি না—

মহুয়া ॥ আর ক্ষিধে বুঝি পায় নি? ক্ষিধেয় পা চলছে না এ কথাটা এই মেয়েমানুষের কাছে বলতে বুঝি—(জীব কাটিল)—তা পাবে গো, সব পাবে, তেষ্টার জলও পাবে, ক্ষিধের রুটিও মিলবে, এই দেখ না— (প্রস্থান)

[পা টিপিয়া টিপিয়া কিছুদূর গিয়া, হামাগুড়ি দিয়া, এবং শেষে গড়াইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল]

নদেরচাঁদ ॥ যাদু জানে, ও যাদু জানে! ওর মুখখানি দেখতে পাই —আর সকল ক্ষুধা মিটে যায় ওর ঐ কাজল-কালো আঁখি দু'টির দিকে চাই, সকল তৃষ্ণা সরে যায়। যেই চলে গেছে, মনে হচ্ছে ছাতি ফেটে গেল—ওঃ—

[অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগ্রত হুমড়ো সর্দারের প্রবেশ]

হুমড়া ॥ (মহুয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে) কেন ঘুমুব? আমি ঘুমুব না। আজ আমি তোদের নাচ দেখব। ওরে মহুয়া, ভানুমতীর খেলটা আজ আমাকে দেখা, সেই যেমন এক পূর্ণিমা-রাতে চুপি চুপি আমায় দেখিয়েছিলি! ভারী ভালো লেগেছিল!—কি? আজ নাচবি নে? কেন রে? কি বলছিস?

[উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল]

নদেরচাঁদ ॥ (সবিস্ময়ে) হুমড়া সর্দার! সর্বনাশ! এ তবে ওদের ছাউনি! মহুয়া যে—কি করি! কি করব!

হুমড়া ॥ ওঃ—ক্ষুধা পেয়েছে! তেষ্টাও পেয়েছে?—কি? দু'দিন না খেয়ে রয়েছিস? কি বলছিস তুই মহুয়া! মানুষেরা কি তোকে খেতে দেয় না? বটে! বটে!

নদেরচাঁদ ॥ আশ্চর্য্য! কার সঙ্গে কথা কইছে?

হুমড়া ॥ আমার দুধের মেয়ে দু দিন না খেয়ে আছে! ব'সো আমি সবাইকে দেখাচ্ছি—(প্রস্থান।

নদেরচাঁদ ॥ যাক্, চলে গেছে! এই ফাঁকে যদি মহুয়া—(রুটি হাতে ছুটিয়া মহুয়ার প্রবেশ)

মহুয়া ॥ ভানুমতীর খেল! ভানুমতীর খেল—তুমি দেখতে চেয়েছিলে, আজ দেখবে?

নদেরচাঁদ ॥ চুপ! চুপ! সর্বনাশ!

মহুয়া ॥ সর্বনাশ না পৌষমাস! হাঃ হাঃ হাঃ।

নদেরচাঁদ ॥ মহা সর্বনাশ, বলছি, কিন্তু জল কই পেলে?

মহুয়া ॥ (দুঃখে) কোনখানে জলই পেলাম না।—যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, এই রুটিই কি পেতাম! শেষে সবার বালিশের নীচে খুঁজতে লাগলাম, পেয়ে গেলাম একজনের মাথার তলে! আমি কি করি জানো? যেদিন রুটি কম থাকে, তখন জানি চুরির ভয় আছে, তাই মুখে পুরে ঘুমাই! একবার কে এসেছিল চুরি করতে, আমি জেগে "নেই" "নেই" বলতে বলতেই তা সাবাড় করে দিলাম—

নদেরচাঁদ ॥ কথা রাখো মহুয়া। জানো এ কাদের ছাউনি?

মহুয়া ॥ না-ই বা জানলাম! ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার পেলেই হলো!

নদেরচাঁদ ॥ খাবার আর মুখে তুলতে হবে না!

মহুয়া ॥ জল নেই বলে? (আত্মহারা হইয়া ব্যাকুল স্বরে) জল—একটু জল—কে আমায় একটু জল দেবে? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, কে একটু জল দেবে? (অনুসন্ধান)—

[জলপাত্র হাতে লইয়া হুমড়া সর্দারের প্রবেশ। তেমনি স্বপ্নবিজড়িত অবস্থায়]

হুমড়া ॥ এই যে মা, এই নে—

(মহুয়া অবাক হইয়া গেল। প্রথমে ভয়ে পিছাইয়া আসিল)

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এমন পিপাসা পেয়েছে, আ—হা-হা এই নে মা, জল নে—, আমি নিজে ঝিল থেকে তুলে নিয়ে এলাম, নে—(অগ্রসর হইল)

মহুয়া ॥ [নদেরচাঁদের জন্য আশঙ্কা হইল। ব্যাধভয়-ভীতা হরিণীর মতো ছুটিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া, কেমন করে পালাব! উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়!

হুমড়া ॥ ঐ তবু বলছিস তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, আরে এই যে আমি জল নিয়ে এসেছি!

মহুয়া ॥ দাও, দাও! বাপুজি, দাও—

হুমড়া ॥ [পরম আগ্রহে] নে—নে—

[জলপাত্র মহুয়ার হাতে দিল। মহুয়া হুমড়ার দিকে পিছন ঘুরিয়া জলপাত্র নদেরচাঁদের হাতে দিল। পরে আবার হুমড়ার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

হুমড়া ॥ আঃ খেয়েছিস মা? আ—হা-হা—তোর সোনার বরণ কালী হয়ে গেছে! শুকিয়ে গিয়েছিস! বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন আর তেমন রোজগার করতে পারি নে। ওরে, আমারো পেট ভরে না, আমি আর বাঁচবো না, যে দু'টো দিন বাঁচি, আমায় খেতে দিস্—

মহুয়া ॥ বাপুজি! বাপুজি! [তাহার বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

হুমড়া ॥ আ—হা—হা—! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দে—দে রে মহুয়া দে—

[মহুয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। হুমড়া ঘুমাইয়া পড়িল]

মহুয়া ॥ বাপুজি! [উত্তর পাইল না।] বাপুজি! [উত্তর নাই] ঘুমিয়ে পড়েছে! এ আমরা কোথায় এসে পড়েছি!

নদেরচাঁদ ॥ বাঘের মুখে—

মহুয়া ॥ বাপের বুকে! আজ কতদিন পরে ওকে পেলুম! আজ কি ভালোই আমার লাগছে!

নদেরচাঁদ ॥ ভুল! ভুল মহুয়া! বাঘও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে। এ তাই। তোমার সর্দার স্বপ্নে কথা কইছে, স্বপ্নে জল দিয়েছে, স্বপ্নে তোমায় আদর করছে—স্বপ্নে—সব স্বপ্নে! যেই জেগে উঠবে—

মহুয়া ॥ এ্যাঁ, তাই তো! তাহলে? তাহলে তখনি তো তোমায়—তুমি পালাও—তুমি পালাও—

নদেরচাঁদ ॥ তুমি?

মহুয়া ॥ না—না—আমি না। আমি যাব না। যেতে পারব না। ওকে আজ কতদিন পর পেয়েছি, কতদিন পর আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, কতদিন পর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, কতদিন পর আজ—না—না—আমি যাবনা—কিছুতেই না—

নদেরচাঁদ ॥ তবে আমিও যাব না।

মহুয়া ॥ না-না, ওরা যদি শুধু তোমার বুকেই ছুরি বসিয়ে দেয়—

নদেরচাঁদ ॥ তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ো। আমার মাথাটি অমনি করে কোলে নিয়ো, তোমার ঐ কাজল-কালো আঁখি দু'টি দিয়ে আমার পানে চেয়ো—দূরে যেয়ো না, সখী দূরে যেয়ো না, মরণকালে যেন তোমায় দেখেই মরি!

মহুয়া ॥ না—না—না—তোমার পায়ে কাঁটাটি ফুটলে যে আজ আমার বুকে বেঁধে! না—না—না—তুমি পালাও, তুমি পালাও—

হুমড়া ॥ [স্বপ্নোত্থিতের মতো স্বপ্নাবেশেই] পালাও—পালাও—[ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হুমড়া কিন্তু মহুয়াকে লক্ষ্য করিল না, তাহারই সম্মুখে আর-এক মহুয়াকে কল্পনা করিয়া ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া] পালাও—পালাও—পালাও—ঐ তারা আসছে, ঐ যে, হুমড়া সর্দার—চোখে তার জ্বালা, হাতে তার ছুরি—তারি পেছনে ঐ সুজন—বুকে তার জ্বালা হাতে তার বর্শা, তার পেছনে মানিকে, তার পেছনে, উঃ উঃ উঃ! পালা—তুই পালা—

মহুয়া ॥ বাপুজি! বাপুজি!

হুমড়া ॥ বাপুজি তোকে বাঁচাতে পারবে না। ওরা বাঘের মতো ছুটে আসছে, তুই আমার মেয়ে, আমার বুক খালি হবে! ও-হো-হো আমার বুক খালি হবে! পালারে তুই পালা, তোর পায়ে পড়ি—পালা—[পায়ে পড়িতে গেল]

মহুয়া ॥ পালালাম, বাপুজি! কিন্তু তোর কথা যে ভাবতে পাচ্ছি নে! পেটপুরে তুই রুটি খেতে পাস্‌নে! এত কষ্ট, এত কষ্টের মধ্যে তোকে রেখে কেমন করে যাই—

হুমড়া ॥ রুটি না পাই সেও ভালো, কিন্তু তুই মরলে যে আমার কবরে

মাটি দেবারও কেউ রইবে না! [চীৎকার করিয়া উঠিল] ঐ তারা এসে পড়েছে—ঐ তারা এসে পড়েছে! ঐ—ঐ - [ভয়ে কাঁপিতে লাগিল]

মহুয়া ॥ পালালাম বাপুজি। [নদেরচাঁদের কাছে গিয়া] তোমার মালাটি আমায় আজ আবার দেবে—

নদেরচাঁদ ॥ সে কি! তোমার মালা—নাও—

মহুয়া ॥ সেদিন আমি তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ তুমি আমার গলায় প'রিয়ে দাও।

নদেরচাঁদ ॥ নাও—[মহুয়ার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন]

মহুয়া ॥ এবার তবে সত্যি সত্যিই আমার হল। [হুমড়ার কাছে গিয়া] বাপুজি, আমরা পালাচ্ছি, কিন্তু—এই রইল—[হুমড়ার মুঠায় মালাটি গুঁজিয়া দিল]

ওর একটা মুক্তো খুলে রুটির কষ্ট দূর ক'রো, বাকীগুলো বুকে রেখে আমার কথা মনে রেখো—[বলিয়াই নদেরচাঁদের হাত ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল]

হুমড়া ॥ এখনো কথা! এখনো গেল না! [ছুটিয়া সুজনের প্রবেশ]

সুজন ॥ সর্দার! সর্দার! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? [সাড়া না পাইয়া পুনরায়] সর্দার! [তথাপি সাড়া না পাইয়া তাহাকে ঝাঁকি দিয়া] সর্দার! [হুমড়ার ঘুমঘোর ভাঙিল] চীৎকার করছিলে কেন?

হুমড়া ॥ কে? কে?

সুজন ॥ আমি সুজন—

হুমড়া ॥ সুজন! ও এখনি বুঝি আবার ছুটতে হবে? ভোর হয়েছে বুঝি?

সুজন ॥ হাঁ, ভোর হয়ে এল—সর্দার, তুমি আর তবে ঘুমাওনি?

হুমড়া ॥ ঘুমিয়েছিলাম কি? [স্মরণ করিতে চেষ্টা] ওরে ওরে, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মহুয়া এসেছিল—[চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে সে তো এসেছিল!

সুজন ॥ কে?

হুমড়া ॥ মহুয়া···

সুজন ॥ সে কি সর্দার?

হুমড়া ॥ [চীৎকার করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে] এসেছিল। এসেছিল।

সুজন ॥ কখন?

হুমড়া ॥ এখনি—

সুজন ॥ তুমি তবে স্বপ্নে দেখেছ!

হুমড়া ॥ স্বপ্ন? ও হাঁ, তবে হয়ত স্বপ্নই। [কিন্তু তখনি হাতের মুঠে

মুক্তোরমালা দেখিয়া] এ কি ! এ যে মহুয়ার মালা [চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে—ওরে, এ যে সেই মালা—

সুজন ॥ [দেখিয়া] মহুয়ার সেই মালা ! [বিষম বিস্মিত হইল]

হুমড়া ॥ এসেছিল—এসেছিল—তবে তো স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই সে এসেছিল, হয়তো এখনো এখানেই আছে, হয়তো এই কাছেই কোনখানে আছে—[উন্মাদের মতো] খোঁজ, খোঁজ ওরে জাগ, তোরা সবাই জাগ [বেদেগণ ছুটিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল] ঐ মহুয়া যায়—ধর্—ধর্—নিয়ে আয় বর্শা, এনে দে আমার ছুরি, এসেছিল, সে এসেছিল ! [মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল]

চতুর্থ অঙ্ক

মন্দির ।

[মন্দিরের সুবৃহৎ দরজা, সুবিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী। নিম্নে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার এক-পার্শ্বে একটি যাত্রীনিবাসও আছে। যাত্রীনিবাসে ঢুকিবার একটি দরজা দেখা যাইতেছে। আর দেখা যাইতেছে যাত্রীনিবাসের একটি সুবৃহৎ বাতায়ন···উন্মুক্ত বাতায়ন তলে দাঁড়াইলে প্রাঙ্গণটি পরিদৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে মন্দিরবাড়ির সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সদর দরজা।] যাত্রীনিবাসে বাতায়নে ভর দিয়া নদেরচাঁদ দাঁড়াইয়া। তাহার চেহারার অতিশয় পরিবর্তন হইয়াছে। ছিন্ন ভিন্ন বেশ, শোক-মলিন চোখমুখ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। প্রাঙ্গণে রাধু পাগল বাতায়ন নিম্নে দাঁড়াইয়া নদেরচাঁদের উদ্দেশ্যে গান গাহিতেছিল।]

গান ॥ ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই
এপার ওপার করি ॥
আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই
দেখেছিলাম তায়,
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই
আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি ॥
আমি তারই আশায় তরী নিয়ে
ঘাটে বসে থাকি।

আমার   তারই নাম ভাই জপমালী
তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার   নয়ন-তারা লইয়া গেছেরে
নয়ন-নদীর জলে ভরি।
ঐ   নদীরও জল শুকায় রে ভাই
সে জল আসে ফিরে,
আর   মানুষ গেলে ফেরেনা কি
দিলে মাথার কিরে।
আমি   ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হ'লাম দেশান্তরী।

[গানের শেষ দিকে মন্দিরের মধ্য হইতে সন্ন্যাসীর প্রবেশ। তৎপূর্বে নদেরচাঁদ বাতায়ন হইতে সরিয়া গিয়াছেন। গান শেষ হইল]

সন্ন্যাসী ॥ রাধু!

রাধু ॥ [তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] প্রভু!

সন্ন্যাসী ॥ সেদিন যাকে নদীর জল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনে যাত্রী-নিবাসে ঠাঁই দিয়েছি, সে নাকি বলেছে সে বেদে?

রাধু ॥ বেদের নাম কি নদেরচাঁদ হয় ঠাকুর?

সন্ন্যাসী ॥ ওকি তাই বলেছে নাকি? ওর নাম নদেরচাঁদ?

রাধু ॥ হাঁ নদেরচাঁদ। বেশ নামটি, না?

সন্ন্যাসী ॥ কানা-ছেলের নাম পদ্মলোচন হলে সেও হয় বেশ!

রাধু ॥ হাঁ ঠাকুর, তুমি যে ঐ গেরুয়া কাপড় পড়, এও হয়েছে বেশ!

সন্ন্যাসী ॥ আঃ রাধু! আবার পাগলামি সুরু করলে?

রাধু ॥ পাগলির ব্যবসাই যে ঐ—

সন্ন্যাসী ॥ ও ব্যবসাটা এখন ছাড়। পাগলামি রেখে এখন ধর্মকর্মে মন দাও। দিন যে ফুরিয়ে এল —!

রাধু ॥ সে তো ভালই হ'ল। রাত্তিরটি না ফুরুলেই হ'ল।

সন্ন্যাসী ॥ আঃ আবার রাত্তির কেন?

রাধু ॥ ধর্মকর্ম করব। ফুল নেব, নৈবেদ্য নেব, পুজো করব—

সন্ন্যাসী ॥ রাত্তির বেলায় পুজো! কাকে?

রাধু ॥ তোমাকে।

সন্ন্যাসী ॥ ছিঃ তোমার মনের কালি এখনো মুছল না—

রাধু ॥ মুছবে কেন ঠাকুর? তুমি কি আমার তেমন গুরু, আর আমিই কি তেমনি শিষ্যা? যে লেখাটি একটিবার—আমার বুকের খাতায়—মনের পাতায় লিখে দিয়েছিলে—

সন্ন্যাসী ॥ আঃ আমি আবার কি শিখলুম ?

রাধু ॥ কেন সেই যে মন্তর দেবার সময়—মনে সেই ? সেই লেখা কি আর ভুলি ?

সন্ন্যাসী ॥ আঃ ! মন্দিরের এই পবিত্র অঙ্গনে—ধর্মকথা বল—

রাধু ॥ কেন ? বীজ মন্তর কি অধর্ম কথা ?

সন্ন্যাসী ॥ রাধু, পাগলামি কি সব সময় করতে আছে রাধু ?… ছি ! তার চাইতে বেশ গাইছিলে। বেশ কথাটি "আয়না আছে পড়ে রে ভাই, আয়নায় মানুষ নাই।"

রাধু ॥ (সুরে)

"(আমি) তারই আশায় তরী নিয়ে ঘাটে বসে থাকি

(আমার) তারই নাম ভাই জপমালা তারেই কেঁদে ডাকি।

(ঐ) নদীরও জল শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে

(আর) মানুষ গেলে ফিরে না'কি দিলে মাথায় কিরে !

সন্ন্যাসী ॥ ঐ গানটি তোমায় কে শেখাল রাধু ?

রাধু ॥…ঐ নদীয়ার চাঁদ ঠাকুর। মস্ত গুণী লোক। পাগলও বলতে পার।

সন্ন্যাসী ॥ পাগল ?

রাধু ॥ প্রেমের পাগল। মাথার বিষে পাগল।

সন্ন্যাসী ॥ শেষকালটায় মন্দির হয়ে উঠল পাগলা-গারদ ! সুবিধের কথা নয়। তা ওর বিষও কি মাথায় উঠেছে ? কি বল্‌ছেন ?

রাধু ॥ (গান)

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জন্যে ভেসে রহিলাম জনম অবধি ॥
ও ভাই তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
আমি চরে এসে বস্‌লাম রে ভাই, ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার সোঁতে ভাসি নিরবধি ॥
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই, ভাঙলে কেন মন,
ও ভাই হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
ও ভাই জোয়ারে মন ফিরেনা আর, ভাটিতে হারায় যদি।
তুমি ভাঙ যখন কূলরে নদী ভাঙ একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ রে নদী দুইকুল ভাঙ তার।
ও ভাই চর পড়েনা মনের কূলে, একবার সে ভাঙে যদি ॥

সন্ন্যাসী ॥ তাহলে মিলেছ বেশ। তুমি তো রাই উন্মাদিনী। আর উনি ?

রাধু ॥ উনি হচ্ছেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

সন্ন্যাসী ॥ সর্বনাশ! রামায়ণ? তা এখন কোন্ কাণ্ড চল্‌ছে?

রাধু ॥ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। সীতাহরণ হয়ে গেছে। ওর সীতাকে না কি কোন্ এক ব্যাটা রাবণ লুট করেছে!

সন্ন্যাসী ॥ তাই বুঝি নদেরচাঁদ—রামচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তা, তিনি তো উদ্ধার হয়েছেন কিন্তু সীতা উদ্ধারের কতদূর?

রাধু ॥ আর উদ্ধার! শ্রীরাম কেঁদেই আকুল, কোথায় সীতা—কোথায় সীতা!—

সন্ন্যাসী ॥ তা তুমি না হয় পবন-নন্দিনী হয়েই লঙ্কার সন্ধানটা নাও।

রাধু ॥ সন্ধান নিচ্ছি বই কি। এই যে আবার চললুম—

সন্ন্যাসী ॥ কোথায়?

রাধু ॥ একটি পাগলিও এ গাঁয়ে কাল দেখা দিয়েছিল কি না! শোন নি? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনো কেঁদেছে, কখনো গেয়েছে, কখনো নেচেছে - শুনেই তো নদীয়ার চাঁদ ক্ষেপে উঠেছেন—বলছেন তিনিই তার মহুয়া!

সন্ন্যাসী ॥ মহুয়া!

রাধু ॥ ঐ সীতা। মাথার তো ঠিক নেই। কখনো বল্‌ছে বুলবুলি, কখনো বলছে টীয়া—

[এই কথাবার্তার মধ্যে নদেরচাদ যাত্রীনিবাস হইতে বাহির হইয়া এখানে উপস্থিত]

নদেরচাঁদ ॥ কখনো বলেছি পাপিয়া, কখনো বলেছি মহুয়া! তুমি এখনো যাওনি রাধু! আমাকেই তুমি নিয়ে চল। পারব, আমি যেতে পারব—পায়ে আমি জোর পাচ্ছি—বুকে আমি বল পাচ্ছি। তাকে আমি শুধু একটিবার দেখব—দেখব সেই কি আমার বলবুলি, সেই কি আমার টিয়া, সেই কি আমার পাপিয়া, তারি নাম কি মহুয়া?

রাধু ॥ এই ভাই আমি গেলাম—(প্রস্থান।

সন্ন্যাসী ॥ তুমি আমায় চিনতে পারছ?

নদেরচাঁদ ॥ চিনেছি। তুমি আমায় জল থেকে কূলে তুলেছিলে, না? কিন্তু তাকে কি দেখেছিলে? "মেঘের মত তার কেশ, তারার মতো তার আঁখি⋯এ দেশে কি উড়ে এসেছে আমার তোতা-পাখী?"

সন্ন্যাসী ॥ কে সে?

নদেরচাঁদ ॥ "আঁধার ঘরে তাকে রাখ—কাঁচা-সোনার মত জলবে সে! বনে তাকে রাখো, ফুল হয়ে ফুটে উঠবে! পাহাড়ে তাকে রাখো, মণি হয়ে জল্‌বে!"

সন্ন্যাসী ॥ তাকে তো দেখিনি, দেখ্‌ছি এক রামেতেই রক্ষে নেই, তার ওপর সুগ্রীব দোসর! ছিল মন্দির হল পাগলা-গারদ—ও কি? কোতয়াল যে!

[ধনপতি সাধুসহ সদলবলে কোতয়ালের প্রবেশ]

কোতোয়াল ॥ প্রণাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী ॥ জয়োহস্তু। হঠাৎ এ পথে?

কোতোয়াল ॥ একটা ভারী জরুরী তদন্তে যাচ্ছিলাম, পথে মন্দির পড়ল, প্রণাম করতে এলাম।

সন্ন্যাসী ॥ জয়জয়কার হোক তোমার! তা কি তদন্ত?

কোতোয়াল ॥ খুনের তদন্ত। লক্ষেশ্বর সওদাগরকে তো জানতেন?

সন্ন্যাসী ॥ কে না জানে? এই তো সেদিন মন্দিরের ঘাটে নৌকা বেঁধে এখানে ঘটা করে পুজা দিয়ে গেলেন···এবারকার বাণিজ্যে তারি তো জয়জয়কার!

কোতোয়াল ॥ তিনিই খুন হয়েছেন! এই যে তার ভাই ধনপতি সাধু—আমাকে তদন্তে নিয়ে যেতে এসেছেন—

সন্ন্যাসী ॥ কে খুন করলে?

ধনপতি ॥ এক পাগলি।

[নদেরচাঁদ দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, পাগলির কথা শুনিয়া কাছে আসিয়া সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন]

সন্ন্যাসী ॥ সে কি!

ধনপতি ॥ তুলসীতলার ঘাট থেকে দাদা নৌকা ছাড়বেন এমন সময় নাকি স্ত্রী-পুরুষ দু'জন লোক নৌকায় উঠে নদী পার হবার জন্যে কাঁদাকাটি সুরু করলে—

নদেরচাঁদ ॥ তুলসীতলার ঘাট?

ধনপতি ॥ তুলসীতলার ঘাট। আমার নৌকা তখনো সে ঘাটে পৌছোয়নি।

ধনপতি ॥ স্ত্রীলোকটির ছিল চাঁদপানা মুখ। দাদার চোখে লেগে গেল। দু'জনকেই নৌকায় তুলে নৌকা ছেড়ে দিলেন—

নদেরচাঁদ ॥ (উত্তেজিত ভাবে) আমার মনে পড়ছে, মনে পড়ছে, সব কথা মনে পড়ছে!

কোতয়াল ॥ (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি) এ কে?

সন্ন্যাসী ॥ এক পাগল। (নদেরচাঁদের প্রতি) ওহে, কোতোয়ালজী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ওঁকে শুধাও না তোমার তোতা-পাখিটি কোথায়?

কোতয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বটে! [নদেরচাঁদকে] তোমার বুঝি তোতা-পাখি উড়ে গেছে?

নদেরচাঁদ ॥ (সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া—প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে) উড়ে গেছে—উড়ে গেছে—!

সন্ন্যাসী ॥ (ধনপতিকে) তারপর ?

ধনপতি ॥ দাদার মতলবটি ছিল একটু অন্য রকম। মাঝ-নদীতে নৌকা গেলে পুরুষটিকে জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, নৌকায় দিলেন পাল তুলে। পাখির মতো উড়ে চলল নৌকা—

নদেরচাঁদ ॥ (ধনপতিকে) আমার সেই তোতা-পাখি ? আমার সেই টিয়া-পাখি ? আমার সেই ময়না ? তার কি হ'ল ?

কোতোয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

ধনপতি ॥ পাখির মতো উড়ে চলল নৌকা। স্ত্রীলোকটি ভারী খুসী। ···নাচতে লাগল। একেবারে পাগলের মতো নাচতে লাগলো !

নদেরচাঁদ ॥ (সোৎসাহে) ময়ূরের মতো ! ময়ূরের মতো ! মেঘ করলেই সে ময়ূর হয়ে নাচতো—আমি অবাক হয়ে দেখতাম !

সন্ন্যাসী ॥ পাগল হলে ময়ূর-নাচও নাচে, আবার ভালুক-নাচও নাচে ! তবে সেই স্ত্রীলোকটির মাথায়ও গোল ছিল। পাগলের সংখ্যাটা আজকাল বড়ই বেড়ে চলেছে। আমার মন্দির তো দস্তুর মতো পাগলা গারদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন হয়েছে যে ভয় হয় কোনদিন আমিই-না ক্ষেপে যাই ! হাঁ, তারপর ?

ধনপতি ॥ দাদা মহাখুসী। একেবারে মজে গেলেন। কিন্তু সে বেটি পাগলির মুখে ছিল মধু, মনে ছিল বিষ ! দাদাকে রাত্রে বিষ খাইয়ে একেবারে উধাও !

নদেরচাঁদ ॥ আমি জানতাম ! আমি জানতাম ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[প্রাণ ভরিয়া পাগলের হাসি হাসিতে লাগিলেন]

কোতোয়াল ॥ আঃ জ্বালাতন ! এই পাগলা থাম্ বলছি !

নদেরচাঁদ ॥ (তৎক্ষণাৎ থামিয়া) তারপর ?

কোতোয়াল ॥ হাঁ, গল্প শোন। সবাই ছিল ঘুমিয়ে সেই ফাঁকে নিশ্চয় পাগলি নদী সাঁতরে পালিয়েছে, তা যাবে কোথায় ? যদি মাছ হয়ে জলে ডুবে থাকে, জেলে হয়ে জাল ফেলে তুলব, যদি পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে থাকে, ব্যাধ হয়ে তীর মারব···

নদেরচাঁদ ॥ (সভয়ে) না—না—না—। মেরো না, তাকে মেরো না, আমার তোতা-পাখি মেরো না, আমার টীয়া-পাখি মেরো না, আমার ময়না-পাখি যদি উড়ে গিয়ে থাকে—যাক্ উড়ে—একদিন তো তোর গান শুনব !

কোতোয়াল ॥ (হাসিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে—মারব না। কিন্তু কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে, এখনি ছুটতে হবে—

সন্ন্যাসী ॥ কোথায় ?

কোতয়াল ॥ ঐ পাশের গাঁয়ে। শুনলাম সেখানে এক পাগলি এসে জুটেছে, একবার গিয়ে দেখে আসি, চল হে চল (সন্ন্যাসীকে) আসি ঠাকুর—প্রণাম—(প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নদেরচাঁদও ছুটিতেছিলেন)

সন্ন্যাসী ॥ এই! দাঁড়াও (নদেরচাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন) তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

নদেরচাঁদ ॥ (কোন উত্তর দিতে পারিলেন না)

সন্ন্যাসী ॥ কোথায় যাচ্ছিলে ?

নদেরচাঁদ ॥ ওদের সঙ্গে—

সন্ন্যাসী ॥ কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ পাখির খোঁজে!

সন্ন্যাসী ॥ (বিরক্ত হইয়া) আঃ—

নদেরচাঁদ ॥ যদি জলে জাল ফেলে! যদি গাছে তীর মারে···ঐ যে বলে গেল ?

সন্ন্যাসী ॥ কি মুস্কিলেই পড়লাম! ঐ যে রাধু এসেছে। কি রাধু, খবর কি ? (রাধুর প্রবেশ)

রাধু ॥ নাঃ তাকে পেলাম না। কোথায় যে কখন্ থাকে, কেউ বলতে পারে না!

নদেরচাঁদ ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কেউ বলতে পারলে না! কেউ না ? (রাধু জানাইল, "না") (দীর্ঘশ্বাসে) কেউ না! কেমন করে বলবে ? সে যে পাখি! ঐ নীলাকাশের আপন-ভোলা পাখি! কোথায় কখন্ থাকে, কেউ জানে না, কেউ বলে না! (বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে আপন মনে যাত্রীনিবাসের দিকে চলিয়া গেলেন)

রাধু ॥ (সন্ন্যাসীকে) তুমি যদি ঐ অমনি পাগল হতে!

সন্ন্যাসী ॥ আশীর্বাদটি তো বেশ! তা তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন ও আশীর্বাদ ফলতে আর বুঝি বেশী বিলম্ব নেই। একদিন দেখছি—কে কখন্ আমাকেই জলে ঠেলে ফেলে দেয়!

রাধু ॥ দিক্ না···

রাধু ॥ [গান]

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥
আমি তোমায় ফুল দিয়েছি সখা তোমার বন্ধুর লাগি,
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল, তাই হ'লাম বিবাগী।

আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো
পরে' শুকাইনিক গলে ॥
ঐ যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থেকে এসে
আমার দুখের তরী দিলাম ছেড়ে চল্‌তেছে সে ভেসে।
এখন সে পথে নাই তুমি বন্ধু গো
তরী সেই পথে মোর চলে ॥

[গাইতে গাইতে নদেরচাদের উদ্দেশ্যে যাত্রীনিবাসে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী রাধুর মনের কথা বুঝিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আপন-মনে রাধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সোপান বাহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। ছুটিয়া প্রবেশ করিল মহুয়া। আলুথালু চুল। মুখে চোখে ভয়—ব্যাধ তাড়িতা হরিণীর মতো। একবার পেছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল। আবার তখনি মন্দিরের দিকে ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখে সন্ন্যাসী উঠিয়া যাইতেছেন। মহুয়া ছুটিয়া উপরে উঠিয়া দুই তিন ধাপ নীচ হইতেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধরিয়া টান দিল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখেন অপরূপা মহুয়া। মহুয়া সন্ন্যাসীর দুই তিন ধাপ নীচে দাঁড়াইয়া। সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিল. মুখে চোখে সেই ভয়, সেই আতংক। তারপরই মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিল কাকুতি…মিনতি]

মহুয়া ॥ বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!

সন্ন্যাসী ॥ (দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন) কে তুই ?

মহুয়া ॥ আমি মহুয়া!

সন্ন্যাসী ॥ (পূর্বে নদেরচাঁদের মুখে এ নাম শুনিয়াছিলেন, এখন চমকিয়া উঠিলেন) মহুয়া! বুলবুলি ? টিয়া ? পাগলের সেই পাখি ? নীল আকাশের আপন-ভোলা পাখি ? কার পাখিরে তুই কার পাখি ?

মহুয়া ॥ জানিনে কার! (মন্দিরের সদর দরজার দিকে ভীতার্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া) তারা ছুটে আসছে, আমায় ধরবে। আমায় তীর ছুঁড়ে মারবে! বাঁচাও গো আমায় বাঁচাও।

সন্ন্যাসী ॥ (তাকাইয়া দেখেন কোতোয়াল আসিতেছে) চুপ। ভয় নেই —(তাহাকে কোলাপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন) [কোতোয়ালের প্রবেশ। সঙ্গে অনুচরগণ]

অনুচরগণ ॥ ধর্—ধর্ —পাগলিটাকে ধর্ —

কোতোয়াল ॥ কোথায় গেল! নাই তো! হাওয়ায় মিশিয়ে গেল ?

অনুচরগণ ॥ আমরা জানি পরীর খেলাই এই!

কোতোয়াল ॥ তবে হয়ত বাইরে সেই বাঁশবাগানে! আমি আগেই বলেছিলাম—(বাহিরে ছুটিলেন)

অনুচরগণ ॥ বাঁশবনের পেত্নীরে বাঁশবনের পেত্নী— (প্রস্থান)

[মন্দিরের দরজা খুলিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। এবং দূরে তাকাইয়া দেখিলেন সানুচর-কোতয়াল অন্তর্ধান করিয়াছে। এই আশ্বাস পাইয়া সদরদরজার দিকেই তাকাইয়া রহিয়া মন্দিরের দরজায় টোকা দিতে দিতে]

সন্ন্যাসী ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ কি ?

সন্ন্যাসী ॥ আর ভয় নেই। তারা চলে গেছে। বেরিয়ে এস—(দরজা-পথে মহুয়া চোরের মতো মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া লইল) এস।

মহুয়া ॥ না—না—এই ভালো—

সন্ন্যাসী ॥ তা ভালো বই কি! ভালো বই কি। তবে কি না স্থানটা একেবারে মন্দিরের ভেতর—একটা ঠাকুরও ওখানে রয়েছেন কি না! তা, বাইরেই বেশ, কেমন ফুরফুরে হাওয়া, গাছে ঐ ফুলও ফুটেছে কি না—ভালোই লাগবে তোমার—(মহুয়া বিনাবাক্য ব্যয়ে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিল। সন্ন্যাসী মহুয়াকে লইয়া নামিয়া আসিয়া) কিন্তু না, এ জায়গাটাও ভালো নয়, ঐ যে আবার একটা যাত্রীনিবাস রয়েছে, কে যে কেন গড়েছিল ঐ পাগলাগারদ, বেকুবেরও অধম!

মহুয়া ॥ তুমি কি বলছ ?

সন্ন্যাসী ॥ বলছিলাম কি, চল আমরা এখান থেকেও চলে যাই…

মহুয়া ॥ কেন ? এই তো বলছিলে এই জায়গাটিই বেশ। তাই তো! ফুরফুরে এই হাওয়া, তুলতুলে ঐ ফুল—বাঃ (ছুটিয়া ফুল দেখিতে গেল)

সন্ন্যাসী ॥ না—না—তুমি দূরে যেয়ো না। ওখানে রাধু পাগলি আছে, নদের পাগল আছে…

মহুয়া ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) নদের পাগল! নদেরচাঁদ ? সোনারচাঁদ ?

সন্ন্যাসী ॥ (নদেরচাঁদকে পাইলে লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে এই আশঙ্কায়, একরূপ আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াই বলিলেন) না—না—না—

মহুয়া ॥ (যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। নদেরচাঁদ! নদেরচাঁদ! কোথায় ? কোথায় সে ? বল সে কোথায় ?

সন্ন্যাসী ॥ (প্রশ্নগুলি যেন তাহার বুকে শেল হানিতে লাগিল) ও—হো—হো—না—না—না—

মহুয়া ॥ (দস্তুর মতো ক্ষেপিয়া গিয়া) কোথায় সে ? কোথায় সে ? তাকে আমি চাই—চাই—কোথায় সে ?

সন্ন্যাসী ॥ সে নেই—সে নেই—

মহুয়া ॥ আছে—তুমি বলেছ আছে, আমার মন বলছে, আছে। (চীৎকার করিতে লাগিল) নদেরচাঁদ! সোনারচাঁদ! কোথায় তুমি সোনারচাঁদ—

সন্ন্যাসী ॥ সে পাগল—

মহুয়া ॥ আমারি জন্যে সে পাগল, তুমি বল কোথায় সে?

সন্ন্যাসী ॥ সে নেই—

মহুয়া ॥ আছে। (পুনরায় চীৎকার) নদেরচাঁদ, সোনারচাঁদ, নদেরচাঁদ, সোনারচাঁদ—(যাত্রীনিবাস হইতে নদেরচাঁদ মহুয়ার কণ্ঠস্বর চিনিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সেইখান হইতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন, মহুয়া! মহুয়া!) ঐ তার স্বর! সে আসছে! সে আসছে! (ছুটিয়া সেইদিকে যাইতেছিল)

সন্ন্যাসী ॥ (তৎক্ষণাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল) তোমার জন্য যদি তাকে হত্যা করতে হয়, করব—যদি নরকে যেতে হয়, যাবো, সাবধান!

মহুয়া ॥ (মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল।) তাকে হত্যা করবে? (আবার ব্যাকুল স্বরে) না—না—না—ওগো—না—

[ছুটিতে ছুটিতে নদেরচাদের প্রবেশ]

নদেরচাঁদ ॥ (ছুটিয়া আসিতে আসিতে) চিনেছি, আমি চিনেছি, আমার সব মনে পড়ছে, আমি কিছু ভুলি নি। মহুয়া গো মহুয়া!

(মহুয়া সন্ন্যাসীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া ছুটিয়া নদেরচাঁদের বুকে পড়িল)

সন্ন্যাসী ॥ (আর্তনাদ করিয়া চোখ-মুখ বুজিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন) ওঃ—

নদেরচাঁদ ॥ আমার টিয়া, আমার বুলবুলি, আমার পাপিয়া আমার মহুয়া!

মহুয়া ॥ (হস্ত প্রসারণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া দিয়া) চুপ!

নদেরচাঁদ ॥ ওরে! আমার হারানো পাখি ফিরে এসেছে, মরা গাছে ফুল ফুটেছে, ভাঙা-বুক জোড়া লেগেছে, মহুয়া রে মহুয়া!

সন্ন্যাসী ॥ না—না—হত্যা করব…আমি ওকে হত্যা করব—

মহুয়া ॥ না—না—(নদেরচাঁদের আলিঙ্গন-মুক্ত হইতে প্রবল চেষ্টা) ছাড় আমায় ছাড়—(আলিঙ্গন-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া) হত্যা করবে? কে ও?

নদেরচাঁদ ॥ (সাশ্চর্যে) কে আমি?

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদের দিকে না তাকাইয়া) কে…ও? আমি তো চেয়েছিলাম 'সে' ও তো 'সে' নয়।

সন্ন্যাসী ॥ (সাগ্রহে) তাই বল—তাই বল—

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! আমি যে তোর সেই সোনারচাঁদ। তুই যে আমারি সেই মহুয়া—

মহুয়া ॥ না—না—না—

নদেরচাঁদ ॥ না?

সন্ন্যাসী ॥ হাঁ তবু স্পর্ধা তোমার, তুমি ওকে বুকে নাও?

নদেরচাঁদ ॥ ও যে আমার বুকের মানিক, তাই নিই। বুকে কেন? ওরে আমার বুকের ধন, আয়, তোকে মাথায় রাখি—

মহুয়া ॥ [সন্ন্যাসীকে] দেখ তো কি বলে!

সন্ন্যাসী ॥ (নদেরচাঁদের প্রতি) খবরদার, ও তোমার কেউ নয়, তুমি ওর কেউ নয়।

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ (সন্ন্যাসীকে) কাজ কি এখানে থেকে? চল না, আমরা ঐ মন্দিরে যাই—(সন্ন্যাসীকে টানিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিল)

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—

মহুয়া ॥ (পিছু তাকাইয়া নদেরচাঁদকে ব্যঙ্গে) ম—হু-য়া!

নদেরচাঁদ ॥ (চরম ব্যাকুলতায়) শোন…শোন—

সন্ন্যাসী ॥ (বজ্রনির্ঘোষে) সাবধান!

মহুয়া ॥ (চট করিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া, মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) কি বলবে বল?

(নদেরচাঁদ মুহূর্তকাল মহুয়ার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রীনিবাসে চলিয়া গেলেন)

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদ অদৃশ্য হইলে) হাঃ হাঃ হাঃ—(হাসিবার ভাণ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। হাসি নহে, কান্না। মহুয়া কাঁদিতে লাগিল)

সন্ন্যাসী ॥ একি মহুয়া! তুমি কাঁদছ?

মহুয়া ॥ না—না-হাসছি… (হাসিয়া কথাটি বলিতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু পারিল না। না—না—গাইছি·· (হাসিও বটে, কান্নাও বটে)

সন্ন্যাসী ॥ কোথা থেকে তুই এসেছিস জানি না কিন্তু এলি যেন ঝর্ণা। পাষাণের বুকে আজ ঝর্ণা নেমেছে, পাষাণের আজ ঘুম ভেঙেছে, কত যুগের পিপাসা আজ মিটছে ঐ ঝর্ণায়…ঐ ঝর্ণায়!

মহুয়া ॥ (মুখ তুলিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি যাদুকরীর দৃষ্টিতে মধুস্বরে) আমি ঝর্ণা?

সন্ন্যাসী ॥ ঝর্ণা! ঝর্ণা! তুই ক্ষুধিত পাষাণের বুকে নেচে নেচে নেমে এসেছিস ঝর্ণা! তুই পিয়াসী পাষাণের চোখে উচ্ছল চপল ঝর্ণা।

মহুয়া ॥ অত শত বুঝিনে ছাই। তুমি আমায় নিয়ে এখন কি করবে তাই বল দিকিনি—

সন্ন্যাসী ॥ কেন?

মহুয়া ॥ (যাত্রীনিবাস দেখাইয়া) ও যদি আবার আসে?

সন্ন্যাসী ॥ যখন তুমি ছিলে না, তখন ওকে রক্ষা করেছি। এখন তুমি এসেছ ওকে আমি হত্যা করব, ক্ষুধিত পাষাণ আমি, পিয়াসী পাষাণ আমি।

মহুয়া ॥ (শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া) খুব ভালো!—তুমি খুব ভালো।···খুব ভালো হবে। তোমার বুঝি ছুরী আছে? আমারো আছে বিষ। (কেশ-পাশ হইতে বিষ বাহির করিয়া দেখাইয়া) তক্ষকের বিষ। পাহাড়ের তক্ষক, মাথায় তার মণি, আমি কিন্তু ভয় পাইনি—দেখলুম—আর নাচতে লাগলুম—ফণী এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল—এক হাতে নিলাম তার মণি—আর এক হাতে তার বিষ।

(গান) ফণির ফণায় জ্বলে মণি
কে নিবি তাহারে আয়।
মণি নিতে ডরে না কে
ফণির বিষ-জ্বালায় ॥
করেছে মেঘ উজালা
বজ্র-মানিক-মালা,
সে মালা নেবে কি কালা
মরিয়া অশনি-ঘায় ॥

সন্ন্যাসী ॥ (গান-শেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) যাদু—যাদু—যাদু জানিস তুই।

মহুয়া ॥ (কুটিল কটাক্ষে) সত্যি? তা নয় গো তা নয়। আজ মনে হচ্ছে কতকাল পরে আমি কাকে যেন পেয়েছি যাকে পেয়ে আমার চোখ নাচছে—মন নাচছে—বুক ভরে উঠছে—সাতরাজার ধন এক মানিক আমার সেই হারানো মানিক বল দেখি কে? (যাত্রীনিবাসের দিকে তাকাইল)

সন্ন্যাসী ॥ (মুস্কিলে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিলেন না।) এঁ্যা···আমি? না—না—(হঠাৎ দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া) ও কি?

মহুয়া ॥ (মহুয়াও চমকিয়া উঠিল, দেখিল কোতোয়াল ও তাহার অনুচরগণ ছুটিয়া আসিতেছে, ভীতার্তকণ্ঠে) ঐ তারা আসছে—ঐ তারা আসছে।

সন্ন্যাসী ॥ কোতোয়াল আসছে। তুমি ঐ মন্দিরে ঢুকে পড়। যাও—যাও—শীগগীর—

মহুয়া ॥ (মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) লুকাবো ? না পালাব ?

সন্ন্যাসী ॥ না—না—লুকাও। ঐ মন্দিরে,—প্রতিমার পেছনে—

মহুয়া ॥ (সোৎসাহে) এ আমি খুব পারি…দেখো এখন—

[ছুটিয়া মন্দিরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

সন্ন্যাসী ॥ কোতোয়ালকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে কোতোয়াল বাবাজী ! এসো বাবাজী এসো— [সানুচর কোতোয়াল ছুটিয়া প্রবেশ করিল।]

কোতোয়াল ॥ কথার সময় নেই। প্রমাণ পেয়েছি সেই পাগলি এই মন্দিরেই কোথায় লুকিয়ে আছে। (অনুচরদের প্রতি) হাঁ করে দেখছ কি ? ঐ মন্দিরের ভেতর দেখ—

সন্ন্যাসী ॥ না—না—দাঁড়াও (অনুচরগণ থমকিয়া দাঁড়াইল)

কোতোয়াল ॥ (সন্ন্যাসীর প্রতি) কেন ?

সন্ন্যাসী ॥ মন্দির অপবিত্র হবে !

কোতোয়াল ॥ রাজকার্যে ও বাধা মানতে পারি নে—

সন্ন্যাসী ॥ (প্রকাণ্ড সমস্যায় পড়িলেন) তবে কি হবে ! তবে কি হবে ! তবে কি হবে ! আচ্ছা, আমি দেখে আসি—

কোতোয়াল ॥ তা দস্তুর নয়। আমাদেরি স্বচক্ষে দেখতে হবে।

সন্ন্যাসী ॥ আঃ ঐ যাত্রীনিবাসটি তো দেখই নি।

কোতোয়াল ॥ মন্দিরে না পেলে সে-ও দেখব। (মন্দিরের দিকে নিজেই ছুটিল।)

[যাত্রীনিবাস হইতে রাধু পাগলি বাহির হইয়া আসিল।]

রাধুপাগলি ॥ এত গোলমাল কেন ? ঘুম ভেঙে গেল, কি জানি কি স্বপ্ন দেখছিলুম, তাও ভেঙে গেল (বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল) এরা কে ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী ॥ (রাধুকে দেখিয়া কোতোয়ালকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন) কোতোয়ালজি ! কোতোয়ালজি !

কোতোয়াল ॥ (পিছু ফিরিয়া তাকাইল) কি ?

সন্ন্যাসী ॥ পাগলি মন্দিরে নেই, কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—

কোতোয়াল ॥ (নীচে ছুটিয়া আসিয়া) কই ?

সন্ন্যাসী ॥ (একবার মন্দিরের দিকে চাহিতে লাগিলেন আবার রাধুর দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না।)

কোতোয়াল ॥ কই পাগলি ?

সন্ন্যাসী ॥ (মাথা নীচু করিয়া রাধুকে দেখাইয়া দিলেন) ঐ—

কোতোয়াল ॥ (অনুচরদের প্রতি) বাঁধো।

রাধু ॥ এঁ্যা—

কোতোয়াল ॥ চুপ ।

রাধু ॥ (সন্ন্যাসীর প্রতি) ওগো ওরা আমায় ধরে নেয় কেন? কেন ওরা আমায় বেঁধে নিয়ে যায় ? (কাঁদিয়া ফেলিল)

সন্ন্যাসী ॥ (তিনিও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না) কেন—কেন —জানি না, জানি না।

কোতোয়াল ॥ ব্যস্ এইবার ছুটে চল, ধনপতি সাধুর ওখানে, কি খুসীই হবেন তিনি—এখনি বকশিস্ মিলবে · চালাও ঘোড়া।

[সোল্লাসে চলিয়া গেল। পশ্চাতে অনুচরগণ রাধুকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল]

রাধু ॥ ওগো তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না, তোমায় ছেড়ে আমি থাকৃতে পারব না · (ক্রন্দন)

সন্ন্যাসী ॥ (তাহাকে যেন বৃশ্চিকে দংশন করিল) ওঃ! (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি সোপান বহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন)

রাধু ॥ আমি বিষ খাবো, আমি বিষ খাবো, বিষ আমার সঙ্গে আছে, আমি বিষ খাবো—ছাড়ো, আমায় ছাড়ো! (অনুচরগণ তাহাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল)

সন্ন্যাসী ॥ (কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন) রাধু! রাধু!···কোতোয়াল! কোতোয়াল! (মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া মহুয়ার প্রবেশ)

মহুয়া ॥ (আসিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল) কোতোয়াল—কোতোয়াল—

সন্ন্যাসী ॥ (তখনই আবার মহুয়ার বিপদ আশঙ্কায় মহুয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন) চুপ—চুপ—কোতোয়াল ডাকো কেন ?

মহুয়া ॥ আমি দরজার ফাঁক দিয়ে স—ব দেখেছি। কেন তুমি মিছিমিছি তাকে ধরিয়ে দিলে ? ছি—ছি—! কোতোয়াল! কোতোয়াল—!

সন্ন্যাসী ॥ চুপ—চুপ। তারা ওকে এখনি ছেড়ে দেবে তুমি ভেবো না, তুমি নেমে এস···শীগগীর নেমে এস। এই মুহূর্তে আমাদের পালাতে হবে—

মহুয়া ॥ সেই পাগলি ?

সন্ন্যাসী ॥ উচ্ছন্ন যাক্ সে। তুমি এস—

মহুয়া ॥ কিন্তু সে যে বিষ খাবে বলে গেল!

সন্ন্যাসী ॥ আঃ তাকে যে এতক্ষণ তারা ছেড়েই দিয়েছে!

মহুয়া ॥ তাহলে বেশ হয়েছে। কিন্তু আমিও খাব, আমার ক্ষুধা পেয়েছে, না খেলে আমি এখান থেকে এক পা-ও চলতে পারব না।

সন্ন্যাসী ॥ কি খাবে? দুধ? জল? না ফল? শীগ্‌গীর বল—

মহুয়া ॥ আমি পান খাব।

সন্ন্যাসী ॥ (আশ্চর্যে) পান?

মহুয়া ॥ হাঁ পান। (চটুল চাহনিতে) পান না খেলে আমি এক পাও নড়ব না।

সন্ন্যাসী ॥ চল তবে ঐ মন্দিরে, শীগ্‌গীর চল। (মন্দিরের দিকে ছুটিলেন)

মহুয়া ॥ দাঁড়াও, ওগো দাঁড়াও—

সন্ন্যাসী ॥ (দাঁড়াইলেন) আবার কি?

মহুয়া ॥ আমার যেমন-তেমন পান খাওয়া নয়, এমন পানই খাবো যে দেখে মনে হয়, আমি রাক্ষুসী, রক্ত খেয়েছি—

সন্ন্যাসী ॥ তুমি য'টা ইচ্ছে—খেয়ো—

মহুয়া ॥ আর তুমি?

সন্ন্যাসী ॥ আমি—আমি তো পান খাই নে।

মহুয়া ॥ বটে! তবে আমিও খাব না। কিন্তু এও বলে রাখছি পান না খেয়ে আমিও এক পা নড়ব না!

সন্ন্যাসী ॥ খাব—আমিও খাব—এসো শীগ্‌গীর—

মহুয়া ॥ সন্ন্যাসীও তবে পান খায়। হাঃ হাঃ হাঃ (লাফাইয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা দিল)

[যাত্রীনিবাস হইতে নদেরচাঁদ টলিতে টলিতে বাহির হইলেন—মন্দিরের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং মন্দিরের দিকে উদাসনেত্রে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—এবং তখনই মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবেন কি হইবেন না এই দ্বিধায় পড়িলেন। একটু উত্তেজনার সহিতই দুইপদ অগ্রসর হইলেন এবং তখনই যেন ভাঙিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রীনিবাসে চলিয়া গেলেন। মন্দির হইতে সন্ন্যাসী আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

[মন্দির হইতে ছুটিয়া মহুয়া বাহির হইয়া আসিল]

মহুয়া ॥ পান আর বিষ দুইই—পান আর বিষ দুই-ই। (যাত্রীনিবাসের দিকে ছুটিল)

সন্ন্যাসী ॥ (দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলেন) ও-হো, বিষ, বিষ! রাক্ষসী! পাষাণী! (তখনই পড়িয়া গেলেন)

মহুয়া ॥ (নদেরচাঁদকে যাত্রীনিবাস হইতে একপ্রকার টানিয়াই বাহির করিয়া)

নদেরচাঁদ ॥ না—না—

মহুয়া ॥ (সকৌতুকে) হাঁ—হাঁ—ঐ দেখ—(মৃতদেহ নদেরচাঁদকে দেখাইল)

নদেরচাঁদ ॥ (মৃতদেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কান্নার সুরেই বলিল) না—না—

মহুয়া ॥ তবু কাঁদে। ওরে বোকা, ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার সঙ্গে ঘর করবি। সন্ন্যাসী যদি বুঝতো আমি তোর বৌ, আগে নিত তোর প্রাণ, তারপর যেত আমার প্রাণ! (সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া) ঐ প্রাণের প্রাণকে পান দিতো কে প্রাণ? চোখ ঠেরে তো আমি তোকে সব বলেওছিলাম তা তুই তো…(দূরে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেল) তাই ত! আবার ঘোড়া? (দেখিয়া) কোতোয়াল! (নদেরচাঁদকে) এইবার তুই আমায় বাঁচা—(সন্ন্যাসীর মৃতদেহ দেখাইয়া দিল)

[এই একটি কথায় নদেরচাদের লুপ্ত তেজ, সুপ্তবল—তখনি ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া নদেরচাদ মন্দিরে উঠিলেন। তাহার মৃতদেহ মন্দিরের ভেতর ঠেলিয়া দিয়া দুয়ার টানিয়া দিয়া নীচে ছুটিয়া আসিলেন—মহুয়া ব্যাকুলভাবে নদেরচাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, নদেরচাদ তাহার কাছে আসিবামাত্র কোতোয়ালদের কোলাহলও ফটকের সম্মুখেই শোনা গেল। তখনি উভয়ে ছুটিয়া ফটকের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিলেই তাহারা দরজার আড়ালে ঢাকা পড়ে এই মতলবে। সেই মুহূর্তে কোতোয়াল কয়েকজন অনুচর সহ ছুটিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সদর দরজা খোলামাত্র দরজার আড়ালে মহুয়া ও নদেরচাদ ঢাকা পড়িল।]

কোতোয়াল ॥ সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—এক নিরপরাধ রমণীকে খরিয়ে দিয়ে সরে পড়লে চলবে না, তার জবাবদিহি কর। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী পালিয়েছে! তবে সে পালিয়েছে, শুধু একা নয়, সেই পাগলি—প্রমাণ পেলাম সে বেদেনী—সেই বেদেনীকে নিয়ে পালিয়েছে! খোঁজ সেই সন্ন্যাসী, ধর সেই বেদেনী (অনুচরদের ইঙ্গিত, তাহারা মন্দিরের দিকে ছুটিল) কোথায় সেই বেদের দল…(নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) ওখানে নয়, আনো ওদের এখানে, যদি সেই বেদেনীকে না পাই তবে (বেদের-দলকে ঘিরিয়া কোতোয়ালের অন্যান্য অনুচরদের প্রবেশ) ওদের সবাইকে আজ কয়েদ করব—

হুমড়া ॥ ঐ মন্দিরে আমরা তার পিছু নিয়েছিলাম, খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছি সে এই মন্দিরে ছুটে এসেছে।

কোতোয়াল ॥ চল সব মন্দিরে—(সকলে মন্দির অভিমুখে ছুটিল।)

মহুয়া ॥ (এই ফাঁকে নদেরচাঁদকে লইয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া) এই ফাঁকে পালাতে হবে। দেখেছ, শুধু কোতোয়াল নয়, ঐ দেখ সর্দার!

নদেরচাঁদ ॥ ঐ মানিক…

মহুয়া ॥ আর সবার পিছে ? (একটু অগ্রসর হইয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিতেই চিনিল, আবেগ ও উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উঠিল)—সুজন!

সুজন ॥ (তখন আর-সবাই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে; বাকী ছিল সবার পিছে শুধু সুজন। সে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইল, মহুয়াকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল) মহুয়া!

[এবং তৎক্ষণাৎ ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া সোপান বাহিয়া নীচে ছুটিল]

মহুয়া ॥ (তাহার মুখোমুখি ছুটিল এবং সম্রাজ্ঞীর মতো আদেশসূচকস্বরে তর্জনী তাড়নায় কহিল) খবরদার—

সুজন ॥ (থমকিয়া দাঁড়াইল কিন্তু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো মহুয়ার চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

মহুয়া ॥ (মহুয়াও প্রথমে তীব্রদৃষ্টিতেই সুজনের পানে চাহিয়াছিল, ধীরে ধীরে দৃষ্টির সে তীব্রতা কমিয়া আসিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া সেই জলভরা চোখে মিনতির সুরে ডাকিল) সুজন!

সুজন ॥ (মহুয়ার তীব্রদৃষ্টিতে সুজন ততটা বিচলিত হয় নাই, কিন্তু মহুয়ার এই করুণ-কাতর সম্বোধনে তাহার হাত হইতে ছুরি পড়িয়া গেল, গড়াইয়া কয়েক ধাপ নীচে পড়িল। সুজন অবশ হইয়া গেল)

মহুয়া ॥ (ছুরিখানি চট করিয়া তুলিয়া লইয়া বিজয়িনীর উল্লাসে হাসিয়া উঠিল) হাঃ হাঃ হাঃ (নদেরচাঁদকে) এই ছুরি ··আর বাইরে কোতোয়ালের ঐ ঘোড়া। ছোট—

নদেরচাঁদ ॥ আর তুমি ?

মহুয়া ॥ তোমার সামনে···ঐ ঘোড়ার পিঠে!

[বলিয়াই নদেরচাঁদকে একটানে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।]

সুজন ॥ [বাইরে ঘোড়ার শব্দে সুজনের চমক ভাঙিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছুটিয়া কয়েক ধাপ নামিল। দেখিল মহুয়ারা ঘোড়া ছুটাইয়া পালাইল—তৎক্ষণাৎ সে ঘুরিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে) সর্দার! সর্দার!

[মন্দিরের দুয়ারে কোতোয়াল ও হুমড়া বেদের আবির্ভাব]

কোতোয়াল ॥ সন্ন্যাসীকেও বিষ দিয়েছে সেই বেদেনী—আজ একের দোষে সকল বেদে-বেদেনী কোতল করব।

হুমড়া ॥ এ্যাঁ—

সুজন ॥ তবে কি সে ?

হুমড়া ॥ কে ?

সুজন ॥ মহুয়া!

হুমড়া ॥ ম—হু—য়া! সেই শয়তানি। কোথায় সে ?

কোতোয়াল ॥ কে মহুয়া ?

সুজন ॥ যে তোমার ঘোড়ায় আমাদের জাতের দুষ্‌মনকে নিয়ে পালাল—

হুমড়া ॥ তোরি সামনে ?

সুজন ॥ সামনে দিয়ে কেন, আমার চোখের ওপর দিয়ে, আমার বুকের ওপর দিয়ে বুকে ছুরি বসিয়ে—

হুমড়া ॥ অধম ! পারিস্‌নি নিতে তার শির ! (সুজন মাথা নীচু করিল)

কোতোয়াল ॥ শির নেব আমরা—(ফটকের দিকে ছুটিলেন)

হুমড়া ॥ খবরদার। বেদের শাস্তি দেবে বেদে। দেব আমি। এক-পা এগিয়েছ কি মরেছ—

[কোতোয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ছুরি তুলিল—কোতোয়াল থমকিয়া দাঁড়াইল]

পঞ্চম অঙ্ক

জয়ন্তী পাহাড়।

(পর্ণ কুটীর। চৌদিকে রাঙা-ফুল ডালে পাকা-ফল। ঝর্ণা। দূরে নদী। যেন একখানি ছবি। পশ্চাতে কল্পলোক)

মহুয়ার গান

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতর হ'ল নিখিল ভুবন ॥
আজি কপোত-কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা-বেণু বাজে বন-মর্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নতুন জগৎ মোরা করেছি সৃজন ॥
মরিতে চাহিনা, পেয়ে জীবন-অমিয়া।
আসিব এ কুটীরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন।
আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রীলয়ে আসিল অনন্যা,
মঙ্গল-ঘটে এল নদীজল ধন্যা,
পার্বতী পরিয়াছে গৌরী-ভূষণ ॥

[পশ্চাতে কল্পলোক-পটে একটি সোনার গাছে রূপার পাতা। তাহাতে মানিকজোড় পাখি বসিয়া আছে। তাহাদের প্রতীক এক খোকা আর এক খুকী মহুয়ার গানের তালে তালে নাচিতেছিল। মহুয়া গানের শেষে জলের কলসী লইয়া নদীতে জল আনিতে গেল। আবার সেই কল্পলোক। খোকা-খুকু সেই গানের তালে তালেই নাচিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কোথা হইতে আর একটি ব্যাধবালক নাচিতে নাচিতে আসিল। হাতে তাহার তীর-ধনুক। সে গাছের মানিকজোড় পাখি লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। একটি পাখি মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়য়া গেল খুকিটী। খোকা তখন তাহারি চারিধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাচতে লাগিল। অবশেষে সেও পড়িয়া মরিয়া গেল। ব্যাধ বালকটি তাহা দেখিয়া কঁাদিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে, অন্ধকারে কল্পলোক অদৃশ্য হইল।]

[নদেরচাদের প্রবেশ]

নদেরচাঁদ ॥ (অতি বিষণ্ণ) মহুয়া! (জলকলস লইয়া মহুয়ার প্রবেশ)

মহুয়া ॥ সোণারচাঁদ!

নদেরচাঁদ ॥ আজ আবার সেই মানিকজোড় পাখি।

মহুয়া ॥ কিছু বলনি তো তাদের? সুখে আছে তারা?

নদেরচাঁদ ॥ (হঠাৎ যেন বাণ বিদ্ধ হইয়াছে) ওঃ!

মহুয়া ॥ ও কি! অমন করলে যে?

নদেরচাঁদ ॥ না—কিছু না—

মহুয়া ॥ বল কি হয়েছে?

নদেরচাঁদ ॥ (কাঁপিয়া উঠিলেন) না—না—না—

মহুয়া ॥ ওদের কথা ভেবে বুঝি ভয় পাচ্ছ? ভারী সুখী পাখি, না? আমারো খালি ভয় হয়, কে কখন্ ওদের তীর মারে। ওদের তু'টিতে কি ভাব! কেউ যদি ওদের একটিকে মেরে ফেলে, আর একটি উড়ে পালায় না,—যে সাথীটি গেল—তারি চারপাশে ওড়ে আর ওড়ে—নেচে নেচে ওড়ে—হঠাৎ পড়ে মরে যায়!

নদেরচাঁদ ॥ আমি দেখেছি—আমি দেখেছি—

মহুয়া ॥ আমি দেখিনি—আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি দেখলে কবে? কোথায় দেখলে?

নদেরচাঁদ ॥ (শিহরিয়া উঠিয়া) না—না—না—

মহুয়া ॥ বটে! না? (সাভিমানে) বেশ। (আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল)

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—(মহুয়া আকাশের দিকে চেষ্টা করিয়াই আরো বেশী মন দিল।)

নদেরচাঁদ ॥ ও কি হচ্ছে মহুয়া?

মহুয়া ॥ (আকাশ হইতে চোখ না ফিরাইয়া) কাজ করছি!

নদেরচাঁদ ॥ কি কাজ?

মহুয়া ॥ বলব না—

নদেরচাঁদ ॥ বুঝেছি। রাগ করেছ। তবে কামরাঙা ফলগুলো…

মহুয়া ॥ (ছুটিয়া কাছে আসিয়া) দাও—

নদেরচাঁদ ॥ সে হচ্ছে পরের কথা। আগে বল আকাশ-পানে তাকিয়ে ছিলে কেন রাগ করেছিলে ?

মহুয়া ॥ (মাথা নাচু করিয়া একমুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া, তখনি নদের-চাঁদের মুখেরপানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে) কড়িকাঠ গুনছিলাম।

নদেরচাঁদ ॥ কড়িকাঠ গুনছিলে আকাশে ?

মহুয়া ॥ (পুনরায় পূর্বস্থানে ছুটিয়া গিয়া পূর্ববৎ আকাশে তাকাইয়া) নিশ্চয়ই একটা কিছু দেখছিলাম। (বিড়বিড় করিয়া) কি দেখছিলাম ! কি দেখছিলাম ! (হঠাৎ) হাঁ, একটা চাঁদ উঠেছে।

নদেরচাঁদ ॥ দিনের বেলায় চাঁদ—!

মহুয়া ॥ শুধু ওঠে নি—আবার জ্বালাতন সুরু করে দিয়েছে।

নদেরচাঁদ ॥ আকাশের চাঁদ তো এক রাতের বেলায়ই ওঠে জানি—

মহুয়া ॥ তবে তো আকাশের চাঁদ নয়, হাঁ, তবে বুঝি নদীয়ার চাঁদ (হঠাৎ তাহার দিকে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) ও, তুমি ? কখন্ এলে ?

নদেরচাঁদ ॥ রাগ ভাঙল ?

মহুয়া ॥ (অপ্রস্তুত হইয়া) বটে। (তখনি নদেরচাঁদকে জব্দ করিবার মানসে) আমার কামরাঙা ফল ? (নদেরচাঁদ হতবাক হইলেন) আমার কামরাঙা ফল ?

নদেরচাঁদ ॥ না—না,—সে ফল যেন কেউ দেখে না, কেউ চায় না, কেউ যেন পাড়তে যায় না—

মহুয়া ॥ কেন ? কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ সেই গাছেই যে মানিকজোড়ের বাসা। ওরে মহুয়া, এই যে আমাদের পাতার কুটির—পাতারই কুটির, প্রাসাদ নয়, অট্টালিকা নয়, শুধু পাতারই কুটির। কিন্তু তবু এই পাতার কুটিরেই আমরা বাসা বেঁধে আছি কি আনন্দে কি সুখে !

মহুয়া ॥ ঠিক যেন মানিকজোড়।

নদেরচাঁদ ॥ হাঁ ঠিক্ যেন মানিকজোড় ! আমাদেরও ঐ পেয়ারা ফলের গাছ রয়েছে, তারই তলে আমরা দাঁড়িয়ে কি সুখেই গল্প করছি। গান করছি—দুজনে দুজনকে ভালোবেসে দুনিয়া ভুলে বসে আছি। হঠাৎ যদি কোন ব্যাধ ঐ ফল পাড়তে তীর ছোঁড়ে, সেই তীর ফলে না লেগে যদি দৈববশে আমাদেরই কারো বুক বিদ্ধ করে তবে—তবে—?

মহুয়া ॥ (কল্পনায় সে দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল) ওঃ !

(চোখ বুঁজিয়া আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে) না—না—চাইনা কমরাঙা ফল—কেউ যেন কখনো না চায়—

নদেরচাঁদ ॥ (বিষম যন্ত্রণায়) তুমি চেয়েছিলে—তুমি চেয়েছিলে—আমিও তীর ছুঁড়েছিলাম—

মহুয়া ॥ (বিষম যন্ত্রণায়) কেন ছুঁড়লে ? কেন ?

নদেরচাঁদ ॥ আমি আগে দেখিনি তারা যে ফলের পাশে পাতার আড়ালে বসেছিল আমি আগে দেখিনি—

মহুয়া ॥ তুটিই কি মারা গেছে ? ওগো, তুটিই কি একসঙ্গে চোখ বুজল ?

নদেরচাঁদ ॥ মরেছে কি বেঁচে আছে আমি দেখে আসিনি। তীর খেয়ে একটি তখনি মাটিতে লোটাল আর একটি কিন্তু পালাল না, মৃত পাখির চারপাশে ঘূর্ণীর মতো ঘুরতে লাগলো।

মহুয়া ॥ ওরই নাম মানিকজোড়ের মরণ-নাচ। সেই নাচ নাচছিল, নাচছিল আর মরছিল—তিলে তিলে মরছিল—দেখনি ?

নদেরচাঁদ ॥ না, দেখিনি। আর তাকাতে পারলাম না। তোমার জন্য নীল হ্রদ থেকে লালকমল তুলেছিলাম। লালকমল ছিল হাতে। হাত থেকে তা পড়ে গেল। আমি চোখ বুঁজে ছুটে পালিয়ে এলাম তোমার কাছে—

মহুয়া ॥ তুমি আবার যাও, গিয়ে দেখে এস, যেটি বেঁচেছিল, যেটি নাচছিল, সেটি কি এখনো বেঁচে আছে ?

নদেরচাঁদ ॥ না—না, আমি যাব না, আর যেতে পারব না।

মহুয়া ॥ যেতে তোমাকে হবেই। যেতেই হবে, তোমাকে যেতেই হবে।

নদেরচাঁদ ॥ কেন ?

মহুয়া ॥ যদি সে এখনো বেঁচে থাকে, তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে চলে এস—তাকে বাঁচাও—তাকে মুক্তি দাও—তাকে শান্তি দাও।

নদেরচাঁদ ॥ না—না আমি যেতে পারব না।

মহুয়া ॥ যাবে না ?

নদেরচাঁদ ॥ না।

মহুয়া ॥ বেশ, আমার লালকমল ?

নদেরচাঁদ ॥ বললাম যে, সেই মানিকজোড়ের পাশে পড়ে আছে, হাত থেকে খসে পড়েছে, আর আমি তুললাম না…

মহুয়া ॥ কেন তুললে না ?

নদেরচাঁদ ॥ ভুলে গেলাম।

মহুয়া। (সাভিমানে) তুমি আমারও তবে মাঝে মাঝে ভুলে বসে থাক!

নদেরচাঁদ॥ না মহুয়া না

মহুয়া॥ হ্যাঁ সোনারচাঁদ হ্যাঁ!

নদেরচাঁদ॥ তোকে ভুলব? তা কি কখনো হয়?

মহুয়া। আমায় তুমি তেমনি ভালোবাস?

নদেরচাঁদ॥ তাও কি মুখে বলতে হবে?

মহুয়া॥ যাও তবে লালকমল নিয়ে এস—যাও বলছি, নইলে আমি অনর্থ করব।

নদেরচাঁদ॥ মহুয়া, আজ যে আর পা চলছে না?

মহুয়া॥ পা চলছে না? ভালো কথা মনে করে দিয়েছ—(ছুটিয়া গিয়া একটি মদ্যপূর্ণ পাত্র সম্মুখে আনিয়া ধরিল) দেখেছ?

নদেরচাঁদ॥ মদ?

মহুয়া॥ মদ! আমি বানিয়েছি। নিজে-হাতে বনের ফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে তৈরী করেছি। একটি চুমুক খেয়েছ কি মন নেচে উঠবে, পা নেচে উঠবে, নাচতে ইচ্ছে হবে—ছুটতে ইচ্ছে হবে। বল দেখি এর নাম?

নদেরচাঁদ॥ তুমিই জানো—

মহুয়া॥ [গান]

(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দেবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোণার চাঁদ-চুঁয়া॥
মধু হ'তে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রং ধরে কাজল-নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নভো-নীল ছোঁওয়া॥
ঝিম্ হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
পান্‌সে জোছনাতে পান্‌সি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারই মিতালী এ মহুয়া॥

মহুয়া॥ (গীত শেষে, গর্বে) এই মাথা ওর বাপ—এই হাত ওর মা—তুমি ওর কেউ নও, হ্যাঁ। মদ তো নয়, যেন মধু। তৈরী করেই একটি চুমুক খেয়েছি, তাতেই মন নেচে উঠছে, রক্ত নেচে উঠছে। শুধু নাচতেই ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে হচ্ছে নেচে নেচেই আজ মরি। তা তো নাচব না, আজ

লালকমল না পেলে জীবনে আর নাচবোই না। ফেলে দিলাম এই মদ—(মন্তপাত্র উপুড় করিয়া ধরিল সব মদ পড়িয়া গেল) কি হবে রেখে? থাকতো যদি আজ সুজন, ঐ মদ খেয়ে নেচে উঠত। ছুটে যেত সেই লালকমল আনতে, যত দূরেই হোক, যেখান থেকেই হোক।

নদেরচাঁদ॥ মদ? ঐ মদ খেয়ে সুজনকে ছুটতে হ'ত? তবে ফেলে দিলে কেন?

মহুয়া। তুমি তো আর খেলে না!

নদেরচাঁদ॥ কেন খাব? কেন খাব মদ?

মহুয়া॥ নেশা—নেশা হ'ত। পা চলত! লালকমলও পেতাম!

নদেরচাঁদ॥ লালকমল পাবে। পা-ও চলবে। আর নেশা? তুই-ই যে আমার নেশা, আমার জীবনের নেশা, আমার মরণের নেশা। মদ আমারও আছে, মদ আমিও খাই। কিন্তু সে মদের নাম মদ নয়, তার নাম সুরা নয়, তার নাম মদিরা নয়—তার নাম "মহুয়া"! [প্রস্থান]

মহুয়া॥ (ক্ষণেক স্তম্ভিত হইল। তৎপরেই নদেরচাঁদের দিকে ছুটিয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পরম ঔৎসুক্যে তাহাকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে আর যখন দেখা যায় না তখন ফিরিয়া আসিয়া)—ভালোবাসে। খুব ভালোবাসে। তবু মন মানে না, ইচ্ছে হয় দেখি—আরো কত ভালোবাসে! কবুতর-কবুতরি দেখি হিংসে হয়, তুজনে তাই তাদের মতোই বাসা বাঁধি ছোট্ট এই পাতার বাসা—চোখ জুড়িয়ে যায় মন পাগল হয়! মানিক-জোড় পাখি দেখি—মনে হয় আমরাও এই মাটির মানিক-জোড়—জন্মে জন্মে ঐ মানিক-জোড়েই জন্মেছি মানিক-জোড়েই মরেছি, (হঠাৎ দূরে পালঙ্কের বাঁশী শোনা গেল।) ও কি! বাঁশী বাজে! কার বাঁশী? (উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া হঠাৎ আতঙ্কে) এ যে পালঙ-সইএর বাঁশী! বিদায়ের সময় সে বলেছিল ঐ বাঁশী বাজলে মাথায় বাজ পড়বে! (মাদল বাদ্যও শোনা গেল) ঐ যে মাদলও বাজে! ও যে সুজনের মাদল!…তবে কি তারা? তবে কি, তবে কি তারাই এখানে ছুটে আসছে? (মাদল বাদ্য) ঐ যে আরো কাছে! এ যে কানের পাশে! সর্বনাশ! আজ মাথায় বাজ পড়বে! আজ মাথায় বাজ পড়বে! (থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল) কোথায় আমার সোনার চাঁদ—কেন তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দিলাম সেও যে এখানেই ফিরে আসছে। পালাই, তার কাছে পালাই (কাঁদিতে কাঁদিতে) রইল আমার পাতার বাসা, রইল আমার হিজল গাছের তল, রইল আমার ঝরণাধারার জল…(মাদল ধ্বনিত)—(কাঁদিতে কাঁদিতে) রইল গো রইল, সব আমার রইল। যাই—গো—আমি যাই, তোদের ছেড়ে পালাই—(পালাইতে গিয়াই হঠাৎ কি মনে পড়িল) পালাব? যদি পথে তার সঙ্গে দেখা না হয়, আমি তো পালালাম, কিন্তু সে যদি অন্যপথে

ওদের সম্মুখে এখানে এসে পড়ে, তবে…(পরিণাম কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া) ওঃ না—না—আমি পালাব না। আসুক তারা। আসুক সে। রইলাম আমি। (একটি বৃক্ষ ধরিয়া নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল)।

[ছুটিয়া নদেরচাঁদের প্রবেশ। তাহার গাত্রবাসে আবদ্ধ একগুচ্ছ রক্তকমল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া…

মহুয়া ॥ (চমকিয়া উঠিল) তুমি! এসেছ! (কপালে করাঘাত করিয়া) সর্বনাশ!

নদেরচাঁদ ॥ চুপ। বেদের দল চারদিক ঘিরে ফেলেছে—আয়, পালাই—

মহুয়া ॥ আর পালিয়ে কি হবে! না—না, আমি পালাব না।

নদেরচাঁদ ॥ কপালে যা আছে তাই হবে, আয়—(তাহাকে কোলাপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া পালাইতে যাইবেন—ঠিক এমন সময় চতুর্দিক হইতে বেদের দলের প্রবেশ। সকলের হাতে প্রসারিত ছুরি)

বেদের-দল ॥ মহুয়া—(নদেরচাঁদ মহুয়াকে নামাইয়া দিলেন। মহুয়া নদেরচাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইল) এইবার?

মহুয়া ॥ আমায় তোমরা মারবে? কেন মারবে? আমি যে তোমাদেরই মেয়ে!

বেদের দল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

মহুয়া ॥ তোমরা হাসছো কেন? নামাও ছুরি, বাজাও মাদল, গাও গান। …বাপুজি! পালঙ-সই! সুজন!

[সুজন তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে নদেরচাঁদের আলিঙ্গন হইতে ছিন্ন করিয়া দিল]

হুমড়া ॥ সুজন, আগে মার দুষমন—

সুজন ॥ না, আগে মারব বেইমানি!

মহুয়া ॥ ও—হো—হো—সোনারচাঁদ…

[ছুটিয়া নদেরচাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেই সুজন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল]

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! জানো এ…কি? মানিকজোড়ের অভিশাপ মানিকজোড়ের অভিশাপ!

মহুয়া ॥ (সুজনের দৃঢ়মুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা) আমায় ছাড়—আমায় ছাড়—

সুজন ॥ (মহুয়ার মুখের কাছে মুখ লইয়া হাস্য-কুটিল স্বর ও দৃষ্টিতে) কেন? কেন?

মহুয়া ॥ আমায় না ছাড় (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ওকে ছেড়ে দাও—দয়া কর সুজন দয়া কর—

সুজন ॥ ওকেই তো দয়া করছি। ওকে আগে মারব না, আগে মারব তোকে। ও তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে চেয়ে দেখুক! (মহুয়াকে) ভুবনকে এতখানি দয়া কে করে? (নদেরচাঁদকে) কেউ করে?

হুমড়া ॥ ঠিক বলেছিস সুজন, ঠিক বলেছিস। এরই নাম বেদের দয়া—হাঃ হাঃ হাঃ।

নদেরচাঁদ ॥ ফিরে নাও তোমাদের এই অপূর্ব দয়া। দয়া করে শুধু এই দয়াটুকু ফিরে নাও…

হুমড়া ॥ তা হয় না ঠাকুর। লোকে তবে বলবে বেদে-জাত বড়ই নির্দয়! হাঃ হাঃ হাঃ।

সুজন ॥ মহুয়া, তবে—? (একহাতে মহুয়াকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। ছুরি কাঁপিতে লাগিল—)

মহুয়া ॥ ও—হো! (ভয়ে চোখ বুঁজিল)

নদেরচাঁদ ॥ না—না—ওরে, না—

পালঙ্ক ॥ সুজন! সুজন! (কাঁদিতে লাগিল)

হুমড়া ॥ (যেন তাহারি মৃত্যুকাল উপস্থিত) দাঁড়া সুজন, একটু দাঁড়া—কথা আছে।

নদেরচাঁদ ॥ হাঁ, একটু দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে শুধু একটিবার চেয়ে দেখে ওর ঐ ভয় ব্যাকুল মুখখানি…

সুজন ॥ ঐ চাঁদমুখখানি, না? (সর্দারকে) ও-মুখ আমরা যেন আজ নতুন দেখব! যে-মুখ দিনের ছিল ধ্যান, রাত্রের ছিল স্বপ্ন, যে-মুখ চোখের ছিল নেশা, মনের ছিল মধু, যে-মুখের কথা ছিল বাঁশী, আর হাসি ছিল সুধা—যে-মুখের একটি কথায় জীবন হয়েছে স্বপ্ন আর স্বপ্ন হয়েছে সোনা—আজ সেই মুখ দেখতে বলছে অপরে! অপূর্ব! অপূর্ব! অতীব অপূর্ব! নয় মহুয়া? (কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল)

মহুয়া ॥ সুজন! ফেলে দে ঐ ছুরি—সুজনের হাত হইতে ছুরি পড়িয়া গেল) কেন কাঁদিস? (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ছেড়ে দে ওকে। ও বাজাবে বাঁশী। তুই বাজাবি মাদল, পালঙ নাচবে। আমি গাইব। বাপুজি শুনবে। সে কেমন হবে বাপুজি, কেমন হবে?

হুমড়া ॥ চুপ শয়তানি—

মহুয়া ॥ চুপ করব কেন বাপুজি! যত কথা আছে শোন। কত সুখে আছি দেখ। দেখ ঐ পাতার বাসা, তারই পাশে দেখ ঐ লতার বন, তারই সঙ্গে শোন ঐ ঝরণার গান—

হুমড়া ॥ আমি দেখব না। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। মন ভুলে যায়। কিন্তু শয়তানি যে, সে এমনি করেই প্রাণ

গলায়, ওরে শয়তানি, আমি তা জানি। ওরে মানিক ওরে সুজন, তোরাও কি শয়তানির মায়ায় ভুললি? সুজন? (সুজনের কাছে গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। সুজন যেন স্বপ্ন দেখিয়া, সচকিত ভাবে জাগিয়া উঠিল) ছুরি কই? (সুজন ছুরি তুলিয়া লইল) শানাও ছুরি। ওরে সবাই শানাও ছুরি—

বেদের দল ॥ (সকলে ছুরি পরখ করিয়া দেখিয়া) ঠিক আছে। সর্দার এই দেখ (সকলে একসঙ্গে ছুরিকা সম্মুখে হানিল—ছুরিকাগুলি চিকমিক করিতে লাগিল।)

মহুয়া ॥ (ভয়ে) বাপুজি! আবার ঐ ছুরি? ও—হো—হো—নামাও, নামাও—

নদেরচাঁদ ॥ আর যদি না নামাও, আগে বসাও আমার বুকে—

হুমড়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

পালঙ ॥ বাপুজি সইএর হয়ে আমি তোমার পায়ে পড়ছি।

মহুয়া ॥ ওরে আমার পালঙ-সই, কত গান রয়েছে গাওয়া হয়নি, কত নাচ রয়েছে নাচিনি, কত কথা ছিল কইনি –(কাঁদিয়া ফেলিল)।

সুজন ॥ সর্দার, সর্দার, মহুয়ার চোখে জল দেখেছ? যা কোনদিন কেউ দেখেনি, আজ দেখ! মহুয়া কাঁদে, আজ মহুয়া কাঁদে—

নদেরচাঁদ ॥ কাঁদে! কাঁদে! (ক্রন্দন।)

হুমড়া ॥ কাঁদলেই হ'ল? কাঁদে তো সবাই। চোখে তো আমারো জল আসছে, তাই বলে আমিও কি কাঁদব? (রুদ্ধ অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল) কখনো না—কখনো না—প্রস্তুত হও সুজন, প্রস্তুত হও মানিক, তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। মনে কর সেই প্রতিজ্ঞা—

বেদেগণ ॥ মনে আছে। আমরা সবাই প্রস্তুত!

হুমড়া ॥ (সকল বেদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া) হুম। ছুরি সব কোষবদ্ধ কর। (আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল) ঐ মায়াবিনীর কাছে দাঁড়িয়ো না। ওর কাছে গিয়ে ওর বুকে ছুরি বসাতে হাত কাঁপবে। হাজার হলেও ও বেদের মেয়ে, সবাই ওকে ভালোবেসেছ একদিন। সেই দুর্বলতায় কারো হাত যদি কাঁপে তার ছুরি যদি ওর বুকে না বসে, বেদের আইনে ওকে দিতে হবে মুক্তি, আর তাকে বরণ করতে হবে মৃত্যু। ওরে মানিক, ওরে সুজন, তাই নয়?

বেদেগণ ॥ হ্যাঁ, তাই—

মানিক ॥ হ্যাঁ তাই। শিকার করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় চাইতে বড় অপমান বেদে আর জানেনা। বেদে জানে শুধু এক—আঘাত। ছুরিরই হোক আর তীরেরই হোক—

হুমড়া ॥ সেই এক—আঘাতে যে মরে না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সে বাঁচুক।

কিন্তু যার সেই এক-আঘাত ব্যর্থ হ'ল, সে বেদের জাতের কলঙ্ক, মৃত্যু দিয়ে তার নাম আমাদের দল থেকে মুছে দেই। কেমন?

বেদেগণ ॥ হ্যাঁ।

হুমড়া ॥ এই কথাটা তোমরা বেশ বুঝতে পাচ্ছ তো? যে এক আঘাত ব্যর্থ হলে তার শাস্তি মৃত্যু?

বেদেগণ ॥ হাঁ সর্দার—

হুমড়া ॥ তবে সকলে তীর-ধনুক নাও। না,—সকলে নয়। একজনই যথেষ্ট। ঐ তো আমার দুধের মেয়ে, একজনের একটি তীরই যথেষ্ট।

মহুয়া ॥ (বুঝি এ রাজ্যে ছিলনা, কল্পনা-চক্ষে কি যেন দেখিতেছিল) কামরাঙা ফল। আমি চাইলাম। ঐ কামরাঙা-গাছে মানিকজোড়ের বাসা। ফল পাড়তে তীর ছুঁড়ল। ফল পড়ল না—পড়ল একটি পাখি—পড়ল আর মরল কিন্তু তার দোসর? দোসর?

নদেরচাঁদ ॥ আমি দেখে এসেছি, আমি দেখে এসেছি…

মহুয়া ॥ বল গো বল, তার দোসর?

নদেরচাঁদ ॥ আমি বলব না—আমি বলব না—

মহুয়া ॥ তারা ছিল—মানিকজোড়—আর গেল কি একলা? (আপন মনে ভাবিতে লাগিল।)

পালঙ ॥ মানিকজোড় কি সই? মানিকজোড়?

মহুয়া ॥ তুই আর সুজন। আমি আর (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ও—হাঃ হাঃ হাঃ—নদেরচাঁদকে নয়?

হুমড়া ॥ ওরে, ও হাসছে! তবে কি ও পাগল হ'ল?

সুজন ॥ আর কথা নয় সর্দার। এ দৃশ্য অসহ্য। শেষ কর এ দৃশ্য।

হুমড়া ॥ কে শেষ করবে?

মানিক ॥ আমি—

সুজন ॥ না, আমি। ও ছিল আমারই বাকদত্তা বধূ। বাকদানের এই সেই বকুলমালা—ঐ দিয়েছিল আমার গলায় তুলে। শুকিয়ে গেছে সে মালা, কিন্তু এখনো আমার বুক জুড়ে রয়েছে সেই ব্যঙ্গ, সেই পরিহাস। (মহুয়াকে) বকুলমালা তার অপমান ভুলে আজও আমার বুক জুড়েই রয়েছে, কিন্তু বকুলমালার সে অপমান, আমার প্রেমের এই অপমান আমি ভুলতে পারি না—

মহুয়া ॥ তুমি তার প্রতিশোধ নাও। মার, আমায় মার। তুমি খুশী হও। খুশী হয়ে আমার শুধু একটা কথা রেখো—

সুজন ॥ কি কথা?

মহুয়া ॥ ঐ পালঙ-সইকে বিয়ে ক'রো। ও তোমাকে ভালোবাসে,

আমি যেমন (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ওকে ভালোবেসেছি—তেমনি! একতিল কম নয়!

সুজন ॥ হাঁ, বিয়ে করব। কিন্তু আগে চাই প্রতিশোধ, তবে তো?

মহুয়া ॥ (ধীরে ধীরে চোখের জলের ডালি লইয়া হুমড়ার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল।) বাপুজি! বিদায় বাপুজি!

হুমড়া ॥ ওরে—ওরে। (ক্রন্দন)

সুজন ॥ তুমিও কাঁদছ সর্দার? তুমি না সর্দার? তুমি নিষ্ঠুর বেদের নির্মম সর্দার এই-না ছিল তোমার গর্ব? কিন্তু আজ! ওরে হতভাগ্য বেদের দল, চেয়ে দেখ ঐ আমাদের সর্দার, কন্যার একটি আলিঙ্গনে কন্যার দু'ফোঁটা চোখের জলে ভাসিয়ে দিল, এতকালের, কতকালের এই বেদে জাতির মান-সম্মান, অপমান, প্রতিহিংসা, প্রতিজ্ঞা!

হুমড়া ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) না—না–

সুজন ॥ ঐ দেখ সর্দার কাঁদে! বেদে তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে, ভয়ে ঐ দেখ, বেদের সর্দার কাঁদে!

হুমড়া ॥ (চোখ মুছিতে মুছিতে) না—না—

সুজন ॥ না? বেশ, তবে হাত তুলে আমায় আশীর্বাদ কর। কর আশীর্বাদ। ঐ আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর বুকে তীর ছুঁড়ব। পারবে করতে আশীর্বাদ?

মহুয়া ॥ বাপুজি! বাপুজি! কর আশীর্বাদ। ঐ সুজন তোমায় চোখ রাঙায় এ আমি সইতে পারি না। কর আশীর্বাদ সে হবে আমার মুক্তি, একলা আমার নয়—তোমারো তোমারো!

হুমড়া ॥ তাই হোক মা, তাই হোক্। ওরে সুজন আশীর্বাদ? (হাত তুলিতে গিয়া তখনি নামাইয়া) না, না, না, পারলাম না—(ক্রন্দন)

সুজন ॥ (রুষ্টভাবে) সর্দার, তোল হাত। অথবা বল বেদের সম্মান কিছু নয়, বেদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়। বল, তাই না হয় বল—

হুমড়া ॥ না—না—তাও নয়। (মহুয়াকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিতে দিতে) আমার চোখ দু'টো অন্ধ হোক্—কর্ণ আমার বধির হোক—বুক আমার ভেঙে চুরমার হোক, তবু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে, বেদের মান, বেদের সম্মান রাখতেই হবে। ওরে আমার মহুয়া-মা, পারলাম না, হাত আমাকে তুলতেই হোল, তুইও গেলি, আমিও পিছে পিছে আসছি—সেইখানে, যেখানে বেদে নেই, বেদের সর্দার নেই, শুধু আছে বাবা শুধু আছে তার কন্যা। ওরে সুজন, ধন্য তুই আমার পুত্র, সার্থক তুই আমার শিষ্য, এই নে—আমার আশীর্বাদ—(বামহস্তে মুখ ঢাকিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন)।

সুজন ॥ আশীর্বাদ আমি মাথা পেতে নিলাম, আজ আমি ধন্য হলাম সর্দার। সত্যসত্যই তুমি আমার এই অনর্থক জীবন সার্থক করলে। মহুয়া—

পালঙ্ক ॥ সুজন! সুজন! পায়ে পড়ি সুজন! (সুজনের পায়ে পড়িল)

সুজন ॥ চুপ। (পা সরাইয়া লইল।) মহুয়া, এইবার—(শর সন্ধানোদ্যত)

নদেরচাঁদ ॥ দয়া কর সুজন, দয়া কর। ধরার আলো ঐ মহুয়া—পাহাড়ের ঝরণা ঐ মহুয়া—

সুজন ॥ তোমার, তোমার। আমার কে?

মহুয়া ॥ কেউ নই। তোমার গলে ঐ বকুলমালা, সে চায় প্রতিশোধ। তুমি চাও প্রতিশোধ। আর কথা নয়, দেরী নয়—

সুজন ॥ কখনো নয়। মহুয়া—(শরসন্ধান করিল। কিন্তু হাত কাঁপিতে লাগিল)

হুমড়া ॥ খবরদার সুজন। হাত কাঁপছে। একটি তীরে একটি আঘাতে ও যদি না মরে, মরবি তুই—

সুজন ॥ (অধীর হইয়া উঠিয়া) জানি—জানি—আমি সে সবই জানি। আর তা জানি বলেই ওরে আমার মহুয়া, এই হ'ল আমার প্রতিশোধ! (ইচ্ছাপূর্বক তীর উর্ধে নিক্ষেপ করিয়াই ধনুক মাটিতে ফেলিয়া দিল)

হুমড়া ॥ সাবাস সুজন! সাবাস! ওরে সাবাস! সাবাস! (ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে বুকে লইল। এবং মহুয়া বাঁচিয়া গেল এই আনন্দের উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিল)

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া—মহুয়া—

মহুয়া } সুজন—সুজন—
পালঙ্ক }

সুজন ॥ (বুক ফুলাইয়া সর্দারের সম্মুখে গিয়া) বেদের আইনে লক্ষ্য-ভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু—দাও মৃত্যু—

হুমড়া ॥ (চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে স্মরণ হইল মহুয়া বাঁচিয়াছে বটে কিন্তু সুজন গেল) মৃত্যু!—লক্ষ্য-ভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো! লক্ষ্য-ভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো! ওরে সুজন! তবে এ তুই কি করলি! (মহুয়াকে ছাড়িয়া সরিয়া আসিল) ওরে! তুই যে বেদে জাতির আশা—ভরসা—আমার শ্রেষ্ঠ-পুত্র, শ্রেষ্ঠ-শিষ্য! তোকেই তবে আজ হারাতে হবে!

পালঙ্ক ॥ (হুমড়ার পায়ে লুটাইয়া পড়িল) বাপুজি, ওকে ক্ষমা কর—

সুজন ॥ চোখের জলে বেদের আইন কলঙ্কিত করো না পালঙ্ক! কই সর্দার?

মহুয়া ॥ সুজন! সুজন! তুমি কেন আমায় বাঁচালে?

হুমড়া ॥ প্রেম! প্রতিহিংসার চাইতে প্রেম হল ওর বড়। (সুজনের প্রতি) বাহাদুরি? না? এইবার মর। বেদের কুলপ্রদীপ নিভে যাক্! শুধু একটা মোহে, একটা খেয়ালে জাতির আশা, ভরসা—সাহস—বল আজ বলি হোক (সুজনের প্রতি চটিয়া, শ্লেষে) কুল-প্রদীপ না কুল-কলঙ্ক! মরতে তো হবেই, এইবার মর—

মহুয়া ॥ (হুমড়ার পায়ে পড়িয়া) বাপুজি, কেন এই অনর্থ! মার গো আমায় মার, তোমার পায়ে পড়ি বাপুজি, আমায় মারো! ও বাঁচুক! (পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল)

মহুয়া ॥ তোর জন্ম ঐ ঠাকুরের জন্য আজ যত অশান্তি যত মর্মপীড়া! হতভাগি, চোখে চেয়ে তো দেখলি বেদের-ব্যাটার কীর্তি! খেলোয়াড়ের মত খেলোয়াড় ঐ সুজন। দেখলি বেদের ব্যাটা প্রাণ নিতেও মেতে ওঠে আবার, প্রাণ দিতেও নেচে ওঠে! কিন্তু বেদের মেয়ে, তুই?

মহুয়া ॥ আমি? কিছু চাইনা আমি। শুধু চাই ও (সুজন) বাঁচুক!

সুজন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ (মহুয়ার কাছে মুখ লইয়া, শ্লেষে) কিন্তু আমি তোমার দয়া চাই না মহুয়া-সুন্দরী, প্রাণ-ভিক্ষা চাইতে হয় চাও ঐ নদেরচাঁদের, আমার নয়—

মহুয়া ॥ (হুমড়ার প্রতি কাঁদিতে কাঁদিতে) ভিক্ষা দাও ঐ সুজনের প্রাণ ভিক্ষা দাও সর্দার—

হুমড়া ॥ হ্যাঁ, দেব। দিতে পারি। আমি তোর কথা রাখব। কিন্তু তার আগে আমি বুঝতে চাই, তুই কে। তুই কি। (ভয়ে ভয়ে) বেদেরই মেয়ে, না, অপরের! বুঝতে চাই, এতকাল ধরে তোকে যে শিক্ষা দিয়েছি, যে দীক্ষা দিয়েছি—যে স্নেহে—যে মমতায় তোকে লালন-পালন করেছি তা কি আমার সার্থক হবে, না মিথ্যা হবে! দিবি সেই পরীক্ষা?

মহুয়া ॥ কি বাপুজি?

হুমড়া ॥ এই ধর বিষলক্ষের ছুরি। জাতির পরম শত্রু, জাতির সেরা দুষমন ঐ—(নদেরচাঁদকে দেখাইল।) ওর বুকে তোকে এই ছুরি, এখনি, আমূল বসিয়ে দিতে হবে। দিবি? যদি দিস, তবে বুঝব, হাঁ তুই বেদেনী, বেদেনীর মতো বেদেনী—ঐ সুজনও বাঁচবে। আর যদি না দিস তোরই চোখের সম্মুখে শত বেদের শত তীর ঐ ঠাকুরের বক্ষ বিদ্ধ করবে, বেদের প্রতিজ্ঞাই তাই। কি করবি?

মহুয়া ॥ (হুমড়া কথা বলিতে বলিতে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল। হুমড়ার বুকে ছিল মহুয়ার দেওয়া সেই মুক্তারমালা। মহুয়া হুমড়ার কথা

শুনিতেছিল আর সেই মুক্তোর মালায় হাত বুলাইতে ছিল। হুমড়ার প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে আঙুল দিয়া ভাবিতে লাগিল কি করিবে। তাহার পর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব।) ছুরি দাও—

হুমড়া ॥ (সাহ্লাদে) নে—নে—এই তো বেদের মেয়ে! যদি কেউ বলে তুই রাজার মেয়ে···হাঃ হাঃ হাঃ—

মহুয়া ॥ (ছুরি লইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্ত কি ভাবিল। পরে নদেরচাঁদের দিকে একবার তাকাইল। তাহার পরই তাকাইল হুমড়ার বুকে সেই মুক্তামালার দিকে। সেটি ধরিয়া) আর দাও এই মালা। তোমার এই মালা হোক আমার আশীর্বাদ?

হুমড়া ॥ (সানন্দে) নে মা নে। (মালা খুলিতে খুলিতে) আমার অন্ন মিথ্যা নয়, আমার স্নেহ মিথ্যা নয়, এই নে তুই আমার মুক্তার মালা—(মালা খুলিয়া তাহা মহুয়ার গলায় পরাইয়া দিয়া) সঙ্গে দিলাম আমার সারা প্রাণের আশীর্বাদ—(নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) বাঁধ ওকে—(আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।)

মহুয়া ॥ (ছুরি লইয়া নদেরচাঁদের দিকে মাতালের মতো টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে হইতে) বেদেনী সব পারে—কি না পারে? নাচতে নাচতে সে সওদাগরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, দেয় নি? সন্ন্যাসীকে পান খাইয়ে তার প্রাণ নেয়, নেয়নি? বেদেনী কি না পারে? সে মালাও গলায় পরিয়ে দেয় আবার বুকেও ছুরি বসায়! বেদেনী কি না পারে? সে সব পারে গো সব পারে!

হুমড়া ॥ বাহবা বেটি! বহৎ খুব! যে হবে বেদেনী সে হবে ডাইনি। ডাইনির মতো হো—হো করে হেসে ওঠ—হেসে উঠে জাতবেদেনীর মতো মার ওর বুকে ছুরি—

মহুয়া ॥ (হুমড়ার দিকে হাস্য-কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া) মারব ছুরি। তার আগে পরিয়ে দেব ওর গলায় এই মালা! এই মরণ-মালা! (বলিয়াই নদেরচাঁদের গলায় মুক্তামালা পরাইয়া দিল) কেমন হ'ল, হাঃ হাঃ হাঃ, কেমন হ'ল! এইবার দেখ জাত-বেদেনীর খেলা! (নদেরচাঁদকে মারিতে ছুরি উঠাইল)

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! তুমি এত সুন্দর! ভীষণতার এত রূপ! হাতে বজ্র-ছুরিকা, চোখে বিদ্যুৎশিখা! হানো ছুরি গো হানো ছুরি—ঝলসে উঠুক বিদ্যুৎ! মুগ্ধ হয়ে মরি, আমি মুগ্ধ হয়ে মরি!

মহুয়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ (সেই ছুরি নিজেরই বুকে বসাইয়া দিল। বেদের দল, বেদের দল কেন, যেন সমগ্র জল-স্থল একসঙ্গে একটি আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ই—ই—ই!—)

নদেরচাঁদ ॥ }
হুমড়া ॥ } মহুয়া!
সুজন ॥ }

পালঙ ॥

মহুয়া ॥ (বুকে ছুরি মারিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া যাইতেছিল, নদেরচাঁদ তখন তাহার দেহভার একহাতের ওপর লইয়াছিলেন। মহুয়ার মুখ হেলিয়া পড়িয়াছিল। নদেরচাঁদ সেই মুখের পানে অব্যক্ত যাতনায় চাহিয়াছিলেন।) সোনারচাঁদ! আঃ—

নদেরচাঁদ ॥ রাক্ষসী, সর্বনাশী,—

হুমড়া ॥ (উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে) মহুয়া-মহুয়া গেল—মহুয়া ফাঁকি দিয়ে পালাল। ওরে সুজন, তবে তুই আর বাকী কেন, তুইও মর—তুইও মর—(কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষেপিয়া উঠিল) কিন্তু না, ঐ দুষমন—মার ঐ দুষমন···মার—

সুজন ॥ বেদের দলের প্রতি) মার—মার—মানিকজোড় মার—

বেদেরদল ॥ মার—(যুগপৎ সকলের তীর ছুটিল। নদেরচাঁদের সর্বদেহ তীর বিদ্ধ হইয়া গেল)

হুমড়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ দুষমন শেষ! কাজ শেষ! না—না, এখনো আর একটা বাকী রয়েছে! (সুজনের প্রতি) এইবার ওরে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, এইবার তোর প্রায়শ্চিত্ত—মর—মর—কিন্তু কোথায় মরবি এখানে? জমি কই? সব যে রক্ত! তুই কোথায় দাঁড়াবি? আমি কোথায় দাঁড়াব? ওরে আমরা দাঁড়াই কোথায়? ভেসে গেল, ভেসে গেল, উঃ! রাজার মেয়ের এত রক্ত! এমন রক্ত! ও রক্তে যে আমার সব ভেসে গেল! ঐ আমার মহুয়া ভেসে যায় ওরে সুজন, আয়—দি ঝাঁপ—

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চলিয়া গেলেন। পেছনে অন্যান্য বেদেগণ ছুটিল]

সুজন ॥ হ্যাঁ, দি ঝাঁপ, দেব ঝাঁপ—এই বকুলমালার আগুন··· সইতে পারি না, সইতে পারি না—(বকুলমালা কণ্ঠ হইতে খুলিয়া ছিঁড়িয়া মহুয়ার দিকে নিক্ষেপ) দি ঝাঁপ, দেব ঝাঁপ—(ছুটিয়া প্রস্থান)।

নদেরচাঁদ ॥ (যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে) মহুয়া। আঃ! (বুকের তীর তুলিয়া ফেলিলেন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইয়া গাত্রবাস ভিজাইয়া দিল। গাত্রবাসে মধ্যমণির মতো আবদ্ধ ছিল সেই লালকমল গুচ্ছ। তাহাও রক্ত-রাঙা হইল। যন্ত্রণায় বুকে হাত বুলাইতেই সেই পুষ্পগুচ্ছে হাত ঠেকিল। নদেরচাঁদ চমকিয়া উঠিয়া) ওরে, এ যে সেই ফুল, সেই লালকমল! মৃত মানিকজোড়ের পাশে শুকিয়ে পড়েছিল, মলিন হয়ে

পড়েছিল, বুকের রক্তে এখন রাঙা হয়ে উঠেছে। মহুয়া, এ ফুল যে তুমিই চেয়েছিলে, এ ফুল যে তোমার জন্যই এনেছি, তোমার জন্যই সেই শুক ফুল—সেই মলিন লালকমল—আজ বুকের রক্তে রঙীন হয়ে তোমার হাতের পরশ চায়, তোমার খোঁপার পরশ চায়, তোমার বুকের পরশ চায়…

মহুয়া ॥ (অতিকষ্টে) দা—ও…

নদেরচাঁদ ॥ (হাত বাড়াইয়া পরম আগ্রহে ফুল দিতে গেলেন, কিন্তু আবদ্ধ দেহে তাহা পারিলেন না। হাতখানি মহুয়ার হাতের কাছে গিয়া শুধু কাঁপিতে লাগিল) না—ও—না—ও—

[পালঙ্ক ইহা দেখিতে পাইল। সে নদেরচাঁদের সেই অর্ঘ্য মহুয়ার অঞ্জলিতে ঢালিয়া সাহায্য করিল।]

মহুয়া ॥ (সেই ফুলগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া) আমার সোনারচাঁদের লালকমল—আঃ—(বলিয়াই নদেরচাঁদের পায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল)

নদেরচাঁদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! আজও আমরা মানিকজোড়! ছিলাম মানিকজোড়! চললাম মানিকজোড়!—(মৃত্যু)

পালঙ্ক ॥ (কাঁদিতে লাগিল) মানিকজোড়! মানিকজোড়!

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ

মনোমোহন থিয়েটার, কলিকাতা

মঙ্গলবার, ১৬ই পৌষ ১৩৩৬

হুমড়া সর্দার	শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী
নদেরচাঁদ	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুজন	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
মানিক	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সন্ন্যাসী	শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী
কোতোয়াল	শ্রীবিজয়কার্তিক রায়
ধনপতি সাধু	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
অনুচরগণ, গ্রামবাসিগণ, বেদেগণ	শ্রীহরিদাস ঘোষ, শ্রীকালীচরণ গোস্বামী, শ্রীসুশীল কুমার বসু, শ্রীমদনমোহন দত্ত, শ্রীপশুপতি চক্রবর্তী, শ্রীবৈদ্যনাথ সেন, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণধন কুণ্ডু, শ্রীকালীপদ গুপ্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষাল, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণকুমার গোস্বামী, শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবনবিহারী পাইন, শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅভয়চরণ গাঙ্গুলি।
রাধু পাগলি	শ্রীমতী ইন্দুবালা
মহুয়া	শ্রীমতী সরযূবালা
পালঙ্ক	শ্রীমতী ফুল্লনলিনী
চন্দ্রাবলী	শ্রীমতী কালীদাসী
বেদিনীগণ	শ্রীমতী নিরুপমা, শ্রীমতী প্রমোদিনী, শ্রীমতী আঙুর বালা, শ্রীমতী সন্তোষকুমারী, শ্রীমতী মণিবালা, শ্রীমতী তারকবালা, শ্রীমতী পটলমণি, শ্রীমতী কালীদাসী, শ্রীমতী প্রমীলাবালা, শ্রীমতী কমলা বালা, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমতী বীণাপাণি, শ্রীমতী মলিনাবালা, শ্রীমতী টিকুমণি ও শ্রীমতী সুশীলাবালা।

অশোক

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

রঙমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩
১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, কলিকাতা

বোধন-গীতি

কত যুগ ধরি পাষাণ-ফলকে রয়েছে কালের লেখা।
সে পাষাণ আজ পাবে কি রে প্রাণ সে লেখা কি হবে শেখা।
কত পদধূলি সে অতীত হ'তে
রহিয়াছে মিশে পথে ও বিপথে.
পায়ের চিহ্ন খুঁজিয়া কে আজ তীর্থে চ'লেছে একা !
সে যুগের গানে দেবে কি রে প্রাণ একালের কুহু-কেকা !

পরম পূজনীয়—

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার,

এম-এ, পি-আর-এস. পি-এইচ্-ডি

শ্রীচরণকমলেষু

স্নেহধন্য—

মন্মথ রায়

—১৭

লেখকের কথা

প্রযোজক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতু সেনের আগ্রহে এবং উৎসাহে আমি "অশোক" রচনায় ব্রতী হই। গত ১৯৩৩ সনের ১৮ই মে তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা গিয়া ২২শে জুন মধ্যে নাটকখানি রঙ্‌মহল নাট্যশালার উপযোগী রূপ দান করি। রঙ্‌মহলের কৃতী পরিচালক ত্রয়ী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক, শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সতু সেন আমার 'অশোক'কে 'অশোকোচিত' সৌষ্ঠব এবং সম্পদ দান করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই; এবং শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র ও নাট্য-সারথি শ্রীযুক্ত সতু সেন রঙ্‌মহলের দুই যাদুকর-প্রযোজক আমার অশোককে আমার কল্পনাতীত মহিমায় মণ্ডিত করিতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করেন নাই। আমি স্বচক্ষে তাঁহাদের যত্ন, চেষ্টা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই।

অশোকের গান রচনা করিয়াছেন 'কলা-লোকের সব্যসাচী' আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। তাঁহার মধু-রচনাকে সুর-ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন সুর-যাদুকর বন্ধু শ্রীযুক্ত নিতাই মতিলাল। সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায়ের পরিচ্ছদ-পরিকল্পনায়, সুপরিচিত চিত্রকর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্রের কারু-চিত্র-কল্পনায়, এবং নট-শেখর শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পালের নৃত্য-পরিকল্পনায় আমার "অশোক" রূপে এবং রসে অপরূপ শ্রী লাভ করিয়াছে। মুগ্ধচিত্তে আমার এই সহযোগী বান্ধবগণের কৃতিত্ব স্মরণ করিতেছি। অশোকের প্রযোজনা কার্যে নাট্য-নিপুণ বন্ধু শ্রীযুক্ত রবি রায় এবং অশোকের অভিনয় পরিচালনা কার্যে, বিশেষ অভিনয়ান্তর্গত সামরিক কলা-কৌশল ব্যবস্থায়, নট-তিলক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে মুগ্ধ-চিত্তে তাহাও স্মরণ করি।

গত ২৯শে নভেম্বর রাত্রি সাড়ে সাতটায় শেষ মহলার (Dress Rehearsal) পর, গত ১লা ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে সাতটায় রঙ্‌মহল কর্তৃপক্ষ অশোকের প্রাথমিক অভিনয়ের (Professional Opening: Trade show) আয়োজন করেন এবং বিশিষ্ট নাট্য-রস-রসিক ও সমালোচকগণ সম্মুখে 'অশোক'কে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের মতামত নির্ধারণ করেন। এ দেশের নাট্যজগতে এরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম এবং তজ্জন্যও আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় আত্মীয় সুকবি শ্রীযুক্ত রাখালবন্ধু নিয়োগী এবং সুপ্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশঙ্কর নিয়োগী অশোকের প্রুফ্ সংশোধন করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যে আন্তরিকতায় তাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাহাতে তাঁহারা আমার নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবার আশা করেন না।

—এই নাটক লিখিত হইল, অভিনীত হইল, কেহ হয়ত ইহাকে প্রশংসা করিবেন, কেহ করিবেন না। কিন্তু, নিন্দা এবং প্রশংসা তুচ্ছ করিয়া আমার যে দুই বন্ধু এই নাটক রচনার দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দ আমার সহিত সমানভাবে বহন করিবেন তাঁহাদের নাম এই নাটকের পৃষ্ঠায় আমি পুনরায় না লিখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা শ্রীযুক্ত সতু সেন এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী।

৯ই জানুয়ারী ১৯৩৪
বরদাভবন
পোষ্ট্ বালুরঘাট
(দিনাজপুর)

মন্মথ রায়

পরিচয়-লিপি

পুরুষ

অশোক	...	...	মগধ-সম্রাট
বীতশোক	...	...	ঐ ভ্রাতা,—মহাবলাধ্যক্ষ
খল্লাতক	...	...	মহাসান্ধিবিগ্রাহিক
রাধাগুপ্ত	...	...	মহামাত্য
ব্রহ্মদত্ত	...	...	মহাসচিব
মহেন্দ্র	...	...	দেবীর পুত্র
কুনাল	...	...	সম্রাট-পুত্র
দিমেকাস	...	...	সিরিয়ার রাজদূত
উপগুপ্ত	...	...	বৌদ্ধগুরু
ধর্মকীর্তি	...	...	বৌদ্ধধর্মাচার্য
চণ্ডগিরিক	...	...	ঘাতক-রাজ
মহাপ্রতীহার	...	...	...
সৈন্যাধ্যক্ষ	...	...	...
জনৈক বৃদ্ধ	...	...	...

স্ত্রী

দেবী	...	...	অশোকের প্রথমা পত্নী
তিষ্যরক্ষিতা	...	...	নটী-শ্রেষ্ঠা
কাঞ্চনমালা	...	...	কুনালের স্ত্রী
মিত্রা	...	...	দেবীর পালিতা-কন্যা
যবনী	...	...	...

রাজপুরুষগণ, সৈন্যগণ, মিসরদূত, দেহরক্ষীগণ, অনুচরগণ, ভিক্ষুগণ, জনৈক বৃদ্ধের পুত্র ও পৌত্রীগণ, সাংবাদিক, দণ্ডধরগণ, বন্দিনীগণ, চামরধারিণী, করঙ্কবাহিনী, ছত্রধারিণী, জনৈক বৃদ্ধা. পুত্রবধূ পৌত্রীগণ, গ্রীক, মিসরী ও ভারতীয় নর্তকীগণ।

অশোক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদান্তর্গত প্রমোদশালা। সিংহাসন। বেদীর নিম্নে অসংখ্য হস্তী-দন্ত-খচিত সুখাসন। প্রতি দ্বারে এবং প্রতি স্তম্ভের সম্মুখে চিত্রার্পিত প্রতিহার। রাজপুরুষগণ। তাম্বুলবাহিনীগণ তাম্বুল এবং চন্দন বিতরণে ব্যস্ত, কেহবা চামর ব্যজন করিতেছে। ছত্রধারিণীগণ ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। দূরে বন্দিনীগণের বন্দনা-গীতি]

শত ঘৃত দীপ ম্লান হলো আজি
রাজা অশোকের মহিমায়।
নবারুণ ওই উদিছে গগনে
স্বদেশ দীপ্ত গরিমায়!
কুমারিকা হ'তে গ্রীস্ ও সিরিয়া,
তব যশোগাথা গাহিছে ফিরিয়া।
ভারত-রাজের অভিষেক বারি—
বিদেশ এনেছে বহি তায়!
ওগো পুরাঙ্গনা দে না হুলুধ্বনি,
বাতায়ন-পথে জ্বালো দীপ,
বরণের ডালা সাজাও যতনে,
কবরীতে আজি বাঁধ নীপ
আজি মোরা সবে বরি তায়॥

রাধাগুপ্ত॥ সম্রাট কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

বীতশোক॥ অসুস্থ নয়, তবে প্রকৃতিস্থ আছেন বলে মনে হচ্ছে না!

ব্রহ্মদত্ত॥ অপ্রকৃতিস্থতার কারণ কিছু অবগত আছেন কি?

বীতশোক॥ কারণ এখনও অপ্রকাশ।

রাধাগুপ্ত॥ সম্রাটকে কি বিষণ্ন বলে মনে হচ্ছে?

খল্লাতক॥ পিতার মৃত্যুর পর আজ চার বৎসর ধরে বাহু এবং বুদ্ধিবলে অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রু সবংশে ধ্বংস ক'রে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার পর

নিরুদ্বেগে আজ হলো তাঁর অভিষেক। আজ তাঁর জয়, পরিপূর্ণ জয়। আজ তো তাঁর বিষন্ন থাকবার দিন নয়।

ব্রহ্মদত্ত ॥ অনুতাপ কিম্বা অনুশোচনা?

রাধাগুপ্ত ॥ অনুতাপ! অনুশোচনা! সম্রাটের মনে! শুনেছ খল্লাতক? মহাসচিব ব্রহ্মদত্ত কি বলছেন শুনেছ?

ব্রহ্মদত্ত ॥ বলছিলাম সম্রাট উৎসবে যোগ দিতে এত বিলম্ব করছেন কেন?

খল্লাতক ॥ সম্রাট অন্তঃপুরে, সেখানে কি যেন একটা ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে।

বীতশোক ॥ ভীষণ ব্যাপার অন্তঃপুরে! কি সর্বনাশ! আচ্ছা, আমি দেখে আসছি—আপনারা ব্যস্ত হবেন না। [বীতশোকের প্রস্থান]

খল্লাতক ॥ সম্রাটকে আজ ক্ষিপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

রাধাগুপ্ত ॥ যা শুনছি তাতে আমারও তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, কারণ কিছু অনুমান করতে পাচ্ছ?

খল্লাতক ॥ সহস্র গুপ্তচর প্রেরণ করেও উজ্জয়িনীর সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ এই অভিষেক-রাত্রে তার সন্ধান না দিতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করতেও ভয় হ'চ্ছে।

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্রাটের সঙ্গে সেই নারীর কি সম্বন্ধ?

[অন্তঃ-পুর হইতে কোলাহল উঠিল]

খল্লাতক ॥ রাজান্তঃপুরে না জানি কি অনর্থ ঘটছে।

রাধাগুপ্ত ॥ কি ব্যাপার বল তো?

খল্লাতক ॥ কিছুই তো বুঝতে পারছি না। মহাবলাধিকৃত ফিরে এলেই সংশয় দূর হবে। হ্যাঁ ভাল কথা, রাজ্যের সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর সংবাদ শুনেছ তো?

রাধাগুপ্ত ॥ কে তিষ্যরক্ষিতা?

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ, অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসিত জনরব সত্ত্বেও?

খল্লাতক ॥ সেই জনরবই তো তাকে অধিকতর লোভনীয় করে তুলেছে।

রাধাগুপ্ত ॥ আমি শুনেছি অতি হীনকূলে তার জন্ম।

খল্লাতক ॥ পঙ্কে জাত হলেও পদ্মকে কে না চায়?

রাধাগুপ্ত ॥ তা বটে!

খল্লাতক ॥ কিন্তু সম্রাট সেই পদ্মকে লাভ করতে পারেন নি। তিষ্যরক্ষিতা সম্রাটের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন।

রাধাগুপ্ত ॥ বল কি খল্লাতক? সে এখনও জীবিত আছে?

খল্লাতক ॥ নিঃসন্দেহ! সে তার সৌন্দর্য্যের শক্তিতে আস্থা রাখে, সে জানে সে নিরাপদ। [ছুটিয়া বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ সর্বনাশ! শতাধিক নারী জীবন্ত দগ্ধ হবে—

খল্লাতক ॥ সে কি! কোথায়?

রাধাগুপ্ত ॥ কেন?

বীতশোক ॥ রাজপুরীতে অশোক-কুঞ্জে শতাধিক কুলাঙ্গনা অভিষেক উপলক্ষে উৎসব-মত্ত ছিল। সম্রাট বাতায়ন-পথে হঠাৎ দেখতে পান অশোক-তরুমূলে তারা পদাঘাত করছে। দেখবামাত্র সম্রাট আদেশ দিয়েছেন, আমার কুৎসিত আকৃতিকে লাঞ্ছিত করবার জন্যই ওরা ওই অশোক-তরুতে পদাঘাত করছে, ওদের হত্যা কর, অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা কর।

রাধাগুপ্ত ॥ ভুল—ভুল, সম্রাট ভুল করেছেন! বীতশোক, তুমি এখনি গিয়ে সম্রাটকে বল সুন্দরীর চরণাঘাত না পেলে অশোক-তরু পুষ্পিত হয় না। এ বহুকালের প্রবাদ এবং প্রথা। হতভাগিনীরা সম্রাটকে কোন অবমাননা করেনি!

[বীতশোকের দ্রুত প্রস্থান। নেপথ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদে প্রাসাদের সকলের চোখে মুখে আতঙ্ক দেখা দিল। ক্রমে সেই আর্তনাদ-ধারা থামিয়া গেল। মহাপ্রতিহারের প্রবেশ ও ঘোষণা]

মহাপ্রতিহার ॥ চতুরুদধি-সলিল-রাশি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী-বসুন্ধরাধিশ্বর-পরমেশ্বর-পরমশৈব-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ সম্রাট!

[বিজয়-বাদ্য বাজিল। দেহরক্ষী-বেষ্টিত সম্রাট অশোক বীতশোকের সহিত প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল]

অশোক ॥ সেই বন্দিনী—[খল্লাতকের কাছে গিয়া জনান্তিকে] উজ্জয়িনীর সেই শ্রেষ্ঠী-রমণীর সংবাদ?

খল্লাতক ॥ এখনও আমরা হতাশ হইনি বৎস, চেষ্টার ত্রুটী নাই।

অশোক ॥ আমার অভিষেক ব্যর্থ করবেন না!

[সিংহাসনে উপবেশন। খল্লাতকের ইঙ্গিতে জনৈক প্রতিহারের প্রস্থান]
[রক্ষিপরিবেষ্টিত্য তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ]

মহাপ্রতীহার ॥ বন্দিনী তিষ্যরক্ষিতা—

অশোক ॥ [তিষ্যরক্ষিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া] তুমি আমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। শুধু এ রাজ্যে নয়—এ বিশ্বে তোমার তুলনা নাই। (তিষ্যরক্ষিতার অভিবাদন) তোমাকে আমি আমার এই অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তুমি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করনি কেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কারণ আছে বৈ কি সম্রাট! অতি হীনকুলে আমার জন্ম। আমার জন্মের জন্য সংসার আমাকে লাঞ্ছিত করেছে। কিন্তু আমাম রূপের জন্য সেই সংসারই আবার আমাকে করেছে পূজা—গোপনে! আমি জানি—আমার

রূপের মূল্য আছে। যে আমাকে আমার রূপের মূল্য দেয় না আমি তাকে দেখা দেই না।

অশোক ॥ চমৎকার! তোমাকে আমার চাই! কেন চাই জান? তুমি যেমন দেশ-বিখ্যাত রূপসী—আমিও তেমনি দেশ-বিখ্যাত কুৎসিত। রাজশক্তি বলে আমি তোমায় লুন্ঠন করতে চাই না। দম্ভভরে আমি বলতে চাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে আমি ক্রয় করেছি। আমি তোমাকে তোমার রূপের মূল্য দিয়েই ক্রয় করব। তোমাকে প্রথম দেখি আমি স্বপ্নে! তার জন্যও কি তোমাকে মূল্য দিতে হবে সুন্দরী?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার রূপের যদি মর্যাদা রাখতে চান কেন দেবেন না?

অশোক ॥ চমৎকার। কেন দেব না? অবশ্য দেব! কি মূল্য তুমি চাও সুন্দরী?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাট, আপনি সংসারের প্রভু! সমাজের পতি! আজ যখন সুযোগ পেয়েছি তখন—

অশোক ॥ বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার রূপের সর্বোচ্চ মূল্যই আজ আমি চাই! সম্রাট, আমার রূপের মূল্য—

অশোক ॥ বল—বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাটের—ওই রাজমুকুট—

[সকলে চমকিত হইল, অশোক যবনীকে চতুষ্কির উপর তাঁর মুকুট সংস্থাপন করিতে ইঙ্গিত করিলেন]

সম্রাট মহানুভব! [মুকুট লইতে গেল]

অশোক ॥ দাঁড়াও—(তিষ্যরক্ষিতা দাঁড়াইল) স্বপ্নে আমি তোমার ছায়াই দেখেছিলাম! তোমার কায়ার মূল্য যদি রাজমুকুটই হয়, তবে সেই স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ার মূল্য এ রাজমুকুট নয়, এই রাজমুকুটের ঐ ছায়া!—(রাজমুকুটের ছায়া দেখাইয়া) নাও, নাও ওই মুকুট—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ ওই ছায়া!

অশোক ॥ হ্যাঁ ওই ছায়া—(হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু তখনই কঠোরস্বরে) নাও!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কি করে নেব, কি করে নেব সম্রাট!

অশোক ॥ নটী—নটী চায় রাজমুকুট, নটী চায় সিংহাসন! স্পর্ধা বটে! চণ্ডগিরিক, শতাধিক নারীর আর্তনাদ শুনছিলাম, এখন শুনছি না কেন?

চণ্ডগিরিক ॥ তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে নীরব সম্রাট!

অশোক ॥ (তিষ্যরক্ষিতাকে) রূপের মূল্য নিলে না সুন্দরী? (বজ্র-নির্ঘোষে) নাও!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন সম্রাট! আমায় বন্দিনী করুন, আমায় বধ করুন! (নতজানু হইল)

অশোক ॥ কেন! আজ তো তোমায় সত্য সত্যই পেলাম! এতো সপ্ন নয়—এযে সম্পূর্ণ সত্য! ছায়ার মূল্য না হয় ছায়াতেই রইলো! কিন্তু আজ যদি তোমাকে আমার মূল্য দিতে হয় তাহ'লে—(মাল্য-দান) এই মূল্যই যে দিতে হয়!

[বাদ্য বাজিল, মিসরী নর্ত্তকীদের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ। তিষ্যরক্ষিতাকে লইয়া অশোকের প্রস্থান। নৃত্য শেষে অশোকের পুনঃ প্রবেশ]

অশোক ॥ চমৎকার, তোমরা কোন্ দেশের ফুল? (উত্তর না পাইয়া) বীতশোক, ওরা বুঝি সত্য সত্যই ফুল, তাই ওরা কথা কয় না?

বীতশোক ॥ না সম্রাট কথা ওরা বলে, কিন্তু সে কথা আমরা বুঝিনা। বরং বলুন ওরা পাখি।—

অশোক ॥ পাখি! পাখি আমি বড় ভালবাসি! শুক, সারিকা, টিয়া, পাপিয়া, চক্রবাক, ময়ূর—(জনান্তিকে খল্লাতককে) সন্ধান পেয়েছেন?

খল্লাতক ॥ না সম্রাট!

অশোক ॥ হ্যাঁ—(নর্ত্তকীদের দেখিয়া) এরা কোন্ দেশের পাখি?

খল্লাতক ॥ এরা মিসর-রাজ টলেমির অর্ঘ্য। সিরিয়া, মিসর, সাইরিন, ইপিরাস, মাসিদন অভিষেকে উপস্থিত হতে না পেরে দুঃখ জ্ঞাপন ক'রে এবং সম্রাটের দীর্ঘায়ু ও জয় কামনা ক'রে যে সব রাজদূত প্রেরণ করেছেন, অভিষেক-কালে সম্রাট তাদের দর্শন দান করেছেন। এখন এই অভিষেক-উৎসবে নিবেদিত হচ্ছে তাদের অর্ঘ্য।

অশোক ॥ অর্ঘ্য শুধু এই একদল নর্ত্তকী!

বীতশোক ॥ না সম্রাট! (মদ্যপাত্র সংযোগে টুং টুং বাদ্য। ইঙ্গিত পাইয়া নর্ত্তকীগণ নেপথ্য গৃহে মদ্য আনিতে গেল)

অশোক ॥ বীতশোক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে হেলায় লাভ করলাম, লাভই করলাম, না পাব তার ভালবাসা, না পারব তাকে ভালবাসতে! (খল্লাতকের উদ্দেশ্যে) দেব! তার কি কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না?

খল্লাতক ॥ আপনি উতলা হবে না!

অশোক ॥ আমার এই পরম দিনটি কি এমনি করেই নিষ্ফল হবে!

খল্লাতক ॥ মানুষের শক্তিতে যতদূর সম্ভব তার কিছু মাত্র ত্রুটী করা হচ্ছে না সম্রাট!

বীতশোক ॥ মহিয়সী তিষ্যরক্ষিতাই কি আমাদের পট্টমহাদেবী?

অশোক ॥ পট্টমহাদেবী! হাঃ হাঃ হাঃ—(নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিয়া

নৃত্য-সহকারে সকলকে মদ্য বিতরণ করিল। অশোক মদ্য পান করিতে করিতে বলিলেন) অপূর্ব! অপূর্ব!

বীতশোক ॥ অভূতপূর্ব!

অশোক ॥ বীতশোক, এই সুরা মিসরের?

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ সম্রাট, এ সুরা মিসরের—ভারতের নয়।

বীতশোক ॥ মিসর বড় লক্ষ্মী দেশ!

অশোক ॥ মিসরের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে সে দেশে এই সুরা প্রস্তুত হয়।

বীতশোক ॥ দুর্ভাগ্য! সেকি সম্রাট?

অশোক ॥ হ্যাঁ বীতশোক—! এ সুরা পান করে শুধু এই কথাটাই কি মনে জাগছেনা যে এ মিসর আমার নয়?

বীতশোক ॥ তাই তো—তাই তো সম্রাট—!

অশোক ॥ অতএব এই মিসর আমরা চাই! অতি একান্তভাবেই চাই—যতদিন না পাই ততদিন—

বীতশোক ॥ ততদিন—

খল্লাতক ॥ এ সুরা নিষিদ্ধ হোক্ সম্রাট!

অশোক ॥ এ সুরা নিষিদ্ধ।

বীতশোক ॥ অবশ্য। এবং আজ এই অভিষেক রাত্রেই মিসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হ'য়ে থাক্ সম্রাট!

রাধাগুপ্ত ॥ নিতান্ত এক তুচ্ছ কারণে একটা দেশের স্বাধীনতা হরণ করলে সম্রাটের অপযশ হবে।

অশোক ॥ যুদ্ধ ঘোষণার একটা গুরুতর কারণ উদ্ভাবন করুন মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক!

বীতশোক ॥ এবং অতি শীঘ্র। কেননা মিসর আমাদের সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কণ্ঠ যে নিরস হয়ে থাকবে মহাসন্ধি বিগ্রাহিক!

রাধাগুপ্ত ॥ সামান্য সুরার লোভে একটা মহাসমরের অনুষ্ঠান করে পররাজ্য গ্রাস—

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ, বৌদ্ধধর্মে সুরাপান দোষাবহ বটে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও! সম্রাটকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত করতে পারলে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে মহামাত্যের বিবর্ধমান সম্মান আরও বর্ধিত হবে সন্দেহ নাই!

অশোক ॥ আপনি নিশ্চয়ই এ কথা বলছেন না যে আমার মহামাত্য বৌদ্ধ!

খল্লাতক ॥ আমি নিজে কিছুই বলতে চাই না। যা বলবার উনিই বলবেন সম্রাট!

অশোক ॥ মহামাত্য!

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট !

অশোক ॥ শুধু মহামাত্য নয়, আপনারা সবাই বলুন দেখি—আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করেছে তার মধ্যে মূর্খতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে কে ?

বীতশোক ॥ এ ব্যাপারে আমি অহিংস। কেউ যদি ও সম্মান দাবী করেন, করুন ! আমার এতটুকু হিংসা হবে না।

অশোক ॥ অভিষেক-রাত্রে কি জানি কেন আমাকে শুধু এই প্রশ্নটাই তাড়না করছে—পৃথিবীর মূর্খতম মানব কে ? বলুন আপনারা, বলুন !

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্রাট নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য করছেন না ?

অশোক ॥ (হাস্য)

বীতশোক ॥ আমাকেও না !

খল্লাতক ॥ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কেউ জন্মগ্রহণ করেনি যে স্বেচ্ছায় মূর্খতার রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করতে চাইবে।

বীতশোক ॥ আপনি সত্য বলেছেন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ! পৃথিবীতে এই একটি মাত্র সম্মানই আছে যা অপরকে নির্বিবাদে নিরভিমান হয়ে দান করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সকলেই প্রত্যেককে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাতে পারে ওই মহাসম্মানের যোগ্য কে !

অশোক ॥ কে সে ব্যক্তি অনুমান করুন ! (সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল)—থাক্ থাক্, গৃহবিচ্ছেদে আবশ্যক নাই। আমাকেই বলতে দিন। আমি এমন একজনকে জানি যে সগৌরবে একদিন ঘোষণা করেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মূর্খ সে !

ব্রহ্মদত্ত ॥ কে সে সম্রাট ?

অশোক ॥ সে ছিল এক রাজপুত্র। স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী প্রিয়া, নয়নানন্দ পুত্র, অগণিত দাসদাসী, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ ·· সব তার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হল, বিষবৎ বোধ হল ! একরাত্রে সে সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষুকের বেশে প্রাসাদ থেকে পলায়ন করে পথে এসে দাঁড়াল, আর সংসারে ফিরল না !

রাধাগুপ্ত ॥ শ্রীবুদ্ধ ! শ্রীবুদ্ধ !

খল্লাতক ॥ মূর্খ ! মূর্খ !

বীতশোক ॥ মহা মূর্খ ! জগতের শ্রেষ্ঠ মূর্খ !

অশোক ॥ যারা বিশ্বের সেই মহামূর্খকে পূজা করে তারা ততোধিক মূর্খ। তাদের মধ্যে আবার সেই শ্রেষ্ঠ, যে প্রকাশ্যে করে আমার পূজা, গোপনে করে তার,—যে পূজায় কোন প্রভুই সন্তুষ্ট হয় না, হতে পারে না !

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাটের এই বক্রোক্তি কি আমারই উদ্দেশ্যে ?

খল্লাতক ॥ আশ্চর্য্য! আর কারও মনে কিন্তু এরূপ প্রশ্ন স্থান পেলনা!

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট—

অশোক ॥ বলুন!

রাধাগুপ্ত ॥ আমি বৌদ্ধ নই। সে ধর্ম আমি এখনও গ্রহণ করিনি। তবে হ্যাঁ, আমি বৌদ্ধ-দর্শন পাঠ করি বটে!

অশোক ॥ পাঠ করেন! পাঠ করে কি শিখলেন?

রাধাগুপ্ত ॥ বুদ্ধের প্রজ্ঞা-নেত্রের সম্মুখে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদঘাটিত হলে তিনি বুঝলেন জন্মের দুঃখ জরা-ব্যাধি, মৃত্যুতে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ। তৃষ্ণাই দুঃখের জননী, তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিরোধ। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আটটি, যথা—সমক্য দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প—

বীতশোক ॥ সম্রাট রক্ষা করুন!

খল্লাতক ॥ আমরা মিসর-অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম।

অশোক ॥ মিসর সম্বন্ধে আলোচনা কাল করব। মহামাত্য—

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ সে আমার কাছে আসে কেন! কেন আসে?

রাধাগুপ্ত ॥ কে?

অশোক ॥ সেই মূর্খ!

রাধাগুপ্ত ॥ শ্রীবুদ্ধ?

অশোক ॥ স্বপ্নে সে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ায়! সেই মূর্তি, যে মূর্তি আমি ঘৃণা করি—যে মূর্তি দেখতে চাইনা, আমি দেখবনা—তবু সেই ভিক্ষু-মূর্তি! রাজাধিরাজের ঐশ্বর্য হেলায় বিসর্জন দিয়ে মুণ্ডিত-মস্তকে গৈরিক চীবর পরিধান করে সে ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়! স্পর্ধা তার, সে প্রসন্ন আননে আমায় সম্বোধন করে বলে, "ভিক্ষা দাও, আমায় ভিক্ষা দাও।" কি ভিক্ষা সে চায়! কেন সে আসে! মহামাত্য, আমার সাম্রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ভিক্ষা নিষেধ। মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, বৌদ্ধধর্ম আমার সমাজ্য হতে দূর করুন! ভিক্ষু-মূর্তি আমি দেখতে চাইনা, আমি দেখব না। আমি চাই রাজ্য—ঐশ্বর্য—সাম্রাজ্য, আমি চাই সুরা। বীতশোক!

বীতশোক ॥ সম্রাট মহানুভব! (মদিরা-বাহিনীকে ইঙ্গিত)

খল্লাতক ॥ সম্রাটের অভিষেক-উৎসবে সেলুকস-নন্দন আঁন্তিয়োক সম্রাটকে অভিনন্দিত করবার জন্য গ্রীদের শ্রেষ্ঠা নর্তকীদের প্রেরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দূতের মুখে অবগত হলাম তিনি করদ নৃপতি-রূপে আপনার আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত।

অশোক ॥ বটে!—[গ্রীক নর্তকীগণ নৃত্যে সম্রাটকে বন্দনা করিল]

বীতশোক ॥ সম্রাটের অভিষেক-উৎসব সত্য সত্যই আজ সার্থক।

অশোক ॥ না না, এত বড় ব্যর্থতা জীবনে আমি আর কোনদিন অনুভব করিনি।

বীতশোক ॥ আপনি কি বলছেন সম্রাট? আপনার এই অভিষেক উপলক্ষে কে না বশ্যতা স্বীকার করেছে? সুদূর সেই গ্রীস, আর এদিকে আসমুদ্র হিমাচল—

রাধাগুপ্ত ॥ কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, হিন্দুকুস, কাশ্মীর, নেপাল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—

খল্লাতক ॥ [মানচিত্র হস্তে খল্লাতক কহিলেন] কলিঙ্গের কথাই শুধু বলা হয়নি সম্রাট! কলিঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা ছিল। কলিঙ্গ অভিষেকে দূত প্রেরণ করলেও, কোন উপহার প্রেরণ করেন নি! সম্রাটের কল্যাণ কামনা ক'রলেও বশ্যতা স্বীকার করেন না!

অশোক ॥ কলিঙ্গ—?

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ সম্রাট কলিঙ্গ! কলিঙ্গ বাদ পড়লে আপনার সাম্রাজ্যের চেহারা এই দাঁড়ায়—[মানচিত্র দেখাইলেন] ভারতবর্ষ তো এইটুকু দেশ! তার মধ্যে কলিঙ্গ যদি আবার বাদ পড়ে—

ব্রহ্মদত্ত ॥ তাহলে আমাদের হাত পা মেলবার স্থানই যে হয় না! ভাল করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও যে কষ্ট হয়!

অশোক ॥ কলিঙ্গ! কলিঙ্গ আমার নয়?

খল্লাতক ॥ না সম্রাট! এবং তার স্পর্ধা দেখুন, অভিষেক-উৎসবে কলিঙ্গ-রাজ যে বাণী প্রেরণ করেছেন শুনুন :

যঃ সহস্রং সহস্রেন সংগ্রামে মনুসঞ্জয়েৎ—

রাধাগুপ্ত ॥ জানি—জানি! যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সংগ্রামে জয় করে তাহাপেক্ষা যে একমাত্র নিজেকে জয় করে, সেই উত্তম সংগ্রামজিৎ।

অশোক ॥ হুঁ—ওরা বৌদ্ধ, না মহামাত্য?

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাটের অনুমান সত্য। বুদ্ধের দন্তকণা বক্ষে ধারণ করে কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর নামে আখ্যাত হয়ে আজ বৌদ্ধের এক মহাতীর্থ।

অশোক ॥ বৌদ্ধের মহাতীর্থ! হুঁ কোথায় সেই দূত?

খল্লাতক ॥ দূত নয় সম্রাট! দূত তার সত্যকার পরিচয় নয়! সে এক কিশোর। তার চোখ, তার মুখ অতুলনীয় নয়, তুলনা তার আছে, কিন্তু এ সংসারে মাত্র একটি লোকের সঙ্গেই তার তুলনা হয়—!

অশোক ॥ আপনি কি বলছেন দেব?

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ সত্য বলছি—তুমি দেখ—

[প্রতিহারকে ইঙ্গিত, প্রতিহারের প্রস্থান]

বীতশোক ॥ অভিষেক-উৎসব যখন সর্বদিক দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছিল—

অশোক ॥ উৎসব! এ জীবনে কোথায় উৎসব? কোথায় স্নেহ, কোথায় প্রেম? মায়া কই? মমতা যা ছিল আমি তা হারিয়েছি! আর যা আছে তা হয় ক্রয় করেছি না হয় পশু শক্তিতে অর্জন করেছি। সংসারে মাত্র দুটী প্রাণী আমায় ভালবেসেছিল, আমি তাদের হারিয়েছি—আমার সমস্ত শক্তিকে ব্যর্থ করে তারা চলে গেছে, একজন চিরতরে—আমার সেই অভাগিনী মাতা!—আর একজন—[মহেন্দ্রকে দেখিয়া] কে, কেও? [প্রতিহারসহ মহেন্দ্রের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ [মহেন্দ্রকে] সম্মুখে সম্রাট—[মহেন্দ্র সম্রাটকে অভিবাদন করিল]

খল্লাতক ॥ [সম্রাটকে] কলিঙ্গ দূত—

অশোক ॥ সেই মুখ—সেই মুখ!

খল্লাতক ॥ এ সংসারে মাত্র একটি লোকের সঙ্গেই এ মুখের তুলনা হয়!

অশোক ॥ সে কে? কে সে?

খল্লাতক ॥ [কানে কানে] তুমি অশোক!

[অশোক সকলকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলে সকলের প্রস্থান।
রহিলেন শুধু অশোক, খল্লাতক ও মহেন্দ্র]

অশোক ॥ তুমি কে?

মহেন্দ্র ॥ কলিঙ্গ দূত।

অশোক ॥ তোমাকে তো কলিঙ্গবাসী বলে মনে হচ্ছে না!

মহেন্দ্র ॥ সম্রাট, আমার জন্মভূমি উজ্জয়িনী। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আজ আমি আপনার অভিষেক-সভায় কলিঙ্গদূতরূপে উপস্থিত! সম্রাটের নিকট আমার এক অভিযোগ আছে।

অশোক ॥ কি অভিযোগ?

মহেন্দ্র ॥ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে এই মৌর্যবংশের শতাধিক রাজপুত্র মৃগয়া উপলক্ষে উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বিদিশারণ্যে গমন করেন। সেই শতাধিক রাজপুত্রের অন্যতম এক রাজপুত্র মৃগয়ায় আহত হয়ে বিদিশা নগরীর এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণকালে সেই শ্রেষ্ঠীর কুমারী কন্যার রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে গোপনে বিবাহ করেন। নিম্নকুলে বিবাহ করবার অপরাধ মৌর্যরাজ ক্ষমা করবেন না জেনে, তিনি তাঁর সদ্য-বিবাহিতা পত্নীকে এই বিবাহের কাহিনী গোপন রাখতে আদেশ দিয়ে সেই কাপুরুষ উজ্জয়িনী থেকে পলায়ন করে। সম্রাট, সেই বৎসরই সেই নারী এক পুত্র সন্তানের জননী হন।

অশোক ॥ তুমি?

মহেন্দ্র ॥ হাঁ সম্রাট, আমি! আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার মাতার উপর অমানুষিক সামাজিক নির্যাতন আরম্ভ হয়। স্বামীর বিপদ হতে পারে আশংকায় আমার মাতা কিছুতেই আমার পিতার পরিচয় দিতে স্বীকৃত হননি—আজও না—আমার কাছেও না!

অশোক ॥ তিনি এখন কোথায়?

মহেন্দ্র ॥ আমার পিতা এই মৌর্য্যবংশেরই কোন রাজপুত্র। সম্রাট, তাঁকে আদেশ করুন তিনি আত্মপরিচয় গোপন না করে আমাকে সমাজে এবং সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন!

অশোক ॥ বৎস! আমি জানি তোমার পিতৃ-পরিচয়। তিনি তোমার মাতাকে সংসারে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এতকাল তাঁর অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হ'য়েছেন। যদি তুমি তোমার পিতৃ-পরিচয় চাও তোমার মাতাকে এখানে আনয়ন কর।

মহেন্দ্র ॥ তা অসম্ভব সম্রাট!

অশোক ॥ অসম্ভব? কেন?

মহেন্দ্র ॥ তিনি সংসারে আর ফিরে আসবেন না—মা আমার ভিক্ষুণী।

অশোক ॥ ভিক্ষুণী! বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন? মৌর্যবংশে আজ পর্যন্ত কেউ ওই মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ করে নি। মৌর্য্য কুলবধূকে অবিলম্বে সেই মিথ্যা ধর্ম ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন ক'রতে হবে।

মহেন্দ্র ॥ আমার মাতার সম্বন্ধে সম্রাটের এই আদেশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

অশোক ॥ ব্যর্থ!

মহেন্দ্র ॥ হাঁ ব্যর্থ।

অশোক ॥ তুমি বল তিনি কোথায়? বল—

মহেন্দ্র ॥ তিনি কলিঙ্গে—

অশোক ॥ কলিঙ্গে! মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! এই যুবক বন্দী।

মহেন্দ্র ॥ সম্রাট—

অশোক ॥ হাঁ বন্দী। এই মুহূর্তে কলিঙ্গে দূত প্রেরণ করুন। এর মাতা আগামী শুক্লা-পঞ্চমীর মধ্যে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন না করলে আগামী শুক্লা-ষষ্ঠীতে তাঁর এই পুত্রকে হ'ত্যা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাট্যশালার নিকটস্থ অলিন্দ

কুনাল বেদীর উপর বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন ও কাঞ্চনমালা গাহিতেছেন

॥ গান ॥

খেলাঘরের নবীন সাথী,
তোমার তরে ছিলাম বসে
পরাণ মাঝে আসন পাতি
তোমায় আমি চিনেছিলাম
মোর জীবনের সকাল-বেলায়,
ছিলে আমার সন্ধ্যা-তারার
সঙ্গে দোলা স্বপন-ভেলায়!
এবার থেকে চির জীবন
তোমায় নিয়ে জাগব রাতি ॥

কুনাল ॥ তুমি এত ভাল গাইতে শিখলে কবে?

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী শিখিয়েছেন। তুমি আমায় বীণা বাজাতে শেখাবে বলেছিলে, কই শেখালে না তো? আর আমি তোমায় সাধব না।

কুনাল ॥ তবে আমিই-বা শেখাব কেন?

কাঞ্চন ॥ নাই-বা শেখালে! শেখাবার লোক বুঝি তুমি একা?

কুনাল ॥ তিষ্যাদেবী বীণা বাজাতেও জানেন নাকি?

কাঞ্চন ॥ তোমাকে এখন একশ বছর শেখাতে পারেন।

কুনাল ॥ আমাকেই যদি একশ বছর শিখতে হয়, তবে তোমার আরও বিপদ কাঞ্চন! হাজার বছরের কমে তোমার শিক্ষা শেষ হবে বলে ত মনে হচ্ছে না!

কাঞ্চন ॥ তোমার বীণা আমি ভেঙে দেব—ভেঙে দেব বলছি—

কুনাল ॥ আঃ শোন—শোন—

কাঞ্চন ॥ তবে আমায় শেখাও এখনি—

কুনাল ॥ আচ্ছা, এস। [কাঞ্চনের উপবেশন] ধর, এমনি করে ধর—তারপর—দেখি—এমনি করে—এমান করে—

কাঞ্চন ॥ আমি পারব। সর, এই দেখ—[প্রথমে ধৈর্য-সহকারে, পরে অধৈর্য হইয়া] দূর ছাই! এও কি আবার বাজনা! বাজনা হবে এমনি। [আপন মনে যথেচ্ছ বাজাইতে লাগিলেন]

কুনাল ॥ আঃ কাঞ্চন, শোন শোন—

[কাঞ্চন যথেচ্ছ বাজাইতেছেন। কুনাল তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। কাঞ্চন হঠাৎ বীণার তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পালাইলেন। কুনাল বীণা তুলিয়া লইয়া তাহা বাজন চলে না দেখিয়া কাঞ্চনের উদ্দেশে ক্রোধভরে চাহিয়া বীণা-সংস্কারে মন দিলেন। রাধাগুপ্তের প্রবেশ]

রাধাগুপ্ত ॥ কুমার!

কুনাল ॥ [সম্ভ্রম সহকারে দাঁড়াইয়া] মহামাত্য!

রাধাগুপ্ত ॥ কুমার এখানে একাকী?

কুনাল ॥ হ্যাঁ। যিনি ছিলেন তিনি এইমাত্র পালিয়ে গেলেন।

রাধাগুপ্ত ॥ [আশঙ্কায়] খল্লাতক!

কুনাল ॥ না মহামাত্য। অত বড় কোন বিপদ নয়।—তবে নিতান্ত কমও নয়!

রাধাগুপ্ত ॥ মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতা?

কুনাল ॥ না, তিনিও নন! তিনি গ্রীকদূত সকাশে গ্রীক-ভাষা শিক্ষা করতে ব্যস্ত।

রাধাগুপ্ত ॥ তবে, ও বুঝেছি। তাহলে আমি নির্ভয়ে—

কুনাল ॥ [আগ্রহে] এনেছেন?

রাধাগুপ্ত ॥ এনেছি।

কুনাল ॥ দিন—আমাকে দিন!

রাধাগুপ্ত ॥ [উত্তরীয়ে লুকায়িত ত্রিপিটক গ্রন্থ বাহির করিয়া তাহা কুনালের সম্মুখে ধরিয়া] শ্রীবুদ্ধের নির্বাণ প্রাপ্তি-কালে শিষ্য আনন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবান, আপনার অভাবে আমাদের উপায়?" শ্রীবুদ্ধ উত্তর দেন, "আমার উপদেশাবলী।" শিষ্যগণ তাঁর নির্বাণ-লাভের ছ'মাস পরে, রাজগৃহে সমবেত হয়ে সেই উপদেশামৃত তিনখণ্ড গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন—বিনয়-পিটক, সূত্র-পিটক এবং অভিধর্ম-পিটক। এই সেই পূণ্যপূত ত্রিপিটক—

[কুনাল শ্রদ্ধাসহকারে গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন]

কুনাল ॥ আমি পরম শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করব। পাঠ করব কখন্ শুনবেন?

রাধাগুপ্ত ॥ কখন্ কুমার?

কুনাল ॥ নিশীথ রাত্রে—যখন ধরণী সুষুপ্ত—একা আমি জেগে থাকি—চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারি না, তখন মনে জাগে—আমি কে! কেন এখানে এসেছি! কি করছি! কি করব! মৃত্যুর পর কোথায় যাব!

রাধাগুপ্ত ॥ ধীরে ধীরে তুমি অগ্রসর হচ্ছ—অগ্রসর হচ্ছ কুনাল! ওদের কথা মিথ্যা নয়। তুমি—তুমি বোধিসত্ত্ব!

কুনাল ॥ বোধিসত্ত্ব! কে সে?

রাধাগুপ্ত ॥ যে প্রাণী ধীরে ধীরে বুদ্ধত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হয়।

কুনাল ॥ [উদভ্রান্তের মত তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন]

রাধাগুপ্ত ॥ কি ভাবছ কুনাল?

কুনাল ॥ তবে শুনুন মহামাত্য! জীবনে এখন আমার অপার মায়া! ভোগ-সুখে এখন আমার অনন্ত লোভ! কাঞ্চনে এবং কাঞ্চনমালায় আমার অপরিসীম প্রীতি!

রাধাগুপ্ত ॥ সিদ্ধার্থের ইতিহাসও অবিকল তাই! ওই অজ্ঞানতার মেঘজাল ভেদ করে তাঁর মনে যেদিন জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হ'ল সেদিন তো তাঁকে কেউ ধরে রাখতে পারল না!—রাজা না, ঐশ্বর্য না, প্রেমময়ী প্রিয়া না, সদ্যোজাত পুত্রের আধ-আধ হাসিও না!

কুনাল ॥ ওরা বলে আমি বোধিসত্ত্ব?

রাধাগুপ্ত ॥ ওরা বলে মৃণালের মত ছিল তার চক্ষু!

কুনাল ॥ আমি বোধিসত্ত্ব?

রাধাগুপ্ত ॥ তোমার চক্ষুই তার সাক্ষী। শোন কুমার, রাজপুরী প্রমাদে আচ্ছন্ন। শ্রীবুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, প্রমাদ মৃত্যুর পদ এবং অপ্রমাদ অমৃত পদ। রাজপুরীকে তুমি শ্রীবুদ্ধ প্রদর্শিত সেই অমৃত-পদে পরিচালিত কর। বুদ্ধানাং শোক উৎপাদঃ সুখাস্বধর্ম্ম দেশনা। সুখা সংঘস্ত সামগ্রী সম প্রাণঃ তপ সুখং।—আসি কুমার। [প্রস্থান]

[কুনাল বেদীর উপর ত্রিপিটক স্থাপিত করিয়া সসম্ভ্রমে উহা প্রণাম করিলেন। খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ কুনাল!

কুনাল ॥ [সচকিত] মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! কি দেব?

খল্লাতক ॥ রাধাগুপ্তের কণ্ঠ শুনলাম না!

কুনাল ॥ হ্যাঁ দেব। তিনি ছিলেন, এইমাত্র চলে গেলেন।

খল্লাতক ॥ হুঁ। আমি তাঁকে একটি কথা বলতে এসেছিলাম। কথাটি শাস্ত্রবাক্য। তুমিও শুনতে পার—

কুনাল ॥ বলুন দেব—

খল্লাতক ॥ স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।

[প্রস্থানকালে হঠাৎ বেদীর উপর স্তস্ত ত্রিপিটক দেখিয়া তাহা তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া—যথাস্থানে রক্ষা করিয়া—কুনালের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ও প্রস্থান। ঐ সময় কুনাল সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি গমন করিলে কুনাল ছুটিয়া গ্রন্থ বুকে তুলিয়া খল্লাতকের গমন

পথের দিকে সক্রোধে চাহিয়া রহিলেন—তখন চোরের মত কাঞ্চনমালা প্রবেশ করিয়া বীণা লইয়া খুব জোরে বাজাইতে লাগিলেন। কুনাল মৃদু হাসিলেন।

কুনাল ॥ কাঞ্চন! [কাঞ্চন খুব জোরে বাজাইতেছেন] আমি পরাজয় স্বীকার করছি! সন্ধিপ্রার্থী!

কাঞ্চন ॥ উত্তম। সন্ধির শর্ত?

কুনাল ॥ তুমি বল!

কাঞ্চন ॥ আজ আমি তোমায় যা বলব তাই করবে!

কুনাল ॥ এ ত বড় বিপদ হল দেখছি। রোজই তুমি অমনি একটা কিছু করবে, বাধ্য হয়ে শেষে আমাকে প্রার্থনা করতে হয় সন্ধি, আর সে সন্ধির শর্ত হয় অনুগতভাবে তোমার আদেশ পালন করা! না কাঞ্চন, আমি তো স্ত্রৈণ নই যে তোমার—[কাঞ্চন আরও জোরে বাজাইতে লাগিলেন]

কুনাল ॥ আঃ—আমি কি বলেছি তোমার কথা রাখব না?

কাঞ্চন ॥ তবে আমার সঙ্গে এস—

কুনাল ॥ কোথায়?

কাঞ্চন ॥ নাটমঞ্চে।

কুনাল ॥ নাটমঞ্চে কেন?

কাঞ্চন ॥ সেখানে আজ আমরা অভিনয় করব।

কুনাল ॥ অভিনয় করবে তোমরা!

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী, আমি, রাজপুরীর সবাই। তিষ্যাদেবী আজ আমাকে ধরেছেন তোমাকেও অনুরোধ করতে—

কুনাল ॥ কি অনুরোধ কাঞ্চন?

কাঞ্চন ॥ তোমাকেও আজ আমাদের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে!

কুনাল ॥ আমাকেও অভিনয় করতে হবে! তিষ্যাদেবীর অনুরোধ?

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবীর একান্ত অনুরোধ। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, তোমাকে নিয়ে যাব। অমত ক'রনা, লক্ষ্মীটি!

কুনাল ॥ আচ্ছা যাব।

কাঞ্চন ॥ এ অভিনয় ত তাঁর উদ্যোগেই হচ্ছে!

কুনাল ॥ বটে!

কাঞ্চন ॥ আচ্ছা, তুমি নাটক লিখতে পার?

কুনাল ॥ না।

কাঞ্চন ॥ এ নাটক তিনি লিখেছেন।

কুনাল ॥ ও—

কাঞ্চন ॥ তাঁর নাচ দেখেছ, গান শুনেছ?

কুনাল ॥ না।

কাঞ্চন ॥ না! আজ তোমার ভাগ্য ভাল। [যাইতে যাইতে] কিন্তু এ আমি তোমায় বলে রাখছি কুনাল, তিষ্যাদেবী যদি তোমার মা না হতেন,— আমি তাঁর সঙ্গে তোমায় অভিনয় করতে দিতাম না। যদি চুরি করে অভিনয় করতে, তোমার পা ভেঙে দিতাম, চোখ কানা করে দিতাম।

[কুনালকে লইয়া প্রস্থান।

[তিষ্যরক্ষিতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া উঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি, কুনাল ও কাঞ্চনের গমন-পথের দিকে চাহিয়া চোরের মত তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন এমন সময় খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ দেবী!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [আত্মস্থ হইয়া] কে? মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক। আপনার সহিত আমার কয়েকটি কথা আছে। অনুমতি হয় ত নিবেদন করি।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ করুন।

খল্লাতক ॥ অভিষেকের পরদিনই সম্রাট এক ঘোষণাসহ কলিঙ্গে দূত প্রেরণ করেছেন, আপনি অবগত আছেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আছি।

খল্লাতক ॥ সেই ঘোষণানুযায়ী আজই হচ্ছে সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর পাটলিপুত্রে আগমনের নির্দিষ্ট দিন। আজ রাত্রির মধ্যে যদি তিনি কলিঙ্গবাস ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে এসে সম্রাটের সঙ্গে মিলিত না হন, তবে সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর বন্দী-পুত্রকে আগামীকল্য হত্যা করা হবে। আপনি জানতেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কে জানে!

খল্লাতক ॥ আজ আমি অবগত হয়েছি, সম্রাটের ওই ঘোষণাসহ কলিঙ্গে দূত প্রেরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, শ্রেষ্ঠী রমণীর সেই বন্দী-পুত্র পাটলিপুত্রের কারাগার থেকে পলায়ন করেছে।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এ কাহিনী চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। কিন্তু এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করবার জন্য আমি এখন ব্যস্ত—

[প্রস্থানোদ্যত]

খল্লাতক ॥ [উত্তেজিত ভাবে] শুনুন! [তিষ্যরক্ষিতা চমকিয়া দাঁড়াইলেন] আপনি বুঝতে পারছেন এ কতবড় দুর্ঘটনা! সম্রাট-প্রেরিত দূতের সঙ্গে সঙ্গেই, পুত্র যখন মাতৃচরণে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবে, মাতার নিকট সম্রাটের এ ঘোষণা এতটুকুও কার্য্যকর হবেনা। ফলে সেই শ্রেষ্ঠী রমণী সম্রাট সম্বন্ধে যেমন উদাসীন ছিলেন তেমন উদাসীনই থাকবেন। পরন্তু সম্রাটের উপর হয়ত তার ঘৃণা ছিল না, এখন জন্মাবে সেই ঘৃণা।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তাতে আমার কি ক্ষতি?

খল্লাতক ॥ আপনার ক্ষতি নাই বরং আপনার তাতে লাভ আছে, আমি তা জানি। আপনি বুদ্ধিমতী, এ কথা বুঝতে আপনি নিশ্চয়ই পেরেছেন সম্রাট যদি কোন নারীকে ভালবেসে থাকেন, সে নারী আপনি নন—সে সেই শ্রেষ্ঠী রমণী, তাঁর প্রথমা প্রণয়িনী, তাঁর প্রথমা পত্নী। তাঁকে যদি সম্রাট একবার ফিরে পান, সম্রাট আপনার সঙ্গে যে খেলা খেলছেন সে খেলা আর খেলবেন না, —না, আপনার ঐ বিশ্বজয়ী রূপের আকর্ষণেও না।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সাবধান! আপনার রসনা সংযত করুন—

খল্লাতক ॥ ক্ষমা করুন, আমি অক্ষম।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [ক্রোধে] প্রতিহার! [প্রতিহারের প্রবেশ] সম্রাট কোথায়?

প্রতিহার ॥ প্রাসাদচূড়া থেকে গোধূলির শোভা নিরীক্ষণ করছেন।

খল্লাতক ॥ [প্রতিহারকে রোষ-কষায়িত নেত্রে] যাও—[প্রতিহার প্রস্থান করিল]···এবং প্রতিমুহূর্তে সাগ্রহে সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখবেন গোধূলির অবসান হ'ল, তিনি এলেন না, যখন শুনবেন তাঁর পুত্র পাটলিপুত্রের কারাগার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, যখন জানবেন সে পালায়নের মূলে এই রাজপুরীরই কোন মহাদেবীর স্বার্থ ছিল, এবং অবশেষে যখন প্রমাণ প্রয়োগে আমি প্রতিপন্ন করব, বন্দী যুবকের সেই মুক্তিদাত্রী—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সাবধান!

খল্লাতক ॥ আমাকে আপনি জানেন না, তাই। শুনুন দেবী, এই অশোককে তার শৈশব থেকে আমি রাজপুরীর সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে এসেছি। অশোকের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য বিন্দুসার আমাকে মন্ত্রীত্ব হতে অপসারিত করেন···সুসীম আমাকে কারারুদ্ধ করেন। থাক সে কথা। ওই অশোককে—অশোক যত না ভাল বাসে আমি ভালবাসি তার বেশী। অশোকও সে কথা জানে।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমি জানতাম না। শুনুন দেব, সম্রাটের মহা বিপদ। সেই শ্রেষ্ঠী রমণী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি যদি এখানে ফিরে আসেন, তাঁর সংস্পর্শে, তাঁর প্রভাবে সম্রাট হবেন বৌদ্ধ।

খল্লাতক ॥ [চমকিত হইয়া] দেবী! এ কথা ত আমার কল্পনায়ও আসেনি!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হ্যাঁ দেব, সম্রাট হবেন সন্ন্যাসী। এই রাজৈশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ, কিছুতেই তাঁর আকর্ষণ থাকবে না। আপনার স্নেহ, আপনার প্রেম, তাঁর বৈরাগ্যের গতিরোধ করতে পারবে না। অবশেষে সিদ্ধার্থের মত একরাত্রে তিনি এই সাম্রাজ্যকে অনাথ ক'রে—

খল্লাতক ॥ দেবী! আপনি উচিত কাজ করেছেন। হ্যাঁ দেবী, আমার এই মহাসাম্রাজ্যের স্বপ্ন যে ধ্বংস করতে আসছিল, সেই আমাদের পরম শত্রু। এ প্রশ্নের—এই দিকটা—বৃদ্ধ হয়েছি দেবী!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হয়েছেন বৈ কি! আমার ইচ্ছা হয় আমি নিজে আপনার শুশ্রূষা করি! সারাদিন সারারাত্রি রাজকার্যে মস্তিষ্ক চালনা করা কিছু নয়! মাঝে মাঝে বিশ্রাম চাই। আসুন, আমাদের অভিনয় দেখবেন আসুন।

খল্লাতক ॥ অভিনয়!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ। আজ রাজধানীতে এই শুভ-সন্ধ্যায় সম্রাটের প্রথমা প্রণয়িনীর শুভাগমন হবে! হবে না? তারই উৎসব! [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] আসবেন কিন্তু, ভুলবেন না—[দ্রুতপদে প্রস্থান। অদূরে কোলাহল। বীতশোক, ব্রহ্মদত্ত ও দিমেকাস গল্প করিতে করিতে সেখানে আসিলেন]

বীতশোক ॥ এই যে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! আপনাকে ছাড়ছিনে। আপনাকেও আজ অভিনয় করতে হবে!

খল্লাতক ॥ আমি বৃদ্ধ—

দিমেকাস ॥ একজন বৃদ্ধেরই আবশ্যক হইয়াছে।

খল্লাতক ॥ না, না আমাকে বাদ দিন। কি গ্রন্থ অভিনীত হবে?

বীতশোক ॥ সিরিয়া রাজবংশের অভূতপূর্ব এক কাহিনী। মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতার আগ্রহে মহামতি দিমেকাস মহাদেবীর সহযোগে মাগধী ভাষায় এই নাটক প্রণয়ন করেছেন। অতি মুখরোচক সেই আখ্যান!

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল! অশ্লীল!

খল্লাতক ॥ কি?

ব্রহ্মদত্ত ॥ সিরিয়ার সেই রামায়ণ!—

দিমেকাস ॥ রামায়ণের মতই পবিত্র সেই কাহিনী। শ্রবণ করিতে থাকুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক। ঘটনা অনেক সময় কল্পনাকে পরাজিত করে। আপনি সিরিয়া-রাজবংশের সত্য ঘটনা শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের ভূতপূর্ব রাজা সেলুকস কত বড় সুমহান পিতা ছিলেন।

বীতশোক ॥ আপনি মহাসন্ধিবিগ্রাহিককে সেই সুমহান পিতার সুমহতী কাহিনী বলতে থাকুন। অভিনয়ের কত বিলম্ব আমি দেখে আসছি। (প্রস্থান)

দিমেকাস ॥ সিরিয়ার বর্তমান ভূপতি মহামতি আঁতিয়োক বীরবর সেলুকসের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। সেলুকস দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কুমার আঁতিয়োক ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অকাল-মৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। রাজবৈদ্যগণ কুমার আঁতিয়োকের এই রোগের কোন কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া স্নেহময় পিতা মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

খল্লাতক ॥ সত্য ঘটনা ?

দিমেকাস ॥ অক্ষরে অক্ষরে ইহা সত্য। রাজবৈদ্যগণ যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন—তখন একদা কুমার আঁতিয়োকের বিমাতা ষ্ট্রাটোনিস কুমারকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাজবৈদ্য কুমারের নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন। বিমাতাকে সন্দর্শন করিয়াই কুমারের নাড়ী অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজবৈদ্য পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলেন রাণী ষ্ট্রাটোনিস! উভয়ের মুখাবলোকন করিয়া দেখেন তাঁহাদের উভয়ের মুখেই স্বর্গীয় প্রেমের রক্তিম আভা!

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল! অশ্লীল!

দিমেকাস ॥ আপনি ইহাকে অশ্লীল বলিবেন না। দেখুন, রাজহংস নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া থাকেন। হায়! হায়! আপনি রাজহংস হইতেও অধম!

খল্লাতক ॥ আপনি বলুন—

দিমেকাস ॥ রাজবৈদ্য তখন চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন—"রোগ নির্ণয় হইয়াছে।—রোগ নির্ণয় হইয়াছে।" রাজা সেলুকস দ্রুতবেগে তথায় আগমন করতঃ সেই মঙ্গলময় বার্তা অবগত হইয়া কহিলেন, "কুমার আঁতিয়োক! তোমার প্রাণ রক্ষার্থে আমি তোমাকে আমার রাণী ষ্ট্রাটোনিসকে দান করিলাম।"

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল—অ-(দিমেকাসের রক্তচক্ষু দেখিয়া থামিয়া গেলেন)

দিমেকাস ॥ মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতার আগ্রহে জগতে এই পুণ্যকাহিনী প্রচার করিবার জন্যই আমরা এই নাটক প্রণয়ন করিয়া অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য পিতার এইরূপ জলন্ত আত্মত্যাগ আর কখনও কি শ্রবণ করিয়াছেন ? (বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক ॥ অভিনয়ের আয়োজন প্রস্তুত। সেই শ্রেষ্ঠী রমণীর পাটলিপুত্রে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয় আরম্ভ হবে। মহাদেবীর ইচ্ছা তৎপূর্বে আমরা আমাদের ভূমিকাগুলি আরও একবার আবৃত্তির দ্বারা অভ্যাস করি। বিশেষতঃ কুমার কুনাল আঁতিয়োকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় অভিনয়টির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে।

দিমেকাস ॥ উত্তম, উত্তম! মহাদেবীর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত। অভিনয় এইরূপেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে।

বীতশোক ॥ আসুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক।

খল্লাতক ॥ সম্রাটের সঙ্গে দেখা না করে আমি যেতে পারব না মহাবলাধিকৃত।

বীতশোক ॥ (ব্রহ্মদত্তকে) আসুন মহাসচিব।

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল! অ—(দিমেকাস গর্জন করিয়া উঠিতেই থামিয়া

গেলেন) চলুন—চলুন— (বীতশোক, দিমেকাস ও ব্রহ্মদত্ত চলিয়া গেলেন। খল্লাতকও যাইতেছিলেন এমন সময় সেখানে স্বয়ং সম্রাট আসিয়া দাঁড়াইলেন)

অশোক ॥ দেব!

খল্লাতক ॥ বৎস!

অশোক ॥ গোধূলি যে অতিবাহিত হয়ে গেল!

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ- সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে।

অশোক ॥ আজ কি তিথি? অমাবস্যা?

খল্লাতক ॥ না বৎস, আজ শুক্লা পঞ্চমী।

অশোক ॥ হ্যাঁ শুক্লা পঞ্চমী।···আমি ভাবছিলাম অন্ধকারে তারা পথ হারাবে না ত?

খল্লাতক ॥ তিনি কি সত্যই আসবেন?

অশোক ॥ কি জানি! কেমন করে বলব! না এলে আমি তাঁকে দোষ দিতে পারি না দেব! যে অপরাধ আমি তাঁর কাছে করেছি—তার ক্ষমা নাই! —ক্ষমা নাই!

খল্লাতক ॥ তুমি ত ইচ্ছা করে তাঁকে ত্যাগ করনি বৎস! নিতান্তই ভাগ্যচক্রে।—

অশোক ॥ এই কথাটি- অতি সত্য এই কথাটি কে তাঁকে বলে? বলতে পারলাম কই? পিতার ভয়ে তাঁকে গোপনে বিবাহ করি—। অদৃষ্টের নির্মম-পরিহাসে তখনই পিতা আমাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। রাজধানীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হই। প্রাণপণ উদ্যমে বিদ্রোহ দমন করে যখন রাজধানী যাত্রা করলাম, মনে হল পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাজধানীতে ফিরে এসেই চর-মুখে সংবাদ পেলাম সে উজ্জয়িনীতে নাই! উত্তর-ভারতের কোথাও নাই! সেই থেকে,—সেই থেকে দেব আজ এই বিশ বৎসর—

খল্লাতক ॥ আমি জানি বৎস!

অশোক ॥ কিন্তু সে ত তা জানে না! একথা তো সে জানে না, এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত জীবনে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—সে আমাকে, আমার দেহ-মনের সকল দীনতা সত্ত্বেও ভালবাসে! এ সংবাদ সে ত রাখেনি যে তাঁকে তাঁর সত্যকার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আমি সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি! এতটুকু বিশ্রাম গ্রহণ করিনি! অদম্য উদ্যমে অসাধ্য সাধন করেছি!···একথা ত কেউ তাকে বলেনি যে শুধু ঐ একটি মাত্র প্রাণীর অভাবে আজ আমার কি নিদারুণ দুর্গতি! জীবন হয়েছে মরুভূমি! হৃদয় হয়েছে শ্মশান! (নাট্যশালায় ঐক্যতানবাদন) ওকি?

খল্লাতক ॥ নাট্যশালায় অভিনয় হবে।

অশোক ॥ ও হ্যাঁ, তিষ্যরক্ষিতা বলেছে বটে। তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে সে উৎসব-আয়োজন করেছে!

খল্লাতক ॥ অভিনয় দেখবে অশোক!

অশোক ॥ তিষ্যরক্ষিতার অভিনয়? প্রতি মুহূর্তেই দেখছি—প্রতি মুহূর্তে! অভিনয় আর সইতে পারি না দেব! সইতে পারি না বলেই ত—দেব! সে কি তবে আসবে না?

খল্লাতক ॥ আসবার হলে বহুপূর্বেই কি আসতেন না?

অশোক ॥ সে আসবে না। আমি ভাবতে পারি না দেব! সে আসবে। আমার মন বলছে সে আসবে! আমি মানস-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি সে আসছে! মশাল জ্বেলে রাজপথ আলোকিত হোক। তার অভ্যর্থনার জন্য প্রাসাদসৈন্য প্রস্তুত হোক। কুলাঙ্গনারা আরতি-দীপ জ্বেলে প্রাসাদে তাঁদের রাজ্যলক্ষ্মীকে বরণ করে আনুক। দেব! আমার সঙ্গে আসুন—

খল্লাতক ॥ কোথায়?

অশোক ॥ কারাগারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নাট্যশালা, নাট্যমঞ্চ।

[নাটকের কুশীলবগণসহ দিমেকাসের প্রবেশ। সঙ্গে রাজপুরীর কয়েকজন দর্শকও আছেন]

দিমেকাস ॥ অনুমান করিতে থাকুন ইহা হইতেছে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ। ইহা শয়ন কক্ষ। উহা—'জোথিকা' 'জোথিকা'—হ্যাঁ, উপশয়ন কক্ষ [কুনাল সংশোধন করিয়া দিল] 'উপবেশন কক্ষ' ও···হ্যাঁ উপবেশন কক্ষ—শয়ন কক্ষ-সংলগ্ন উপবেশন কক্ষ। আর ঐ লতাবিতান। (কুনালকে) আপনি হইতেছেন সেলুকসের একমাত্র পুত্র কুমার আঁতিয়োক। আপনি দুর্জয় ব্যাধিতে তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছেন। আপনি শয়ন করিয়া থাকিবেন। [কাঞ্চনকে] আপনি হইতেছেন শুশ্রূষাকারিণী মিডিয়া। শুশ্রূষায় রত থাকুন। 'কোকা' 'কোকা'— পাখা—পাখা—[পাখা আনাইয়া মিডিয়াকে বাতাস করিতে দিলেন] [ব্রহ্মদত্তকে] আপনি রাজবৈদ্য, আপনি কুমারের নাড়ী ধারণ করিয়া থাকুন। [কুনালকে] আপনার চিত্তবিনোদনের জন্য নর্তকীগণ নৃত্য-গীত করিবে। [নর্তকীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা লতাবিতানে নৃত্য-গীত করিতে লাগিল]

এস মোর পরাণ-প্রিয় মধুর এই সমীরণে,
বস আজ লতায়-ঘেরা শীতল এই কুঞ্জবনে।

চোখে ঘুম লাগলে প্রিয়
খুলি মোর উত্তরীয়—
বসাব স্নিগ্ধ ছায়ে গাব গান আপন মনে।
ফাগুনে ফুলের বনে,
এস আজ ফুল্ল মনে
বাঁধিব বাহুর-ডোরে জীবনের পরম-ক্ষণে।

[মত্তাবস্থায় সেলুকসবেশী বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ আবার—আবার—

দিমেকাস ॥ আপনি মহা বিপদ সংঘটন করিতেছেন। আপনি উহাদিগকে পুনরায় নৃত্য-গীতের আদেশ দিবেন কেন? আপনি বলিবেন "ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও! আমার মুমূর্ষু পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত করিও না।" আপনার এই আদেশে নর্তকীকুল পলায়ন করিবে।

বীতশোক ॥ আমার ভুল হয়েছে। ওদের নৃত্য-গীত আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল বলেই আমি ওদের পুনর্বার নৃত্য-গীতের আদেশ দিয়েছিলাম। উত্তম, আমি আবার আসছি। [ফিরিয়া] দিমেকাস! মহামতি দিমেকাস! দয়া করে প্রণিধান করুন। ধরা যাক না কেন পুত্র আঁতিয়োকে শয়ন-কক্ষ বহুদূরে অবস্থিত, এবং সেজন্য এস্থানে নৃত্য-গীত সংঘটিত হলে শ্রীমানের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না?

দিমেকাস ॥ আপনি বৃথা তর্ক করিবেন না। আপনি ভূমিকানুযায়ী অভিনয় করিবেন।

বীতশোক ॥ উত্তম—উত্তম। [লতাবিতানপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন]

দিমেকাস ॥ আপনি দ্রুতপদে প্রবেশ করুন।

বীতশোক ॥ উহারা পুনরায় নৃত্য-গীত করুক!

দিমেকাস ॥ [বিরক্ত হইয়া নর্তকীদের প্রতি] কিঞ্চিৎ—

[নর্তকীগণ কিঞ্চিৎ নৃত্য-গীত করিল। বীতশোকের দ্রুত প্রবেশ]

বীতশোক ॥ ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও! [তাহার পর কি বলিতে হইবে ভুলিয়া গিয়া দিমেকাসের দিকে তাকাইলেন। দিমেকাস বলিয়া দিলেন—] আমার মুমূর্ষু পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত কর—

দিমেকাস ॥ আপনাকে দিয়া চলিবে না। আপনি আপনার মুমূর্ষু পুত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে আদেশ দিলেন?

বীতশোক ॥ এত কথা কি করে মনে রাখি? এর চেয়ে দেখছি যুদ্ধ জয় করা সহজ! আমি ভীষণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কে কোথায় আছ সিরিয়ার রাজাকে এক পাত্র মদ্য পান করতে দাও।

দিমেকাস ॥ ভীষণ বিপদের কথা। আপনি দেখিতেছি নাটকটিকে হত্যা করিবেন।

বীতশোক ॥ সে আর বেশী কথা কি? এখনি একপাত্র মদ্য না পেলে আমাকেই আত্মহত্যা করতে হবে। বরং আপনি এক কাজ করুন, আমাকে একটি মাতালের ভূমিকা দিন। আপনাদের নাটকও রক্ষা পাবে, আমিও।

দিমেকাস ॥ এ নাটকে মাতালের ভূমিকা নাই মহাবলাধিকৃত।

বীতশোক ॥ না থাকে একটা সৃষ্টি করুন না কেন? আমার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। আমি আসছি। [নেপথ্যগৃহে প্রস্থান]

দিমেকাস ॥ [হতাশ হইয়া অবশেষে] এইবার কুমার আঁতিয়োকের বিমাতা রাজ্ঞী ষ্ট্রাটোনিস। আমরা ইহাকে সতৃষ্ণা আখ্যা দিয়াছি, রাণী সতৃষ্ণা, আপনি কুমারকে দেখিতে আসুন।

[মৃদু-বাদ্যের তালে তালে রাজ্ঞী সতৃষ্ণা-বেশী তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ ও উপবেশন-কক্ষে উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থান। শুশ্রূষাকারিণী কাঞ্চনমালা দিমেকাসের নির্দেশানুযায়ী তাহার নিকট গেলেন। তিষ্যরক্ষিতা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন কুমার কিরূপ আছেন। কাঞ্চন অভিনয়ে ব্যক্ত করিলেন কোন আশা নাই, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষিতা তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কুনালের কাছে গিয়া মুগ্ধ-নেত্রে তাহাকে অবলোকন করিলেন। কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিলেন। আহতমনে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন]

দিমেকাস ॥ রাজবৈদ্য ছুটিয়া আসুন এবং সেলুকসের অনুসন্ধান করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ অশ্লীল—অ—

দিমেকাস ॥ [সক্রোধে তাঁহার প্রতি] এই—

ব্রহ্মদত্ত ॥ [ভয়ে স্তব্ধ হইলেন, পরে ভাল মানুষটির মত দিমেকাসের প্রতি] কি বলব?

দিমেকাস ॥ আমি যাহা বলিব তাহাই বলিবেন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ হ্যাঁ তাই বলব। [মদ্যপানরত সেলুকসবেশী বীতশোক প্রবেশ করিলেন]

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] সম্মুখে নৃপতি সেলুকস, অভিবাদন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্মুখে নৃপতি সেলুকস, অভিবাদন করুন।

দিমেকাস ॥ নৃপতি সেলুকস বলিতে হইবে না—শুধু অভিবাদন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ নৃপতি সেলুকস বলিতে হইবে না—শুধু অভিবাদন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ নৃপতি সেলুকস বলিতে হইবে না—শুধু অভিবাদন করুন।

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] আঃ শুধু অভিবাদন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ আঃ শুধু অভিবাদন করুন!

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] অভিবাদন করিতে হইবে না—আপনি বলুন!

ব্রহ্মদত্ত ॥ অভিবাদন করিতে হইবে না—আপনি বলুন!

বীতশোক ॥ অভিবাদন করিতেই হইবে, নতুবা আমি শুনিব না।

ব্রহ্মদত্ত ॥ [সভয়ে বীতশোককে অভিবাদন করিলেন]

দিমেকাস ॥ [ব্রহ্মদত্তকে] এইবার বলুন।

ব্রহ্মদত্ত ॥ এইবার বলুন।

দিমেকাস ॥ রাজ্ঞী সতৃষ্ণাকে দর্শন করামাত্র কুমার আঁতিয়োকের ব্যাধি অর্ধেক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মদত্ত ॥ রাজ্ঞী সতৃষ্ণাকে দর্শন করামাত্র কুমার আঁতিয়োকের ব্যাধি অর্ধেক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

দিমেকাস ॥ আর চিন্তা নাই, রোগ নির্ণয় হইয়াছে। গুপ্ত পরামর্শ আছে। আমরা এখান হইতে প্রস্থান করি—আসুন!

ব্রহ্মদত্ত ॥ দিমেকাসেরই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রস্থানের জন্য দিমেকাসের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।]

দিমেকাস ॥ আমাকে না। [বহুকষ্টে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ব্রহ্মদত্ত ও সেলুকসকে নেপথ্য-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।] এইবার আপনাদের অভিনয়! [দূরে দাঁড়াইয়া দিমেকাস স্মারকের কার্য করিতে লাগিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [কুনালকে] এস আমরা লতাবিতানে গিয়ে বসি। ওর শান্ত-শীতল ছায়ায় দেহ-মন স্নিগ্ধ হবে। আমি গান গাইব তুমি শুনবে?

কুনাল ॥ শুনব। [কাঞ্চনমালা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল] মিত্রিয়া, আমায় লতাবিতানে নিয়ে চল।

[কাঞ্চন কুনালকে ধরিয়া তুলিল। তিষ্যরক্ষিতা তাহাকে সাহায্য করিতে গেলেন]

কাঞ্চন ॥ [তিষ্যরক্ষিতার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে] তিষ্যাদেবী! আমি একাই পারব। [তিষ্যরক্ষিতা চমকিয়া উঠিয়া পরে কাঞ্চনের পানে চাহিয়া হাসিলেন]

[কুনাল ইতঃপূর্বে কোনদিন অভিনয় করেন নাই। অভিনয়ের এই ব্যাপারটাই তাঁহার নিকট অতি অপূর্ব এবং রহস্যময় মনে হইতে লাগিল। এই অভিনয়ে যে কোন দোষ আছে তাঁহার মনে হইল না। তিষ্যরক্ষিতা নৃত্য-গীত সহকারে আগে আগে চলিলেন, কুনাল ও কাঞ্চন তাহার অনুসরণ করিলেন। কুনাল লতাবিতানে গিয়া বেদীর উপরে বসিলেন। কাঞ্চন পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিষ্যরক্ষিতা কুনালের সম্মুখে নৃত্যসহকারে গাহিলেন]

মানস-সরসী ফুলে ফুলে ওঠে
দুলে দুলে ওঠে জল।
আমার এ গাঙে এসেছে জোয়ার
কল-কল ছল-ছল।

চাঁদ ও কুমুদ দেখে যে স্বপন
মন-মাঝে তারে করিব বপন।
তোমার পরাণে রণিয়া ফিরুক
আমার হাসি উছল।

[তিষ্যরক্ষিতা নৃত্য ভঙ্গীতে কুনালের পার্শ্বে বসিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কেমন লাগল, ভালো লাগল?

কুনাল ॥ ভাল লাগল।

[কাঞ্চনের চোখে চোখ পড়িলে দেখিলেন তাহার চোখ জ্বলিতেছে]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ [কুনালের মুখ তাহার মুখের কাছে আনিয়া] শোন—

[কাঞ্চন তিষ্যরক্ষিতার হাত সরাইয়া লইয়া তাহার প্রতি জ্বালাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—]

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী! [তিনজনের চোখে মুখে চাঞ্চল্যের আভাস প্রকাশ পাইল। দিমেকাস বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া—]

দিমেকাস ॥ মিডিয়া আর ওখানে থাকিবে না। ওখান হইতে তাহার প্রস্থান হইবে।

কাঞ্চন ॥ না—[কুনালকে] আমি থাকব! [তিষ্যরক্ষিতা প্রথমে জ্বলিয়া উঠিলেন। পরে যখন দেখিলেন নিজের মনের কথা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা তখন বলিলেন—]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ নাটকে ত তা নেই কাঞ্চন! [কুনালকে] কি হবে?

কুনাল ॥ তাই ত কাঞ্চন! কি হবে?

দিমেকাস ॥ (কাঞ্চনকে) আপনি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?

কাঞ্চন ॥ (কুনালকে) তুমি এ নাটক করতে পারবে না। না—না—পারবে না। (কুনালের উঠিবার উপক্রম)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ ছিঃ ছিঃ ঐ বিদেশী কি ভাবছে? (কুনালের হাত ধরিয়া রহিলেন)

দিমেকাস ॥ ভারতবাসীরা কি অভিনয় সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ?

কুনাল ॥ (দ্বিধায়)—কাঞ্চন!

কাঞ্চন ॥ না।

দিমেকাস ॥ দেখিতেছি নাটক অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।

কুনাল ॥ কাঞ্চন শোন। (কাঞ্চন সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। কাঞ্চন যে ভাবে চলিয়া গেলেন তাহাতে কুনাল মনে ব্যথা পাইয়া তাহার অনুসরণ করিতে গেলেন। তিষ্যরক্ষিতা কুনালের মুখ সেদিক হইতে ঘুরাইয়া আনিলেন)

দিমেকাস ॥ (কুনালকে) আবার আপনি উঠিতেছেন কেন?

কুনাল ॥ (রাগিয়া) বসছি। (কুনাল পুনরায় বসিলেন)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তুমি কি সুন্দর! কি অপরূপ ঐ চোখ দুটি!

দিমেকাস ॥ আঁতিয়োক বলিবেন—"তোমারও"!

কুনাল ॥ তোমারও।

দিমেকাস ॥ "কিন্তু ঐ চোখ ম্লান কেন? দীপ্তি কই? রাজ্ঞী সতৃষ্ণা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কুমার আঁতিয়োক কহিবেন—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিন্তু ঐ চোখ ম্লান কেন? দীপ্তি কই? যেদিন ঐ আঁখিপদ্ম প্রথম দেখেছিলাম সেই দিন থেকে দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে ঐ আঁখিপদ্মই হয়েছে আমার দিবসের ধ্যান—রজনীর স্বপ্ন! (কুনাল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দিমেকাস নূতন কথা শুনিয়া ঘন ঘন পাতা উল্টাইতে লাগিলেন)

দিমেকাস ॥ রাজ্ঞী ক্ষান্ত হউন—নাটক বহির্ভূত কথা বলিবেন না! কুমার আঁতিয়োক বলুন—মৃত্যুর করাল-ছায়া আমার চোখে—তাই আমার চোখ ম্লান!

কুনাল ॥ মৃত্যুর করাল-ছায়া আমার চোখে—তাই আমার চোখ ম্লান!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ ম্লান পদ্ম কিসে প্রস্ফুটিত হয়, সে রহস্য আমি জানি কুনাল!

দিমেকাস ॥ পুনরায় নাটক বহির্ভূত কথা! দেখিতেছি তোমরা ভারতবাসী অভিনয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবগত নহ! এ আমার পণ্ডশ্রম।

[হাতের পুঁথি ভূতলে ফেলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কুনাল—কুনাল—(তিষ্যরক্ষিতার এই আচরণে কুনাল বিস্মিত…ভীত হইয়া তাহার বাহু-বন্ধন-মুক্ত হইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা কেহই দেখিতে পান নাই অশোক কখন্ যে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন)

অশোক ॥ চমৎকার—(বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলে যেমন চমকিত হয় তিষ্যরক্ষিতা ও কুনাল সেই প্রকার চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চেষ্টা করিয়া সপ্রতিভ হইয়া তিষ্যরক্ষিতা—)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমরা—আমরা অভিনয় করছিলাম। সিরিয়ার সেই নাটক!

অশোক ॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) অভিনয়! অভিনয়! অভিনয়! স্ত্রী করে অভিনয়, পুত্র করে অভিনয়, সমস্ত জগতই যদি অভিনয় করে, তবে জীবনে কোথায় সত্য, কোথায় পবিত্রতা, কোথায় নিষ্ঠা!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কেন কলিঙ্গে?

অশোক ॥ হ্যাঁ কলিঙ্গে। তুমি তার বন্দী-পুত্রকে কারামুক্ত করে সেই মহাসতীর আগমন-পথ রোধ করেছ। কিন্তু আমার পথ রোধ করবে কে? আমি স্বয়ং সেই মহাসতীকে অভ্যর্থনা করে আনতে চললাম।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তুমি পারবে না। তিনি আসবেন না। শ্রীবুদ্ধের চরণে তিনি আত্ম-নিবেদন করেছেন। তিনি তোমার কাছে ফিরে আসবেন না। তিনি তোমায় মর্মে মর্মে চিনেছেন। ভেবে দেখ সম্রাট! অন্তরে বাহিরে তুমি

সমান কুৎসিত! এ সংসারে যদি কেউ তোমার যোগ্যা সহধর্মিণী থাকে, সে আমি, দেবী নয়।

অশোক॥ উত্তম। আমি কলিঙ্গ থেকে যতদিন না ফিরব, তুমি এই প্রাসাদেই বন্দী রইলে। যদি একা ফিরে আসি তুমি মুক্তিলাভ করবে, এবং তোমারই হবে জয়। তুমি যথেচ্ছা জয়োৎসব করতে পারবে আর সে যদি আমার সঙ্গে ফিরে আসে, তবে তোমার হবে পরাজয় এবং তোমার মৃত্যুতে হবে আমার সেই জয়োৎসব! কুনাল! তুমি এই বিষাক্ত প্রাসাদ ত্যাগ করে সস্ত্রীক এই মুহূর্তে তক্ষশীলায় যাত্রা কর। (মত্তাবস্থায় বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক॥ সেলুকসও সঙ্গে যাবে তো?

অশোক॥ বীতশোক! বীতশোক!! সেনাপতি!!!

বীতশোক॥ ("সেনাপতি" এই আহ্বানে বীতশোকের নেশা তৎক্ষণাৎ টুটিয়া গেল। বীতশোক সামরিক প্রথায় সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া) সম্রাট!

অশোক॥ কলিঙ্গ—(এই আদেশে বীতশোক তৎক্ষণাৎ সৈন্য-বাহিনী সজ্জিত করিবার জন্য সামরিক প্রথায় প্রস্থান করিলেন। নেপথ্যে জয়-বাদ্য। সৈন্যগণের সমবেত পদধ্বনি)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিঙ্গ রাজধানী—দন্তপুরের মহাবিহার। সন্ধ্যা।
দেবী একাকী গাহিতেছিলেন।

জ্বালাও তোমার প্রদীপখানি,
জ্বালাও আমার আঁখির আগে,
অন্ধকারে বন্ধ যে দ্বার—
বুকের মাঝে কাঁপন লাগে।
চল্‌তে গিয়ে একলা পথে—
ঝাপ্‌টা বায়ে নিভ্‌লো বাতি,
ধ্রুবতারা ঢাকলো মেঘে
চল্‌ছে ঝড়ের মাতামাতি—।
তাই তো তোমার পরশখানি—
আজকে আমার চিত্ত মাগে।

[বিহারাভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া মহেন্দ্রের প্রবেশ]

মহেন্দ্র ॥ মা!

দেবী ॥ কি বাবা?

মহেন্দ্র ॥ তারা আসছে···অশ্বারোহণে···হাতে উন্মুক্ত তরবারি। সম্মুখে যাকে পাচ্ছে তাকেই—(বাহিরে সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ—) ঐ! ···(ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষপথে কি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল) উঃ! (দেবীর নিকট ছুটিয়া গেল) মা!

দেবী ॥ মিত্রা কোথায়? আমার মিত্রা?

মহেন্দ্র ॥ সে ঐ ঘরে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

দেবী ॥ পিতৃমাতৃহীন ঐ অভাগীকে কি করে রক্ষা করব মহেন্দ্র? ও যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না!

মহেন্দ্র ॥ কেউ কি কাউকে রক্ষা করতে পারে মা? (বাহিরে পুনর্বার পূর্ববৎ আর্তনাদ)

দেবী ॥ ওর মা মৃত্যুকালে ওকে আমার বুকেই তুলে দিয়ে গেছে। প্রাণ দিয়ে ওকে রক্ষা করতে না পারলে কেন ওর ভার নিয়েছিলাম! ওকে বাঁচান চাই মহেন্দ্র, ওকে বাঁচাতেই হবে।

মহেন্দ্র ॥ কি উপায় করব মা! কোন উপায়ই ত দেখছি না।

[বাহিরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল]

দেবী ॥ ওদের সঙ্গে কি সম্রাট আছেন?

মহেন্দ্র ॥ জানি না। দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয় সে সঙ্গেই আছে। আর সকলে তত নিষ্ঠুর নয় মা যত সেই সম্রাট, সেই নর-পিশাচ!

দেবী ॥ সত্য সত্যই কি সে এত নিষ্ঠুর?

মহেন্দ্র ॥ তুমি তাকে দেখনি মা। তাই তোমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি তাকে দেখেছি। ঘাতকও তার চেয়ে দয়ালু হয়। তার চোখ ছুটি দেখলে মনে হয় সে চোখ যেন মানুষের নয়!

দেবী ॥ তুমি তাকে একদিন মাত্র দেখেছ। একদিনে মানুষকে চেনা যায় না বাবা—এক বৎসরেও চেনা যায় না— এক জীবনেও না!

[বাহিরে পূর্ববৎ আর্তনাদ। বিহারাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষুগণ একে একে সাতঙ্কে ছুটিয়া আসিতে লাগিল]

প্রথম ভিক্ষু ॥ ওরা মানুষ নয়, রাক্ষস। পল্লীতে পল্লীতে ওরা আগুন দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ভিক্ষু ॥ কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা…কত বালক-বালিকা জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে!

তৃতীয় ভিক্ষু ॥ উঃ যারা পালাচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাদের বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে বধ কচ্ছে!

প্রথম ভিক্ষু ॥ এই যে দেবী! তোমার কাহিনী ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে।

দ্বিতীয় ভিক্ষু ॥ ভগবান উপগুপ্তের অনুরোধে কলিঙ্গ তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, এই তার অপরাধ।

তৃতীয় ভিক্ষু ॥ সংঘে প্রবেশ করে তুমি সংসারে কিছুতেই ফিরতে চাইলে না। কলিঙ্গ তোমাকে সমর্থন করল। তোমার ধর্মরক্ষার জন্য কলিঙ্গ সেই দুর্বৃত্তদের রক্ত-চক্ষু তুচ্ছ করল। তার ফলে আজ কি দেখছি! ভগবান বুদ্ধের কি এই ইচ্ছা ছিল! (বাহির হইতে আর্তনাদধারা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় কতিপয় ভিক্ষু ছুটিয়া আসিল)

চতুর্থ ভিক্ষু ॥ বর্শা দিয়ে আঘাত করে এক বৃদ্ধের চোখ ছুটি—উঃ—

পঞ্চম ভিক্ষু ॥ মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে পাষাণের উপর আছড়ে মারছে! উঃ—(সন্ত-জাগ্রতা মিত্রা ছুটিয়া আসিল)

মিত্রা ॥ মা! মা!

দেবী ॥ (তাহাকে বুকে লইয়া) কি মা!

মিত্রা ॥ রাক্ষসের সেই রাজা আমাদের কাটতে আসছে। আমাদের কি হবে মা?

দেবী ॥ ভয় নেই মা, ভয় নেই।

তৃতীয় ভিক্ষু ॥ ও মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে লাভ কি দেবী? মায়ের বুক থেকেই যে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাষাণে আছড়ে মারছে।

মিত্রা ॥ উঃ—, (ভয়ে দেবীর বুকে মুখ লুকাইল)

প্রথম ভিক্ষু ॥ জগতের ইতিহাসে হয়ত এই প্রথম, যে এক নারীর জন্য—

দেবী ॥ (বাক্যযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া)

বুদ্ধো খমতুতং মম।
বুদ্ধো খমতুতং মম।
বুদ্ধো খমতুতং মম।

মিত্রা ॥ (কাঁদিয়া) মা! মা!

[বাহিরে সৈন্যগণের পদধ্বনি। বিহারের দ্বারে করাঘাত। আর্তনাদ, চীৎকার, কোলাহল। ভিতরে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভিক্ষুগণ ভিতর হইতে তোরণদ্বার ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিল, যাহাতে বাহির হইতে উহা কেহ না খুলিতে পারে। বাহিরে রমণীগণের আর্তনাদ শোনা গেল। মহেন্দ্র ছুটিয়া গিয়া একটি গবাক্ষ অর্ধোন্মুক্ত করিয়া বাহিরে ব্যাপার কি দেখিয়া লইয়াই গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—]

মহেন্দ্র ॥ (ভিক্ষুগণকে) দ্বার খোল—দ্বার খোল—ওরা শত্রু নয়। প্রাণ ভয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে। ওদের আশ্রয় দাও—ওদের আসতে দাও! বিলম্ব হলে ওদের হত্যা করবে—!

[মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া ভিক্ষুগণকে সরাইয়া দিয়া তোরণদ্বার খুলিয়া দিল। একদল নর-নারী বন্যার জলের মত ছুটিয়া বিহারে ঢুকিল। ভিক্ষুগণ তোরণদ্বার পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল]

এক বৃদ্ধ ॥ নর-রাক্ষস, বাবাঠাকুর, নর-রাক্ষস! আমার সর্বনাশ করেছে বাবাঠাকুর, চোখ দুটো একেবারে গেছে। জল! জল! আমি আর কথা বলতে পারছি না। (সঙ্গীর লোকজনদের) ও বাবা, তোরা এসেছিস বাবা?

তাহার পুত্র ॥ সবাই এসেছে বাবা। কেবল আমার নরোত্তম—

বৃদ্ধ ॥ তাকে মেরে ফেলেছে? মেরে ফেলেছে? ওরে, কথা কচ্ছিস না যে? উত্তর দে—উত্তর দে—

পুত্র ॥ কি উত্তর দেব বাবা? আমার বুক থেকে কেড়ে নিল যে বাবা! আমায়ও—আমায়ও—ওঃ!

বৃদ্ধ ॥ আমার মা-লক্ষ্মী? মা-লক্ষ্মী?

পুত্রবধূ ॥ এই যে বাবা! কিন্তু আমার বুকের ধন নরোত্তম—(কাঁদিয়া উঠিল)

মহেন্দ্র ॥ এ শোকের সময় নয়—শোকের সময় নয়। এস—এস—দেখি তোমাদের যদি বাঁচাতে পারি—! (তাহারা হা-হুতাশ করিতেছিল) এস—এস—আমার সঙ্গে এস—

[মহেন্দ্র তাহাদিগকে বিহারাভ্যন্তরে লইয়া গেল। বাহিরে সৈন্যদের পদধ্বনি শোনা যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বিহারাভ্যন্তর হইতে মহাস্থবির ধর্মকীর্তি বাহির হইয়া আসিলেন]

ধর্মকীর্তি ॥ শান্ত হও—শান্ত হও। আর ভয় নাই। আমাদের কাতর আহ্বানে বৌদ্ধ-গুরু ভগবান উপগুপ্ত সুদূর মথুরা থেকে এখানে শুভাগমন করেছেন। তিনি আমাদের দ্বারে। দ্বার উদ্‌ঘাটন কর।

[মহেন্দ্র দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ সকলে দ্বারের দিকে মুখ করিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া ধর্মকীর্তির সহযোগে আবৃত্তি করিল]

ওঁ নমঃ বুদ্ধায় গুরবে।
নমঃ ধর্ম্মায় তারণে
নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ।

[উপগুপ্ত প্রবেশ করিলেন]

ভবতু সব্ব মঙ্গলং
রক্‌খন্তু সব্ব দেবতা
সব্ব-বুদ্ধান ভাবেন
সদা সোত্থি ভবন্তুতে।

[ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ উপগুপ্ত উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, উপগুপ্ত মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন]

দেবী ॥ (কাঁদিয়া) পিতা!

উপগুপ্ত ॥ আমি সবই জানি মা!

ধর্মকীর্তি ॥ একলক্ষ কলিঙ্গবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে, দেড়লক্ষ কলিঙ্গবাসীকে বন্দী ক'রে, নগরের পর নগর, পল্লীর পর পল্লী ধ্বংস করে, কলিঙ্গকে মহাশ্মশানে পরিণত ক'রে মগধ-সম্রাট আজ এই মহাবিহারের দ্বারদেশে!

উপগুপ্ত ॥ সম্রাট যদি মহাবিহারের দ্বারদেশে, তবে দ্বার রুদ্ধ কেন? দ্বার উদ্‌ঘাটন কর—

জনৈক ভিক্ষু ॥ প্রভু! ও আদেশ দেবেন না প্রভু! ওরা বড় নির্দয়! বড় নির্মম!

উপগুপ্ত ॥ ভগবান বুদ্ধের মন্দির-দ্বার কখনও অবরুদ্ধ থাকে না। শত্রু, মিত্র, পাপী, তাপী সকলেরই এখানে সমান প্রবেশাধিকার। দ্বার উদ্‌ঘাটন

কর—(দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। বাহিরে কাহাকেও দেখা গেল না। অদূরে রণবাদ্য। সৈন্যগণের পদধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর শোনা যাইতে লাগিল)।

দেবী ॥ পিতা! আমারই জন্য আজ কলিঙ্গ ধ্বংস হল। আপনি আমায় আসন্ন-মৃত্যু থেকে কেন রক্ষা করেছিলেন? কেন আমায় আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন! মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আমাকে দূরে রাখবার জন্য কেন আপনি আমায় সপুত্র কলিঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন?

উপগুপ্ত ॥ কোন অন্যায়ই আমি করি নি মা!

কায়িকং হরতি মানসং তথা
দেহিনাং ভবময়ং মহাভয়ম্।
বুদ্ধ এব ভগবান সুধা নিধি
সর্ব্বলোক পরলোক বান্ধব ॥

ভয় কি মা! শ্রীবুদ্ধই আমাদের ভয়হারী বন্ধু। মা! যে প্রাণের এত মমতা, আজ তাই হোক বুদ্ধ-চরণে আমাদের শেষ অর্ঘ্য!···সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়! তোমরা প্রাণভয়ে শ্রীবুদ্ধের সন্ধ্যারতি বিস্মৃত হয়েছ! যাও মা! তুমিই আজ শ্রীবুদ্ধের সন্ধ্যারতি কর—(দেবী বিহারাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন)

উপগুপ্ত ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
সকলে ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
উপগুপ্ত ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সকলে ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
উপগুপ্ত ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
সকলে ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

[মুক্ত দ্বারপথে প্রতিহারের প্রবেশ]

প্রতিহার ॥ পরমেশ্বর-পরমশৈব - পরমভট্টারক - মহারাজাধিরাজ - মগধ - সম্রাট-অশোক-সেনাপতি-মহাবলাধিকৃত-মহাবীর বীতশোক!

[কতিপয় সেনানীসহ বীতশোকের প্রবেশ]

বীতশোক ॥ দেবী! কে দেবী? কোথায় তিনি?

ধর্মকীর্তি ॥ তিনি এখানে ছিলেন—কিন্তু এখন এখানে নাই।

বীতশোক ॥ তিনি এখানে আছেন। আপনারা বলছেন এখানে নাই। উত্তম! (সেনানীদের আদেশ দিলেন) আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—হত্যা—(সেনানীগণ আঘাত করিতে ছুটিল, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, পরন্তু)

উপগুপ্ত ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধগণ ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

উপগুপ্ত ॥ ধর্ম্ম শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধগণ ॥ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

উপগুপ্ত ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধগণ ॥ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বীতশোক ॥ (বিচলিত সেনানীগণের প্রতি) ঐ কণ্ঠ চিরতরে নীরব কর—

প্রথম সেনানী ॥ (বৌদ্ধগণের প্রতি) অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—

উপগুপ্ত ॥ বৌদ্ধের শিক্ষা অন্যরূপ। তাদের যুদ্ধ স্বতন্ত্র।

বীতশোক ॥ কিরূপ ?

উপগুপ্ত ॥ স্বচক্ষে তা দেখেছ।

বীতশোক ॥ হ্যাঁ দেখেছি। তারা মেষের মত শুধু প্রাণবলি দিয়েছে! মানুষের বেশে বেঁচে থাকবার অধিকার ভীরু মেষের নাই। (সেনানীদের প্রতি) ওদের বধ কর—

সেনানীগণ ॥ ওরা অস্ত্র নিক—

বীতশোক ॥ না, ওরা অস্ত্র নেবে না—বধ কর—

প্রথম সেনানী ॥ তুমি জাননা—তুমি জাননা প্রভু, আজ আমাদের চেয়ে দুর্বলতর লোক সংসারে নাই!

দ্বিতীয় সেনানী ॥ প্রভু! প্রভু! রাত্রে আমরা ঘুমুতে পারি না প্রভু!

তৃতীয় সেনানী ॥ প্রভু! তুমি আমাদের বধ কর। আমাদের বধ কর!

বীতশোক ॥ প্রাণদণ্ড তোমাদের দণ্ড নয়। তোমাদের দণ্ড—

[সেনানীগণ নতজানু হইয়া বীতশোকের সম্মুখে অস্ত্র ত্যাগ করিল]

অস্ত্র নাও। (সেনানীগণ অস্ত্র লইল) যাও—(তাঁহার আদেশানুযায়ী বাহিরে চলিয়া গেল। বাহির হইতে দ্বিতীয় সেনানী ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাদিগকে) আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—হত্যা—

[বিহারাভ্যন্তর হইতে দেবীর প্রবেশ]

দেবী ॥ এদের কি অপরাধ ?

বীতশোক ॥ আপনি কে ?

দেবী ॥ আমার নাম দেবী।

বীতশোক ॥ আপনারই নাম দেবী! আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন দেবী!...আপনাকে জয় করতে এসে সম্রাট কলিঙ্গকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছেন। কিন্তু, তবু আপনি অপরাজিতাই রয়েছেন! সম্রাটের ইচ্ছা আপনি আজ প্রথম-প্রহর রাত্রি মধ্যে সম্রাটের শিবিরে গিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন—অন্যথায়—

দেবী ॥ অন্যথায় ?

বীতশোক ॥ দ্বিতীয়-প্রহরে এই মহাবিহার চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে—চৈত্য ধূলিসাৎ হবে- এবং—

দেবী ॥ কি ?

বীতশোক ॥ আমি জানিনা দেবী। আপনি বিবেচনা করে কাজ করবেন। সম্রাট দুর্জয়…দুর্ধর্ষ! (প্রস্থানোদ্যত)

দেবী ॥ আপনি ?

বীতশোক ॥ আমি সম্রাটের অস্ত্র। নাম বীতশোক। পরিচয় মহাবলাধিকৃত।

দেবী ॥ আপনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে এসেছেন ?

বীতশোক ॥ আমার যা বলবার আমি বলেছি। ভয় পাবেন কিনা—সে আপনি জানেন। আসি দেবী। (প্রস্থানোদ্যত)

দেবী ॥ দাঁড়ান—

বীতশোক ॥ দেবী!

দেবী ॥ আমাকে কি সম্রাট সত্য সত্যই চান ?

বীতশোক ॥ এ অতি নিরর্থক প্রশ্ন দেবী, যখন আপনি জানেন, এবং কে না জানে, যে আপনার জন্যই কলিঙ্গে লক্ষ লোক নিহত হয়েছে—লক্ষাধিক লোক বন্দী হয়েছে!

দেবী ॥ উত্তম। কিন্তু, এ কথা কি আপনি কখনও কল্পনা করতে পারেন যে লক্ষাধিক লোক হত্যা করার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার সম্রাট এই মহাবিহারে এসে বুদ্ধ-চরণে আত্মসমর্পণ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন ?

বীতশোক ॥ দেবী! (অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া) না দেবী।

দেবী ॥ তবে আপনি এই-বা কি করে কল্পনা করতে পারেন যাঁরা পিতার স্নেহে, মাতার মমতায়, ভ্রাতার ভালবাসায়, ভগিনীর সমবেদনায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল, অবশেষে দিল প্রাণ, আমি তাঁদের স্মৃতি, তাদের শবদেহ পদতলে দলিত করে, আপনার সম্রাটের হস্তে আত্মসমর্পণ করব!

বীতশোক ॥ আপনাকে যতক্ষণ না দেখেছিলাম ততক্ষণ অতি অনায়াসে ওরূপ কল্পনা করেছি—কিন্তু আপনাকে দেখা অবধি আমার মনে হচ্ছে দেবী, আপনি অসাধারণ, সত্য সত্যই অনন্যসাধারণ। শুধু একটা নারীদেহ ধারণ করেন না…ঐ দেহে—ঐ তপঃক্লিষ্টা দেহে এমন কোন শক্তি আছে—যা আমি দেখতে পাচ্ছি না—যা দেখা যায় না—কিন্তু অনুভব করতে পাচ্ছি—! যা এই সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে ছিন্ন হয় না—যা আমার চেয়ে—আমার সম্রাট যে সম্রাট—সেই সম্রাটের চেয়েও সহস্রগুণ শক্তিমতী। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, পৃথিবীতে অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নয়—(হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া) এ আমি কি বলছি!…

উপগুপ্ত ॥ তুমি কিছুই মিথ্যা বলনি বীতশোক।

বীতশোক ॥ তোমরা মায়াবী! হাঁ, তোমরা—তোমরা—(আত্মস্থ হইয়া দেবীকে) আপনাকে প্রথম-প্রহর মধ্যে সম্রাট-শিবিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে—নতুবা—

দেবী নতুবা?

বীতশোক ॥ এই বিহার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে—চৈত্য ধূলিসাৎ করে, আপনাকে বলপূর্বক—

দেবী ॥ কাকে? আমাকে? না আমার মৃতদেহকে? এই মুহূর্তে তুমি আমার মৃতদেহ দেখতে চাও বীর?

বীতশোক ॥ না—না দেবী!...দেবী, তুমি অপরাজিতা। সম্রাটের অমানুষিক সাধনাকে এই শেষ মুহূর্তে তুমি ব্যর্থ ক'র না—ক'র না দেবী! সম্রাট কলিঙ্গ জয় করেছেন সত্য, কিন্তু সম্রাটকে জয় করেছ তুমি। আমি তোমার কাছে সকাতরে প্রার্থনা করছি...দেবী, তুমি এস! যে আগ্রহ,—যে ব্যাকুলতা নিয়ে সম্রাট তোমার পথ চেয়ে রয়েছেন—সেই আগ্রহ, সেই ব্যাকুলতার যদি তিনি দেবতার পথ চেয়ে থাকতেন তবে এর বহু পূর্বে স্বর্গ থেকে দেবতা নেমে আসতেন—প্রসন্নমুখে সম্রাটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতেন! (সেনানীগণসহ প্রস্থান)

দেবী ॥ (উপগুপ্তকে) প্রভু!

উপগুপ্ত ॥ নির্বাণ সর্বত্যাগ। আমাদের মন নির্বাণার্থী। সুতরাং যে ত্যাগ আমাদের করতে হবে তা আমরা সর্বপ্রাণীর কল্যাণেই ত্যাগ করব।

দেবী ॥ (মহেন্দ্রকে) বৎস!

মহেন্দ্র ॥ মা!

দেবী ॥ মিত্রা রইল। ওকে দেখো। আমার জন্য দুঃখ করোনা বৎস!

মহেন্দ্র ॥ আজও কি তুমি আমায় বলবে না?

দেবী ॥ আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

উপগুপ্ত ॥ কিন্তু, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নই। আমি বলব।

মহেন্দ্র ॥ বলুন—বলুন (দেবী না বলিবার জন্য উপগুপ্তকে সকাতরে ইঙ্গিত করিলেন)

উপগুপ্ত ॥ (মহেন্দ্রকে) আজ নয়, বলব সেই দিন যেদিন তার পরিচয় পেলে তুমি তোমাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত পুত্র বলে মনে করবে!

দেবী ॥ (উপগুপ্তকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া)

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

[বলিতে বলিতে বিহার হইতে বাহির হইয়া সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়া গেলেন।—আকাশে-বাতাশে বিদায়ের···বিসর্জনের করুণ রাগিনী বাজিয়া উঠিল। বিহারের অভিভূত নর-নারী দেবীর যাত্রা-পথ-লক্ষ্যে তাকাইয়া রহিলেন। বিহারাভ্যন্তর হইতে মিত্রা "মা। মা—" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিল—কিন্তু উপগুপ্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বুকে টানিয়া নিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিঙ্গ। রাত্রি। গুহাভ্যন্তরস্থ কক্ষে সম্রাট অশোকের সাময়িক সামরিক-আবাসে। কক্ষে একটি শয্যা, শয্যাপার্শ্বে দীপাধারে প্রদীপ। অন্যত্র আর কয়েকটি প্রদীপ। কক্ষে একটি বুদ্ধমূর্তি, তাহার চরণদ্বয় ভগ্ন; ভগ্নাংশ কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে। সম্রাটের যবনী দেহরক্ষী কক্ষে একাকী। সে গাহিতেছিল—]

হে মোর কামনা—হে মোর ধ্যানের ছবি,
তব তরে প্রিয় বিলায়ে দিয়াছি সবি!
তবু তুমি মোর সুদূর সন্ধ্যা-তারা,
কেন একা ফেলে কর মোরে দিশাহারা—
তোমার স্বপনে পরম চেতনা লভি।
যারে বুকে চাই সেকি রবে দূর নভে?
মরুভূমি শুধু পরাণ জুড়িয়া রবে!
তব গাথা রচি হব আমি ব্যথা-কবি!

[সামরিক সজ্জায় সজ্জিত সম্রাট অশোক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যবনী পত্রাধারটি তাঁহার সম্মুখে ধরিল—সম্রাট তাহা হইতে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া, শয্যায় বসিয়া দীপালোকে পাঠ করিতে লাগিলেন। যবনী সম্রাটের বর্ম চর্মাদি সামরিক সজ্জা খুলিতে লাগিল। কক্ষের দ্বারদেশে রাধাগুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্যাকুলভাবে সম্রাটের দৃষ্টিপ্রসাদের অপেক্ষায় রহিলেন]

অশোক॥ আমাকে এ পত্র কে দিয়ে গেছে যবনী?

রাধাগুপ্ত॥ সম্রাট! আমি।

অশোক॥ আপনি এ পত্র কোথায় পেলেন?

রাধাগুপ্ত॥ ভগবান উপগুপ্ত—বৌদ্ধগুরু উপগুপ্ত প্রেরিত এক বৌদ্ধ এই পত্র এনেছিল সম্রাট!

অশোক॥ কোথায় সেই ভগবান বৌদ্ধ? আর কোথায়ই-বা সেই বান উপগুপ্ত?

রাধাগুপ্ত॥ সেই বৌদ্ধকে সম্রাটের দেহরক্ষিগণ নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

অশোক॥ আর শ্রীউপগুপ্তকে—?

রাধাগুপ্ত ॥ তাঁর সংবাদ আমি এখনি নিচ্ছি। কিন্তু, তৎপূর্বে সম্রাটের নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে।

অশোক ॥ বলুন।

রাধাগুপ্ত ॥ এই নৃশংস হত্যার আদেশ প্রত্যাহার করুন সম্রাট।··· সম্রাট, নিজের মন দিয়ে অপরের ব্যথা, অপরের বেদনা একটিবার অনুভব করুন। এই হত্যা-স্রোত নিবারণ করুন। জগতে প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করুন। দয়া করুন সম্রাট!

অশোক ॥ প্রেমের রাজ্য! প্রেম! উত্তম, তাই যদি হয়. আমার প্রেমের যারা প্রতিকূলাচরণ করছে আমি তাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করছি। অন্যায় আমি কিছুই করছি না মহামাত্য।

রাধাগুপ্ত ॥ আপনি ভুল বুঝেছেন সম্রাট। কলিঙ্গ বৌদ্ধরাজ্য। অনন্ত প্রেম, অসীম করুণা, অপরিসীম মমতাই শ্রীবুদ্ধের ধর্মভিত্তি। দেবী যদি সম্রাট-সকাশে আগমন করতে চাইতেন, কলিঙ্গবাসী তাঁকে বাধা দিত না। আমি অবগত হয়েছি সম্রাট, দেবী সম্রাটের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়!

অশোক ॥ আমি বিশ্বাস করি না। আমি দেবীকে চাই। যতক্ষণ দেবী আমার সম্মুখে উপস্থিত না হবেন, ঐ হত্যা-স্রোত অবাধে অব্যাহতগতিতে চলবে।

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ আপনি আমার আদেশ বিস্মৃত হয়েছেন মহামাত্য! আমি অবিলম্বে অবগত হতে চাই ভগবান শ্রীউপগুপ্ত জীবিত কি মৃত। (রাধাগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে) যদি তিনি জীবিত থাকেন, আমি তাঁর দর্শন ইচ্ছা করি।

রাধাগুপ্ত ॥ তবে আমি স্বয়ং মহাবিহারে যাচ্ছি সম্রাট। যদি সৌভাগ্যবশতঃ তাঁকে জীবিত দেখি, তাঁকে আমি এখানে আনয়ন করব-ই।— সেজন্য যদি তাঁর চরণ-ধারণও করতে হয়—

অশোক ॥ দাঁড়ান মহামাত্য।

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ এই গুহাকক্ষে প্রথম প্রবেশ করে দেখি আমার অনুচরদের সতর্কদৃষ্টিকে প্রতারিত করে একটি প্রস্তরমূর্তি তথন দণ্ডায়মান। অনুসন্ধানে অবগত হলাম কলিঙ্গ-রাজ মূর্তিটির চরণপূজা করে ধন্য হতেন।

রাধাগুপ্ত ॥ শ্রীবুদ্ধমূর্তি! কই সে মূর্তি সম্রাট?

অশোক ॥ চরণধারণ করবেন? ধন্য হবেন?

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক॥ হাঃ হাঃ হাঃ চরণ তার নাই! আমি ভগ্ন করেছি। ঐ দেখুন—

[ভগ্নমূর্তি দেখিয়া রাধাগুপ্ত মর্মাহত হইলেন। তিনি অশোকের সম্মুখে তাহার মর্মবেদনা গোপন করিতে গেলেন, অশোক উহা উপভোগ করিতে লাগিলেন]

অশোক॥ মহাবিহারে যেতে আপনার বিলম্ব হচ্ছে মহামাত্য! (হাসিতে লাগিলেন) যান, শীঘ্র যান—গিয়ে উপগুপ্তের চরণ-বন্দনা করে তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে আসুন। তাঁর চরণযুগল দর্শন কামনায় আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি মহামাত্য! (বক্রহাস্য)

রাধাগুপ্ত॥ (ভীত হইয়া) সম্রাট, অনুমতি হয় ত আমি বরং কোন দূতই তাঁর নিকট প্রেরণ করি।

অশোক॥ (হাসিয়া) যেরূপ অভিরুচি। ফলকথা তাঁকে আমি চাই—এখানে—এখনি। (নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাধাগুপ্তের প্রস্থান)

অশোক॥ যবনী, পত্রখানা অগ্নিদগ্ধ কর—(পত্র নিক্ষেপ। যবনী তাহাঃ তুলিয়া লইয়া প্রদীপশিখায় ধরিতে গেলে) দাঁড়া—(যবনী থামিল) দেখি—(যবনী পত্রখানি অশোকের সম্মুখে ধরিল। অশোক তাহা গ্রহণ করিতেই বাহিরে অশ্বখুরোত্থিত শব্দ শুনিয়া) ওকি! কে? অশ্বারোহণে কে এল? (দ্বারদেশে চণ্ডগিরিককে দেখা গেল)

চণ্ডগিরিক॥ সাংবাদিক।

অশোক॥ পাঠিয়ে দে—(সাংবাদিক ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল) সংবাদ?

সাংবাদিক॥ পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক—

অশোক॥ (অধীর হইয়া) সংবাদ?

সাংবাদিক॥ মহাবীর মহাবলাধিকৃত—

অশোক॥ হাঁ—হাঁ-বীতশোক! তারপর?

সাংবাদিক॥ পরম বিক্রম-সহকারে মহাবিহারে প্রবেশ করতঃ দেখেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ মহাসমারোহে—

অশোক॥ তোমাকে আমি বধ করব। দেবীর সংবাদ?

সাংবাদিক॥ অসহ্য পিপাসায় আমার কণ্ঠরোধ—

অশোক॥ (সম্মুখস্থ পানীয়জল তাহার মুখের কাছে ধরিয়া) দেবীর সংবাদ?

সাংবাদিক॥ তিনি মহাবিহারে নাই।

অশোক॥ অসম্ভব! অসম্ভব! মহাবিহারে যদি নাই তবে কোথায় তিনি?

সাংবাদিক॥ তা এখনও অজ্ঞাত। (জলপানার্থে চোখে-মুখে চরম ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল)

অশোক ॥ এ সম্মানের অযোগ্য তুমি। (জলপাত্র নামাইয়া রাখিলেন) যতক্ষণ না দেবীর সংবাদ পাওয়া যায় ততক্ষণ জলগ্রহণ তোমার নিষেধ।

[খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ হতভাগ্যকে ক্ষমা কর সম্রাট। (পানীয় লইয়া সাংবাদিককে দান কালে) আমার-চর সংবাদ এনেছে দেবী মহাবিহারে আছেন, সঙ্গে তাঁর পুত্র মহেন্দ্রও আছে। আমি বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েছি অশোক।

অশোক ॥ কেন দেব?

খল্লাতক ॥ উপগুপ্ত মহাবিহারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে বৌদ্ধগণ, বিশেষতঃ ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধজ্ঞানে পূজা করে।

অশোক ॥ শুনেছি দেব। এবং তিনি শুধু বৌদ্ধকেই উপদেশ দেন না, এই চণ্ডাশোককেও এক পত্র লিখে অনুগ্রহ করেছেন।

খল্লাতক ॥ বটে! কি লিখেছেন?

অশোক ॥ প্রথমতঃ তিনি বলেছেন অতীত এবং বর্তমান আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ভাগ্য গঠন করে। এবং যেহেতু আমি লোকের বুকে শেলাঘাত করেছি—করছি—অতএব আমার বক্ষেও শেলাঘাত হবে—হবেই হবে।

খল্লাতক ॥ শেলাঘাত করবে কে?

অশোক ॥ আমার কর্ম।...দেব, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?

খল্লাতক ॥ ও কথা বিশ্বাস করতে গেলে রাজত্ব করা চলে না। রাজ্য-রক্ষা, সাম্রাজ্যবৃদ্ধি, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষণ প্রভৃতি প্রতিকার্যে রাজাকে কঠোর হতে হয়। শাসনদণ্ড চিরকালই নির্মম।

অশোক ॥ কর্মফল! কর্মফল! (হঠাৎ) দেবী কি আসবে না দেব? উপগুপ্তই হয়ত তাকে আসতে বাধা দিচ্ছে। আমি উপগুপ্তকে এখানে উপস্থিত করবার জন্য আদেশ দিয়েছি।

খল্লাতক ॥ আমি শুনলাম। কিন্তু এ আদেশ সমীচীন হয়নি অশোক!

অশোক ॥ কেন? কেন দেব?

খল্লাতক ॥ সে যাদু জানে। সে বলে, যারা ক্লান্ত...শ্রান্ত...অবসন্ন...সে তাদের শান্তি দিতে জানে। জরা, ব্যধি ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করবার রহস্য না কি সে উদঘাটন করেছে।

অশোক ॥ সত্য? সত্য দেব?

খল্লাতক ॥ যদি বলি সত্য?

অশোক ॥ আমি এখনি স্বয়ং তার কাছে যাব—

খল্লাতক ॥ যদি বলি মিথ্যা?

অশোক ॥ আমি তাকে বধ করব॥

খল্লাতক ॥ তবে শোন অশোক। এ তার মিথ্যা দম্ভ।

অশোক ॥ তাকে এখনি বন্দী করে এখানে আনয়ন করুন—

খল্লাতক ॥ না অশোক।

অশোক ॥ তবে তাকে বধ করা হোক্—

খল্লাতক ॥ (বিচলিত হইলেন। কি ভাবিলেন) না অশোক, তাও না।

অশোক ॥ না! কেন?

খল্লাতক ॥ কারণ জিজ্ঞাসা না করলেই আমি সুখী হব অশোক।

অশোক ॥ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! আমি উপগুপ্তকে এখনি এখানে চাই।

খল্লাতক ॥ তা হয় না অশোক

অশোক ॥ (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক ॥ তুমি জানো না অশোক, তোমার সৈন্যদল রণক্লান্ত। তাকে দর্শন করামাত্র তোমার ঐ ঘাতকও অভিভূত হবে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ গেয়ে উঠবে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

অশোক ॥ সেই উপগুপ্ত রয়েছে মহাবিহারে—যেখানে আমার দেবী!… মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! আপনি কি তবে চান না দেবী মহাবিহার ত্যাগ করে আমার কাছে আসে?

খল্লাতক ॥ উতলা হয়োনা অশোক! বীতশোক সংবাদ পাঠিয়েছে প্রথম-প্রহর মধ্যেই দেবী এখানে শুভাগমন করবেন। প্রথম-প্রহর উত্তীর্ণ হতে আর বিলম্ব নাই।

অশোক ॥ আসবে? আসবে? যদি সে না আসে দেব?

খল্লাতক ॥ কলিঙ্গের দুর্ভাগ্য! কলিঙ্গে প্রাণীমাত্রও জীবিত থাকবে না!

অশোক ॥ (শিহরিয়া উঠিয়া) না—না, তাতে লাভ?

খল্লাতক ॥ অশোক, এতদূর অগ্রসর হবার পর তুমি ওই প্রশ্ন করছ?

অশোক ॥ আপনি জানেন না—জানেন না দেব! ও প্রশ্ন আমার নয়।

খল্লাতক ॥ তবে কার?

অশোক ॥ ঐ প্রশ্ন করে একজন আমাকে অহোরাত্র জ্বালাতন করছে। আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি—কিন্তু—তবু—তবু তাকে আমি রোধ করতে পারি না। আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে সে গোপনে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়!

খল্লাতক ॥ তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়! গোপনে! কে? কখন্?

অশোক ॥ রাত্রে।

খল্লাতক ॥ এখনি আমি প্রহরীদের প্রাণদণ্ড দেব। চণ্ডগিরিক!

অশোক ॥ না—না দেব। ওদের অপরাধ কি? পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে তাকে রোধ করে! (বুদ্ধমূর্তি দেখাইয়া—) আমি ওর চরণদ্বয় ভগ্ন করেছি—তবু আমি ওর গতি—

খল্লাতক ॥ (বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াই দপ করিয়া জলিয়া উঠিলেন) এ কি!

[অশোকের অসি লইয়া মূর্তিকে আঘাত করিতে গেলেন]

অশোক ॥ (হাসিয়া) ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেও আসবে!

খল্লাতক ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) অশোক!

অশোক ॥ (অভিভূতের মত) দিবসে আমার তন্দ্রায়, রাত্রিতে আমার স্বপ্নে ঐ ভগ্নমূর্তি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শান্ত, সৌম্য ঐ মূর্তি মমতা-মধুর আননে, করুণা-সুন্দর চক্ষে সকাতরে যখন আমার প্রতি চেয়ে থাকে—তখন—তখন—

খল্লাতক। (অশোককে ঝাঁকি দিয়া) অশোক! অশোক! (অশোকের চৈতন্য হইলে) এ স্বপ্ন দেখে বিহ্বল হবার সময় নয় সম্রাট। তোমার চতুর্দিকে গুপ্ত শত্রু শাণিত ছুরিকা নিয়ে—লুক্কায়িত!

অশোক ॥ আপনি কি বলছেন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক?

খল্লাতক ॥ আমি এইমাত্র তাদের একদলকে ধৃত করেছি। তারা সঙ্কল্প করেছিল আজ রাত্রে তোমাকে গুপ্তহত্যা করবে!

অশোক ॥ সত্য? সত্য দেব?

খল্লাতক ॥ তুমি কি এ কথা বিশ্বাস করতে—

অশোক ॥ পারছি না দেব, এতই সুসংবাদ এই কথা! আঃ এতদিন পর আজ নিস্তেজ ধমনীতে রক্তের চাঞ্চল্য অনুভব করছি। রণোন্মাদনা আবার ফিরে পাচ্ছি।···হত্যা করতে হবে না, যুদ্ধ করতে পারব। আমি বেঁচে গেলাম দেব, বেঁচে গেলাম। অনুতাপ অনুশোচনার জ্বালা থেকে মুক্তি পেলাম। মেষের দল তবে এতদিনে মানুষ হল!

খল্লাতক ॥ তুমি ভুল করছ অশোক। গুপ্তহত্যার জন্য যারা অস্ত্রধারণ করেছে তারা কলিঙ্গবাসী নয়!

অশোক ॥ তবে?

খল্লাতক ॥ যদি কলিঙ্গবাসী নয়, তবে তারা কে, অনুমান করা কি এতই শক্ত অশোক?

অশোক ॥ আপনি বলেছেন কি দেব!

খল্লাতক ॥ আমি সত্যই বলেছি। কোন সত্য আমাকে এত বেশী লজ্জা দেয়নি—কোন সত্য আমাকে এত বেশী বিচলিত করেনি।

অশোক ॥ তারা কি এখন জীবিত?

খল্লাতক ॥ পশুর মত তারা নিহত হয়েছে। কিন্তু তবু অশোক—

অশোক ॥ বলুন দেব—

খল্লাতক ॥ আমার অনুরোধ, সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুমি আজ রাত্রে বিশেষ সাবধানে থাকবে। কে শত্রু, কে মিত্র আমি বুঝতে পারছি না। আমি

বুঝি না কেন ওদের মনে এই বিদ্রোহ-সঞ্চার হয়েছে। তুমি কাউকে কাছে আসতে দিয়ো না অশোক! সাবধান, খুব সাবধান! (প্রস্থানকালে) যবনী! খুব সাবধান! (প্রস্থান)

অশোক॥ যবনী, আলো জাল্—আলো জাল্। বড় অন্ধকার! আলো—আলো! (আলোর ব্যবস্থা করিতে যবনী বাহিরে গেল॥ কক্ষমধ্যে কাহার ছায়া পড়িল দেখিয়া অশোক চমকিয়া উঠিলেন; বোধহয় তাঁহার অজ্ঞাতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন) …কে? (অতি সন্তর্পণে বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক॥ আমি।

অশোক॥ (বজ্রমুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া) দাঁড়াও—দাঁড়াও তুমি ওখানে—(বীতশোক বিস্মিত হইয়া আরও কাছে আসিলেন) কে তুমি?

বীতশোক॥ ঐ প্রশ্ন কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?

অশোক॥ তুমি ভিন্ন ত এখানে আর কেউ নাই। কে তুমি?

বীতশোক॥ আমি বীতশোক।

অশোক॥ না বীতশোকের ছদ্মবেশে—?

বীতশোক॥ সে কি সম্রাট!

অশোক॥ ঘুমের ঘোরে উঠে এসেছ!…ছুরি কোথায়? ছুরি?

বীতশোক॥ (তীব্রকণ্ঠে) সম্রাট! সম্রাট!

অশোক॥ (বীতশোকের মুখপানে ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিয়া) ভুল! আমারই ভুল!…ছি—ছি—ছি! (কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন) …(হঠাৎ) বীতশোক, দেবী কই?

বীতশোক॥ মহাবিহারে। তাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম সম্রাট। সত্য সত্যই তিনি দেবী!

অশোক॥ দেবী! না পাষাণী?

বীতশোক॥ পাষাণী! না সম্রাট, না।

অশোক॥ সে পাষাণী, পাষাণী। পাষাণী না হলে সে এখনও এখানে এল না!

বীতশোক॥ তুমি প্রথম-প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

অশোক॥ অপেক্ষা আমি করব। শুধু প্রথম-প্রহর কেন, অপেক্ষা আমি আজীবন করব। অপেক্ষা যে আমাকে করতেই হবে! কিন্তু আজীবন অপেক্ষা করলেও কি তাকে পাব?

বীতশোক॥ প্রথম-প্রহর উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই তাঁর আসবার কথা আছে। কিন্তু প্রথম-প্রহর উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই যে আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক, আমি সেই আলোচনার অনুমতি প্রার্থনা করি, এখনই—!

অশোক ॥ কি আলোচনা বীতশোক ?

বীতশোক ॥ অতি গোপনে আজ আমি তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি। যবনী—(যবনীকে বাহিরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত)

যবনী ॥ (অশোকের প্রতি) প্রভু !

অশোক ॥ (যবনীকে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া) বীতশোক ! বীতশোক ! শাণিত ছুরিকা আমার বুকে বিদ্ধ করবার জন্য আমার চারিপাশে আমার স্বজন, পরিজন, বন্ধুবান্ধব লুক্কায়িত আছে। শত্রু, মিত্র আমি চিনি না বীতশোক !

বীতশোক ॥ তুমি আমাকেও অসঙ্কোচে বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃ করছ সম্রাট ! (অশোক যবনীকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। যবনী বাহিরে গেল)

বীতশোক ॥ (চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখার পর)···সম্রাট, আজ রাত্রিশেষেই পাটলিপুত্র যাত্রা করুন !

অশোক ॥ কেন ? কেন বীতশোক ?

বীতশোক ॥ আর মুহূর্তকালও এখানে থাকা আমাদের নিরাপদ নয়।

অশোক ॥ গুপ্তহত্যার ভয় করছ ?

বীতশোক ॥ না সম্রাট, আমি ভয় করছি ঐ উপগুপ্তকে, ঐ মহাবিহারে এখন যে মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ জীবিত আছে, ভয় করছি তাদের।

অশোক ॥ তুমি উপগুপ্তকে এখনো বধ করনি কেন ? কেন সেই মুষ্টিমেয় বৌদ্ধদের এখনও জীবিত রাখ ?

বীতশোক ॥ তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচেই বলছি, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি তা পারলাম না। এবং বিস্ময় বিস্মিত হয়ে অনুভব করলাম এ পৃথিবীতে অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নয়! আমি একরূপ পালিয়ে এসেছি সম্রাট।···সম্রাট আজ রাত্রে পাটলিপুত্র যাত্রা না করলে সমূহ বিপদ···!

অশোক ॥ বীতশোক—!

বীতশোক ॥ ওদের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে সম্রাট। তা দেখা যায় না, তা অদৃশ্য, কিন্তু ··কিন্তু দুর্নিবার তার গতি !

অশোক ॥ সে কি বীতশোক ?

বীতশোক ॥ শোন···(কানে কানে কহিলেন। অদূরে অগণিতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল ··"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ।")

বীতশোক ॥ ঐ আবার !

অশোক ॥ কে ওরা ?

বীতশোক ॥ ও ভাষা ত কলিঙ্গের নয় সম্রাট !···সম্রাট, তুমি আদেশ দাও, আমি ওদের দণ্ডবিধান করি—

অশোক ॥ (কি ভাবিলেন) দণ্ডবিধান! দণ্ডবিধান!...কিন্তু তৎপূর্বে ঐ দলের অন্ত একজনের দণ্ডবিধান করতে হয়। তার দণ্ডবিধান না করে ওদের দণ্ডবিধান করলে অন্যায় হবে বীতশোক, নিতান্ত অন্যায় হবে।

বীতশোক ॥ কে সে?

অশোক ॥ তার মনেও মাঝে মাঝে ঐ দুর্বলতা আসে। মাঝে মাঝে সেও মনে-প্রাণে গেয়ে ওঠে—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!" মাঝে মাঝে সম্রাট অশোকের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—নির্ভয়ে স্পষ্টকণ্ঠে প্রকাশ করে —"সম্রাট, তুমি মানুষ নও! তুমি পশু। তুমি নির্মম নৃশংস রাক্ষস।"

বীতশোক ॥ (জলিয়া উঠিয়া) কে সে সম্রাট? আমি এখনি তাকে— (অসিতে হাত দিলেন)

অশোক ॥ তুমি পারবে না বীতশোক, তুমি তাকে দণ্ড দিতে পারবে না। তুমি তাকে পূজা কর—ভক্তি কর—ভালবাস!

বীতশোক ॥ না। আমি জানতে চাই সে কে?

অশোক ॥ (অর্ধোচ্চারিত-স্বরে) আমি বীতশোক, আমি!

বীতশোক ॥ (পিছাইয়া গিয়া)—সম্রাট!

অশোক ॥ বীতশোক, কি দণ্ড তুমি আমাকে দেবে, দাও—

বীতশোক ॥ সম্রাট! সম্রাট! (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন)

অশোক ॥ (তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া) ভয় নাই—ভয় নাই বীতশোক! এ আমার মুহূর্তের দুর্বলতা। আমাকে আজ রাত্রিটুকু বাঁচিয়ে রাখ ভাই, আজ রাত্রিটুকু! তুমি বলছ আজ রাত্রে সে আসবে। আমার ভয় হচ্ছে বীতশোক ...লক্ষ অশরীরি আত্মা...(কি যেন দেখিলেন)

বীতশোক ॥ কি বলছেন সম্রাট!

অশোক ॥ লক্ষ অশরীরি আত্মা আমাকে বেষ্টন করে ঘুরছে!...বলছে "সে এলেও তুমি তাকে পাবে না।" কেন, জান?...কর্ম! আমার কর্ম! আমি ওদের হত্যা করেছি—প্রিয়জনের মাঝে আমি বিচ্ছেদ রচনা করেছি! আমার সেই কর্ম প্রিয়জন হতে আমাকে...না—না.. আমি বিশ্বাস করি না— বিশ্বাস করি না—

বীতশোক ॥ সম্রাট! সম্রাট!

অশোক ॥ দেবী কই? আর কতদূরে? বীতশোক, বিলম্ব আর আমি সইতে পারছি না! তুমি দয়া করে দেখ বীতশোক, প্রথম প্রহরের কি শেষ নাই?

বীতশোক ॥ আমি দেখছি—(চলিয়া গেলেন)

অশোক ॥ ···যবনী—যবনী! কারও কি পদশব্দ শুনতে পাচ্ছিস?

যবনী ॥ না প্রভু!

অশোক ॥ আমিও পাচ্ছি না, আমিও না। অথচ তবু ও বলে গেল সে আসবে। কখন আসবে? আমার ঘুম পাচ্ছে যবনী! (ভগ্ন বুদ্ধমূর্তির উপর দৃষ্টি পড়িতেই—) সে এলে আমি তাকে বিস্মিত করে দেব, দেখবি? (বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাংশগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া পূর্ণমূর্তি রচনান্তর) সে দেখেই চমকে উঠবে! অবাক বিস্ময়ে সে··কি অপরূপ রূপ যবনী! (মূর্তির প্রতি অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।) প্রাণহীন পাষাণ! তুমি কি সুন্দর! তুমি কি সুন্দর! (ক্ষণকাল মূর্তির দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ উচ্ছসিত কণ্ঠে) তোমায় আমি প্রণাম করছি বুদ্ধ! তোমায় আমি প্রণাম করছি!

[ক্ষণকাল প্রণতঃ ভাবে থাকিয়া হঠাৎ উঠিলেন। খেয়াল হইল তাঁহার এই দৌর্বল্য প্রকাশ সঙ্গত হয় নাই। লজ্জিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আশেপাশে চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন তাঁহার দৌর্বল্যের সাক্ষী একমাত্র যবনী]

(যবনীকে) আমি ওকে প্রণাম করিনি! করেছি? (যবনী কি বলিবে বুঝিল না) (দৃঢ়কণ্ঠে) না। তাকে বলবি ঐ মূর্তি এখানে আমি রেখেছি, শুধু সে চমকে উঠবে ব'লে। ঐ মূর্তি দেখে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে আমার পানে চাইবে।·সে আসছে! তার পায়ের ধ্বনি আমার বুকে তালে তালে বাজছে! গা যবনী সেই গান "তাঁর চরণের নূপুর-ধ্বনি বাজে আমার বুকের মাঝে" (শয্যায় শয়ন করিলেন)। (যবনী অশোককে ব্যজন করিতে করিতে গাহিল)

তার চরণের নূপুর ধ্বনি
বাজে আমার বুকের মাঝে।

বাজে নীরব নিশীথ রাতে,
বাজে মধুর সকাল-সাঁঝে।

বর্ষা-মেঘের মাদল সনে
বেজেছে তার চরণ ধ্বনি,

রৌদ্র-উজল দীপ্ত দিবায়
তার নূপুরের ধ্বনি গণি,

বজ্রসম আর্তনাদে,
সে ধ্বনি মোর বক্ষে বাজে

আজকে একা আঁধার সাঁঝে
জ্বালাই প্রদীপ বারে বারে,
তার সে চলা শেষ হবে কি
জীর্ণ এ মোর কুটীর দ্বারে।
আঁধার ঘরে জ্বালাই প্রদীপ
পায়ের ধ্বনি বক্ষে বাজে।

[যবনীর গান শুনিতে শুনিতে অশোক নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। যবনী তাহা বুঝিয়া একটিমাত্র ঘৃতদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া বাকী দীপগুলি নিভাইয়া দিয়া দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পর দেবীকে সঙ্গে লইয়া খল্লাতক দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খল্লাতক দেবীকে কক্ষমধ্যে রাখিয়া যবনীকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।...দেবী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বুদ্ধমূর্তি দেখিলেন। আনন্দে, বিস্ময়ে তাঁহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবী বুদ্ধমূর্তি প্রণাম করিলেন। তৎপর তিনি অশোকের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্লান দীপালোকে তাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্ত না হওয়ায় দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, দীপহস্তে অশোকের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে গেলেন। অপলক নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সম্রাটকে ডাকিলেন—

দেবী ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ (অশোক চমকিয়া চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন) —কে ? (অশোকের এই আকস্মিক চীৎকারে, ত্রস্তা দেবীর কম্পমান হাত হইতে প্রদীপটি সশব্দে ভূতলে পতিত হইয়া নিভিয়া গেল)

অশোক ॥ (অন্ধকার-কক্ষে দীপ-পতনের শব্দে এবং পার্শ্বে কেহ দাঁড়াইয়া আছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সাতঙ্কে দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—) গুপ্তহত্যা! গুপ্তহত্যা!

[সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ অসি তুলিয়া সম্মুখীন মূর্তির বক্ষে তাহা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ নারীকণ্ঠের নিদারুণ আর্তনাদ শোনা গেল]

অশোক ॥ যবনী! রক্ষী! আলো! আলো!

[যবনী আলো লইয়া ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বীতশোক, খল্লাতক, চণ্ডগিরিক প্রভৃতি ছুটিয়া আসিলেন। কক্ষ আলোকিত হইলে দেখা গেল রক্ত-বন্যার মাঝখানে ভূবলুণ্ঠিতা দেবী। অশোক তাঁহার বুকে অসি বিদ্ধ করিয়া বীভৎস মূর্তিতে দণ্ডায়মান]

অশোক ॥ বধ করেছি! বধ করেছি! [উপস্থিত সকলকে] কে? এ কে?

বীতশোক ॥ একি! দেবী!

অশোক ॥ দেবী?

বীতশোক ॥ দেবী।

[অশোকের অবর্ণনীয় শোক]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজপুরীতে মহাদেবী তিষ্যরক্ষিতার প্রাসাদ। রাত্রি। সমাজ-উৎসবে নিমন্ত্রিত রাজপুরুষগণ। নটীগণ তাহাদের চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য-গীত করিতেছে)

মনের-বনের ঋতুর কোকিল
ক্ষণিক অতিথ্ এই কুটীরে—
ক্ষণিক ভালো বাস্‌লে দু'দিন—
উড়্‌বে আবার মেঘের শিরে।
তোমার দেশের মলয়-অনিল,
মোদের প্রাণে জাগায় দোলা,
তোমার মনের হাতছানিতে—
করলো সবার প্রাণ উতলা।
মিলন-ক্ষণে বিদায় দিতে
ঝড় এলো যে মোদের চিতে
ছিন্ন তারে বৃথাই বাজাই—
মোদের মনের ছন্দটিরে।

ব্রহ্মদত্ত ॥ সম্রাটের বর্তমান মানসিক অবস্থায় মহাদেবীর এই উৎসব-আয়োজন আমার বিধেয় বলে মনে হচ্ছে না।

বীতশোক ॥ দেবীর শোচনীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে সৈনিক আমি, আমারও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু সেজন্য আমরা সমাজ-উৎসব করতে পারব না, এও ত হতে পারে না! কি বলেন মহাসচিব?

ব্রহ্মদত্ত ॥ সমাজ-উৎসব কোন নূতন উৎসব নয়। সমাজ-উৎসব পাটলিপুত্রের বহু পুরাতন কৌলিক উৎসব—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বার্ষিক উৎসব। এ উৎসব কোনমতেই বন্ধ হওয়া উচিত নয়, কিন্তু—

বীতশোক ॥ সম্রাটের বিরক্তি-ভাজন আমি হতে চাই না মহাসচিব। তিনি যে কি মানসিক অশান্তিতে আছেন আমি জানি। কিন্তু উৎসবও ত চাই! তাঁর মানসিক অশান্তি দূর করবার জন্য উৎসবের আরও অধিকতর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুনছি সমস্ত উৎসব নিষিদ্ধ হবে। তা নিতান্ত অন্যায় হবে— কি বলেন মহাসচিব?

ব্রহ্মদত্ত ॥ তা ত বটেই ! তা ত বটেই ! এই যে মহাদেবী ! মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ! যাক কতটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বীতশোক ॥ (নিমন্ত্রিত রাজপুরুষগণকে) আপনারা প্রাসাদে অপেক্ষা করুন—আমরা আসছি।

[ব্রহ্মদত্ত, বীতশোক ব্যতীত অন্য সকলে প্রাসাদাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অন্যদিক দিয়া খল্লাতক ও নর্ত্তকীসহ তিষ্যরক্ষিতা আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

খল্লাতক ॥ মন্ত্রণা কি এখানেই হবে ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ নিশ্চয় ! এর চেয়ে ভাল সুযোগ, ভাল স্থান আর কোথায় মিলবে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ?

বীতশোক ॥ এই প্রকাশ্য উৎসবে ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ, এই প্রকাশ্য উৎসবে, যেহেতু এখানে কেউ কোন সন্দেহ করবে না। কি বলেন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ?

খল্লাতক ॥ একথা খুবই সত্য মহাবলাধিকৃত। গুপ্তমন্ত্রণা গুপ্তস্থানে হলেই প্রকাশ পায়।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ উৎসবের সকল আয়োজনই প্রস্তুত। দ্বিধা কেন মহাবলাধিকৃত ? কিসের ভয় ? আমরা ত কোন অন্যায় করছি না ! আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। প্রতি বৎসর এই তিথিতে মহাসমারোহে সমাজ-উৎসব সম্পন্ন হয় নি ?

বীতশোক ॥ নিশ্চয়ই হয়েছে। সমাজ-উৎসব পাটলিপুত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব। সে একদিন ছিল......যেদিন এই তিথিতে—গত দুই বৎসর পূর্বেও—এই তিথিতে রূপ ও রসের বন্যায় এই প্রাসাদ ভেসে গেছে। সুবাসিত ফুলের গন্ধে, রূপসীদের কলহাস্যে মর্ত্তে অমরাবতীর সৃষ্টি হয়েছে। সুপক্ক মদিরায় আমরা সন্তরণ করেছি !

ব্রহ্মদত্ত ॥ কাব্যকলায় মহাসভা করেছি। বিরাট এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি স্বয়ং তার কর্তৃত্ব করেছি। রন্ধনশালায় নানাবিধ ব্যঞ্জন-রচনায় জন্য কত লক্ষ প্রাণী যে হত্যা করা হয়েছে তার ইয়ত্তাও ছিল না ! মৃগের মাংস···ময়ূরের মাংস···

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি মহাসচিব ?

ব্রহ্মদত্ত ॥ (উজ্জ্বল চোখে) হ্যাঁ ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিছুমাত্র না। ভয় কি ? সাহস চাই। নির্ভয়ে বলা চাই আমরা আমাদের এই কৌলিক সমাজ-উৎসব ক-র্-বো। কোন বাধা আমরা মা-ন-বো না। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) কই ? আর বিলম্ব কেন ?

[আলোর বন্যার মত উৎসব-মত্তা নটীগণের প্রবেশ—ও নৃত্য-গীতারম্ভ]

আজকে মনের গোপন কথা
পারিজাতের পরাগ মত—
পড়ুক বুকে, পড়ুক মুখে
পড়ুক ঝরে অবিরত।

[হঠাৎ অদূরে ধর্ম-ভেরী বাজিয়া উঠিল। নিমেষে সমস্ত উৎসব যন্ত্রচালিতবৎ বন্ধ হইয়া গেল। যে যেখানে সে সেখানে সেইভাবে স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া ভেরীবাদ্য শ্রবণ করিতে লাগিল। ধর্মঘোষের প্রবেশ]

ধর্মঘোষ ॥ (ঘোষণা করিল) দেবী, সম্রাটের আদেশে আজ থেকে সমাজ-উৎসব নিষিদ্ধ। (ধর্মঘোষ প্রস্থান করিল। উপস্থিত সকলে প্রমটায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল।)

খল্লাতক। আজিকার এই সমাজ-উৎসব তবে নিষিদ্ধ হ'ল ?

ব্রহ্মদত্ত ॥ আমি রন্ধনশালার কথাটাই ভাবছি।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আপনাদের কিছুই ভাবতে হবে না। উৎসবের দায়িত্ব আমার। উৎসব হ-বে।

বীতশোক ॥ কিন্তু—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিন্তু নয়, উৎসব হবে। এবং এই উৎসবে আমি সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছি। আপনারা স্বচ্ছন্দমনে উৎসবে যোগদানই করুন।

[পূর্ববৎ উৎসব সুরু হইল। নটীগণের নৃত্য-গীত। তিষ্যরক্ষিতা এক পত্র লিখিয়া সেই পত্র সম্রাট-সকাশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কি কাজে উঠিয়া গেলেন]

আজকে মনের গোপন কথা
পারিজাতের পরাগ মত—
পড়ুক বুকে, পড়ুক মুখে
পড়ুক ঝরে অবিরত।
ভবন-শিখীর পুচ্ছে আজি
সাজবো সবাই রূপের রানী,
নিশীথ-রাতে জাগবে রে চাঁদ,
চলবে মোদের কানাকানি!
সুরার সাথে সুর মিলায়ে—
ভুলবো মোরা প্রাণ বিলায়ে,
আজ সখি সব সঙ্গোপনে—
মুখ ফুটে তা কইব কত।

বীতশোক ॥ এ কিন্তু সম্রাটের নিতান্ত অন্যায়। এখন আর আমার ভয় হচ্ছে না—ক্রোধ হচ্ছে!

খল্লাতক ॥ এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মহাবলাধিকৃত, যে যুদ্ধে জয়লাভ করে মানুষের মনে কি করে দুঃখ হয়! পরাজয়ের পর এমনিধারা বৈরাগ্য স্বাভাবিক। কিন্তু চরম জয়লাভ করার পর—

বীতশোক ॥ আমি বুঝতে পেরেছি মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! সম্রাটের মস্তিষ্ক-বিকার হয়েছে, চিকিৎসার আবশ্যক। রাজকার্য ওঁকে দিয়ে আর কিছুতেই চলবে না।

খল্লাতক ॥ বীতশোক! বীতশোক! কত আশা করে—কত কামনা বুকে নিয়ে আমি সম্পদে-বিপদে ওর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছি! মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে ওর পক্ষ সমর্থন করেছি। নিজের জীবন বিপন্ন করে ওর সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করেছি। সে কি এরই জন্য? আমার কল্পনাকে মূর্তিমতী করতে পারে যে মহামানব, ওকে আমি সেই মহামানব ভেবেছিলাম। ও যদি সে মহামানব নয়, ও আমার কেউ নয়—কেউ নয় বীতশোক!

বীতশোক ॥ না—না মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! সম্রাটকে আপনি বাল্যাবধি রক্ষা করে এসেছেন। এখন আপনিই তাঁকে রক্ষা করুন। আমার বুদ্ধি নাই কিন্তু এই অসি আছে—

[হঠাৎ অদূরে ঘনঘন শঙ্খনাদ ও ভেরীবাদ্য। উন্মত্তার মত তিষ্যরক্ষিতা ছুটিয়া আসিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সে এসেছে! সে এসেছে!

[ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বাহিরে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিলেন]

খল্লাতক ॥ কে এসেছে দেবী?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (এই প্রশ্নে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন খল্লাতক ও বীতশোক। লজ্জা ও সঙ্কোচে…কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া) কি জানি কে! আমি জানি না।

[বাহিরে পুনরায় শঙ্খনাদ ও ভেরীবাদ্য। তিষ্যরক্ষিতা পুনরায় বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। গবাক্ষে ছুটিয়া গিয়া পুনরায় বাহিরে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত]

বীতশোক ॥ কে এল? কে?

[তিষ্যরক্ষিতা পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন। বীতশোক গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পথরোধ করিলেন]

খল্লাতক ॥ আমি দেখছি—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) না।

খল্লাতক ॥ সম্রাট বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তকে পাটলিপুত্রে নিমন্ত্রণ করেছেন। হয় ত তিনিই এলেন।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ না—না—তিনি নন!

খল্লাতক ॥ আমি দেখে আসছি— (গমনোদ্যত হইলেন)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ না। আপনি যাবেন না।

বীতশোক ॥ (ইতিমধ্যে তিনি গবাক্ষে গিয়া দাঁড়াইলেন—বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন) তক্ষশিলার রথ বলে মনে হচ্ছে!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া চরম আগ্রহে) কই? কোথায়? (গবাক্ষের দিকে ছুটিলেন)

খল্লাতক। তবে কি কুনাল? কিন্তু, তার ত তক্ষশিলার কাজ এখনও শেষ হয়নি—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (খল্লাতকের দিকে ফিরিয়া) না—না—সে কেন আসবে? (কাহার পদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। চরম ব্যাকুলতায় একরূপ চিৎকার করিয়াই উঠিলেন) কে? [কাঞ্চনমালার প্রবেশ]

খল্লাতক ॥ একি! কাঞ্চন তুমি!

কাঞ্চন ॥ আমি এইমাত্র এলাম। বলুন ত আমার সঙ্গে কে এসেছেন?

খল্লাতক ॥ কে কাঞ্চন?

[তিষ্যরক্ষিতা উদ্‌ভ্রান্তার মত একবার কাঞ্চনের দিকে আর একবার দ্বারপথে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন]

কাঞ্চন ॥ শুনলে আশ্চর্য হবেন।

বীতশোক ॥ কে? কুনাল?

কাঞ্চন ॥ (হাসিয়া) না।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ না!

বীতশোক ॥ তবে—?

কাঞ্চন ॥ ভগবান উপগুপ্ত। কলিঙ্গ থেকে তিনি তক্ষশিলায় যান। সেখানে একটা বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন করে আমরা এখানে এলাম। আপনারা এখনও এখানে! সম্রাট যে—

বীতশোক ॥ এই যে আমরা যাচ্ছি। আসুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক।

[উভয়ে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন]

কাঞ্চন ॥ (ধীরে ধীরে তিষ্যরক্ষিতার সম্মুখে গিয়া) আপনি কুমারকে পত্র লিখেছেন তিষ্যাদেবী?

[তিষ্যরক্ষিতার চোখ দুটি জ্বলিতেছিল। কোন উত্তর দিলেন না]

কাঞ্চন ॥ আপনি তাঁকে এখানে আসতে লিখেছিলেন? তাঁর জন্যই আজ আপনি মহাসমারোহে সমাজ-উৎসবের আয়োজন করেছেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (আর তাহার লজ্জা-সঙ্কোচ নাই— দৃপ্তকণ্ঠে) হাঁ, করেছি।

কাঞ্চন ॥ কিন্তু তিনি আসবেন না।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কেন আসবেন না?

কাঞ্চন ॥ এখনও তাঁর আসবার সময় হয়নি।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এ কি তাঁর কথা—না—তোমার?

কাঞ্চন ॥ তাঁরই কথা তিষ্যাদেবী। আমি তাঁকে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি এলেন না। তিনি আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমি চাই না।

কাঞ্চন ॥ পড়বেনও না! এ পত্রে খুব সুন্দর একটি গল্প আছে। আমায় বলেছেন ঐ গল্প নিয়ে আপনি যেন একটা নাটক লেখেন। খুব সুন্দর গল্প। মথুরায় পরমা রূপসী এক নটী ছিল, নাম ছিল তার বাসবদত্তা।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (কাঞ্চনের হাত হইতে পত্র কাড়িয়া লইয়া) তুমি থাম—আমি পড়ছি।

[রুদ্ধনিশ্বাসে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বীতশোক ফিরিয়া আসিলেন]

কাঞ্চন ॥ (বীতশোককে) ফিরে এলেন যে!

বীতশোক ॥ আমরা স্থির করলাম আমরা কেউ যাব না—এখানে উৎসবই করব।

কাঞ্চন ॥ আপনাদের আবার অভিনয় করতে হবে। কুমার গল্প পাঠিয়েছেন—সেই গল্প নিয়ে তিষ্যাদেবী নূতন নাটক লিখবেন।

বীতশোক ॥ বটে—বটে! তাহলে দিমেকাসকে··না—না, দিমেকাস নয়। দিমেকাস বড়ই বিপদ সংঘটন করে থাকে। এ নাটকের প্রযোজনা করব আমি। বল—বল কাঞ্চন, কুনাল কি গল্প পাঠিয়েছে বল—দিমেকাসের পূর্বে, সর্বাগ্রে আমি শুনতে চাই—

কাঞ্চন ॥ তিষ্যাদেবী—!

[তিষ্যরক্ষিতা তৎক্ষণাৎ পত্রখানি সরোষে মুষ্টিমধ্যে সম্পূর্ণ পুরিয়া ফেলিয়া, কাঞ্চনের প্রতি অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া···সক্রোধে চলিয়া গেলেন]

বীতশোক ॥ (তিষ্যরক্ষিতার ঐ ভাব দেখিয়া কাঞ্চনকে) এ কি! নূতন নাটক অভিনয় আরম্ভ হল না কি? তুমি বল—বল কাঞ্চন—অভিনয় করবার জন্য আমার মন ছটফট করছে!

কাঞ্চন ॥ (পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া) খুব সুন্দর গল্প! শুনলে অভিনয় না করে থাকতে পারবেন না। মথুরা নগরীতে পরমাসুন্দরী এক নটী ছিল, নাম ছিল তার বাসবদত্তা।

বীতশোক ॥ তিষ্যাদেবী—এ ভূমিকা তিষ্যাদেবীর।

কাঞ্চন ॥ বাসবদত্তার মত রূপ কেউ কখনও দেখে নাই। দেশশুদ্ধ লোক তার দৃষ্টিপ্রসাদ পাবার জন্য পাগল হয়ে ফিরত! কিন্তু সে কাকে ভালবাসত কেউ তা জানত না।

বীতশোক ॥ নটী কাউকে কখনো ভালবাসে না—ভালবাসতেও জানে না।

কাঞ্চন ॥ আগে শুনুন সবটা। সেদিন ছিল অমাবস্যা। সেই অমাবস্যার অন্ধকারে বাসবদত্তা অভিসারে বের হয়েছে। হঠাৎ কার অঙ্গে তার চরণ ঠেকল।

বীতশোক ॥ হয়ত কোন এক মাতাল! এটা আমি পারব কাঞ্চন।

কাঞ্চন ॥ না—না, শুনুন। বাসবদত্তার হাতে ছিল প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে চেয়ে দেখল যার অঙ্গে তার চরণ ঠেকল সে পরমসুন্দর এক তরুণ তাপস!

বীতশোক ॥ তবে কুনাল।

কাঞ্চন ॥ বাসবদত্তার চরণ-স্পর্শে তাপস ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলেন। রূপ দেখে জীবনে সেই প্রথম বাসবদত্তা চমকে উঠল। তার সঙ্গে তার আবাসে যাবার জন্য বাসবদত্তা তাকে সকাতরে নিমন্ত্রণ করল।

বীতশোক ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—তারপর?

কাঞ্চন ॥ কিন্তু তরুণ তাপস তাকে বললেন, "এখনও আমার সময় হয়নি। যে দিন সময় হবে সেদিন আমি বিনা নিমন্ত্রণেই তোমার কুঞ্জে যাব।"

বীতশোক ॥ অন্তরালে দাঁড়িয়ে থেকে শুনলাম তিষ্যাদেবী কুনালকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কুনাল বলে পাঠিয়েছে, "এখনও আমার সময় হয়নি।" অভিনয় তবে কি আরম্ভ হয়ে গেছে কাঞ্চন?

কাঞ্চন ॥ না—না, আমি গল্পই বলছি। বলুন ত সেই তরুণ তাপস কে?

বীতশোক ॥ কে কাঞ্চন?

কাঞ্চন ॥ ভগবান উপগুপ্ত।

বীতশোক ॥ অশীতিপর বৃদ্ধ, তরুণ তাপস? বরং বল কুনাল।

কাঞ্চন ॥ এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু তিনি ত একদিন তরুণ ছিলেন!

বীতশোক। এ কাহিনী কি সত্য?

কাঞ্চন ॥ সত্য। তারপর শুনুন। কিছুদিন পর দেশে এল নিদারুণ মহামারী। সেই দুরন্ত ব্যাধি রূপসী-শ্রেষ্ঠ বাসবদত্তাকে আক্রমণ করল।

বীতশোক ॥ তিষ্যাদেবী সম্মত হলে হয়! আচ্ছা, তারপর?

কাঞ্চন ॥ পুরবাসীরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তাকে নগর-প্রাচীরের বাইরে পরিত্যাগ করে চলে এল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা-রজনী। মাথার ওপর দিয়ে পাপিয়া গান গেয়ে উড়ে গেল। মুমূর্ষু বাসবদত্তা হঠাৎ অনুভব করল সে সেই জনহীন প্রান্তরে একা নয়। কে যেন এসেছে! কে যেন তাকে কোলে টেনে নিল। তার রোগ-ক্লিষ্ট-দেহে চন্দন-প্রলেপ দিয়ে বলল, "এইবার আমার সময় হয়েছে বাসবদত্তা! আমি এসেছি।" বাসবদত্তা চেয়ে দেখল তার আজিকার

সেই অনাহুত অতিথি আর কেউ নয়, সে রাত্রির সেই তরুণ তাপস। [কাঞ্চনের কথামধ্যে তিষ্যরক্ষিতা পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

বীতশোক ॥ কুনাল, না—না, উপগুপ্ত।

কাঞ্চন। উপগুপ্ত! ভগবান উপগুপ্ত!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (সক্রোধে) মহাবলাধিকৃত!

বীতশোক ॥ আমার ভুল হয়েছিল মহাদেবী! কুনাল নয়, উপগুপ্ত।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (জ্বালাময় দৃষ্টিতে) কাঞ্চন !…নাটকই যদি লিখতে হয় কাঞ্চন, আমি সে নাটকের পরিসমাপ্তি করব অন্য রকমে!

কাঞ্চন ॥ কি রকম ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কি রকম? যে পদ্ম-আঁখির এত দর্প…সেই পদ্ম আঁখি আমি—(শিহরিয়া উঠিলেন)

কাঞ্চন ॥ বলুন—বলুন—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ বলবার সময় এখনও হয়নি! (ত্বরিৎপদে প্রস্থান)

বীতশোক ॥ আমি বরাবর দেখেছি কাঞ্চন, তিষ্যাদেবীর মত অভিনয় কেউ করতে পারে না, কেউ না। দেখলে কেমন চলে গেল। চমৎকার!

কাঞ্চন ॥ (সাতঙ্কে) একি! আমার বুক কাঁপছে কেন? (বিষম চঞ্চল হইয়া পড়িয়া) না—না, এ কি হল! তিষ্যাদেবী—তিষ্যাদেবী—

[তিষ্যরক্ষিতার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া প্রস্থান]

বীতশোক। এও ত মন্দ করল না। চমৎকার! (খল্লাতক প্রভৃতি রাজপুরুষগণের প্রবেশ) দেখুন, উপগুপ্ত হঠাৎ পাটলিপুত্রে কেন এলেন! সম্রাট কি…শুনুন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, আমাদের আর নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ।

খল্লাতক ॥ যা শুনে এলাম, তাতে আমারও ত তাই মনে হচ্ছে। কলিঙ্গ জয়ের পর সম্রাট এতদিন বৌদ্ধধর্মে অনুরাগীই ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু আগামীকাল তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবেন।

বীতশোক ॥ বলেন কি!

খল্লাতক ॥ হাঁ, উপগুপ্তই তাঁকে দীক্ষা দেবেন।

বীতশোক ॥ অসম্ভব। আমার বোধ হয় আপনার সংবাদ সত্য নয় মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক ॥ দীক্ষার আয়োজন করবার জন্য সম্রাট আমাকে স্বয়ং আদেশ দিয়েছেন বীতশোক! এবং এই মুহূর্তে তিনি উপগুপ্তের সম্মুখে ঘোষণা

করেছেন—আজ হতে অহিংসা তাঁর ধর্ম, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, তাঁর মন্ত্র, তাঁর অসি চিরদিনের তরে কোষবদ্ধ হল।

বীতশোক ॥ আমি বিদ্রোহ করলাম মহাসন্ধিবিগ্রাহিক। তিনি তাঁর অসি কোষবদ্ধ করুন। আমি আমার অসি কোষমুক্ত করলাম।

খল্লাতক ॥ সাধু! সাধু! রাজ্য বিস্তার তোমার কর্ম। যুদ্ধই তোমার ধর্ম। তুমি সৈনিক। ভীরুতা,··কাপুরুষতা তোমার ভ্রাতাকে আচ্ছন্ন করেছে। তুমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে সিংহাসনে উপবেশন কর। মগধের রাজমুকুটে তোমার শির অলঙ্কৃত হোক।

জনৈক রাজপুরুষ ॥ আমরা সকলেই আপনার সঙ্গে যোগদান করব মহাবলাধিকৃত!

অন্যান্য রাজপুরুষগণ ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বীতশোক ॥ উত্তম, তবে তাই হোক। বংশ-গরিমা রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। হ্যাঁ, আমি আমার কর্তব্য স্থির করেছি। আমার পথ অন্ধকার নয়। এই অসির দীপ্তিই আমার পথ আলোকিত করবে। আসুন, কে আমায় অনুসরণ করবেন, আসুন!

[সদলবলে প্রস্থানোদ্যত,—সদলবলে তিষ্যরক্ষিতা আসিয়া বীতশোকের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এ কি! আপনারা সব কোথায় যাচ্ছেন? আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে! আমি কি দোষ করলাম?

বীতশোক ॥ আজ থেকে আমরা বিদ্রোহ করলাম।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে আমার এই যে উৎসব—তার নাম কি বিদ্রোহ নয়? সে বিদ্রোহ সর্বাগ্রে করেছে কে?

বীতশোক ॥ তুমি দেবী!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এই অপমানই বুঝি তার পুরস্কার?

খল্লাতক ॥ এ তিরস্কারের অধিকতর সত্যই তোমার আছে দেবী।

বীতশোক ॥ সত্যই আমার অন্যায় হয়েছে দেবী! আমাকে মার্জনা কর।··(সকলের প্রতি) সমাজ-উৎসবের শেষ অধ্যায় পানোৎসব। বন্ধুগণ! আমাদের বহুকালের কৌলিক-উৎসব আজ নিষিদ্ধ হয়েছে। পানোৎসবে যোগদান করে, আসুন, আমরা সম্রাটের এই অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ জানাই!

[বীতশোক ও তিষ্যরক্ষিতা সকলকে মদ্য-পরিবেশন করিলেন। অবশেষে, উভয়ে পাত্র বিনিময় করিয়া···সকলে যুগপৎ মদ্যপান করিলেন। তিষ্যরক্ষিতার নেতৃত্বে গান আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিতগণ মহা-উৎসাহে নৃত্য-গীতে মত্ত হইলেন। বীতশোকও তাহাতে সোৎসাহে যোগদান করিলেন]

তিষ্যরক্ষিতা : ভাঙ্‌বো এবার লোহার বাঁধন
নর্তকীগণ : মুক্ত-পাখি—সাজ্‌বে না তোর
ঘরের কোণে ধর্ম-কাঁদন !
তিষ্যরক্ষিতা : ঢাল্‌না সুরা পাত্র পুরে—
বাজুক বাঁশী রাত্র জুড়ে :
নর্তকীগণ : অসীম সুনীল আকাশ তলে
চলুক মোদের রূপের মাতন।
তিষ্যরক্ষিতা : উৎসবে আজ জ্বাল্ না আলো—
সেই তাড়াবে নিষেধ-কালো !
নর্তকীগণ : ধর্ম-ভীরু নইকো মোরা
সে যে মোদের মর্ম-যাতন !

বীতশোক ॥ আমাদের বিদ্রোহের জয়যাত্রা এখান থেকেই সুরু হোক !

[উন্মুক্ত উদ্যত অসি-হস্তে:বীতশোক সহ উপস্থিত রাজপুরুষগণ বিদ্রোহার্থে অগ্রসর হইতেই…অশোক ও তৎপশ্চাতে যবনীর প্রবেশ]

অশোক ॥ বিদ্রোহের আবশ্যকতা নাই। (অশোকের এই আকস্মিক উপস্থিতিতে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। আশোকের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাঁহারা অপরাধীর মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। অশোক ধীরে ধীরে বীতশোকের সম্মুখে গিয়া] সিংহাসনে উপবেশন কর। রাজ্যশাসন কর।

বীতশোক ॥ তুমি ?

অশোক ॥ সাতদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করছি। আগামীকাল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে সাতদিন গুরু-সকাশে ধর্মপদ অধ্যয়ন করব।

বীতশোক ॥ না—। ঐ মিথ্যাধর্ম তুমি গ্রহণ করতে পারবে না। যে ধর্মের মতে যৌবন মিথ্যা, জরাই সত্য,…জীবন মিথ্যা, মৃত্যুই সত্য, সে ধর্ম—ধর্ম নয়, মিথ্যা মোহ।

অশোক ॥ জরা সত্য নয় ? মৃত্যু সত্য নয় ? উত্তম। রাজত্ব করবে মাত্র সাতদিন। অষ্টম দিবসে—

বীতশোক ॥ অষ্টম দিবসে— ?

আশোক ॥ প্রা-ণ-দ-ণ্ড !

বীতশোক ॥ কি অপরাধে ?

অশোক ॥ তোমার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার অপরাধে !

বীতশোক ॥ আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নি।

অশোক ॥ তিষ্যরক্ষিতা— !

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ, বিদ্রোহ করেছ। আমি তার সাক্ষী।

বীতশোক ॥ (তিষ্যরক্ষিতার এই আচরণে যেরূপ বিস্মিত হইলেন, জীবনে কখনও অত বিস্মিত হন নাই। তাহার সম্মুখে গিয়া, চোখে চোখে চাহিয়া) আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি। (অশোকের উদ্দেশে) আমি তোমার সন্ন্যাস ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি!

অশোক ॥ হ্যাঁ, আমি, সন্ন্যাসী, কিন্তু আমি সম্রাটও! অহিংসা আমার পরম ধর্ম, কিন্তু রাজধর্মও আমার অক্ষুণ্ণ আছে। দুষ্কৃতের দমন এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজন হলে রক্তপাত করতেও আমি কুণ্ঠিত হব না!

খল্লাতক ॥ কুণ্ঠিত হবে না?

অশোক ॥ না।

খল্লাতক ॥ কিন্তু আমি বুঝেছিলাম অন্যরূপ। যাক্। আমিও তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম সম্রাট! আমিও দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত!

অশোক ॥ সাতদিন পর আমি আপনার বিচার করব মহাসন্ধিবিগ্রাহিক! কিন্তু তাই বলে এই সাতদিন আপনার বিশ্রাম নাই। এই সাতদিনের মধ্যে আপনি মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সর্বত্র আমার অনুশাসনগুলি প্রেরণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। যবনী, মস্যাধার—লেখনী—(যবনী উহা আনিতে গেল) রাত্রি গভীর!

[সম্রাটকে অভিবাদনান্তে অন্য সকলের প্রস্থান। যবনী মস্যাধার-লেখনী প্রভৃতি পত্রোপকরণ আনিয়া সম্রাটের সম্মুখে ধরিল। সম্রাট সুখাসনে বসিয়া পত্র-রচনা আরম্ভ করিলেন। তিষ্যরক্ষিতা ব্যজনী লইয়া সম্রাটকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন]

অশোক ॥ (পত্র রচনা করিতে করিতে তিষ্যরক্ষিতার উদ্দেশে) দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার অপরাধ?

অশোক ॥ আমার নিষেধ অবগত হয়েও তুমি আজ এখানে উৎসব করেছ।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তার ফলেই বিদ্রোহের বিষয় অবগত হতে পেরেছি! যথাসময়ে যথাস্থানে সে সংবাদ দিয়ে সম্রাটকে সাবধান করতে পেরেছি।

অশোক ॥ ও কথায় আমি ভুলব না। তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ করেছি।

অশোক ॥ কেন?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমার অধিকার আছে।

অশোক ॥ অধিকার! কি অধিকার?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ বলছি, তোমার পত্র লেখা আগে শেষ হোক্—

অশোক ॥ (পত্র লেখা শেষ হইলে নিজ অঙ্গুরীয়ক দ্বারা পত্র মোহরাঙ্কিত

করিয়া রাখিয়া যবনীর প্রতি) যবনী, তক্ষশিলার পারাবত—(যবনী পারাবত আনিতে গেল) কাঞ্চন আজ এখানে এসেছে।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ জানি।

অশোক ॥ কিন্তু কুনাল আসে নি। তার আঁখিপদ্ম দুটি কতদিন দেখিনি। তাই তাকে এখানে প্রেরণ করবার জন্য তক্ষশিলার রাতুককে পত্র দিচ্ছি। কুনাল আসেনি কেন জান ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (ইতস্ততঃ করিয়া) আমি জানি না।

অশোক ॥ কাঞ্চন বলল সে বলেছে, "এখনও সময় হয় নি।" কেন যে হয়নি বুঝলাম না। ভগবান উপগুপ্ত বললেন "ও বোধিসত্ব।" শুনে অবধি ওকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ নিতান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে, কি জানি কেন তাকে এখানে আনতে আমার আতঙ্কও হচ্ছে। আমি যাকে চাই, তাকে পাই না, যাকে চাইনা…তাকে (হঠাৎ) আমার আদেশ অমান্য করে তুমি উৎসব করেছ। কেন ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমাকে চাওনা বলেই কি হঠাৎ ঐ প্রশ্ন ?

অশোক ॥ উত্তর দাও—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ মনে করে দেখ সম্রাট, তুমি যাকে চেয়েছিলে, আমি বলেছিলাম তুমি তাকে পাবে না। তুমিই বলেছিলে আমার কথা যদি সত্য হয়, আমারি হবে জয়, এবং আমি যথেচ্ছা জয়োৎসব করতে পারব। তুমি ত দেবীকে আনতে পার নি! এ আমার সেই জয়োৎসব!

অশোক ॥ কোন নারী যে এত নির্মম হতে পারে, আমার জানা ছিল না! হাঁ, দেবীকে আমি আনতে পারিনি। শুধু আনতে পারিনি নয়, আমি তাকে স্বহস্তে …(আর বলতে পারিলেন না। ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া) আঘাত করতে তুমি আমায় কিছুমাত্র ত্রুটি করলে না তিষ্যরক্ষিতা! কিন্তু ভগবান বুদ্ধের কৃপায় আজ আমার আঘাত সইবার ক্ষমতা এত বেশী যে তুমি তা ধারণাও করতে পার না!

[তিষ্যরক্ষিতার প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলেন।…তাহার চোখে-মুখে জয়ের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু অশোকের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশোক-লিখিত পরিত্যক্ত পত্রখানি ছুটিয়া গিয়া তুলিয়া লইলেন—এক নিঃশ্বাসে উহা পাঠ করিয়া চারিদিকে একবার দেখিয়া লইয়া ঐ পত্রে কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিয়া বাহিরে কাহার পদশব্দে অপরাধিনীর মত চমকিয়া উঠিয়াই পত্রখানি লুকাইয়া ফেলিলেন।]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ …কে ? (পারাবত হস্তে যবনীর প্রবেশ)

যবনী ॥ (অভিবাদনান্তে) তক্ষশিলার পারাবত—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ দাঁড়াও—! (আলুথালুবেশে কাঞ্চনমালার প্রবেশ) তুমি! (চীৎকার করিয়া উঠিলেন!) এখানে কেন ?

কাঞ্চন ॥ (চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে) জানিনা কেন!

কে যেন আমায় এখানে টেনে আনল। কেন যেন আমার শুধুই মনে হচ্ছে তুমি—তুমি—তুমি—

[তিষ্যরক্ষিতা নির্মম নিয়তির মত দক্ষিণ হস্ত যবনীর দিকে প্রসারিত করিলেন। যবনী তাহার হস্তস্থিত পত্র লইবার জন্য করপুট বিস্তার করিল। পত্র যবনীর করপুটে পতিত হইল]

কাঞ্চন ॥ (উহা দেখিয়াই চমকিয়া শিহরিয়া…উঠিলেন, সাতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)—ও কি ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ সম্রাটের পত্র।

কাঞ্চন ॥ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমার চোখের আলো নিভে যাচ্ছে! চারিদিকে আমি অন্ধকার দেখছি!…তিষ্যদেবী! আমার চোখ গেল—চোখ গেল! (তিষ্যরক্ষিতার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ হাঁ, গেল… (অঙ্গুলি সঙ্কেতের ইঙ্গিত মাত্র যবনী বাতায়ন-পথে তক্ষশিলার পারাবত আকাশে ছাড়িয়া দিল।—তিষ্যরক্ষিতার চোখে-মুখে সয়তানি হাসি ফুটিয়া উঠিল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ। মিত্রা গান গাহিতেছিল। অশোক তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। অশোকের পরিধানে ভিক্ষুর বেশ। মিত্রার পরিধানেও গৈরিক বসন]

থেমেছে ঝড়-বাদল!
ব্যথাতুর প্রাণে ছড়াবো আজিকে স্নিগ্ধ শান্তি জল।
তোমার পরাণে নেভে যাক্ আজ প্রখর সূর্যালোক,
হৃদয়-গগনে চাঁদের অ,মিয় আরো মধুময় হোক।
ঝড় থেমে গেছে, সরোবর-বুকে শশী করে টলমল।
রক্ত-সায়রে উঠুক ফুটিয়া ব্যথায় লাল-কমল।

[গীত মধ্যেই রাজমুকুট হস্তে বীতশোকের প্রবেশ। বীতশোককে দেখিলে চেনা যায় না। সাতদিনে মৃত্যুভয়ে তিনি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার চোখে-মুখে বৈরাগ্যজাত শান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। মিত্রার গান শেষ হইলে বীতশোক ধীরে ধীরে অশোকের সম্মুখে নতজানু হইয়া রাজমুকুট প্রত্যার্পনার্থে হস্তে প্রসারণ করিলেন]

বীতশোক ॥ আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত—

[অশোক রাজমুকুট লইয়া মিত্রার হাতে দিয়া বীতশোকের মুখপানে চাহিলেন]

মৃত্যুকে আর আমি ভয় করি না। আমাকে দণ্ড দাও।

অশোক ॥ (কি ভাবিলেন—ধীরে ধীরে গিয়া ত্রিপিটক আনিয়া বীতশোকের প্রসারিত করে রক্ষা করিলেন)...দণ্ড দিলাম। (বীতশোক পরমানন্দে সশ্রদ্ধচিত্তে ত্রিপিটক মাথায় ঠেকাইলেন) বীতশোক! ভাই!

[অশোক বীতশোককে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। রাধাগুপ্তের প্রবেশ]

রাধাগুপ্ত ॥ সম্রাট!

অশোক ॥ কি মহামাত্য?

রাধাগুপ্ত ॥ পাটলিপুত্রের মহাবিহারের বুদ্ধমূর্তি—

অশোক ॥ বলুন (রাধাগুপ্ত ইতঃস্তত করিতে লাগিল) বলুন, বলুন মহামাত্য! মহাবিহারের বুদ্ধমূর্তি?

রাধাগুপ্ত ॥ এক ব্রাহ্মণ রাত্রিযোগে ধ্বংস করেছে।

অশোক ॥ ধ্বংস করেছে! বুদ্ধমূর্তি—?

রাধাগুপ্ত ॥ হ্যাঁ সম্রাট, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম...মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ!

অশোক ॥ ব্রাহ্মণ সে মূর্তি ধ্বংস করেছে। ব্রাহ্মণ! (রাধাগুপ্ত অশোকের উগ্রমূর্তি দেখিয়া মস্তক অবনত করিলেন) কোথায় সেই ব্রাহ্মণ?

রাধাগুপ্ত ॥ পলায়ন করেছে সম্রাট!

অশোক ॥ আমার শ্রীবুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ! ব্রাহ্মণ! অথচ ব্রাহ্মণকে আমি সম্মান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণের মস্তক চাই —আজ রাত্রেই।—অন্যথায়, কাল প্রাতেই সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রত্যেকের মস্তক চাই। এই মুহূর্তে নগরে ঘোষণা করুন মহামাত্য, যে সেই ব্রাহ্মণের ছিন্ন শির আমাকে উপহার দেবে, আমি তাকে সহস্র স্বর্ণ পুরস্কার দেব।

[রাধাগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত। বীতশোক এই আদেশে কাতর হইলেন]

বীতশোক ॥ মহামাত্য! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।···সম্রাট আর হিংসা নয়। রক্তধারায় ধরণী সিক্ত হয়েছে সম্রাট! রক্তপাত আর নয় সম্রাট!

অশোক ॥ মহামাত্য—(রাধাগুপ্তকে চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রাধাগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে বীতশোক অশোককে পরম মিনতি সহকারে বলিলেন—)

বীতশোক ॥ এইমাত্র—এইমাত্র তোমারই গুরুর মুখে বাণী শুনে তাঁর এলাম। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। মৃত্যুভয়েই. হে সম্রাট, আজ আমার এই পরিবর্তন! দয়া করে এ আদেশ প্রত্যাহার কর সম্রাট!

অশোক ॥ না মহামাত্য! (মহামাত্য প্রস্থানোদ্যত হইলেন)

বীতশোক ॥ (মরিয়া হইয়া) মহামাত্য! সম্রাট!

অশোক ॥ না।

বীতশোক ॥ না! (ত্রিপিটক রাখিয়া দিয়া) সম্রাট, এ অনুরোধ আমি—আমি করছি সম্রাট! অনুরোধ করছে সে—যে এক কলিঙ্গেই লক্ষ লোক হত্যা করেছে—যে সেই হত্যাদৃশ্য দেখে আনন্দে, উল্লাসে পৈশাচিক অট্টহাস্যে হেসে উঠেছে—যে অট্টহাস্যে তুমি···তুমি যে সম্রাট—তুমিও শিউরে উঠতে! কটা লোক স্বহস্তে তুমি হত্যা করেছ সম্রাট? আর আমি—(শিহরিয়া উঠিয়া) ওঃ সেই আমি সম্রাট, তুচ্ছতম যে কীট, ক্ষুদ্রতম যে প্রাণী—তাদের ক্লেশও আজ সইতে পারি না। দয়া কর সম্রাট! আমার এই নব-জীবনের প্রথম প্রভাতে তোমার কাছে সানুনয়ে, সকাতরে প্রার্থনা করছি—হত্যার আদেশ প্রত্যাহার কর— প্রত্যাহার কর—

অশোক ॥ না মহামাত্য। (মহামাত্যের প্রস্থান)

বীতশোক ॥ রক্তপাতে তুমি এখনও তৃপ্ত হওনি সম্রাট! তৃপ্ত নও!··· তৃপ্তি? তৃপ্তি? আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা! (প্রস্থান)

মিত্রা ॥ তুমি বড় নিষ্ঠুর বাবা। আমাদের দেশের সমস্ত লোক তুমি মেরে ফেলেছ। আমাকেও তোমার লোকেরা মেরে ফেলত আর একটু হলে!

(অশোক মিত্রাকে বুকে টানিয়া লইলেন) আমার মাকে তুমি কেটে ফেললে। তোমার মনে তারপর দয়া এল, তুমি ভাল হয়ে গেলে। আবার কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ বাবা? যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইব না। (সরিয়া গেল)

অশোক ॥ মিত্রা, শোন্ শোন্—

মিত্রা ॥ আচ্ছা, এতবার তুমি ঠকেছ, তবু আজও তোমার বুদ্ধি হল না?

অশোক ॥ বুদ্ধি হল না···বুদ্ধি হল না। (হঠাৎ দ্বারস্থ প্রতিহারীর প্রতি) মহামাত্য! (প্রতিহারী গমনোদ্যত হইল) না, থাক।

মিত্রা ॥ থাক কেন? আবার কিন্তু তুমি ঠকবে তা আমি বলে রাখছি—

অশোক ॥ ঠকি ঠকব।

মিত্রা ॥ শেষে আবার ত কাঁদবে। সারারাত ত এমনি ঘুমুতে পার না॥ ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠ।

অশোক ॥ তোকে আমার কাছ থেকে না তাড়াতে পারলে চলছে না মিত্রা।

মিত্রা। কেই-বা আর তোমার কাছে থাকছে বল? তিষ্যাদেবী ত কাছেই আসেন না। তক্ষশিলা থেকে কাঞ্চন দেবী এলেন, ভাবলাম বেশ হল—তা যে রাত্রে এলেন সেই রাত্রেই চলে গেলেন। একে একে দেখছি তোমার কাছ থেকে সবাই পালাবে!

অশোক ॥ বলতে পারিস কাঞ্চন কেন চলে গেল? কোথায় গেল?

মিত্রা ॥ কি করে বলব? শুনলাম, যে রথে এসেছিলেন, সবাই যেই ঘুমুল, সেই রথেই চলে গেলেন।

অশোক ॥ তক্ষশিলাতেই চলে গেছে, কি বলিস?

মিত্রা ॥ হবে। আমিও যাব।

অশোক ॥ কোথায়? কোথায় যাবি মিত্রা?

মিত্রা ॥ বল ত!

অশোক ॥ কলিঙ্গে?

মিত্রা ॥ না। সেখানে কি আর যাওয়া যায়?

অশোক ॥ (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর) তুই কোথায়ও যাবিনে। আমাকে ছেড়ে কি করে যাবি? আর তোকে ছেড়ে আমিই-বা কি করে থাকব মিত্রা?

মিত্রা ॥ তোমার বাবা তোমায় ছেড়ে যায়নি? তোমার মা? আমার মা—?

অশোক ॥ না, ওরে না, আমায় ছেড়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না!

মিত্রা ॥ সব ঠিক হয়ে গেছে যে—না বল না, লক্ষ্মী বাবা।

অশোক ॥ কোথায় যাওয়া হবে শুনি?—

মিত্রা ॥ গান গেয়ে গেয়ে আমি যাব। বুদ্ধের জয় গেয়ে আমি পাহাড় পার হব। ধর্মের জয় গেয়ে মরুভূমি পার হব। সঙ্ঘের জয় গেয়ে সাগর পার হব। পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর মুগ্ধ হয়ে আমার গান শুনবে! ভালবেসে আমার পথ করে দেবে! সাগরের ওপারে রাক্ষসদের সেই দেশ। লোকেরা সব ঘুমিয়ে আছে। রাক্ষসরা রূপার কাঠি ছুঁইয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। আমার হাতে থাকবে সোনার কাঠি। আমি যেন সেই রাজকন্যা। সোনার কাঠি যেই ওদের চোখে ছোঁয়াব, ওরা জেগে উঠবে। জেগে উঠেই আমার সঙ্গে গাইবে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

[ভিক্ষাপাত্র হাতে উপগুপ্তের প্রবেশ। সঙ্গে ভিক্ষু মহেন্দ্র]

উপগুপ্ত ॥ সম্রাট, কাল তুমি সঙ্ঘে তোমার পুত্র মহেন্দ্রকে দান করেছ। আজ কি দান করবে সম্রাট?

মিত্রা ॥ (সোৎসাহে অশোককে) আমাকে, বাবা, আজ আমাকে—

অশোক ॥ (সাতঙ্কে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া) মিত্রা! (তাহাকে বুকে টানিয়া নিয়া) কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রভু!

উপগুপ্ত ॥ তোমার কল্যাণে সঙ্ঘে স্বর্ণের অভাব নাই। ধনরত্ন দানে তোমার ক্লান্তি নাই। তোমার রাজকোষের দ্বার সঙ্ঘের জন্য সর্বদাই ত উন্মুক্ত রয়েছে সম্রাট!

অশোক ॥ বুঝেছি প্রভু আপনার কি অভিপ্রায়।...কিন্তু ও যে তার শেষ স্মৃতি! ও যে আমার—(ক্ষণপর, চেষ্টা করিয়া দুর্বলতা দমন করিয়া—মিত্রাকে ধীরে ধীরে উপগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন) গ্রহণ করুন—গ্রহণ করুন দেব!

মিত্রা ॥ বাবা, তুমি কাঁদছ?

অশোক ॥ না, না মিত্রে—(অশ্রু গোপন করিলেন)

উপগুপ্ত ॥ অশোক—অশোক!

অশোক ॥ গুরুদেব, গুরুদেব! পৃথিবী জয় করাও বুঝি এর চেয়ে সহজ! (কাঁদিতে লাগিলেন)

উপগুপ্ত ॥ অশোক, শোন। "বনং ছিন্দ চ মা বৃক্ষং, বনতো জায়তে ভয়ম্, বনঞ্চ বনকং চিত্তা, নৈর্বনং জাত ভিক্ষব।" বনকে অর্থাৎ তৃষ্ণাসমূহকে ছেদন কর। বৃক্ষকে, কোন বিশেষ তৃষ্ণা-মাত্রকে ছেদন করিতে যাইও না। (মহেন্দ্র ও মিত্রাকে) হে ভিক্ষুগণ! তোমরা 'নির্বণ' অর্থাৎ তৃষ্ণাশূন্য হও। ধর্ম পথের যাত্রী! বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য লোকের

প্রীতি অনুকম্পাভরে এই নব ধর্মের নির্বাণবাণী দেশে দেশে, দিকে দিকে প্রচার কর। (মিত্রা গাহিল। মহেন্দ্র তাহাতে যোগ দিল)

শঙ্খ তব শুনতে পেলাম
আর ত মোদের শঙ্কা নাই—
ছন্দে গাবো সত্য-গীতি
তুলে নিলাম ডঙ্কা ভাই।
লঙ্ঘি মোরা চলবো সাগর—
মানবো নাকো ঝড় তূফান
নিদ্রা-পুরীর ভাঙবে রে ঘুম—
উঠবে জেগে গাইবে গান
শঙ্কাহরণ মন্ত্র নিয়ে
বিশ্ব জয়ে শঙ্কা নাই!

[উপগুপ্ত মহেন্দ্র ও মিত্রাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যদিক দিয়া খল্লাতকের প্রবেশ]

খল্লাতক॥ সম্রাট!

অশোক॥ দেব!

খল্লাতক॥ আমাকে আপনি স্মরণ করেছেন?

অশোক॥ ও—হাঁ, কাঞ্চনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল?

খল্লাতক॥ যতদূর সন্ধান পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে তিনি তক্ষশিলাতেই যাত্রা করেছেন।

অশোক॥ কুনালের কোন সংবাদ আছে?

খল্লাতক॥ না সম্রাট।

অশোক॥ কুনালকে এখানে আসবার জন্য সপ্তাহ-পূর্বে পারাবত-যোগে আমি এক পত্র প্রেরণ করেছি। আজও ত সে এল না!

খল্লাতক॥ আসবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নি সম্রাট! তা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে পারাবতের গতি সময় সময় রুদ্ধ হয়েও থাকে!

অশোক॥ (স্নেহকাতর কণ্ঠে) ওরা কেন আসবে না? কেন এখানে থাকবে না? এ বিদ্রোহ ত আমি ক্ষমা করব না! তারা তক্ষশিলাতেই বাস করতে চায়। আমি কি এখানে একা পড়ে থাকব? শুনুন দেব, ওদের ইচ্ছাতে ত কোন কাজ হবে না,—আমার ইচ্ছামত ওদের চলতে হবে। আমার ইচ্ছা হয়েছে কুনাল আর কাঞ্চন আমার কাছে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে থাকে—দিবারাত্র আমার চোখের সামনে থাকে!

খল্লাতক ॥ বুকের কাছে একটি সন্তান চাই বই কি সম্রাট। পিতার মর্মব্যথা আমি বুঝি সম্রাট।

[স্নেহের এই দুর্বলতা খল্লাতক ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা অশোকের ভাল লাগিল না]

অশোক ॥ না—না মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, সে জন্য নয়। আমার ধর্মের আদেশ, বন্ধন হতে মুক্ত হও। আমি বলছিলাম কি—

খল্লাতক ॥ যা-ই বলুন না কেন, বন্ধন হতে একেবারে মুক্ত হতে পারছেন কই? কুনাল—কাঞ্চন—এরা যে সম্রাটের—

অশোক ॥ (খল্লাতকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া) মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, আপনি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আজ আপনার বিচারের দিন। আমি আপনার বিচার করব—দণ্ড দেব—

খল্লাতক ॥ আমিও সম্রাটকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিলাম!

অশোক ॥ আপনাকে দণ্ড দিলাম—আজ হতে আর আপনি মহাসন্ধিবিগ্রাহিক নন! আপনি ধর্ম-মহামাত্য—একমাত্র ধর্ম বিস্তারই আপনার কার্য্য!

খল্লাতক ॥ আমি সে পদ গ্রহণে অক্ষম অশোক!

অশোক ॥ অক্ষম! আমি যেখানে আপনাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারতাম!

খল্লাতক ॥ প্রাণদণ্ডই দাও অশোক! যে সাম্রাজ্য দেহের রক্তে আমি গড়ে তুলেছি সে সাম্রাজ্য ধ্বংস হচ্ছে চোখে দেখতে পারব না।··· অশোক! যদি তুমি আমাকে বধ না কর, স্থির জেন আমি এ বৃদ্ধ বয়সেও তোমার বিরুদ্ধে—

অশোক ॥ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক—!

খল্লাতক ॥ হ্যাঁ সম্রাট, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তোমার শ্রীবদ্দশাতেই সাম্রাজ্যের এই সুবিশাল সৌধ ভেঙে পড়বে! সে দৃশ্য আমি দেখতে পারব না—পারব না অশোক! তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর, নতুবা আমি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব।

অশোক ॥ বিদ্রোহ করবেন আপনি? আমার বিরুদ্ধে? বাল্যে, স্নেহে লালন পালন ক'রে, কৈশোরে প্রতিপদে রক্ষা করে, যৌবনে দেহের রক্ত দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে আমার বিরুদ্ধে আপনি বিদ্রোহ করতে পারবেন দেব?

খল্লাতক ॥ পারব না, আমি পারব না অশোক। (কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল) সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতনও ত এ বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখতে পারব না।

অশোক, আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকে আমাকে দণ্ড দাও।

অশোক ॥ উত্তম! আমি আপনাকে দণ্ডই দেব, কিন্তু—মৃত্যু-দণ্ড নয়।

খল্লাতক ॥ তবে?

অশোক ॥ আপনার পক্ষে তা মৃত্যুদণ্ডেরও অধিক! দণ্ডাজ্ঞা আমি লিখছি দেব! আপনি অনুগ্রহ করে প্রাসাদে ক্ষণেক অপেক্ষা করুন!

[খল্লাতক ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। অশোক কি দেখিতে লাগিলেন! অন্যদিক দিয়া তিষ্যরক্ষিতার প্রবেশ। তিষ্যরক্ষিতাকে দেখিলে চেনা যায় না। দেখিলেই মনে হয় কি একটা নিদারুণ ঝড় তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।]

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (ধীরে ডাকিলেন) সম্রাট!

অশোক ॥ (লিখিতে লিখিতে) বল—

[তিষ্যরক্ষিতা কি বলিতে গিয়া, তক্ষা বলিতে পারিলেন না]

অশোক ॥ (লিখিতে লিখিতে) কি তিষ্যরক্ষিতা-?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কিছু না!

অশোক ॥ (তিষ্যরক্ষিতাকে দেখিয়া চমকিত, বিস্মিত হইলেন) একি তোমার আকৃতি তিষ্যরক্ষিতা! কি করেছ তুমি?

তিষ্যরক্ষিতা। এইমাত্র একটা পাপ—একটা নিষ্ঠুর কাজ করে এলাম সম্রাট!

অশোক ॥ কি? বল·· কি?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (বলিতে গিয়া সাহসে কুলাইল না) বলতে চাই·· বলতে চাইছি···কিন্তু আমি পারছি না···বলতে পারছি না সম্রাট! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

অশোক ॥ চণ্ডগিরিক! (চণ্ডগিরিক আসিয়া না দাঁড়াইতেই)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (ছুটিয়া আসিয়া) না—না···আমি বলছি···বলছি সম্রাট—

অশোক ॥ (চণ্ডগিরিককে ইঙ্গিতে সরাইয়া দিয়া) বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ এইমাত্র আমি প্রাসাদের সমস্ত—(আর বলিতে পারলেন না)

অশোক ॥ কি সমস্ত·· বল—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) পারছি না—পারছি না সম্রাট!

অশোক ॥ চণ্ডগিরিক—(চণ্ডগিরিক আসিয়া দাঁড়াইল) এইমাত্র দেবী প্রাসাদে কি করে এলেন?

চণ্ডগিরিক ॥ মহাদেবীর আদেশে প্রাসাদের সমস্ত পারাবত বধ করা হয়েছে।

অশোক ॥ (ইঙ্গিত দ্বারা চণ্ডগিরিককে সরাইয়া দিয়া তিষ্যরক্ষিতাকে) এর অর্থ?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ অর্থ! অর্থ! অর্থ! কি আবার অর্থ! (নিরর্থক হাস্য)

অশোক ॥ (চিন্তা করিতে লাগিলেন) তুমি পারাবত বধ করেছ— পারাবত বধ করেছ! পারাবত…পারাবত গৃহের শোভা…পারাবত… পারাবত পত্র বহন করে…(তিষ্যরক্ষিতা অশোকের প্রতিটি কথা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিতেছিলেন—'পত্র বহন করে' উচ্চারিত হওয়া মাত্র তিষ্যরক্ষিতা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

অশোক ॥ (তন্মুহূর্তে বুঝিলেন কোনও পত্র বহনের সহিত তিষ্যরক্ষিতার বর্তমান মানসিক অবস্থার যোগাযোগ আছে। তিনি চিন্তা-স্রোত ছিন্ন করিলেন না)·· পারাবত পত্র বহন করেছে- সেদিন—তোমার প্রাসাদে—আমার পুত্র কুনালের—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (ভীতিবিহ্বল হইয়া) আমি বলছি—আমি বলছি—

অশোক ॥ (রুদ্রমূর্তিতে) নারী!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ আমাকে শাস্তি দাও- শাস্তি দাও সম্রাট!

অশোক ॥ আমি তক্ষশিলার রাজুককে পত্র লিখেছিলাম "কুনালকে অবিলম্বে পাটলিপুত্রে প্রেরণ কর"।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তাতে আরও দুটি কথা ছিল।

অশোক ॥ (সতীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তিষ্যরক্ষিতার চোখে চোখে চাহিয়া) 'আরও দুটি কথা!'…কে লিখেছিল? আমি?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ তুমি। (শিহরিয়া উঠিয়াই) না—না, আমি—আমি।

অশোক ॥ তুমি! এ দুঃসাহস তোমার হতে পারে। অসম্ভব নয়। আমি তোমার ওখানেই সে পত্র রেখে এসেছিলাম। তুমি—(তিষ্যরক্ষিতার চক্ষু হইতে চক্ষু না ফিরাইয়া তৎপ্রতি শঙ্কাকুল-চিত্তে অগ্রসর হইতে হইতে) বল···কি সে দুটি কথা? যদি প্রাণের মমতা থাকে সত্য গোপন কোরো না—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (বহু কষ্টে, অবশেষে, আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন) "অন্ধ করে প্রেরণ কর।

অশোক ॥ (সার্তনাদে) অন্ধ করে! (রুদ্রমূর্তিতে) রাক্ষসী, তোকে আমি—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (নতজানু হইয়া) আমাকে বধ কর!

অশোক ॥ (হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল। তিনি তিষ্যরক্ষিতার চোখে চোখে চাহিয়া কহিলেন) না · ও কথা তুমি লিখতে পার না—কিছুতেই পার না—

তিষ্যরক্ষিতা ॥ পারি না!

অশোক ॥ না—কিছুতেই না। আমি জানি—কেন তুমি পার না!··· কিন্তু তবু আমার মন বিষম চঞ্চল হয়ে উঠছে। কোন এক অন্যায় কথা

সংযোজনা করে সেই পত্র তুমি পাঠিয়েছ। পরে তোমার অনুতাপ হয়েছে, মনে হয়েছে ঐ পারাবত কেন গেল! পারাবত শেষে তোমার অসহনীয় হয়ে উঠল!—তাই, তাই আজ তুমি পারাবত কুল নির্মূল করেছ—! সবই আমি বুঝতে পারছি। শুধু বুঝছি না কি কথা তুমি সংযোজন করলে! আমার কুনাল—সেই সরল নিষ্পাপ বালক! (হঠাৎ কি মনে হওয়ায়) রাক্ষসী, তুই তার কাঞ্চনকে হত্যা করিস নি ত?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কি জানি, হয় ত কাঞ্চনকেও আমি হত্যা করেছি!

অশোক ॥ তুই আমাকে উন্মাদ করবি। আমাকে উন্মাদ করবি।

তিষ্যরক্ষিতা ॥ উন্মাদ! উন্মাদ! (অদূরে নারী-কণ্ঠের গান শোনা গেল) ও কি? (উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন)

অশোক ॥ কে? (তিনিও উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন)

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (ছুটিয়া গেলেন) ওরা আসছে! ঐ ওরা আসছে!

অশোক ॥ (আনন্দে·· উল্লাসে) ওরা বেঁচে আছে! ঐ ওরা আসছে! ওরে, আয়—আয়—আমার বুকে আয়— বুকে আয়—

[ছুটিয়া গিয়া গবাক্ষদণ্ড ধরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কাঞ্চন অন্ধ কুনালকে হাত ধরিয়া লইয়া গাহিতে গাহিতে প্রাসাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

বন্ধু তোমার পথের আঁধার ঘুচবে আমার আঁখির তারায়
তোমার বুকে যে শিখা তার কাঁপন লাগে তারায়-তারায়!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ (ছুটিয়া গিয়াছিলেন কুনালের চোখ আছে কি না দেখতে। চোখ নাই দেখিয়াই) উঃ—(দুই হাতে চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করিলেন)

অশোক ॥ (তিনিও তিষ্যরক্ষিতার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদিগকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন) কাঞ্চন! কুনাল! (কুনালকে অন্ধ দেখিয়াই) একি! ওঃ—(আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন) রাক্ষসী! এ তুই কি করেছিস! ··কাঞ্চন, আমার পত্র কই? আমার পত্র? (কাঞ্চনের হাত হইতে পত্র লইয়া পাঠ) 'অন্ধ করে' প্রেরণ কর! (তিষ্যরক্ষিতাকে) রাক্ষসী, তোর মনে কি আর কোন কথা ছিল না?

তিষ্যরক্ষিতা ॥ কত কথাই তো ছিল! কিন্তু আমাকে তো তা লিখতে দিল না! ও দিল না—তুমি দিলে না—কাঞ্চন দিল না—বিধাতাও না!

অশোক ॥ আমি বিচার করব—জীবনের শেষ বিচার!

তিষ্যরক্ষিতা ॥ বিচার করবে? কর বিচার!

অশোক ॥ হ্যাঁ, বিচার—আমার জীবনের শেষ বিচার। তোমাকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করব। চণ্ডগিরিক! (চণ্ডগিরিক-ছুটিয়া আসিয়া তিষ্যরক্ষিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল)

কুনাল ও কাঞ্চন ॥ না পিতা, না—

কাঞ্চন ॥ চোখ নেই বলে ত ওর মনে এতটুকু ক্ষোভও নেই!

কুনাল ॥ মা, তুমি আমার মহাগুরু। আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়ে মা আমাকে দিব্য জ্যোতি দিয়েছেন পিতা! আমার মনে ত আজ এতটুকু ক্ষোভও নেই! · ঘরে দুটি মাটির দীপ জ্বলছিল। সেই দীপ নিভিয়ে দিল। জোৎস্নাধারা এসে আমার ঘর পরিপ্লাবিত করে দিল! (কাঞ্চন কুনালকে ক্রন্দনরতা তিষ্যরক্ষিতার সম্মুখে লইয়া গেলেন) মা, তুমি আমায় ডেকেছিলে, আজ আমি এসেছি মা! (উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত ॥ আজ যে তোমার সময় হয়েছে কুনাল! তাই তো আজ মা-হারা সন্তান সন্তান-হারা মায়ের কাছে ফিরে এসেছে! মৃত্যু আজ দণ্ড নয় সম্রাট! আজ নব-জন্মের শুভদিন—নব-জীবনের সুখপ্রভাত! কাঞ্চন, মাকে শানাও তোমার সেই গান—

[কাঞ্চন এক হাতে তিষ্যরক্ষিতা অন্য হাতে কুনালকে ধরিয়া লইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলেন—সেই গান যে গান গাহিতে গাহিতে আসিয়াছিলেন। তিষ্যরক্ষিতার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল]

বন্ধ তোমার পথের আঁধার ঘুচবে আমার আঁখির তারায়
তোমার বুকে যে শিখা তার কাঁপন লাগে তারায়-তারায়।
তোমার চোখের আঁধার-কালো জ্বালে একি উজল আলো,
শোনালে যে মহান-বাণী পরাণ যেন নাহি হারায়।
নিকষ-কালো অমানিশায় জ্বাললো কে গো প্রেমের-প্রদীপ,
ঝড়-বাদলে বজ্রপাতে আর কি কভু নিভবে ও দীপ?
আজকে আমার পরাণ মাঝে চির-চেনার বংশী বাজে—
ধন্য আমি হে প্রিয়তম তাঁহার অসীম সুধার ধারায়!

অশোক ॥ (তাহাদের উদ্দেশ্যে) ওরে, তোরা একটু অপেক্ষা কর—একটু অপেক্ষা কর! আমিও যাচ্ছি—(ফিরিয়াই দেখেন সেখানে খল্লাতক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন)

মহাসন্ধিবিগ্রাহিক ॥ (খল্লাতকের দণ্ডাজ্ঞা পূর্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা লইয়া খল্লাতকের হাতে দিয়া) পাঠ করুন—

খল্লাতক ॥ (পাঠ করিলেন) "এই সিন্ধুপরিবেষ্টিত মণি-মুক্তাহীরকাদি-প্রসবিনী যাবতীয়-প্রাণী সমাকীর্ণ ভারতবর্ষ আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম।" (পাঠ করিয়া চমকিত হইয়া) সাম্রাজ্য তুমি সঙ্ঘকে দান করলে অশোক! (দানপত্র অশোকের হাতে দিয়া) যে সাম্রাজ্য আমি দেহের রক্তে—

অশোক ॥ (দানপত্র লইয়া) হ্যাঁ দেব। কুনাল সভাই বলেছে আকাশভরা

জ্যোৎস্না কক্ষে প্রবেশ করতে পারছে না। ক্ষুদ্র দীপ দিয়ে আমি তার পথ রোধ করে বসে আছি। কিন্তু আর নয়, বাইরের অনন্ত, অসীম, অফুরন্ত জ্যোৎস্না আমায় ডাকছে! (উপগুপ্তের সম্মুখে নতজানু হইয়া দানপত্র ধরিলেন। উপগুপ্ত তাহা গ্রহণ করিলেন)

খল্লাতক ॥ আমায় দণ্ড দাও, নতুবা—

অশোক ॥ সজ্ঞে আমি সাম্রাজ্য দান করেছি। এই দানই যদি আপনার দণ্ড হয়, তবে···আপনাকে আমি দণ্ড দিয়েছি মহাসন্ধিবিগ্রাহিক!

খল্লাতক ॥ সত্য! অতি সত্য! তুমি আমায় দণ্ড দিয়েছ—এমন দণ্ড দিয়েছ যে—আমার যাবার স্থানও যে রাখলে না অশোক!

অশোক ॥ বিদ্রোহ করবেন না দেব?

খল্লাতক ॥ বিদ্রোহ করব কার বিরুদ্ধে? তোমার? এক নিঃস্ব ভিখারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে খল্লাতক! তোমার আর কি আছে অশোক?

অশোক ॥ আছে দেব এই অর্ধ-আমলকি! কোথায় যেন কার জন্য হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে এখনও একটু মায়া—একটু মমতা অনুভব করছি দেব! তাই এখনও এই অর্ধ আমলকি ত্যাগ করতে পারি নি। কে সে? কোথায় সে?

খল্লাতক ॥ যে দিন তোমায় প্রথম বুকে তুলে নিয়েছিলাম সেদিন তোমার অধিকতর সম্পদ ছিল। তুমি পিতৃপরিত্যক্ত হলেও সেদিন তোমার মহিমময়ী মা ছিলেন।···কিন্তু আজ? আজ আমি তোমাকে কি করে ত্যাগ করব অশোক? (অশোককে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

উপগুপ্ত ॥ কিন্তু ত্যাগ যে তোমাকে করতেই হবে খল্লাতক। যে প্রেম প্রিয় বিচ্ছেদে ভয়ে পায়—সে প্রেম ত প্রেম নয়, সে প্রেম মোহেরই নামান্তর। শোন আমার প্রভুর বাণী! "গৃহকারকের সন্ধান করিয়া তাহাকে না পাইয়া কতবার জন্মগ্রহণ করিলাম! কত সংসার পরিভ্রমণ করিলাম! পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কি দুঃখই না পাইলাম! হে গৃহকারক, এবার তোমার দেখা পাইয়াছি। এবার আর গৃহ-রচনা করিতে পারিবে না! তোমার সকল স্তম্ভ ও গৃহভিত্তি ভগ্ন হইয়াছে! আমার বিগত-সংস্কার চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়াছে!" খল্লাতক, তোমারও ত গৃহভিত্তি ভগ্ন! স্তম্ভসমূহ ভগ্ন! তোমার রাজা আজ সন্ন্যাসী! মুক্তি তোমার সম্মুখে! তুমি তাঁকে উপেক্ষা করবে কেন খল্লাতক? (বিবাদ-ক্লিষ্ট রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

অশোক ॥ মহামাত্য! মহামাত্য! আমি সেই মূর্তি-ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করছি। বীতশোক কই? তাকে এ সংবাদ—

রাধাগুপ্ত ॥ (কম্পিতকণ্ঠে, নতমুখে) সম্রাট!

অশোক ॥ হাঁ মহামাত্য, সে অভিমান করে চলে গেছে। তাকে ডেকে আনুন। এখনও আমার হাতে অর্ধ-আমলকি আছে—এখনও···এখনও আমি

সম্রাট। আমি আজ বুঝেছি দণ্ডের চেয়ে ক্ষমা বড়। আজ আমার শুধুই ইচ্ছা হচ্ছে সকলে সুখী হোক···তুচ্ছতম যে কীট—ক্ষুদ্রতম যে প্রাণী—সবাই—সবাই।

রাধাগুপ্ত ॥ (আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) তিনিও তাই চেয়েছিলেন।

অশোক ॥ কে?

রাধাগুপ্ত ॥ মহামতি বীতশোক।

অশোক ॥ তাই ত তাকে ডাকছি! দুটি ভাই আজ একসঙ্গে তীর্থযাত্রা করব॥ তাকে ডাকুন—সে আজ শুধু আমার ভাই নয়, সে আজ আমার ধর্মপথের সাথী!

রাধাগুপ্ত ॥ (আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) সম্রাট! সম্রাট! (কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিলেন না)

অশোক ॥ বলুন মহামাত্য, বলুন!···আমার অনুমান হচ্ছে আপনি কোন দুঃসংবাদ এনেছেন—যা বলতে আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন। বলুন মহামাত্য! কোন দুঃসংবাদই আর বোধ হয় আমাকে অধীর করতে পারবে না।

রাধাগুপ্ত ॥ সেই মূর্তি ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণকে আজ রাত্রিমধ্যে বধ করতে না পারলে তার স্বজন-পরিজনকে আগামী প্রভাতে হত্যা করা হবে—সম্রাটের আদেশ ছিল। মহামতি বীতশোক এই আদেশে অত্যন্ত বিচলিত হন। এই আদেশ প্রত্যাহার করবার জন্য তিনি সম্রাটকে সকাতরে অনুনয় করেন। সম্রাট তাঁর কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রাণরক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি উন্মাদের মত পথে ছুটে বের হলেন। স্বল্পবুদ্ধি, ধনলোভী এক দরিদ্র গোপালক সহস্র সুবর্ণ পুরস্কারের আশায় সেই ব্রাহ্মণের সন্ধানরত ছিল। মহামতি বীতশোক তাকে ডেকে নিয়ে বলেন "সেই ব্রাহ্মণ আমি। আমার ছিন্নশির নিয়ে"—

অশোক ॥ (চরম অস্থিরতায়) মহামাত্য! মহামাত্য! তবে কি—

রাধাগুপ্ত ॥ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) হ্যাঁ সম্রাট, তাঁরই ছিন্নশির সম্রাটের দ্বারে।

অশোক ॥ (অশোকের বক্ষে বোধহয় বাণ বিদ্ধ হইল। তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন) উপগুপ্ত! ভগবান উপগুপ্ত!

উপগুপ্ত ॥ অশোক! বৎস!

অশোক ॥ আমায় নিয়ে চলুন দেব আমার হাত ধরে—সেই পথে—যে পথে দুঃখ নাই—ব্যথা নাই—অনুতাপ নাই—অনুশোচনা নাই! আমার শেষ সম্বল এই অর্ধ-আমলকি তোমার হাতে দক্ষিণা দিচ্ছি। কোথায় গৌতমের সেই পথ? কোন্ পথে তাঁর পদধূলি এখন বর্তমান? সিদ্ধার্থের সেই

মহাতীর্থে আমায় নিয়ে চলুন—নিয়ে চলুন দেব! (উপগুপ্ত অশোককে লইয়া তীর্থপথে যাত্রা করিলেন। তীর্থ-যাত্রীদল গাহিয়া উঠিল)

শঙ্খ তোমার শুনতে পেলাম
আর তো মোদের শঙ্কা নাই—
ছন্দে গাব সত্য-গীতি—
তুলে নিলাম ডঙ্কা তাই!
লঙ্ঘি মোরা চলব সাগর—
মানবো নাকো ঝড়-তুফান,
নিদ্রাপুরীর ভাঙবে রে ঘুম
উঠবে জেগে গাইবে গান
শঙ্কা-হরণ মন্ত্র নিয়ে—
বিশ্ব-জয়ে শঙ্কা নাই!

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

অশোক—	রবীন্দ্রমোহন রায়
বীতশোক—	ভূমেন রায়
খল্লাতক—	নরেশচন্দ্র মিত্র
রাধাগুপ্ত—	বিজয়কার্তিক দাস
ব্রহ্মদত্ত—	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
মহেন্দ্র—	ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
কুনাল—	রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দিমেকাস—	অমর বসু
উপগুপ্ত—	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
ধর্মকীর্তি—	সনৎ মুখোপাধ্যায়
সভাসদ্‌গণ—	সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুধাংশু মিত্র শৈলেন রায় বিজয় মজুমদার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
মিসর দূত—	গণেশ মজুমদার
মহাপ্রতিহার—	স্বরাজ বর্মা
চণ্ডগিরিক—	রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়
মিসর বালক—	রমেন
সাংবাদিক—	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
ভিক্ষুগণ—	সহদেব গঙ্গোপাধ্যায় বিজয়কুমার মজুমদার বিনয় বসু গণেশ মজুমদার
জনৈক বৃদ্ধ—	সুধাংশু মিত্র
ঐ পুত্র—	সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প্রতীহার—	সুহাস ঘোষ

সৈনিকগণ—		বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
		পবিত্র ভট্টাচার্য
		বিনয় বসু
		পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিসরী পরিচারক		মৃণাল দাসগুপ্ত
		পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিষ্যরক্ষিতা— শান্তি গুপ্তা
কাঞ্চন— রেণুবালা (সুখ)
দেবী— সুহাসিনী
মিত্রা— জ্যোতির্ময়ী (জ্যোতিঃ)
যবনী— বীণাপাণি
চামর ধারিণী— রেণুবালা ও গিরিবালা
সখীগণ—আসমানতারা, বীণাপাণি (কালো), জ্যোতির্ময়ী, মহামায়া (কিনি), প্রতিভা, ফিরোজবালা, পূর্ণিমা, বীণাপাণি, রাধারাণী, নির্মলা, রেণুকা।

তারাস্ শেভচেঙ্কো

Taras Shevchenko
তারাস শেভচেঙ্কো

Characters
চরিত্র

In order of appearance
প্রবেশানুক্রমে

*Two armed Cossack guards
*Some young peasants
Baron Engelhardt
*Natasa
Servant
Taras Shevchenko
Vassily Ivanovich Grigorovich
V. I. Sternberg
K. P. Bryullov
V. A. Zhukovsky
Prince Saltykov
*Razin
*Kobzar & a boy
*Some serfs
Likera Polusmakova
Yarina
*Junior Engelhardt
N. Kostomarov
*Petrov
Gulak
Savich
Navrotsky
*Obryadin
Some young singers
*Ivan
*Doctor Semyonovich
Chernyshevsky

শেভচেঙ্কোর কবিতা ও গান মূল রচনা থেকেই সরাসরি বাংলায় অনূদিত হওয়া সঙ্গত মনে করায় বর্তমান রুষভারতী পত্রিকা সংস্করণে ইংরেজী অনুবাদই রাখা হলো। পুস্তকাকারে প্রকাশিতব্য পরবর্তী সংস্করণে কবিতা ও গানগুলি মূল হইতেই বাংলায় অনূদিত হবে।

চিহ্নিত চরিত্রগুলি নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত।*

তারাস্ শেভচেঙ্কো

॥ প্রথম পর্ব ॥

৩০ মে, ১৮৮১

(অবতরণিকা)

[Kenev শহরের উপকণ্ঠে তারাস শেভচেঙ্কোর সমাধি। পাহারারত সশস্ত্র কসাক প্রহরী ঘুমে ঢুলিতেছে। গভীর রাত্র। অদূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিল। কয়েকজন গ্রাম্য কৃষক যুবক অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ঘুমন্ত প্রহরীটির মুখ বাঁধিয়া তাহাকে বন্দী করিল। অতঃপর তাহারা শেভচেঙ্কোর কবরটি খুঁড়িতে উদ্যত হইল। পাহারারত পুলিশটির পাহারার সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় নিকটবর্তী শিবির হইতে অন্য একজন পুলিশ প্রহরী পাহারা দিতে আসিয়া ওখানকার ঘটনা দেখিয়া বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। কৃষক যুবকগণ থমকিয়া দাঁড়াইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও হইল বটে। দ্বিতীয় প্রহরী বন্দুক উঁচাইয়া কৃষক যুবকদের কাছে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল; এবং বন্দী পুলিশটিকে মুক্ত করিল। ইতিমধ্যে কৃষক যুবকদের অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু কবর খননোদ্যত দুইজন কৃষক যুবক শাবল হাতে করিয়া বিদ্রোহের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।]

২য় পুলিশ ॥ (প্রথম পুলিশকে) ওরে হতভাগা, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলি তুই?

১ম পুলিশ ॥ (নীরবে মুখ নত করিল। দ্বিতীয় পুলিশ এইবার বিদ্রোহী কৃষক যুবকদ্বয়ের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকাইল। তাহারা কিন্তু ভয় পাইল না।)

২য় পুলিশ ॥ আবার এই কবর খুঁড়তে এসেছিস তোরা? [কৃষক যুবকদ্বয় নিরুত্তর রহিল]

২য় পুলিশ ॥ এবার নিয়ে ক'বার এলি?

[যুবকদ্বয় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল]

১ম পুলিশ ॥ এবার নিয়ে চারবার। আর এবারকার সাহসটা দেখ। আমাকে কিনা···আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই তোদের রক্ষে—জেগে থাকলে তোদের মাথার খুলি আমি গুলি করে উড়িয়ে দিতাম। নাঃ, তোদের সাহস দেখে আমি অবাক হই।

২য় পুলিশ ॥ তুই একটা গর্দভ। গুলি করে এখনি মেরে ফেল্ বদমাশ ছুটোকে।

১ম পুলিশ ॥ নিশ্চয়। (কৃষক যুবকদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঁচাইল।) এই দেখ, হতভাগা ছুটো ভয়ে একটু কাঁপছেও না। ওরে শালা, তোরা যে এখনি মরবি! [কৃষক যুবকদের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না]

১ম পুলিশ ॥ নাঃ, এদের দেখছি মরতেও ভয় নেই!

২য় পুলিশ ॥ তাতে কি হয়েছে? গুলি কর।

১ম পুলিশ ॥ মরতে যাদের ভয় নেই তাদের গুলি করে লাভ? মিছিমিছি গুলিগুলো নষ্ট হবে। না না, অত বোকা আমি নই। (ছুটিয়া গিয়া কৃষক যুবকদ্বয়কে দুই লাথি মারিয়া) ভাগ্—

[কৃষক যুবকদ্বয় চলিয়া যাইতেছিল]

২য় পুলিশ ॥ তুই ছেড়ে দিলেও আমি ছেড়ে দেব না।

[দ্বিতীয় পুলিশটি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। কিন্তু কেহ আহত হইল না। গুলির শব্দে তাহারা পালাইয়া গেল।]

১ম পুলিশ ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—

২য় পুলিশ ॥ হাসবার কি আছে? ফাঁকা আওয়াজ করেছি। মশা মেরে আমি হাত কালো করি না।

১ম পুলিশ ॥ কোনো কসাবই তা করে না। একটা সিগ্রেট দে।

[দ্বিতীয় পুলিশটিকে সিগারেট দিল এবং নিজেও ধরাইল]

২য় পুলিশ ॥ রাত ফর্শা হলো। পালা বদল করতে ভাগ্যিস আমি একটু আগেই এসে পড়েছিলাম, নইলে তো ওরা আজ কবর খুঁড়ে ফেলতো। তোমার-আমার কারুরই চাকরি থাকতো না। ঠাঁই হতো একেবারে সাইবেরিয়ার জেলে। এত করে তোকে বলি, ঘুমটা একটু কমা।

[কৃষক যুবকদ্বয় পালাইবার সময় একটি শাবল ফেলিয়া গিয়াছিল। শাবলটির প্রতি প্রথম পুলিশের দৃষ্টি পড়িল। সে দ্বিতীয় পুলিশের কথার উত্তর না দিয়া শাবলটি তুলিয়া আনিল। একবার শাবলটি এবং আর একবার কবরটি দেখিতে লাগিল।]

২য় পুলিশ ॥ ব্যাটারা শাবলটি ফেলে গেছে। কী সব বীরপুরুষ!

১ম পুলিশ ॥ যারা জীবনটা ফেলে দিতে এসেছিল, একটা শাবল ফেলে যাওয়া তাদের কাছে বড় কথা নয়। এই শোন্।

২য় পুলিশ ॥ কি?

১ম পুলিশ ॥ আমি কি ভাবছি জানিস?

২য় পুলিশ ॥ বল।

১ম পুলিশ ॥ শুনলে তুই কি ভাববি জানি না। কিন্তু আমি এটা করবোই।

২য় পুলিশ ॥ কি করবি ?

১ম পুলিশ ॥ কবরটা আমি খুঁড়বো। খুঁড়ে আমি দেখবো।

২য় পুলিশ ॥ শেভচেঙ্কোর এই কবর ?

১ম পুলিশ ॥ শেভচেঙ্কোর এই কবর।

২য় পুলিশ ॥ যে কবর পাহারা দেওয়াই আমাদের চাকরি, সেই কবর খুঁড়বি তুই ? এ দুঃসাহস তোর আসে কোত্থেকে ?

১ম পুলিশ ॥ ঐ কৃষক ছেলেগুলোকে দেখে। ওদের বিশ্বাস, ঐ কবরে শুধু শেভচেঙ্কোর হাড়গোড়-ই নেই, ওখানে পোতা রয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র—যা খুঁড়ে তুলে নিয়ে ভূমিদাস কৃষকেরা জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করে জিতবে—মুক্ত হবে।

২য় পুলিশ ॥ কথাটা যে কে রটিয়েছে জানি না। কবরের মধ্যে নাকি কখনো অস্ত্রশস্ত্র লুকোনো থাকে ? যত সব গাঁজা।

১ম পুলিশ ॥ গাঁজাই যদি হবে তবে মহামান্য Tsar এই কবরে পুলিশ পাহারা রাখেন কেন ? গাঁজাই যদি হবে তবে ঐ ক্রীতদাস কৃষকগুলো মরবার ভয় না করে কবর খুড়তে আসে কেন ? আসে এই জন্যে যে এরা শুনেছে, শেভচেঙ্কো নিজেও ভূমিদাস ছিল—আর সারা জীবন ভূমিদাসদের মুক্তির জন্য লড়াই করেছে।

২য় পুলিশ ॥ (ব্যঙ্গাত্মক স্বরে) কি রকম লড়াই ? ছবি এঁকেছে, পদ্য লিখেছে, গান তৈরি করেছে সাইবেরিয়ায় বছরের পর বছর জেল খেটেছে—এই যার লড়াইয়ের নমুনা, তার কবরে অস্ত্র-শস্ত্র থাকবে, না, থাকবে গুবরে পোকা আর কেঁচো! যত সব—

১ম পুলিশ ॥ বেশ তো। কি আছে দেখাই যাক না। আজ আমি খুঁড়ে দেখবোই এ কবর। [শাবল লইয়া কবর খুড়িতে উদ্যত হইল।]

২য় পুলিশ ॥ এ সব বে-আইনী কাজে আমি নেই। কবর যদি খুঁড়তে হয়, তুমিই খোঁড়ো, আমি চলে যাচ্ছি। এখন ছিল পাহারার পালা আমার, কিন্তু তুমি যখন সরছো না—আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি। দায়-দায়িত্ব এখন যা কিছু তোমার। ভালোই হলো। বাকী রাতটা নাক ডেকে ঘুমানো যাবে। কাল সকালে যদি কেউ দেখে কবরটা খোঁড়া হয়েছে, তার জন্য দায়ী তুমি।

১ম পুলিশ ॥ হ্যাঁ, আমি। আমি বলবো, আমাকে একলা রেখে তুমি

চলে গেছ। চাষী-ছোঁড়ারা দল বেঁধে এসে আমাকে কাবু করে কবর খুঁড়ে গেছে।

২য় পুলিশ ॥ হ্যাঁ, বলবে—যদি বেঁচে থাকো, তবে। কবর খুঁড়লে শেভ-চেস্কোর ভূত মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে, তোমার ঘাড় মটকাবে। তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি বন্ধু। আকাশে ঐ এক ফালি চাঁদ ছিলো, মেঘে এখন তাও ঢাকা পড়লো। যীশু তোমাকে রক্ষা করুন। একটা কথা শুধু তোমাকে বলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

১ম পুলিশ ॥ কি ?

২য় পুলিশ ॥ তোর মাথা খারাপ হয়েছে। তোকে ভূতে পেয়েছে। এ সব মতলব ছেড়ে দে। চাকরির মায়া যদি থাকে এখনো বলছি, তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়। না হয় আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি। চল্, দু'জনেই গিয়ে শুয়ে পড়ি। গুলির শব্দ পেয়ে আশে-পাশের লোক নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে। এই আঁধার রাতে কবর খুঁড়তে কোনো ব্যাটাই আর আসবে না। আয়—

১ম পুলিশ ॥ না। খুঁড়বো। কবর আমি আজ খুঁড়বোই।

২য় পুলিশ ॥ খোঁড়। দেখছি কাল ভোর বেলা তোর কবর খুঁড়তে হবে আমাকেই।

[দ্বিতীয় পুলিশ তাঁবুতে চলিয়া গেল। শাবল হাতে লইয়া প্রথম পুলিশ ক্ষণকাল শেভচেস্কোর কবরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। পরে এদিকে ওদিকে সাবধানে দৃষ্টিপাত করিল। নিকটস্থ গাছ হইতে পেচক ডাকিয়া উঠিল। দুই একটি বন্য জন্তুরও আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রথম পুলিশ কিছুটা বিচলিত হইয়া পড়িল। সে শাবল হাতে লইয়াই তাহার বসিবার স্থানে গিয়া বসিল এবং কি যেন ভাবিতে লাগিল। মেঘ কাটিয়া গেল। চন্দ্রালোকে দেখা গেল প্রথম পুলিশ তাহার সংকল্পে পুনরায় দৃঢ় হইয়া কবরের দিকে অগ্রসর হইল। কবরে শাবলের প্রথম আঘাত হানিতে উদ্যত হইতেই একটি অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

কণ্ঠস্বর ॥ থামো।

[প্রথম পুলিশ চমকাইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া সে পুনরায় কবরে আঘাত হানিতে শাবল তুলিল। আবার শোনা গেল সেই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর]

কণ্ঠস্বর ॥ থামো। হাত নামাও। আমাকে ঘুমোতে দাও।

১ম পুলিশ ॥ আমি জানতে চাই তোমার কবরে কি অস্ত্র আছে ? যা চাষীরা চুরি করে নিয়ে যেতে চায়। আমি জানতে চাই কে তুমি ? কি তোমার শক্তি ?

কণ্ঠস্বর ॥ অমার শক্তি, আমার অস্ত্র আমার কবরে মাটি চাপা নেই। কোথায় রয়েছে আমি উঠে এসে বলছি। তুমি সরে যাও।

[প্রথম পুলিশ ইতস্তত করিতে লাগিল।]

কণ্ঠস্বর ॥ যাও বলছি। যা—ও—

[প্রথম পুলিশ এই নির্দেশ আর অমান্য করিতে পারিল না। সে ধীর পদক্ষেপে তাহার আসনে গিয়া বসিল। কবরের পশ্চাৎ হইতে শ্বেত বস্ত্রে আচ্ছাদিত ঊর্ধ্ব বাহু একটি মূর্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মূর্তিটি প্রথম পুলিশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম পুলিশ তাহার সকল দৃঢ়তা সত্ত্বেও ভীত না হইয়া পারিল না। ঊর্ধ্ব বাহু মূর্তিটি যখন তাহার কাছে আসিল তখন প্রথম পুলিশের মূর্ছার উপক্রম হইল। ভয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। মূর্তিটি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।]

মূর্তি ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ— (শ্বেত বস্ত্র অপসারণ করিয়া) বন্ধু! তুমি আমাকে চিনতে পারো নি ?

১ম পুলিশ ॥ কে! একি! তুমি ?

[দেখা গেল মূর্তিটি আর কেহ নহে, দ্বিতীয় পুলিশ]

২য় পুলিশ ॥ হাঁ বন্ধু। তোমাকে নিরস্ত করতে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

১ম পুলিশ ॥ (রাগিয়া উঠিয়া) শয়তান! তোকে আমি—

২য় পুলিশ ॥ শয়তান আমি নই বন্ধু। মৃত আত্মার শান্তির ব্যাঘাত করে যে, শয়তান সে।

[প্রথম পুলিশ নীরবে এই ভর্ৎসনা সহ্য করিল]

২য় পুলিশ ॥ গেল মাসে ছুটি নিয়ে আমি দেশে গিয়েছিলাম, মনে আছে ?

১ম পুলিশ ॥ হ্যাঁ গিয়েছিলে। তাতে কি হয়েছে।

২য় পুলিশ ॥ যার কবর আমরা রাত দিন পাহারা দিচ্ছি সেই শেভচেঙ্কো সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে এসেছি। ভারী আশ্চর্য তাঁর জীবনী। নিজেই লিখে গেছেন তাঁর জীবনের সব গল্প। আর, আমি তা শুনে এসেছি গ্রামের এক মাতব্বরের মুখে। দেখলাম, সবাই যা জানে আমরা তার কিছুই জানি না। আমরা শুধু লোকটির কবরই পাহারা দিচ্ছি।

১ম পুলিশ ॥ কি জেনে এসেছো ?

২য় পুলিশ ॥ আয় বসি। আমি বলছি, তুই শোন।

১ম পুলিশ ॥ না তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কই, তুমি তো এর আগে আমাকে সে সব কিছু বলোনি ?

২য় পুলিশ ॥ হ্যাঁ বলিনি। চাকরির মায়ায় বলিনি। যা শুনে এসেছি তা নিছক সত্য। আর তা শুনলে এই অত্যাচারী Tsar-এর আর চাকরি করতে ইচ্ছা হয় না। কেবলই ইচ্ছা হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাষীদের মুক্তি-অন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

১ম পুলিশ ॥ বটে!

২য় পুলিশ ॥ হ্যাঁ। এই ইউক্রেনের Kiev শহরের কাছে Morintsy গাঁয়ে ১৮১৪ সালে Taras Shevchenko-র জন্ম হয় ভূমিদাস এক কৃষকের ঘরে। মালিক জমিদারের নাম Baron Engelhardt। জমিদারটি যেমন ছিল অত্যাচারী তেমনি ছিল খাম-খেয়ালী। ভাত জোটে না এমন বাপ-মায়ের ঘরে খুবই দুঃখ কষ্টে মানুষ হতে লাগলো Shevchenko। ছোটবেলাতেই মা-বাপ দুই-ই হারিয়ে শেষটায় জমিদার Baron Engelhardt-এর কাছে খানসামার চাকরি পেলো বটে, কিন্তু। জমিদার দেখলেন মারপিট করেও ছেলেটির কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। সে আঁকে শুধু ছবি। খাম-খেয়ালী জমিদার বললেন—'যা বেটাচ্ছেলে, তবে তুই আমার দরবারের চিত্রকর হয়ে থাক।'

১ম পুলিশ ॥ বাঃ!

২য় পুলিশ ॥ জমিদারের সঙ্গে শেভচেঙ্কো পীটার্সবার্গে এলো।

১ম পুলিশ ॥ পীটার্সবার্গে?

২য় পুলিশ ॥ হ্যাঁ। সেন্ট পীটার্সবার্গে। সেটা ১৮৩১ সাল। তখন অত্যাচারী Tsar প্রথম নিকোলাসের রাজত্ব চলছে। শেভচেঙ্কো পালিয়ে পালিয়ে চলে যেতো Summer Gardens-এ। সেখানকার নাম করা সব স্ট্যাচু নকল করে আঁকতো নিজের খাতায়। ওখানেই ইউক্রেনের খুব বড় এক চিত্রকর Soshenko একদিন তার হাতের কাজ দেখে অবাক হয়ে যান। Soshenko-ই তাকে খুব বড় দুটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। একজন হলেন নামজাদা চিত্রকর Karl Bryullov আর একজন হলেন Zhukovsky—মস্ত বড় কবি।

১ম পুলিশ ॥ ভাগ্যের দুয়ার তবে খুলে গেল Shevchenko-র!

২য় পুলিশ ॥ ভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের সেটা বুঝবে যখন Shevchenko-র বাকী জীবনটা তুমি শুনবে। সিগারেটটা ধরাও। বলছি।

[উভয়ে সিগারেট ধরাইল। দেয়াশলাই-এর আলোতে উদ্ভাসিত হইল দুইটি মুখ। যবনিকা নামিল।]

———

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

(২২ এপ্রিল, ১৮৩৮)

[সেণ্ট পীটার্সবার্গে Baron Engelhardt-এর প্রাসাদোপম বাসভবনের সাজ্যআসর। Engelhardt এবং তাঁর প্রণয়িনী Natasa মদ্য পান করিতেছেন।]

Natasa ॥ নাঃ, তুমি দেখছি আমার এমন সন্ধ্যেটা মাটি করে দিলে।

Engelhardt ॥ মাটি করে দিলাম কি গো? সোনা করে দেব। এই যে আমার বুড়ী গিন্নী রাগ করে বাপের বাড়ি গেছে, না, এবার আর আমি গিয়ে ধরে আনছি না। পচে মরুক গিয়ে বাপের বাড়িতে। আমার হাড় জুড়োক।

Natasa ॥ তোমার হাড় জুড়োলে আমার কি? আমার প্রাণ জুড়োবে কি তাতে?

Engelhardt ॥ মধুমুখি, সে তুমি এখনি দেখবে। আজ থেকে আমি তোমার ছবি আঁকবো। তোমার এমন রূপ। হুঁ হুঁ. এ আমি বেঁধে রাখবো ছবির ফ্রেমে। টাঙিয়ে রাখবো দেওয়ালে—ঐ ওখানে। বুড়ি হতে আমি তোমাকে দেব না—দেব না।

Natasa ॥ তোমার এ কথা শুনতে শুনতেই আমি বুড়ি হয়ে যাচ্ছি। তোমার চিত্রকরেরই পাত্তা নেই। তুমি আবার ছবি আঁকাবে।

Engelhardt ॥ হারামজাদা শুয়োর দেখছি মাথায় উঠেছে। পই পই করে বলে দিয়েছি, আজ সন্ধ্যায় তুমি আসবে। আজ থেকে সুরু করতে হবে ছবি আঁকা তোমার। শালা ছোটলোক। আমার এক ভূমিদাসের বাচ্চা। শালার ছেলেকে খানসামার চাকরি দিয়েছিলাম।

Natasa ॥ তোমার খানসামা আঁকবে আমার ছবি? তবেই হয়েছে। আমি উঠছি।

Engelhardt ॥ আরে না না, শোনই না চাঁদবদনী। সে এক ভারী মজার কথা।

Natasa ॥ কি?

Engelhardt ॥ একদিন আমি আর সেই শুয়োরের মেয়েটা—

Natasa ॥ শুয়োরের মেয়ে! সেটা আবার কে?

Engelhardt ॥ আমার গিন্নী গো। আমরা দু'জনে গেছি বলড্যান্সের পার্টিতে। রাত তিনটেয় বাড়ি ফিরে দেখি আমার পড়বার ঘরে বাতি জ্বলছে। চোর ঢুকেছে ভেবে পা টিপে টিপে গিয়ে দেখি শালার ছেলে

সেই খানসামা শেভচেংকো। মোমবাতি জেলে ঘরের অয়েল পেন্টিংখানা নকল করে নিচ্ছে কাগজে। মারলাম এক লাথি তারপর বেতের পর বেত। কিন্তু ওর কাগজটা কেড়ে নিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! গোবরে পদ্মফুল! কী সুন্দর ওর হাতের কাজ।

Natasa ॥ অথচ তুমি তাকে লাথি আর বেত মারলে? তোমরা জমিদাররা কী রকম লোক গা?

Engelhardt ॥ লাথি মারবো না বেত মারবো না তবে কি চুমু খাবো? ঐ মোমবাতির আগুন লেগে যদি বাড়ি ঘর পুড়ে যেত। শোনো দয়াময়ি! তোমায় আমি একটা গুপ্ত কথা বলি। ছোটলোকদের ঠেঙালেই ওরা থাকে ভালো। তাগদ বাড়ে, বহাল তবিয়তে থাকে। কাজ ভালো পাওয়া যায়। আমি দেখেছি, না ঠেঙালে ওদের অসুখ হয়। শেভচেংকো যে খানসামা থেকে আজ অমন ছবি-আঁকিয়ে হয়েছে, সে হয়েছে আমার ঠেঙানীর চোটে। ওকে আমি আমার খাস দরবারের আর্টিষ্ট করেছি।

Natasa ॥ যেমন তুমি, তেমনি তোমার আর্টিষ্ট। এক পাড়াগেঁয়ে ভূত সে আঁকবে আমার ছবি। আমি উঠছি।

Engelhardt ॥ না না, দোহাই মনমোহিনী! শোনো শোনো। তুমি Soshenko-র নাম শুনেছো?

Natasa ॥ কেন শুনবো না? আমাদের ইউক্রেনের সেরা আর্টিষ্ট! আমার শোবার ঘরে তাঁর আঁকা ছবি রেখেছি। কেন, তুমি দেখনি?

Engelhardt ॥ কেন দেখবো না। দেখেছি বলেই তো বলছি। শালার ছেলে ঐ শেভচেংকো ফাঁক পেলেই পালিয়ে যায় সেই 'সামার গার্ডেনে'। সেখানে সেই যে শনিঠাকুরের স্ট্যাচু, সেই স্ট্যাচু দেখে দেখে আঁকছিল তার খাতায়। Soshenko শালা বেড়াতে এসে দেখলো হারামজাদা শেভচেংকোর এই কাণ্ড। দেখেই নাকি মাথা ঘুরে গেল, বুকে জড়িয়ে ধরলো হারামজাদাকে। সেই থেকে Soshenko হয়ে গেছে ঐ হারামজাদার মুরুব্বি।

Natasa ॥ রাখো রাখো। আর গুল দিয়ো না।

Engelhardt ॥ আমি জানি তুমি পোড়ার মুখি এ কথা বলবে। কিন্তু জানো, Soshenko নিজে আমাকে এ কথা বলেছে, একটা বড় পার্টিতে। আমি তো শুনে অবাক। কিন্তু [নিজেকে দেখাইয়া] এই বেটাছেলে সব চেয়ে অবাক হলো কবে জানো?

Natasa ॥ বললে তবে তো জানবো।

Engelhardt ॥ হ্যাঁ বলছি। শুনে তোমার চাঁদবদন হাঁ হয়ে যাবে। এই কয়েকদিন আগে আমার কাছে এলো আর্টিষ্ট Venetsianov—খাস

আঁকা ছবি আমি পয়সা দিয়ে কিনে আমার আর্ট গ্যালারীতে রেখেছি। ব্যাটা এসে বলে কি জানো?

Natasa ।। কি?

Engelhardt ।। বলে আমার ঐ গুবরেপোকা শেভচেঙ্কো সে নাকি একটা মস্ত গুণী লোক। তার ছবি আঁকার হাতে নাকি যাদু আছে। Karl Bryullov এর নাম শুনেছো?

Natasa ।। কে না শুনেছে? রাশিয়ার সব চেয়ে সেরা আর্টিষ্ট।

Engelhardt ।। পাগলী জানে দেখছি। কিন্তু আমার এই সবজান্তা পাগলীটি কি Zhukovsky-র নাম শুনেছে?

Natasa ।। মস্ত বড় কবি। মাটি থেকে যাদের টাকা তাদের বরং না জানবার কথা। রূপ বেচে যাদের টাকা, রূপের পূজারী কবিদের তারা চেনে। ক'দিন চেষ্টা করেছি ঐ Zhukovsky-কে একবার দেখবো।

Engelhardt ।। দেখবে, দেখবে। আমার এখানেই ও শালাকেও দেখবে। কেন জানো? ঐ Bryullov, ঐ Zhukovsky আর সেই Soshenko-ই আমার কাছে পাঠিয়েছিল ঐ শিল্পী শালা Venetsianovকে।

Natasa ।। এসব আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

Engelhardt ।। (উঠিয়া গিয়া একটি ভিজিটিং কার্ড আনিয়া Natasa-কে দেখাইয়া) হলো তো? ওরে আমার 'চোখগেল'-পাখিটি—হলো তো? শালা এসে বলে কি জানো?

Natasa ।। কি?

Engelhardt ।। প্রথমে সব বড় বড় কথা। মানব জন্মের মহিমা, মনের উদারতা, মানবতা—এই সব। আমি ভাবি শালা এসব বলছে কি? শুয়োরের কাছে মুক্তো ছড়াচ্ছে কেন?

Natasa ।। বটেই তো। তা যা বলেছো!

Engelhardt ।। শেষে শালার ঝোলা থেকে বেরিয়ে এলো বেড়ালটা।

Natasa ।। বেড়ালটা!

Engelhardt ।। মানে আসল কথাটা।

Natasa ।। কি সে কথাটা?

Engelhardt ।। ঐ হারামজাদা শেভচেঙ্কোর কথা। ঐ সব বাঘা বাঘা গুণীরা সবাই নাকি ঐ শালা ইঁদুরের বাচ্চা শেভচেঙ্কোর ছবি আঁকার হাত দেখে মুগ্ধ। ওঁরা একরত্তি ঐ পোকাটাকে একাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিতে চান। তা শালার ছেলে তো ক্রীতদাস। আইনে বাধছে। কাজেই ঐ সব বাঘা বাঘা গুণীরা আমার কাছে দরবার করে পাঠিয়েছেন—আমি যাতে ওকে মুক্তি দি।

Natasa ॥ দিলে ?

Engelhardt ॥ ওরে আমার বোকা-শশি ! দাম না নিয়ে মুক্তি দেব আমার এমন একটি গুণধর গোলামকে, অত বেকুব আমি নই ! আমি Venetsianov-শালার মুখের ওপর বলে দিলাম বড় বড় বক্তৃতা রাখুন মশাই। হারামজাদা গোলামটার দাম আড়াই হাজার রুবল্ আমি চাই। দিয়ে খালাস করে নিয়ে যান বোকা পাঁঠাটাকে।

Natasa ॥ দিয়েছে ?

Engelhardt ॥ তুমিও যেমন ! আড়াই হাজার রুবল্ দেবে ? ও সব ফাঁকা মানবতা আমি ঢের দেখেছি। কিন্তু মধুমুখি, একটা কথা খুবই ঠিক, ঐ হারামজাদা সত্যি খুব ভালো ছবি আঁকে। আর তা' আঁকে বলেই আমি চাই আমার এই প্রাণ-ভোলানো, মন-মাতানো চন্দ্রমুখীকে ছবির ফ্রেমে চিরকাল আমার ঘরে বেঁধে রাখতে।

[শেভচেকো দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল]

Engelhardt ॥ কে ? শেভচেকো ! ওরে হারামজাদা ! ওরে বোকাপাঁঠা ! কোথায় কার পা চাটছিলি এতক্ষণ ? আয় এদিকে। এগিয়ে আয়। [শেভচেঙ্কো সভয়ে কাছে আসিল] বল্ কোথায় ছিলি। [শেভচেকো নীরব রহিল]

Engelhardt ॥ বলবি তো জর হয়েছে নয় পেটের অসুখ। কাজের কথা বললেই সব শালা গোলামই তাই বলে। তোকে না বলেছিলাম, আজ সন্ধ্যা থেকে আমার এই প্রাণেশ্বরীর পোর্ট্রেট আঁকবি ! সন্ধ্যা কখন উতরে গেছে। ওরে হারামজাদা ! তুই ভেবেছিস কি ? কাছে আয়—তোর লম্বা কান দুটো নিয়ে আমার কাছে আয়। তোর দাওয়াই কি আমি জানি।

Natasa ॥ (এঙ্গেল হার্দৎ-কে) না না, এ তুমি কি করছো ? যাকে তুমি এমন অপমান করছো, সে যদি আমার ছবি আঁকে, তাতে আমারই অপমান।

Engelhardt ॥ ও।

Natasa ॥ হ্যাঁ।

Engelhardt ॥ বেশ। তবে তোমার খাতিরে ওকে একটু আদরই করছি। ওরে আমার যাদুমণি, কাছে আয়। আয়—আয়—আয়। ওরে আমার ঘোড়ার ডিম, এক পাত্র ভদ্‌কা খেয়ে নে। জরটর ছেড়ে যাবে। কিছু মনে করিসনে বাবা। জানিস তো, যাকে আমি যত গালাগাল করি, যত মারধোর করি, তাকে আমি তত ভালবাসি। ওগো চাঁদবদনি, বল নাগো, এটা সত্যি কিনা ! মনে নেই, সেদিন রাতে তোমাকে কেমন কামড়ে দিয়েছিলাম !

Natasa ॥ তুমি একটি আস্ত জানোয়ার।

[ভৃত্য একটি কার্ড আনিয়া এঙ্গেল হার্দৎ-এর সামনে ধরিল]

Engelhardt ॥ একি! Vassily Ivanovich Grigorovich, Secretary of the Academy of Arts, St. Petersburg! নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। (ভৃত্য চলিয়া গেল) Academy of Arts-এর সেক্রেটারী! দেখা করতে আসছে আমার সঙ্গে। বোঝ আমি শালা কে! কিন্তু এ শালাকে তো আমি চিনি না। [গ্রিগোরোভিচ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন]

Engelhardt ॥ আসুন হুজুর আসুন। দয়া করে বসুন। ইনি আমার বান্ধবী নাতাসা। আর ইনি একাডেমি অব আর্টসের অতবড় নর্তক!

Natasa ॥ নর্তক কিনা জানিনা, তবে, তবে নামজাদা চিত্রকর, সে আমি জানি। ওঁর আঁকা ছবি আমি কিনে ঘরে রেখেছি। আপনি বুঝি নাচেনও।

Grigorovich ॥ না না আমি নাচি-টাচি না। তবে হ্যাঁ, ছবি-টবি আঁকি! আপনি যে আমার আঁকা ছবি ঘরে রেখেছেন সেজন্য সত্যিই আমি গৌরব বোধ করছি। ধন্যবাদ। আমি যে জন্য আজ এসেছি, বলছি।

Engelhardt ॥ বলুন হুজুর, বলুন। আপনি এই গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এতেই আমি ধন্য।

Grigorovich ॥ Bryullov, Bryullov কে জানেন তো?

Engelhardt ॥ তা আর জানবো না? অতবড় বাজীকর—না না, চিত্রকর! তাঁকে যদি না জানবো তবে এই মনুষ্য জন্ম বৃথা।

Grigorovich ॥ হ্যাঁ, সেই Bryullov, Zhukovsky-এর একটা পোট্রেট আঁকে। Zhukovsky কে আশা করি সেটা বলে দিতে হবে না?

Engelhardt ॥ না-না। অতবড় খেলোয়াড়—

Natasa ॥ আঃ! কবি বল।

Engelhardt ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ খেলোয়াড়-কবি। জগতের সেরা কবি। কবি হওয়া মানেই কথা নিয়ে খেলা। কাজেই খেলোয়াড় তো বটেই। হ্যাঁ হুজুর বলুন।

Grigorovich ॥ Bryullov-এর আঁকা Zhukovsky-র পোট্রেট আমরা লটারি করেছিলাম। পাওয়া গেছে কত জানেন?

Engelhardt ॥ কত?

Grigorovich ॥ আড়াই হাজার রুবল্।

Engelhardt ॥ বলেন কি ?

Grigorovich ॥ হ্যাঁ। ঐ ক্রীতদাসটির মুক্তির জন্য ঠিক যা ছিল আপনার দাবি। (পার্শ খুলিয়া আড়াই হাজার রুবল্ সামনে রাখিলেন) এই আড়াই হাজার রুবল মুক্তি পণ নিয়ে আপনার ঐ গোলামটির মুক্তি-পত্র দয়া করে লিখে দিন।

Engelhardt ॥ বলেন কি হুজুর। আমি অবাক হচ্ছি। হ্যাঁ, অবাক-ই হচ্ছি। ঐ ঘোড়ার ডিমের মধ্যে মহামান্য হুজুর আপনারা এমন কি দেখলেন যে ওকে নিয়ে এত মাতামাতি সুরু করেছেন আপনারা। না-না আমি অবশ্য এতে খুশীই হচ্ছি। ছবি-টবি একটু আধটু আঁকতে পারতো এ অবশ্য আমিও দেখেছি। আর তা দেখেই চিত্রকর Shirayev-এর কাছে ওকে এ্যাপ্রেন্টিস্ করে দিয়েছিলাম। তাতেই এখন যা একটু শিখেছে। খোদাইয়ের কাজও কিছু পারছে। ওর আঁকা দু'একটা পোর্ট্রেট-এর তারিফ আমিও করি। এই তো আমার বান্ধবীর পোর্ট্রেট করবার জন্য হুকুম দিয়েছি। কিন্তু ওর মধ্যে আপনারা হুজুর এমন কি দেখলেন, যাতে বাঘা বাঘা সব শিল্পী, বাঘা বাঘা সব কবি ওকে নিয়ে নেচে উঠেছেন!

Grigorovich ॥ কয়লার মধ্যে হীরে লুকিয়ে থাকে। আপনার এ শেভচেঙ্কো হচ্ছে তাই। হ্যাঁ, ওর হাতের কাজ দেখেই আমরা এ কথা বলছি। আপনি জানেন কি, শেভচেঙ্কো শুধু ছবি আঁকে না। কবিতাও লিখেছে। ওর "Bewitched" কবিতাটি আমি পড়েছি। পড়লেই প্রাণ আনচান করে। এ দুনিয়ায় প্রতিভা বড়ই দুর্লভ। শেভচেঙ্কোর মধ্যে সেই প্রতিভার সন্ধান আমরা পেয়েছি বলেই ওকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেখতে চাই কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আপনি তাহলে মুক্তিপত্রটি লিখতে থাকুন। আমি ততক্ষণ শেভচেঙ্কোর সঙ্গে কয়েকটি দরকারী কথা সেরে নিতে চাই।

Engelhardt ॥ (শেভচেঙ্কোকে) ওহে হীরের টুকরো, যাও—যাও। লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ওঁকে নিয়ে বসো! [শেভচেঙ্কো ও গ্রিগোরোভিচ চলিয়া গেলেন। যাওয়া মাত্র এঙ্গেল হার্দৎ নিজের গাল এবং পাছা চাপড়াইতে লাগিলেন।]

Natasa ॥ কি হলো? কি হলো? অমন করছো কেন?

Engelhardt ॥ হারামজাদার দাম আমি দশ হাজার রুবল্ বলিনি কেন? চাইলেই দিতো। কি ঠকাই না ঠকে গেলাম।

Natasa ॥ আমিও ঠকে গেলাম। যার হাতের কাজ দেখে Bryullov,

Zhukovsky, Grigorovich মোহিত হয়েছেন, সে ছেলেটার হাতে সত্যি যাদু আছে। তাকে দিয়ে আমার ছবি আঁকানো হলো না। হ্যাঁ, এ দুঃখ আমার রয়ে গেল। কিন্তু একটা কথা; তুমি এমন বেকুব কেন বলোতো ?

Engelhardt ॥ বলছি তো, বেকুব আমি নিশ্চয়ই। নইলে আড়াই হাজার রুবলে একটা হীরের খনি আমি ছেড়ে দিচ্ছি ?

Natasa ॥ একবার কথা যখন দিয়েছো, সে তোমাকে দিতেই হবে। তোমাকে বেকুব বলছি সে জন্য নয়। বেকুব বলছি এই জন্য যে তুমি চিত্রকর গ্রিগোরোভিচকে বললে নাচিয়ে। আর কবি Zhukovsky-কে বললে খেলোয়াড়। কি লজ্জাটা পেলাম বলতো।

Engelhardt ॥ ওসব বলতে হয়, বলতে হয়। ওসব লোককে আমরা বেশ ভাল করেই চিনি। কিন্তু আমরা বড়লোক। আমাদের ভাণ করতে হয় না চেনবার। জেনে রাখবে, জমিদারদের এটা একটা খানদানি কায়দা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

——

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

(১৮৪২ সাল)

[Ivan Soshenko র ফ্ল্যাট : সেণ্ট পীটার্সবার্গ। রোগপীড়িত শেভচেঙ্কো একটি চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া আরাম কেদারায় শায়িত। পাশের একটি টেবিলে ঔষধপত্র এবং পথ্যাদির সরঞ্জাম রহিয়াছে। ইহা যে শিল্পীর কক্ষ, ঘরে প্রবেশ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ালে টাঙানো বিভিন্ন শিল্পীর চিত্রাবলী। ঘরের এক কোনে ছবি আঁকিবার সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে। প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণরশ্মি উন্মুক্ত বাতায়ন পথে শেভচেঙ্কোর দেহে আসিয়া পড়িয়াছে। ঔষধ হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সহবাসী সতীর্থ চিত্রকর বন্ধু V. I. Sternburg. তিনি আসিয়া শেভচেঙ্কোর মাথায় হাত রাখিলে শেভচেঙ্কো মুখ হইতে চাদরটি সরাইয়া লইলেন।]

Sternburg ॥ কি বন্ধু, এখন কেমন বোধ করছো ? জ্বর আছে বলে তো মনে হয় না।

Shevchenko ॥ না, জ্বর নেই। কিন্তু কেমন অবসন্ন বোধ হচ্ছে।

Sternburg ॥ ডাক্তারকে আমি তা বলেছি। তিনি সব শুনে বললেন, কাল রাতে ঘুম হয়নি, তাই। ওষুধপত্র দিয়েছেন। ঘুমের জন্য 'পিল' ও দিয়েছেন।

Shevchenko ॥ ঘুমের পিলটা দাও।

Sternburg ॥ না না, ঘুমোবে কি ? তোমাকে যে সব দেখতে আসছেন !

Shevchenko ॥ কারা ?

Sternburg ॥ Bryullov আর Zhukovsky.

Shevchenko ॥ সে কি ?

Sternburg ॥ হ্যাঁ। ওঁরা সকালে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা। শুনে ওঁরা বললেন, বেড়িয়ে ফেরার সময় ওঁরা তোমাকে দেখে যাবেন।

Shevchenko ॥ বল কি ? ওঁরা আমাকে দেখতে আসছেন ! কি আশ্চর্য ! কে আমি ! এক ক্রীতদাসের ছেলে। তাই ভাবছি—

Sternburg ॥ কি ?

Shevchenko ॥ মুক্তির পর এই চার বৎসরেই আমার ভাগ্যের কি পরিবর্তন। একাডেমির ছাত্র আমি। স্বয়ং Bryullov আমার গুরু। কোনো ক্রীতদাস এটা কল্পনা করতে পারতো ?

Sternburg ॥ না, তা আর কি করে পারবে? এই চার বৎসরেই তুমি তো শুধু বিশিষ্ট চিত্রকরই হওনি, নামজাদা কবিও হয়েছো। তোমার লেখা কবিতা বই হয়ে বেরিয়েছে। দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

Shevchenko ॥ (উত্তেজিত হইয়া) কাজেই বন্ধু, এটা কি তোমার মনে হচ্ছে না যে উপযুক্ত সুযোগ আর পরিবেশ পেলে ক্রীতদাসেরাও মানুষের মতো মানুষ হতে পারে?

Sternburg ॥ তা তো বটেই।

Shevchenko ॥ শক্তির কি বিরাট অপচয়! আমি বলবো, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে এমনি করে পায়ের তলায় চেপে রেখে ঈশ্বরকেই অপমান করছেন Tsar। ঈশ্বরের শত্রু মানুষের শত্রু এই Tsar।

Sternburg ॥ পায়ের শব্দ পাচ্ছি। বোধহয় ওঁরা এসে গেলেন।

[দরজায় করাঘাত শোনা গেল। Sternburg ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিলেন Bryullov, Zhukovsky ও Grigorovich]

সকলেই ॥ সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!

Zhukovsky ॥ (শেভচেঙ্কোকে) আবার অসুখ করলো কেন? খুব খাটছো বুঝি?

Bryullov ॥ আমাকে তুমি গুরু বলে মানোনা দেখছি শেভচেঙ্কো। আমি তোমাকে কতবার বলেছি তুমি চিত্রশিল্পী। রাতের পর রাত জেগে কবিতা লিখতে যেয়ো না।

Zhukovsky ॥ কবিতা যদি ওকে ভর করে তাহলে তুলি ফেলে কলম ওকে ধরতেই হবে। যাক এখন কেমন আছো বলো।

Shevchenko ॥ খুব ভাল আছি। আপনার ছবি, আপনার কবিতা এ দুঃখের জগতে মানুষকে আনন্দ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে—সেই আপনারা স্বয়ং আসছেন আমাকে দেখতে—আমি কি বলবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সব অসুখ সেরে গেছে।

Grigorovich ॥ ওহে শেভচেঙ্কো! তবে দুঃসংবাদটা তোমাকে এদের সামনেই দি। হ্যাঁ, এঁরাই তোমাকে দিতে পারবেন সে দুঃসংবাদ সইবার শক্তি।

Zhukovsky ॥ দুঃসংবাদ!

Grigorovich ॥ দুঃসংবাদ ছাড়া কি! একাডেমিতে শেভচেঙ্কো চার বৎসর কেটে গেল। Bryullov-এর মতো গুরুর কাছে শিক্ষা পেল। এতদিনে ওর একাডেমিসীয়ান উপাধি পাওয়া উচিত ছিল। ছিল না কি?

Zhukovsky ॥ নিশ্চয়! শেভচেঙ্কোর আঁকা অনেক ছবিই আমি

দেখেছি। কিন্তু ওর "A Begger Boy Gives His Bread to a Dog." ছবিটা আমি মনে করি অসাধারণ, অপূর্ব। ওর আর একটা ছবি "A Gypsy Woman Telling a Ukrainian Girl Her Fortune"। সেটিও অপূর্ব। Bryullov-কে তখন আমি অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলাম, সার্থক তোমার গুরুগিরি।

Bryullov ॥ কিন্তু এসব ছবি একাডেমিতে অস্পৃশ্য। একাডেমি চায় বাইবেল অথবা পৌরাণিক কাহিনীর ছবি। কাজেই একাডেমির কর্তারা সুনজরে দেখেন নি শেভচেঙ্কোর বাস্তব-ধর্মী এইসব ছবি।

Grigorovich ॥ আর তাই কর্তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শেভচেঙ্কো 'Academician' উপাধি পাবে না। দুঃসংবাদ এই।

Bryullov ॥ অবশ্য এর আর একটি কারণও আছে শেভচেঙ্কো। আমি এখন মহামান্য জারের বিরাগভাজন। জারের 'Bad Book'-এ নাকি আমার নাম উঠেছে। কাজেই গুরুর পাপে শিষ্যকেও দণ্ড পেতে হবে বৈকি! ইতালিতে গিয়ে শিক্ষার সুযোগটিও তুমি এই জন্য পাবে না, এও আমি বলে রাখছি।

Grigorovich ॥ Bryullov মিথ্যা বলেন নি! এ দুঃসংবাদটাও আমি এখনই দিতে যাচ্ছিলাম।

Zhukovsky ॥ শিল্পীকে রাজনীতির শেকলে বেঁধে রাখা একমাত্র আজকের রাশিয়াতেই সম্ভব।

Bryullov ॥ যাক। তোমার প্রতিভাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না শেভচেঙ্কো। তোমার পোর্ট্রেট পেন্টিং, তোমার এনগ্রেভিং আমি যা দেখেছি তাতে এ ভবিষ্যৎবাণী করছি—তুমি সকল শাসনের ঊর্ধ্বে।

Zhukovsky ॥ তবে আমিও এক ভবিষ্যদ্বাণী করবো। এ ভবিষ্যদ্বাণী শেভচেঙ্কোর কবিতা সম্পর্কে। আচ্ছা কবিতা তুমি কতদিন লিখছো?

Shevchenko ॥ ১৮৩৭ সালে "Summar Garden"এ পালিয়ে এসে যখন স্ট্যাচুগুলো নকল করে আঁকতাম, তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম্য ছড়া আর গান বাঁধতাম। আমাদের ইউক্রেনে অন্ধ গায়েনরা গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। তাদের বলা হয় 'Kobzar'। সেই সব গান আর সেই সব সুর আমাকে পাগল ক'রে তুলতো। এখনও করে। আমার ছড়া, আমার কবিতা তাদেরই প্রতিধ্বনি। জানি অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচিতে আমার এই গ্রাম্য গান আর ছড়া Vulgar। কিন্তু তবু—তবু ১৮৩৮ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে আমার সেই দাসত্ব মুক্তির পরমানন্দে আমার দুঃসাহস বিচার করে দেখিনি—আমার 'Katerina' কবিতাটি আপনাকে উৎসর্গ করেছি, আর 'Haidamaki' কবিতাটি উৎসর্গ করেছি এই Grigorovich-কে। আমি গরীব। কৃতজ্ঞতা জানাবার এর চেয়ে বড় কিছু আমার ছিল না, আজো নেই।

Grigorovich ॥ বিনয় রাখো শেভচেঙ্কো। এই দু বছরের মধ্যে তোমার ছড়ার বই Kobzar আর Epic কবিতা Haidamaki বেরিয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সারা রাশিয়াকে যেন নাড়া দিয়েছে তোমার এই দুই বই।

Shevchenko ॥ না-না-না। অমন করে বলবেন না। রাশিয়াকে, জারের রাশিয়াকে, মৃত গলিত রাশিয়াকে নাড়া দেওয়া সে আমার সাধ্য নয়। জারের অত্যাচারে, জমিদারদের অনাচারে গোটা রাশিয়াটা আজ প্রাণহীন পাথর। গোটা ইউক্রেন আজ নির্জীব মরুভূমি।

Zhukovsky ॥ নাঃ, দেখছি, আমাদের এখন যেতেই হয়। অসুস্থ শরীরে তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ছো শেভচেঙ্কো। কিন্তু যাবার আগে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি করবো বলেছিলাম, সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করছি। তোমার kobzar আর Haidamaki এই দুই কবিতায় ভাবের যে অঙ্কুর আর জীবনের যে স্পন্দন আমি দেখেছি, তা একদিন একটা ভূমিকম্প ঘটাবে। এসো Bryullov, এসো Grigorovich.

Bryullov ॥ হ্যাঁ, চলো। আচ্ছা, Soshenko-র খবর কি?

Shevchenko ॥ ঐ আর একটি লোক। যিনি তাঁর এই দেশী ভাইটিকে ধূলো থেকে হাতের মুঠিতে তুলে নিয়ে আপনাদের কৃপা-ধন্য করে তাঁর নিজের এই ফ্ল্যাট-এ আমাকে ঠাঁই দিয়ে গেছেন আমার সেই মুক্তির দিনটি থেকেই। চিঠি পেয়েছি বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে শিগ্গীরই ফিরছেন।

Bryullov ॥ হ্যাঁ। সে না থাকলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। আচ্ছা চলি। সেরে উঠলেই একাডেমিতে এসো।

[Bryullov, Zhukovsky এবং Grigorovich চলিয়া গেলেন।]

Sternburg ॥ Bryullov-এর মুখখানা আজ লক্ষ্য করে দেখেছিলে কি?

Shevchenko ॥ কেন বলো তো?

Sternburg ॥ Bryullov কে আজ খুব ম্লান দেখাচ্ছিলো না কি? তুমি হয়ত লক্ষ্য করনি। কিন্তু আমি দেখেছি, আর সেই সঙ্গে দেখেছিলাম Zhukovsky-র মুখখানা।

Shevchenko ॥ এসব কেন বলছো, বলতো?

Sternburg ॥ তোমার তুলির খ্যাতির চেয়ে কলমের খ্যাতিটা বেড়ে গেছে। মনে হলো Bryullov তোমাকে যেন হারালেন, আর বুকে তুলে নিলেন Zhukovsky.

Shevchenko ॥ না না, তুমি এসব কি বলছো? ওঁরা দু'জনেই আমাকে বুকে তুলে নিয়েছেন। কেউ আমাকে হারাবেন না। তুলি আর কলম—এ হল আমার দুটি হাত।

Sternburg ॥ তা যদি বলো, তবে তোমার ডান হাতে এখন কলম, আর বাঁ হাতে তুলি।

[উভয়েই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। দরজায় করাঘাত হইল।]

Sternburg ॥ আবার কে এলো ?

Shevchenko ॥ বোধ হয় Prince Saltykov। আজ সকালে আসবেন কথা আছে।

Sternburg ॥ Prince Saltykov ! তিনি আবার কে ?

Shevchenko ॥ কেন, নাম-করা ভবঘুরে চিত্রকর। দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়ান আর 'ছবি আঁকেন। কিছুদিন হলো ভারত থেকে ফিরেছেন। দেখ তো, তিনি কিনা !

[Sternburg উঠিয়া গিয়া Saltykov-কে লইয়া আসিলেন।]

Saltykov ॥ সুপ্রভাত !

Shevchenko ॥ সুপ্রভাত ! আমার সেই বন্ধু Sternburg। আর ইনি সেই ভ্রাম্যমান চিত্রকর Prince Saltykov। [Sternburg ও Saltykov উভয়েই করমর্দন করিলেন।]

Shevchenko ॥ আপনি বলেছিলেন পৃথিবীর এত সব দেশ দেখে কি যেন একটা আবিষ্কার করেছেন। সেই আবিষ্কারটা কি, আজ আপনার বলার কথা।

Saltykov ॥ সেটা এক মুহূর্তেই বলা যায়।

Shevchenko ও Sternburg ॥ কি ?

Saltykov ॥ দুনিয়ায় দেশ বহু, কিন্তু জাত একটা।

Shevchenko ॥ বলেন কি ?

Saltykov ॥ হ্যাঁ, সে জাতটার নাম মানুষ।

[তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন।]

Shevchenko ॥ কথাটা এক হিসাবে খুবই সত্য। কিন্তু আরেক হিসাবে মিথ্যে।

Saltykov ॥ মিথ্যে ? কেন বল তো ?

Shevchenko ॥ আমি বলবো জাত দুটো। মানুষ আর অমানুষ।

[সকলের হাস্য]

Saltykov ॥ হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে।

Shevchenko ॥ এই রাশিয়া দেখুন। আদি যুগে একটা জাতই ছিল—মানুষ। হ্যাঁ, সবাই ছিল তখন মানুষ। কিন্তু কিছু লোকের মনে বাসা বাঁধলো লোভ। এই লোভের বশে—বরং বলবো, দুর্লোভের বশে সেই কিছু লোক অন্য লোকদের শোষণ করা শুরু করলো—ছলে,বলে, কৌশলে। ছিল

মানুষ, হয়ে গেল অমানুষ—রাক্ষস। যেমন এই Tsar। দুনিয়ার আর সব দেশেও কি তাই? এই তো ভারত দেখে ফিরলেন। সেখানে কি দেখলেন?

Saltykov ॥ তা যদি বলো, তোমার ওকথা সব দেশেই খাটে। ভারতে তো বটেই। সেখানেও বিদেশী বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজতক্তে বসে এক হাতে করছে শাসন, আর এক হাতে করছে লুণ্ঠন। বরং বলবো, সেখানে শাসন মানেই শোষণ।

Shevchenko ॥ তাহলে ভারতেও মূলতঃ জাত ঐ দুটো। মানুষ আর অমানুষ। আমার আর শুধু একটি জিজ্ঞাসা।

Saltykov ॥ কি?

Shevchenko ॥ ওখানকার মানুষগুলো কি এই মুষ্টিমেয় অমানুষদের শাসন আর নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করছে? মাথা পেতে নিচ্ছে?

Saltykov ॥ না। সেখানেও দেখে এসেছি, প্রজাদের অসন্তোষের বারুদ জমছে। একটা দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বালানো যা বাকি।

Shevchenko ॥ দেখে এসেছেন? আপনি দেখে এসেছেন?

Saltykov ॥ দেখে এসেছি। আর সে বারুদ ওখানে জ্বললো বলে।

Shevchenko ॥ আর এখানে?

Saltykov ॥ এখানে জ্বলবে তারও আগে।

Sternburg ॥ কেন?

Saltykov ॥ এখানে Shevchenko-র মত একজন কবি পেয়েছি আমরা। যার কবিতায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। ইংরেজদের একটা কথা আছে Pen is mightier than Sword—অসির চেয়ে মসী বড়।

Shevchenko ॥ কি বললেন! অসির চেয়ে মসী বড়?

Saltykov ॥ হ্যাঁ, অসির চেয়ে মসী বড়।

[দরজায় করাঘাত হইল। Sternburg গিয়া দরজা খুলিলেন। দরজায় Engelhardt এবং Natasa কে দেখা গেল।]

Engelhardt ॥ শোন হে, আমরা শেভচেঙ্কোর সাথে দেখা করতে এসেছি। মানে, আমি আসিনি, এসেছেন ইনি। আর ইনি এসেছেন বলে আমাকে আসতে হয়েছে। কান টানলেই যেমন আসে মাথা।

Sternburg ॥ শেভচেঙ্কো অসুস্থ।

Engelhardt ॥ কাজে ফাঁকি দেবার সেই অছিলা। (চীৎকার করিয়া) এই শেভচেঙ্কো! আসবো? আমি ব্যারন এঙ্গেল হার্দৎ। ব্যাপারটা প্রাইভেট।

Shevchenko ॥ ষ্টার্ণবার্গ! ওঁরা আসুন।

[এঙ্গেল হার্দৎ ও নাতাসা ঘরে প্রবেশ করিলেন]

Engelhardt ।। নাঃ, কালে কালে যে কত কি দেখবো।

Shevchenko ।। সুপ্রভাত।

Natasa ।। সুপ্রভাত।

Engelhardt ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুপ্রভাত। তুমি তো আর এখন, মানে, যা-তা লোক নও। কিন্তু জেনো, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। এসেছেন ইনি। আর ইনি এসেছেন বলেই, আসতে হলো আমাকে। তা, এটা কিন্তু প্রাইভেট ভিজিট। (বলিয়াই Sternburg ও Saltykov-এর দিকে তাকাইলেন।)

Sternburg ।। শেভচেঙ্কো, আমার সেই জরুরী কাজটা সেরে আসি।

Saltykov ।। আমিও চলি। আমার দেরী হয়ে গেছে। মনে রেখো Shevchenko, অসির চেয়ে মসী বড়।

[উভয়ে বাহিরে চলিয়া গেলেন]

Shevchenko ।। আপনারা দয়া করে বসুন।

Engelhardt ।। ও হ্যাঁ। চেয়ারও আছে দেখছি! তা ঘরটা সাজিয়েছে বেশ। বসো Natasa। তুমি তো আবার সোফা ছাড়া বসতে পারো না। প্রজাদের শায়েস্তা করতে মাঝে মাঝে আমাকে তাদের বাড়িতে যেতে হয় তো, আমার সব চলে।

[উভয়েই বসিলেন। শেভচেঙ্কোও বসিলেন]

Engelhardt ।। (Natasa-কে) কি বলবে চটপট সেরে নাও। আমি ততক্ষণ ঘোড়দৌড়ের 'টিপ'গুলো দেখি।

Natasa ।। আমার পোর্ট্রেট আঁকার কথা ছিলো তোমার। কিন্তু যেজন্য সেদিন তা' আঁকা হয়নি, তাতে আমি খুশীই হয়েছি শেভচেঙ্কো।

Shevchenko ।। আমি তা বিশ্বাস করি। আপনি বলেছিলেন, আমাকে অপমান করে আমাকে দিয়ে আপনার ছবি আঁকালে আপনার অপমান হবে। কথাটা আমার মনে এখনও গেঁথে আছে। আমি আপনার পোর্ট্রেট আঁকবো।

Natasa ।। কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমার পোর্ট্রেট আঁকাতে আজ আমি আসিনি। আমি জানতে এসেছি, তুমি আমার জীবনের গোপন কথা কি করে জানলে শেভচেঙ্কো।

Shevchenko ।। সে কি? আমি আপনার জীবনের কথা জেনেছি! এ আপনি কি বলছেন?

Natasa ॥ তুমি জানো, তুমি জানো। আর তা জানো বলেই তুমি লিখেছো তোমার 'Katerina' কবিতা।

[ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া 'Katerina' কবিতাটি পড়িতে লাগিলেন।]

"O lovely maidens, fall in love,
But not with Muscovites,
For Muscovites are foreign folk,
They do not treat you right.
A Muscovite will love for sport,
And laughing go away ;
He'll go back to his Moscow land
And leave the maid a prey
To grief and shame ....."
['Katerina' : 1838 St. Petersburg,]

হুবহু আমার জীবন। কি করে তুমি জানলে! কি করে তুমি জানলে?

Shevchenko ॥ এমন যে আমি ইউক্রেনে হামেশা দেখেছি। মস্কোর সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা,—সামন্ত জমিদাররা—জারের সেনানীরা এমন কত শত সরলা মেয়েকে প্রলুব্ধ করে তাদের শান্তির কুটীর থেকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বাসনা চরিতার্থ করে শেষে আবর্জনার মত ফেলে দিয়েছে পথে। আমার এই 'Katerina'র অবস্থাটা কল্পনা করুন, যখন তার কোলে এলো ঐ অবৈধ মিলনের সাক্ষী হয়ে একটি সন্তান।

Natasa ॥ আমারো এসেছিলো—আমারো—

Shevchenko ॥ তখনই সুরু হয় অকথ্য সামাজিক নির্যাতন। সে নির্যাতন সইতে না পেরে, কোলের শিশুটির ভরণপোষণ করতে না পেরে আমার সেই অভাগিনী Katerina আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়ালো।

Natasa ॥ আমি কিন্তু তা পারিনি। আমি কিন্তু তা পারিনি। আমার সেই সন্তানকে মানুষ করবার জন্য আমি হলাম বারবনিতা; আমি হলাম (এঙ্গেল হার্দৎকে দেখাইয়া) এমনি একটা পশুর—একটা বাজে লোকের রক্ষিতা।

Engelhardt ॥ নঃ, আর দেখছি থাকা চলে না। মাতলামীর মাত্রাটা মাগীর বেড়েই যাচ্ছে দেখছি। (নাতাসাকে) এই ওঠ্—চল্।

Natasa ॥ না না, আর একটু, আর একটু—

Engelhardt ॥ না। আর একটুও নয়। এই আমি চললাম। এলি তো মাস পয়লায় মাসোহারার টাকাটা মিলবে। না এলি তো খতম।

ওরে শালী, তুই আমাকে বাজে লোক বলবি আর আমি তোকে মাস মাস টাকা গুণবো ? দেখি তোর ছেলে মানুষ হয় কি করে।

Natasa ॥ (Engelhardtকে) না না, আমাকে ক্ষমা করো। চল চল, আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি !

[Natasa Engelhardt এর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল।]

Shevchenko ॥ দাঁড়াও মা। আমি একটি মা খুঁজছিলাম—যার পোর্ট্রেট এঁকে দেখাতে পারি মা কী! মা কে! দেবে মা আমাকে আঁকতে তোমার পোর্ট্রেট ?

Engelhardt ॥ ওরে হতভাগা, সেজন্য আমার অনুমতি চাই। ওর নয় !

Shevchenko ॥ দেবেন আপনি আমাকে সেই অনুমতি ?

Engelhardt ॥ আচ্ছা, সে আমি ভেবে দেখবো। কিন্তু ওর ছবি আঁকতে হলে তোকে, না না—তোমাকে তোমাকে, তুমি এখন নামজাদা শিল্পী—তোমাকে তার দাম দিতে হবে।

Shevchenko ॥ দেব। কত দাম আপনি চান।

Engelhardt ॥ সেটা আমি ভেবে চিন্তে বলবো। আর ঠকতে আমি রাজি নই। (Natasaকে) চলে আয়। ঘরের গন্ধে আমার বমি আসছে।

Shevchenko। শুনুন হুজুর, আমার আর একটা আরজি আছে।

Engelhardt ॥ কি ?

Shevchenko ॥ থাকবার মধ্যে আমার একটি মাত্র বোনই আছে। Yarina। আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। কিন্তু সে এখনও আপনার ভূমিদাসী। তার মুক্তির জন্যে আমার যথাসর্বস্ব বিক্রি করে আপনাকে আমি আড়াই হাজার রুবলই দেব। দয়া করে দেবেন আপনি তাকে মুক্তি ?

Engelhardt ॥ না—না—না। মাত্র আড়াই হাজার রুবল ! না—না—না—একবার ঠকেছি, আর ঠকবো না। তুমি তো এখন বড় লোক হে। হাঃ—হাঃ হাঃ—

[Natasaকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

Shevchenko ॥ বটে ! আচ্ছা। পৃথিবীতে দুটো জাত—মানুষ—আর—অ-মানুষ। লড়াই চলছে—লড়াই চলবে। Saltykov, আমি ভুলব না—এ লড়াইএ অসির চেয়ে মসী বড়।

॥ যবনিকা ॥

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

(১৮৪৩ সাল)

ইউক্রেন অঞ্চলে Kiev প্রদেশে Baron Engelhardt-এর জমিদারীর অন্তর্গত Kirillowa গ্রাম। যুবতী ভূমিদাসী Likera Polusmakova-এর বৃদ্ধ পিতা ভূমিদাস Razin এর কুটির প্রাঙ্গন। সন্ধ্যাকাল। কতিপয় ভূমিদাস উপস্থিত। এক অন্ধ গায়েন।

(Kobzar) গান গাহিতেছে, তৎসহ একটি বালক Kobza বাজাইতেছে, যুবক ভূমিদাসগণ ঐ Kobzar গানের দোহার। Likera এবং শেভচেঙ্কোর ভূমিদাসী ভগ্নী, যুবতী Yarina ইহাদের পানীয় এবং তামাক পরিবেশন করিতেছে।]

॥ গান ॥

On earth there is fortune—
On whom does it smile ?
On earth there is freedom—
On whom does it shine ?
On earth there are people—
All silver and gold,

*   *

Take your gold and silver,
Be rich if you will,
But I prefer tear-drops
To pour out my ills ;
I'll drown out misfortune —
With tears for a sea,
I'll stamp out oppression—
With my naked feet ।
The time when I'm happy
And wealthy will come
The day when my spirit
In freedom can roam !

['Katerina' : 1838—St. Petersburg]

Razin ॥ কি আর বলবো বলো, সেই ঘোড় সওয়ারটা আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে আমাদের ঠকিয়ে গেছে। সন্ধ্যা উতরে গেল, কই, Shevchenko তো এলো না।

১ম ভূমিদাস ॥ আরে মশাই! আমি কত দূরের লোক; হাটে এসে শুনলাম ঘোড় সওয়ারটা বলছে, বুড়ো Razin-এর বাড়িতে আজ সন্ধ্যা বেলা আসবে Shevchenko। ভাবলাম, আমাদের মতই এক ভূমিদাসের ছেলে Shevehenko অতবড় গান লিখিয়ে হয়েছে, যার গান আজ ইউক্রেনের লোকের মুখে মুখে ফিরছে! ভাবলাম ছোকরাকে দেখতে হবে। তা কিনা এলো না!

কয়েকজন ভূমিদাস ॥ আমরাও তো তাই এসেছিলাম। খুজে খুঁজে বুড়ো Razin-এর এই বাড়ি বের করাই সার হলো। কিন্তু রাত হ'য়ে আসছে, আর তো থাকা চলে না।

অপর কয়েকজন ভূমিদাস ॥ তোমরা ভিন্ গাঁয়ের লোক; তোমরা চলে যাও; আমরা যারা এই Kirillova গাঁয়ের লোক, আমরা থাকবোই।

২য় ভূমিদাস ॥ ঘোড় সওয়ার আসছিল ঘোড়ায় চড়ে। Shevchenko আসছিলো পায়ে হেঁটে। এ গাঁয়ে আসতে তার রাত হবে বলেই ঘোড় সওয়ারকে দিয়ে আগে ভাগে খবর পাঠিয়েছে—

৩য় ভূমিদাস ॥ যাতে এখানে এসে রাতের খাবারটা মেলে।

Razin ॥ রাতের খাবার তো তৈরী। আমার মেয়ে Likera ছিল Shevcchenko-র ছোটবেলার খেলার সাথী। ও আসছে খবর পেয়ে Likera কত রকম রান্না রেঁধে রেখেছে। তা দেখছি সবই মাটি হলো।

৩য় ভূমিদাস ॥ মাটি হবে কেন, আমরা দূর গাঁয়ের লোক। আমাদের খাইয়ে দাও না হে।

Likera ॥ না না, রাতে যদি আমাদের অতিথিটা এসে পড়ে তখন কি আমরা তাকে ঘোড়ার ডিম খাওয়াবো?

[সকলে হাসিয়া উঠিল।]

৪র্থ ভূমিদাস ॥ Likera ঠিকই বলেছে। আজ রাতে যদি Shevchenko না আসে, আমরা কাল ভোরে খামারে যাবার পথে ঐ মিষ্টি খাবারগুলো চেটে যাবো।

৫ম ভূমিদাস ॥ তা নয় তো কি! কোত্থেকে ভিন্ গাঁয়ের লোক এসেছো তোমরা। চিনি না, জানি না। তোমরা আমাদের ভাগে ভাগ বসাবার কে হে?

১ম ভূমিদাস ॥ তোমরা কেমন বেকুব হে! Shevchenko-র ঐ যে অমন গানটা শুনলে, ওটা কি শুধু এই Kirillovka গাঁয়ের লোকের জন্যে সে লিখেছে? গোটা ইউক্রেনের লোকদের জন্য সে ঐ গান বাঁধে নি?

৬ষ্ঠ ভূমিদাস ॥ ঠিক, ঠিক। Shevchenko-র গানের ভাগীদার যখন সবাই, তার খাবারের ভাগীদারও আমরা সবাই। (Likeraকে) আনো তার খাবার। আমরা সবাই মিলে খাবো।

৫ম ভূমিদাস ॥ বটে। ভিন্ গাঁয়ের লোকদের এত বড় আস্পর্ধা! আমাদের গাঁয়ের খাবার লুটপাট করে খেতে চায়!

Razin ॥ গোলামী করে করে দেখছি তোমরা মনিবের ঐ লুটপাটের গুণটিই শুধু পেয়েছো।

১ম ভূমিদাস ॥ বুড়ো Razin তুমি ঠিকই বলেছো। Shevchenko কত গানে মালিকদের লুটপাটের কি নিন্দেই না করেছে। না না, লুটপাট নয়।

২য় ভূমিদাস ॥ তুমি ঠিকই বলেছো। যে লুটপাটের আমরা এতটা নিন্দে করি, সে লুটপাট আমরা নিজেরা করবো না। চলো, আমরা সবাই মিলে মিশে চলে যাই।

৬ষ্ঠ ভূমিদাস ॥ বেশ তাই হোক। তবে একটা কথা, আমরা ভিন্ গাঁয়ের লোক চলে যাবো আর এ-গাঁয়ের লোক এখানে বসে খাবার খাবে সেটি হচ্ছে না। যেতে হয় চলো সব একসঙ্গে যাবো।

অনেকে ॥ ঠিক, ঠিক!

৩য় ভূমিদাস ॥ Shevchhenko যদি আসে, খবরটা আমরা যেন পাই হে!

Razin ॥ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এ গাঁয়ের ছেলে—ভূমিদাসের ছেলে, রাজধানীতে গিয়ে সে আজ এত বড় হয়েছে, দেশবিদেশে নাকি নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সে হয়েছে আজ ইউক্রেনের সূর্য—আমার এই একমুঠো আকাশে উঠলেও, তোমরা সবাই তাকে দেখবে বৈ কি!

সকলে ॥ ঠিক ঠিক।

১ম ভূমিদাস ॥ ওহে Kobzar; গানটা ধর দেখি। চল আমরা সকলে গাইতে গাইতে যাই।

[Kobzar গানটি আবার ধরিল। সকলে তাহার সহিত সুর মিলাইয়া ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিল।]

Razin ॥ ওরে, হতভাগী Likera, ওরে Yarina, আর কেন? আসর ভাঙলো। পিঁড়ি, মাদুর, লণ্ঠন তুলে সব ঘরে নে।

Likera ॥ লণ্ঠনটা টাঙানোই থাক বাবা। যদি সে আসে। আলো থাকলে তবে তো বাড়িটা চিনবে।

Razin ॥ তা বটে, লণ্ঠনটা তবে থাক!

Yarina ॥ দাদু! দাদা যখন এলো না, আমি আর থেকে কি করবো?

Likera ॥ না না, সে তো হবে না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যেতে হবে। বোনের দাদাকে না পাই, দাদার বোনকে তো পেয়েছি।

Yarina ॥ তবে ভাই শিগগীর। আমাদের ছোট হুজুরের বাতের ব্যারাম! আমি গিয়ে পা টিপবো তবে তিনি ঘুমোবেন। আর জানোই তো আমাদের ছোট হুজুরকে। যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। চাবুকটা তাঁর হাত থেকে দিনে রাতে নামে না।

Razin ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর রাত না করাই ভালো। ওকে আবার এই আঁধার রাতে হেঁটেও যেতে হবে অনেকটা পথ। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে এসো তোমরা। খেতে বসি।

[বৃদ্ধ Razin ভিতরে চলিয়া গেল। Yarinaও মাদুর ইত্যাদি লইয়া ভিতরে গেল। Likera ঘরের বারান্দা হইতে একটি জলচৌকি লইতে গিয়া দেখে একটি লোক চাদর মুড়ি দিয়া বারান্দার নীচে মাটিতে বসিয়া বারান্দাতেই হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে।]

Likera ॥ এ হতভাগা আবার কে? ঘুমোচ্ছে নাকি। বেশ মজার লোকতো। ওহে কে তুমি; ওহে ওঠো।

[লোকটি চাদর ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

লোকটি ॥ চিনতে পারছো না?

Likera ॥ না তো!

লোকটি ॥ Shevchenko আসেনি?

Likera ॥ না তো!

লোকটি ॥ না এসে পারে?

Likera ॥ কে তুমি?

লোকটি ॥ দেখ তো!

Likera ॥ Shevchenko! তাইতো! তুমি এত বড় হয়েছো? দেখতে এত সুন্দর হয়েছো?

Shevchenko ॥ সুন্দর কিনা—সে বলুক এই সুন্দরী।

Likera ॥ তুমি কি বলো তো! তুমি আসবে জেনে এত লোক এখানে জমায়েত হলো; ভিন গাঁয়েরও কত লোক এলো; আর তুমি কিনা—

Shevchenko ॥ আরে, আমিও তো তাদের সঙ্গে এসেছি।

Likera ॥ কেউ তোমাকে চিনলো না?

Shevchenko ॥ চোদ্দ বছর পর গাঁয়ে ফিরছি। কে চিনবে? তোমরাও তো চিনলে না!

Likera ॥ চোদ্দ বছর পর দেখা। তোমার আর সে চেহারা আছে? পরিচয় দিলে না কেন?

Shevchenko ॥ পরিচয় দিলে এই রাতটিতে কি আর তোমাকে পেতাম? সারারাত সবাই মিলে আমাকে নিয়ে গান বাজনা করে মাতামাতি করতো না?

Likera ॥ কি দুষ্টু হয়েছো তুমি।

Shevchenko ॥ তা ছাড়া, পরিচয় দিলে এ দেশের লোকের মনের খবরটা আমি অমন খোলা-খুলি পেতাম না—যেমনটি পেলাম পরিচয় না দেওয়াতে।

Likera ॥ উঠে এসো। ভেতরে চল। (চীৎকার করিয়া বাবাকে ডাকিতে গেল) বা—

Shevchenko ॥ (Likera-র মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ। আমার যখন তের বছর বয়স, তখন পাহাড়ের কোলে ভেড়া চরাতাম, যখন আমার খাবার জুটতো না, তখন শুধু ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে, কাঁদতে কাঁদতে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করতাম; তেমনি একটি দিনে পাহাড়ের একটা টিলায় বসে সূর্যাস্ত দেখছিলাম আর গান গাইছিলাম কি কাঁদছিলাম জানিনা। সেদিন ছোট্ট একটি মেয়ে অবাক হয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিল চুমো দিয়ে দিয়ে—সে মেয়েটি—কে?

Likera ॥ (সলজ্জভাবে) যাও।

Shevchenko ॥ চুমোর সেই ঋণ আজ আমি ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

[Likera-কে বুকে টানিয়া আনিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার মুখ আচ্ছন্ন করিয়া দিল। অন্দর হইতে বৃদ্ধ Razin-এর কণ্ঠস্বর ইহাদের চমকিত করিল]

Razin ॥ Likera! দেরী করছিস কেন?

Likera ॥ (চীৎকার করিয়া) যাচ্ছি বাবা। (Shevchenko-কে) এসো। উঠে এসো। ভেতরে চলো। (তাহাকে টানিতে টানিতে চীৎকার) বাবা!

Yarina ॥ দেখ কে এসেছে।

[Shevchenko-কে তাহার ঝোলাঝুলি সহ টানিতে টানিতে অন্দরে লইয়া গেল। অন্দর হইতে আনন্দের কোলাহল ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সময়ক্ষেপণসূচক আলোর পরিবর্তন। উষার আলো ফুটিয়া উঠিল। সূর্যোদয়ের আভাস মিলিল। প্রসন্ন প্রভাতে পূর্বোক্ত Kobzar তাহার বালক সঙ্গীটি সহ Shevchenko-র গান গাহিতে গাহিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।]

॥ গান ॥

Old Perebendya, minstrel blind,
Is Known both near and far,

He wanders all the country' round
And plays on his kobza.
The people know the man who plays,
They listen and are glad,
Because he chases gloom away,
Though he himself is sad.

[Perebendya : 1839—St. Petersburg]

[Kobzar-এর এই গানের মধ্যে দেখা গেল ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল নিম্নোল্লিখিত Shevchenko. আড়মোড়া ভাঙিয়া Shevchenko, Kobzar-এর মুখোমুখি বারান্দায় বসিয়া পড়িল! তাহার পর ভিতর হইতে খামারের কাজে যাইবার সজ্জায় সজ্জিত Razin আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আসিল এক মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া Likera। তাহার পিছে পিছে আসিয়া দাঁড়াইল Yarina। Kobzar গান শেষ করিলে Likera ভিক্ষা দিল।]

Shevchenko ॥ আমার গাঁয়ের Kobzar আজ গেয়ে বেড়াচ্ছে আমার লেখা কবিতা। Kobzar ভাই, দাঁড়াও। আমি তোমাকে কিছু দিচ্ছি। (পকেট হইতে একটি রুবল বাহির করিয়া Kobzar-কে উহা দিল।)

Yarina ॥ দাদা, তুমি কি ভিক্ষা দিলে? একটা আস্ত রুবল?

Likera ॥ তোমার দাদা তো আজ আমাদের মত ভূমিদাস নয়। দস্তুর মতো বড়লোক।

Razin ॥ যা ব্যাটা যা। আজ তোর খুব জোর বরাত। যার লেখা গান তুই গেয়ে বেড়াচ্ছিস সেই লোকই তোকে ভিক্ষে দিলো। কত দিল জানিস? গোটা একটা রুবল।

Kobzar ॥ তবে Shevchenko-ভাই এসে গেছে? তার হাতখানি কই? আমি একটা চুমু খাবো, আমি একটা চুমু খাবো।

Shevchenko ॥ শুধু চুমু খাবে কেন ভাই, পেট ভরে কিছু খেতেও হবে তোমাদের। আমার সঙ্গে বসে খাবে (Likera কে) সকালের খবরটা দাও না। এদের নিয়েই একটু আনন্দ করে খাই!...এই যে আমি।

[Shevchenko হাত বাড়াইয়া দিল। Kobzar তাহার হস্ত চুম্বন করিল। Yarina ও Likera অন্দরে গেল।]

Razin ॥ Shevchenko, আর তো আমি থাকতে পারছি না বাবা। মালিকের খামারে যাবার সময় উত্তরেই গেল বুঝি। দেরী হলে তো আর রক্ষা নেই বাবা; আমি চলি। দুপুরে কিন্তু এক সঙ্গে এখানে খাবো।

[Razin কাজে চলিয়া গেল।]

Shevchenko ॥ আমার এ গানটি তুমি কোথায় পেলে Kobzar ভাই।

Kobzar ॥ লোকের মুখে মুখে। Kiev-এ। তোমার গানতো আজ লোকের মুখে মুখেই ভেসে বেড়াচ্ছে গোটা ইউক্রেনে। কিন্তু জানো? তোমার গান গাওয়ার বিপদ আছে বাপু।

Shevchenko ॥ কি বিপদ Kobzar ভাই?

Kobzar ॥ তোমার গান গাইতে দেখলে পুলিশ ঠেঙায়।

Shevchenko ॥ আমি তা জানি। কিন্তু কি আশ্চর্য Kobzar ভাই, পুলিশ যত ঠেঙাচ্ছে, আমার গান লোকে তত বেশী গাইছে।

Kobzar ॥ তাই হয়, তাই হয়। Ryleyev-এর নাম কি শুনেছো ভাই?

Shevchenko ॥ কেন শুনবো না। রাশিয়ার নাম করা কবি।

Kobzar ॥ হ্যাঁ ভাই, তাঁর কবিতা আমরা যখন গাইতাম, সুরের যেন আগুন জ্বলতো। হ্যাঁ ভাই, তাঁর গান এক সময়ে গাইতাম বলেই খেসারত দিতে হয়েছে আমার এই দুটি চোখ।

Shevchenko ॥ সে কি!

Kobzar ॥ হ্যাঁ। সেটা ১৮২৫ সাল। একটা অঘটন ঘটলো ডিসেম্বর মাসে।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ, ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে অত্যাচারী Tsar-এর একদল অফিসার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, সেই ঘটনার কথা বলছো কি?

Kobzar ॥ হ্যাঁ। Tsar-এর officer Tsar-এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, এ কতবড় অঘটন বল দেখি।

Shevchenko ॥ এতেই প্রমাণ হয় ভাই মনুষ্যত্ব আজও আছে—সে মনুষ্যত্বে এই স্বৈরাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

Kobzar ॥ ঠিক বলেছো ভাই। আর এই নিয়েই গান বেঁধেছিলেন Ryleyev। ডিসেম্বরের সেই বিদ্রোহ সফল হলো না যদিও, কিন্তু লোকের মনে তার ছাপ রাখলাম আমরা গানে গানে। ক্ষেপে গেলেন Tsar। কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা হলো গায়কদের। বহু গায়ক ধরা পড়লো। ওই সব গান হলো নিষিদ্ধ। আমি কি করলাম জানো?

Shevchenko ॥ কি?

Kobzar ॥ গান গাওয়াই ছেড়ে দিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেতাম গ্রামে গ্রামে। ঐ সব গান না গেয়ে বই থেকে পড়ে শোনাতাম গানগুলো। কিন্তু তাও বেশী দিন পারলাম না। এক গুপ্তচর আমাকে দিল ধরিয়ে।

Shevchenko ॥ তারপর?

Kobzar ॥ গান গাওয়া বন্ধ ছিল। কিন্তু পড়ে শোনানোও বন্ধ করে দিল আমার এই চোখ দুটি উপড়ে নিয়ে।

Shevchenko ॥ Kobzar! Kobzar!

Kobzar ॥ ছিলাম আমি স্কুল মাষ্টার। চাকরিটি খোয়ালাম। কি করে বাঁচি। দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। এলাম kiev-এ। Kobzar-এর দলে ভিড়ে গেলাম। এ বাপ-মা মরা অনাথ ছেলেটাকেও পেলাম। ওরই হাত ধরে ধরে এখন ভিক্ষে করে বেড়াই তোমার গান গেয়ে। পুলিশ এখনো জানতে পারেনি আমি কে।

[Likera ও Yarina খাবার আনিয়া ইহাদের সম্মুখে রাখিল।]

Shevchenko ॥ তোমার খাবার এসেছে। এসো আমরা খাই। না না, শোনো। আমার পেছনেও পুলিশ লেগে আছে। তোমার চোখ দুটি গেছে বটে, গলায় এখনও গান আছে। তোমার খাবার আমি তোমার ঝোলায় ঢেলে দিচ্ছি। আমি চাই তুমি বাঁচো, নিরাপদে বেঁচে থাকো। তুমি বেঁচে থাকলে তোমার মধ্য দিয়ে আমিও বেঁচে থাকবো! তুমি চলে যাও—তুমি চলে যাও।

[Kobzar-এর ঝোলায় সব খাবারগুলি ঢালিয়া দিয়া Kobzar এবং তাহার বালক সঙ্গীটিকে রওনা করিয়া দিল।]

Yarina ॥ আমিও চলি দাদা। আজ আমার কপালে যে কি আছে কে জানে?

Shevchenko ॥ না না, ঘাবড়াসনে। তোদের ছোট হুজুরের খোদ বাবা স্বয়ং বড় হুজুর হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই Engelhardt—শুয়োরটা, সেও এখন আমাকে খাতির করে। আমি নিজে তোকে সঙ্গে করে তোর ছোট হুজুরের কাছে নিয়ে যাবো। তোর কিছু ভয় নেই। তুই থাক।

Likera ॥ তবে আর কি? কত কাল পর দাদাকে পেয়েছো, একটু বোসো, গল্প-টল্প কর। আমি তোমাদের জন্য আবার খাবার করছি।

[Likera ভিতরে চলিয়া গেল।]

Shevchenko ॥ Yarina! তুই আমার থেকে দু'বছরের ছোট, না?

Yarina ॥ কি জানি দাদা, জানিনা। ছোটবেলা থেকে এক তোমাকে জানি। বাপ-মায়ের কথাও মনে পড়েনা। শুধু মনে পড়ে তোমার কথা। আঃ! কি দুঃখ কষ্টই না আমাদের গেছে। যাক, তবু ভালো, তুমি আর জমিদারের ভূমিদাস নও, তুমি আজ দেশের দশ জনের একজন। আমার যত দুঃখ কষ্টই থাক না কেন, আমার এই সুখটুকু তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না দাদা।

Shevchenko ॥ (তাহার মস্তক চুম্বন করিল) কি দুঃখ কষ্টে আমরা মানুষ হয়েছি—তার একটা কবিতা আমার মনে সব সময় ভাসে। (কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।)

'Twas there my mother gave me birth
And, singing as her child she nursed,
She passed her pain to me...'Twas there,
In that wee house, that Eden fair,
That I saw hell...There people slave
without a let-up night and day,
Not even having time to pray.
In that same village to her grave.
My gentle mother, young in years,
Was laid by toil and want and cares.
There father, weeping with his brood
(We were but tiny, tattered tots),
Could not withstand his bitter lot
And died at work in servitude ! ..
And we—scattered where we could
Like little field mice."...

[Young masters, if you only knew : 1850—Orenburg.]

তুই ভাবিসনে Yarina। তোকে আমি মুক্ত করবো। একদিন না একদিন এ দাসত্ব থেকে তোদের সবাইকে আমি মুক্ত করবোই। এখন যা দেখি, তোকে আমি যে পোষাকটা এনে দিয়েছি সেটা পরে আয়তো দেখি! কেমন দেখায় দেখবো। হ্যাঁ, আর সেই গয়নাটা। সেটা পরে আসবি।

Yarina ॥ দাদা, আমি ওসব পরবো? জীবনে কখনও পরিনি!

Shevchenko ॥ পরবি বৈকি! আমি এনে দিয়েছি—পরবিনে?

Yarina ॥ তবুও ওসব আমাকে লুকিয়ে পরতে হবে দাদা। ওসব প'রে বেরুলে লোকে আমাকে চোর বলবে।

Shevchenko ॥ আমি দিয়েছি, তবুও চোর বলবে? কার সাধ্য চোর বলে, দেখবো তো! যা' ই—পরে আয়।

[Yarina ভিতরে চলিয়া গেল। এমন সময় একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। Engelhardt একটি ভূমিদাসের কাঁধে চড়িয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ভারবাহী ভূমিদাস ॥ এই যে হুজুর, এই সেই বাড়ি।

ছোট Engelhardt ॥ বাড়ি কি বলছিস হতভাগা, এটা তো একটা আস্তাকুড়। এইখানে এসেছে সেই শালি! নামা।

[ভারবাহী ভূমিদাস বসিলে তাঁহার কাঁধ হইতে ছোট Engelhardt নামিতে চেষ্টা করিল।]

ছোট Engelhardt ॥ (Shevchenko-কে) এই ব্যাটা! হাঁ করে দেখছিস কি? ধরে নামা না?

[Shevchenko মুচকি হাসিয়া ছোটো Engelhardt-এর হাত ধরিয়া নামাইল।]

ছোট Engelhardt ॥ বসবো কোথায়? (ভারবাহী ভূমিদাসকে) এই ব্যাটা! চেয়ার হ।

[ভারবাহী ভূমিদাস হামা দিয়ে 'চেয়ার' হইল। ছোট Engelhardt তাহার পিঠের উপর বসিল।]

ছোট Engelhardt ॥ তুমি শেয়ালটি কে হে?

Shevchenko ॥ আমি হুজুর, এদের অতিথি। কাল এখানে এসেছি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে।

ছোট Engelhardt ॥ কোথা থেকে?

Shevchenko ॥ সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে।

ছোট Engelhardt ॥ সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে! আমার বাপ বড় হুজুর Engelhardt কে দেখেছো? না দেখে থাকলে তুমি শালা একটা মিথ্যুক।

Shevchenko ॥ তা হুজুর, খুব দেখেছি। তাঁরই গোলাম ছিলাম আমি। আমার নাম Shevchenko।

ছোট Engelhardt ॥ ওরে বাবা, বলছো কি হে? তুমিই নাকি সেই লোকটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছুটা মনে পড়ছে তো! ছোট বেলায় আমাকে তো কোলে কাঁধে নিয়ে হাওয়া খাওয়াতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই লোকটাই তো! তা' তুমি তো শুনছি এখন নাকি বাবার হাত থেকে ছাড়া পেয়েছো! খুব নাকি ভালো পোটো হয়েছো? গান-টানও লিখছো! তুমি তো এখন মস্ত লোক হে! তা এসো, আমার খামারে বেড়াতে এসো। এক পেয়ালা চা খেয়ে যেয়ো। তা' সে শালি কোথায় গেল?

Shevchenko ॥ কে হুজুর?

ছোট Engelhardt ॥ Yarina। কাল বিকেল থেকে হাওয়া। রাতে

আমার পা টিপে দেয়নি। শুনলুম পালিয়ে এসেছে এই আঁস্তাকুড়ে। শালি ভেবেছে কি? (চীৎকার করিয়া) এই হারামজাদী Yarina! ভাল চাস তো বেরিয়ে আয়।

[এই হুকুম অমান্য করার শক্তি দরজার আড়ালে দণ্ডায়মানা Yarina-র ছিলো না। Shevchenko প্রদত্ত পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিতা Yarina মন্ত্রাবিষ্টের মত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নতজানু হইয়া প্রভুর হস্ত চুম্বন করিল।]

ছোট Engelhardt ॥ এ কে রে বাবা! এ কিরে বাবা। এ সব কোত্থেকে চুরি করেছিস? বল শালি। নইলে (হস্তস্থিত চাবুক উত্তোলন করিল)

Shevchenko ॥ এ সব ওকে দিয়েছি আমি। হুজুর বোধহয় জানেন না, ও আমার নিজের মায়ের পেটের বোন।

ছোট Engelhardt ॥ তাই নাকি হে? তবে তো দেখছি ওর দর বেড়ে গেল। তোমার মত লোকের বোন আমার পা টেপে, হ্যাঁ, এটা একটা বলবার মত কথা হলো! ভেবেছিলাম, চুলের মুঠি ধরে চাবুক মারতে মারতে খামারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তোমার যখন বোন, তা আর দেখছি হলো না। তা না হোক। তোমার সঙ্গে তো দেখা হলো। সেদিন কে বলছিলো তোমার ছবিও নাকি কোথায় ছাপা হয়েছে। তোমাকে কিন্তু আসতে হবে।

Shevchenko ॥ কোথায়?

ছোট Engelhardt ॥ আমার দরবারে। আজ সন্ধ্যায়। সবাইকে একবার দেখিয়ে বলতে হবে না—আজ তুমি যত বড়ই হও, একদিন শালা তুমি আমাকে কাঁধে নিয়ে হাওয়া খাইয়েছো। সকলে দেখে অবাক হবে। (ভারবাহী ভূমিদাসকে) নে এবার ওঠ (Yarina কে) চল—

Shevchenko ॥ ও বিকেলে না হয় আমার সঙ্গেই যাবে!

ছোট Engelhardt ॥ বেশ। তুমি যখন বলছো, তাই যাবেখন। কিন্তু এই সব পোষাক নিয়ে যেন যায়। ওসব তো এখন আমার সম্পত্তি কিনা।

[ছোট Engelhardt উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ভারবাহী ভূমিদাস উবু হইয়া বসিলে তাহার কাঁধে চড়িয়া তাহাকে চাবুক মারিল—যেমন ঘোড় সওয়ার ঘোড়াকে মারে। মানুষ ঘোড়া আরোহী লইয়া চলিয়া গেল।]

Shevchenko ॥ শয়তানের বাচ্চা।

Yarina ॥ তুমি এ পোষাক, এ গয়না কেন দিলে, কেন দিলে? তুমি

কি জানো না, ভূমিদাস—ভূমিদাসীর নিজের বলতে কিছু থাকেনা, থাকতে পারে না।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ। আমি ভুলই করেছি যে Yarina, ভুলই করেছি। তুই এ সব পরে যাসনে ওর বাড়ি।

Yarina ॥ কিন্তু জানোয়ারটা যে দেখে গেল।

Shevchenko ॥ তাও তো বটে। নিক—সব লুটে নিক। ঈশ্বরের যদি চোখ থাকে, দেখুক ঈশ্বর। না না, তুই মন খারাপ করিসনে। আমাদের দিন আসছে—আমাদের দিন আসছে। আচ্ছা Yarina তুই আমাকে সেই কচু শাক রেঁধে খাওয়াতে পারিস? তোর হাতের রান্না কত কাল খাইনি রে!

Yarina ॥ আর সে লাউ এর ঘণ্ট?

Shevchenko ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই লাউ-র ঘণ্ট। পারবি খাওয়াতে আমাকে?

Yarina ॥ কোন পারবো না? দেখি Likera কি রেঁধেছে। এসব যদি না রেঁধে থাকে, তবে আমি গিয়ে রাঁধছি।

[চা ও খাবারের ট্রেসহ অন্দরের দরজায় আত্মপ্রকাশ করিল Likera।]

Likera ॥ আমি সব শুনেছি। ভাই কি খেতে ভালবাসে, আমি কি করে তা জানবো? (Yarina-কে) যাও না গিয়ে রাঁধো। আমারও মুখটা বদলাবে।

[Yarina ভিতরে চলিয়া গেল। Likera খাবারের ট্রে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

Shevchenko ॥ খাবার এনেছো? আনো, আনো। এসো, এখানটায় আমরা বসি। উঃ, কত খাবার এনেছো? এ যে দস্তুর মতো Break-Fast.

Likera ॥ তুমি এখন সহরের লোক। স্বাধীন লোক। নামজাদা লোক। তা বাপু, খুদ-কুঁড়ো যেটুকু পেয়েছি, জোগাড় করেছি। জানিনা, এ তোমার মুখে আজ রুচবে কি না!

Shevchenko ॥ রুচবে না! এই খেয়েই তো মানুষ। মনে পড়ে Likera?

Likera ॥ কি?

Shevchenko ॥ সেই আমি যখন পাহাড়ে পাহাড়ে ভেড়া চরাতাম, তুমিও ছাগল চরাতে চরাতে সেখানে যেতে! তোমার মুখে থাকতো চুরি করা আপেল। তোমার মুখ থেকে সেই আপেল আমি কেড়ে খেতাম। তার স্বাদ আজো আমার মুখে রয়েছে লেগে।

Likera ॥ কি বকছো যা তা। সে দিন কি আর আছে!

Shevchenko ॥ আছে আছে। যদি না থাকবে, তবে কেন আমি এলাম এখানে? হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে? কিসের লোভে, সেকি তুমি বোঝো না Likera!

Likera ॥ কেন যে এলে সেই তো আমি ভেবে পাইনা Shev! শেকল ছেঁড়া পাখি তুমি। দেশে দেশে নীল আকাশে মনের সুখে উড়ে বেড়াতে পারে যে, কেন সে ফিরে আসে দাসত্বের এই নরকে। খাচ্ছো না তো কিছুই। খুব না খিদে পেয়েছে বলছিলে?

Shevchenko ॥ না না, খাচ্ছি।

[কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত Shevchenko খাবার খাইতে লাগিল। Likera চা তৈয়ারী করিতে লাগিল।]

Shevchenko ॥ সুন্দর!

Likera ॥ কি?

Shevchenko ॥ এই খাবার।

Likera ॥ ওটা বলতে হয় তাই বললে।

Shevchenko ॥ না। সত্যিই সুন্দর। কিন্তু এর চেয়েও সুন্দর—

Likera ॥ কি?

Shevchenko ॥ তুমি সব কিছুর চেয়ে সুন্দর। হ্যাঁ, সব চেয়ে সুন্দর, তুমি!

Likera ॥ শহরের লোকরা, পাড়া গাঁয়ে এসে মেয়েদের ঠিক এই কথা বলে। তোমার "Katerina" কবিতা, নিজে লিখে ভুলে যাচ্ছো?

Shevchenko ॥ কিন্তু আমি কি সেই শয়তান? আমি তোমাকে নিয়ে খেলতে চাইনে, আমি তোমাকে বিয়েই করতে চাই।

Likera ॥ কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইনা।

Shevchenko ॥ কেন? কেন?

Likera ॥ তোমাতে আমাতে আজ অনেক তফাৎ।

Shevchenko ॥ বলবে আমি আজ ক্রীতদাস নই। তুমি আজও ক্রীতদাসী।

Likera ॥ হ্যাঁ।

Shevchenko ॥ তুমি। একথা বলতে পারো, আমি জানতাম। কিন্তু Likera, এতে বিয়ে বাধে না।

Likera ॥ না, তা বাধে না বটে।

Shevchenko ॥ তবে?

Likera ॥ আমার সম্মানে বাধে। [নিস্তব্ধতা]

Likera। একটা কথা বলবো Shev ?

Shevchenko। বলো।

Likera। তোমার কবিতা, তোমার গান যতটা আমার কানে এসে পৌঁছেছে, তাতে একটা কথা বুঝেছি—

Shevchenko। কি ?

Likera। এই জমিদারের হাতে ভূমিদাসদের যা দুর্গতি হয়েছে তার জন্য তুমি অঝোরে কেঁদেছো। এ কান্না তো সবাই কাঁদছে shev। আমি কিন্তু তোমার কাছে এর চেয়ে একটু বেশী আশা করেছিলাম।

Shevchenko। কি ?

Likera। আশা করেছিলাম তুমি আগুন জ্বালবে—বিদ্রোহের আগুন।...একি! ধোঁয়া কেন ? ঘরে আগুন লাগলো নাকি ?

Shevchenko। এঁ্যা! তাইতো!

[উভয়েই ছুটিয়া ভিতরে গেল। অন্দর হইতে চীৎকার ভাসিয়া আসিতে লাগিল—]

Shevchenko। একি Yarina! তুই একি করছিস ?

Likera। জল! জল! Shev, ওখানে জলের ড্রাম আছে। কয়েক বালতি জল আনো।

[ছুটিয়া বাহির হইল Yarina। উন্মাদের চেহারা। হাতে Shevchenko প্রদত্ত পোষাকটি প্রজ্বলিত।]

Yarina। তোমার সম্পত্তি! তোমার সম্পত্তি!

[ছুটিয়া আসিল Shevchenko ও Likera।]

Shevchenko। Yarina, আমার হাতে দে, আমার হাতে দে—আগুনটা আমার হাতে দে।

[Yarina-র হাত হইতে প্রজ্বলিত পোষাকটি Shevchenko কাড়িয়া লইল। কিন্তু নিবাইতে চেষ্টা করিল না। প্রজ্বলিত অগ্নি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। Shevchenko-র মুখমণ্ডল অগ্নিদীপ্ত হইল, সেই সঙ্গে অপর দুইজনেরও।]

॥ য ব নি কা ॥

—বিরতি—

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

(মার্চ, ১৮৪৭ সাল)

[Kiev প্রদেশে Vilno সহরে Baron Engelhardt-এর প্রাসাদোমপভবনের একাংশে তাঁহার রক্ষিতা Natassa-র সান্ধ্য-মজলিস। তখনও লোকজন কেহ আসে নাই। Natasa নিজেই ঝাড়ন দিয়া আসবাবপত্র মুছিতেছেন; এবং বিড় বিড় করিয়া আপন মনে কি যেন বকিতেছেন। বার্দ্ধক্য তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। প্রসাধনে বার্দ্ধক্য কিছুটা ঢাকা পড়ে বটে কিন্তু তাঁহার মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার ছাপ তাঁহার মুখে সুস্পষ্ট।]

Natasa ॥ বলে, আমার রাণী! রাণী না দাসী! দাসী ছাড়া আর কি! নিজের ঠাট বজায় রাখতে দয়া করে পেট-ভাতা দিচ্ছে। সবাই ভাবে এত বড় বাড়িতে থাকে, না জানি কি! ভুল, ভুল। আমি বাঁদী, বাঁদীরও অধম। আমি দেখছি, লোকে সামনে খাতির করে, কিন্তু পেছনে গিয়ে মুখ টিপে হাসে।

[বহির্দরজায় করাঘাত। নাতাসা পোষাক ঠিক-ঠাক করিয়া লইয়া মুখে হাসি আনিয়া নিজে গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। প্রবেশ করিলেন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর Semukhin। Natasa এক গাল হাসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।]

Natasa ॥ কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন।

[তাঁহাকে সাদরে লইয়া গিয়া সোফায় বসাইলেন।]

এবারও আনন্দ মেলার চার্জে আছেন তো?

পুলিশ ইনস্পেক্টর ॥ থাকতেই হবে। আমাদের বড় কর্তা তো হুকুম দিয়ে রেখেছেন যদ্দিন Vilno সহর আছে তদ্দিন আনন্দ মেলাও আছে। আর যদ্দিন আনন্দ মেলা আছে ততদিন আমিই এর চার্জে থাকবো।

Natasa ॥ আপনাকে তবে অমর করে দিয়েছেন আপনাদের বড় কর্তা। তা রাশিয়ার পুলিস সবই পারে। তা' হঠাৎ কি মনে করে?

পুলিস ইনস্পেক্টর ॥ এখানকার মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন Baron Engelhardt। ১৮৪৪ সালে এই মেলার পত্তন থেকে আজ '৪৭ সাল পর্যন্ত মেলার প্রচারপত্রে ঐ নামটি সগৌরবে শোভা পাচ্ছে। কিন্তু এবার লোকটির দেখা নেই। তাই খবর নিতে এলাম, ব্যাপার কি?

Natasa ॥ হ্যাঁ। এবার তিনি আসেন নি। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়েছে কি কিছু? মেলা তো শুনছি জমে উঠেছে।

পুলিস ইনস্পেক্টর ॥ তা উঠেছে। কিন্তু তিনি এলে হয়তো আরও জমতো।

Natasa ॥ বকে করুন, এই যা জমেছে তাতেই তো শুনছি মদের একটা নদী বয়ে যাচ্ছে।

পুলিস ইনস্পেক্টর ॥ তা মিথ্যে বলেন নি। এবার কত দূর দেশ থেকে ছোকরা-ছুকরিরা স্ফূর্তি করতে এসেছে।

Natasa ॥ আর বলেন কেন! আমার ছেলে Petrov Kiev ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তা' ক্লাস পালিয়ে দিন সাতেক হলো চলে এসেছে এখানে।

পুলিস ইনস্পেক্টর ॥ ক্লাস পালিয়ে?

Natasa ॥ ক্লাস পালিয়ে—মানে, শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে, একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করে ছুটি নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি তো জানি ব্যাপারটা কি?

পুলিস ইনস্পেক্টর ॥ Petrov! নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। ও, হ্যাঁ। পুলিস রিপোর্টে পেয়েছি এবারকার আনন্দ মেলায় একপাল বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে খুব নাচ-গান হল্লা করছে। তা করুক। বয়সকালে ছেলে-পুলেরা এমন করেই থাকে। তবে পড়াশোনাও চাই। লেখা পড়ায় কেমন?

Natasa ॥ ভালোই তো শুনি। ওদের এক প্রফেসার Kostomarov—তাঁকেও এখানকার মেলা দেখাতে ও ধরে এনেছে। খুব বড় লেখক। ইউক্রেনের ইতিহাস লিখে নাকি তাঁর খুব নাম। তিনি তো আমাকে বললেন আমার Petrov-এর মত চৌকষ ছেলে হয় না।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ ভালো ভালো। আপনার ঐ Kostomarov লোকটিকেও আমি জানি। উনি একটা সোসাইটি করেছেন—Society of Cyril and Methodius।

Natasa ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলছিলেন বটে। অনেক বড় বড় লোক ওর নাকি মেম্বার। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। কিন্তু Cyril আর Methodius এ দুটি লোক কে? শুনে তিনি হেসে উঠলেন।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ ও দুটি পৌরাণিক নাম। সেই কোন আদিযুগে ওরা নাকি Slav জাতের লোকদের মধ্যে প্রথম লেখা পড়া চালু করেছিলেন। মানে বিদ্যার দেবতা আর কি! সবাই জানে, অথচ আপনি এই দেবতাদের নাম জানেন না—প্রফেসর তাই হেসে থাকবেন। ওদের নামে Kostomarov

মশাই সোসাইটি করেছেন, Slav জাতের মধ্যে একতা এনে তাদের লেখা পড়া শেখাবার চেষ্টা করছেন। ওদের সোসাইটির এ উদ্দেশ্যটুকু বেশ ভালো কিন্তু ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করার জন্য এই সোসাইটি উঠে পড়ে লেগেছে—এটা মহামান্য Tsar এর একেবারেই পছন্দ নয়।

Natasa ॥ বটে?

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥, হ্যাঁ, প্রফেসর তো আপনার এখানেই গেস্ট হয়ে আছেন?

Natasa ॥ হ্যাঁ। আমার ঐ হতভাগা ছেলেটা ধরে এনেছে।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ না না, তাতে কিছু দোষ হয়নি। উনি একজন সম্মানিত লোক। অত বড় Kiev University-র নাম করা প্রফেসর। আমারই তো ওঁর সঙ্গেই আলাপ করতে লোভ হয়। আছেন কি উনি?

Natasa ॥ না না, উনি তো Lunch-এর পরেই Petrov-এর সঙ্গে মেলায় চলে গেছেন। মেলায় নাকি আজ Folk Song আর Fo'k Dance-এর মস্ত উৎসব।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। (ঘড়ি দেখিয়া) হ্যাঁ। শুরু হয়ে গেছে। আমি উঠছি। আপনি যাবেন না?

Natasa ॥ আনন্দ করবার বয়স কি আমার আছে?

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ না না, সে কি! এখনও আপনাকে দেখলে—

Natasa ॥ রাখুন। লোকে ওসব বলেই থাকে। মনে আনন্দ থাকবে তবে তো আনন্দ করবো।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ (হাসিয়া) আপনার কর্তা বুঝি এখন আর এখানে বেশি আসেন না?

Natasa ॥ না না, সে কথা হচ্ছে না। তিনি এখন সপরিবারে মস্কোতে কি সব রাজকার্যে আছেন। আসতে চাইলেও সময় পান না। তাছাড়া বুড়োও হয়ে পড়েছেন। শরীরও ভালো যায় না। কিন্তু তবুও বলবো, তিনি তাঁর কর্তব্য ভোলেন নি।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। Vilno-এর এই প্রাসাদটা বোধ হয় আপনাকেই দিয়েছেন?

Natasa ॥ তা দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট Engelhardt-কেও আমার দেখাশোনার জন্য দিয়েছেন। সে ছেলে তো এখন এখানে।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ এই বাড়িতে?

Natasa ॥ এই বাড়িতে। বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। চিকিৎসা

চলছে। সে আর আমাকে কি দেখাশোনা করবে, তাকেই এখন দেখতে শুনতে হচ্ছে আমাকে। হুঁ! আনন্দ করবো আমি!

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ বটেই তো বটেই তো। আচ্ছা চলি। মাঝে মাঝে এসে কিন্তু বিরক্ত করবো।

Natasa ॥ বিরক্ত! না না সেকি! আসবেন বৈকি! আপনাদের ভরসাতেই আছি।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ নমস্কার।

Natasa ॥ নমস্কার।

[পুলিস ইনস্‌পেক্টর চলিয়া গেলেন। পার্শ্বের দ্বার দিয়া Yarina-র প্রবেশ।]

Natasa ॥ কিরে Yarina, তোর ছোট প্রভুর খবর কি?

Yarina ॥ ঘুমুচ্ছেন হুজুরাইন।

Natasa ॥ ঈশ্বর করুন, ঘুমটা যেন আর না ভাঙে। হাড়টা তোর জুড়াতো।

Yarina ॥ না হুজুরাইন, দেখে এখন কষ্ট হয়। আমাদের ওপর এত যে অত্যাচার করেছে, তাও বলবো, তাও বলবো—ওঁর কষ্টের শান্তি হোক! চোখে দেখা যায় না হুজুরাইন, এত কষ্ট।

Natasa ॥ আরে আমিও তো তাই বলছি। ভবলীলা সাঙ্গ করে শান্তি পাক। কষ্ট পাবে না? ইশ্বর কি নেই? তাঁর বিচার কি নেই? বাপ ব্যাটা যা করেছে ঈশ্বরের কাছে কিছুই অগোচর নেই। ঈশ্বরের আসন এইবার টলেছে। ঈশ্বর কি শুধু জারের, ঈশ্বর কি শুধু জমিদারের? প্রজার নয়? সাধারণ মানুষের নয়? আমাদের নয়?

Yarina ॥ ঐ একটি আশাই আমাদের আছে হুজুরাইন যে ঈশ্বর কেবল ওদের নয়, আমাদেরও। তাঁর সুবিচার একদিন এই ভূমিদাসরাও পাবে। দাদা বলেন—ভাল কথা হুজুরাইন, তুমি যে বলেছিলে, আমার দাদাও নাকি এখানে আসবেন। কই আসছেন কই?

Natasa ॥ চুপ! আসবে, আসবে। আজই তার আসবার কথা। আজই রাতে। কিন্তু খবরদার, কাক-পক্ষীতেও একথা যেন না জানে! ওদের পেছনে পুলিশ লেগেছে। হ্যাঁ। এখনই এসেছিল এক পুলিস ইনস্‌পেক্টর।

Yarina ॥ বল কি হুজুরাইন!

Natasa ॥ হ্যাঁ, খুব সাবধান।

Yarina ॥ কিন্তু দাদা এলে আমি যেন খবর পাই হুজুরাইন। সে যখনই হোক, যত রাতই হোক।

Natasa ॥ সে তোকে বলতে হবে না। কোথায় যাচ্ছিস এখন ?

Yarina ॥ ভাবছিলাম, ছোট প্রভু অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, তোমার যদি সময় হয় তোমার সঙ্গে গিয়ে মেলাটা দেখে আসি। এই মেলাতে আমার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে।

Natasa ॥ ছোঁড়াটা কে রে ?

Yarina ॥ ছোঁড়া নয় হুজুরাইন, ছুঁড়ি। Likera।

Natasa ॥ সেটা আবার কে ?

Yarina ॥ কাউকে বলবেনা যদি বলো, তবে বলি।

Natasa ॥ না না, বলতে যখন বারণ করছিস তবে কেন বলবো ?

Yarina ॥ ছোট বেলা থেকেই আমার দাদার সঙ্গে তার ভালবাসা।

Natasa ॥ তাই নাকি ? তা' তোর দাদার যা চেহারা আর এখন তার যা নাম-ডাক—মেয়েটার খুব ভাগ্য তো! আচ্ছা Yarina, তুই কারো প্রেমে পড়েছিস।

Yarina ॥ কার আবার প্রেমে পড়বো ?

Natasa ॥ সব দেখে শুনে একটা কথা কিন্তু আমার মনে হয়।

Yarina ॥ কি ?

Natasa ॥ তুই ঐ ছোট Engelhardt-এর প্রেমে পড়েছিস।

Yarina ॥ সে কি! না হুজুরাইন।

Natasa ॥ হ্যাঁ। ওর টাকা দেখে মজেছিস।

Yarina ॥ না হুজুরাইন; আমাদের রক্ত-মাখা ও টাকা। ও-টাকা আমি ছুঁই না।

Natasa ॥ কিন্তু তোর পেটে যখন ওর খোকা আসবে ?

Yarina ॥ না, কখ্খনো না।

Natasa ॥ বললেই হোলো। ওরে খুকি শোন, আমিও একদিন তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু তবু তো এলো—ঐ Petrov। আর তা যখন এলো তখন নাগপাশে জড়িয়ে পড়লাম আমি। মায়ের প্রাণ। ছেলেকে মানুষ না করে উপায় নেই। আর উপায় নেই বলেই যে আমার সর্বস্ব লুটলো, সেই ঠগের শেকলেই এমন বাঁধা পড়লাম যে সে শেকল আর ছিঁড়তে পারছি না। শত লাথি ঝাঁটা খেয়েও সেই বুড়ো সাপটারই লেজ চাটছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

Yarina ॥ হ্যাঁ, তা দেখছি। কিন্তু আমার জন্য ভেবোনা হুজুরাইন। এই ছোট সাপটার সন্তান দেবার ক্ষমতাটুকুও নেই। যত ক্ষমতা ওর মুখে। আর কিছুটা ছিল ওর চাবুকে। কিন্তু সে মুখে আজ কথা সরে না, সে হাতও আজ নড়ে না। সত্যি ওকে দেখে এখন দুঃখ হয় হুজুরাইন।

Natasa ॥ তোর দুঃখ হয় কিন্তু আমার হয়না। আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি। আজ আমার এদশা কারা করেছে? তোর দাদা একটা কবিতা লিখেছে। হ্যাঁ আমার কথাই লিখে থাকবে।

"An unwed mother wlth her babe
Is shuffling down the lane—
Her parents drove her from the house,
And none will take her in!
E'en beggars chase her from their midst!
Young master pays no mind.
He's had some twenty maidens since,
To while away the time!"
[A Dream: 1844—St. Petersburg.]

বড় লোকদের জমিদারদের এই তো সব কীর্তি! সব চেয়ে বড় জমিদার সেই—সেই মহামান্য জার, তিনি তো সন্ন্যাসিনী Nun-দেরও চাটেন। দুঃ—

Yarina ॥ আমি একবার মেলায় যাবো? যদি Likera এসে থাকে, যদি দাদা এসে থাকে!

Natasa ॥ যা না। দূর তো নয়, চট করে দেখে আয়।

Yarina ॥ হুজুরাইন, তুমি যাবে না?

Natasa ॥ না রে আমি যেতে পারবো না। আজ এখানে অনেকের আসবার কথা আছে।

[বহির্দরজায় করাঘাত হইল]

Natasa ॥ ঐ যে! কেউ এলেন বুঝি! তুই যা—

[Natasa গিয়া দরজা খুলিলেন। Yarina বাহির হইয়া গেল এবং Prof. Kostomarov ভিতরে প্রবেশ করিলেন।]

Kostomarov ॥ শুভ সন্ধ্যা!

Natasa ॥ শুভ সন্ধ্যা! কোথায় ছিলেন আপনি?

Kostomarov ॥ কেন, আনন্দ মেলায়।

Natasa ॥ Police Inspector-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

Kostomarov ॥ হ্যাঁ। ভদ্রলোক খুব আলাপী। পেটের কথা টেনে বের করতে চান। পুলিসের যা দস্তুর। Shevchenko-রও খোঁজ নিচ্ছিলেন।

Natasa ॥ Shevchenko যে আজ আমার এখানে আসবে তা জেনেছে নাকি?

Kostomarov ॥ ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে আমাদের খুব সাবধান থাকা ভালো। মনে হয় আমাদের ওপর নজর পড়েছে। একটা ব্যাপারে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

Natasa ॥ কি?

Kostomarov ॥ Shevchenko আর আমার সই করা হাতের লেখা কিছু গোপন সার্কুলার ছিল আমার এই পোর্টফোলিওতে। মেলায় আমাদের পার্টির কিছু লোক আজ এসেছে! সেই সার্কুলার তাদের কাছে বিলি করতে গিয়ে দেখি পোর্টফোলিওতে একটা সর্কুলারও নেই।

Natasa ॥ বল কি প্রফেসর?

Kostomarov ॥ হ্যাঁ। কেউ এই পোর্টফোলিও থেকে সার্কুলারগুলো সরিয়েছে।

Natasa ॥ কে সরাবে?

Kostomarov ॥ ভেবে পাচ্ছিনা। এ পোর্টফোলিও আমি কারো হাতে দেই না—দেইনি। যখন বাইরে যাই তখন এর যদি দরকার না থাকে, তবে ঘরে রেখে ঘর তালাবন্ধ করে যাই। কালও তাই গিয়েছি। তাই ভেবে পাচ্ছিনা ম্যাডাম—এ পোর্টফোলিও থেকে ঐ গুপ্ত সার্কুলার কি ভাবে কখন উধাও হলো।

Natasa ॥ সত্যি আশ্চর্য!

Kostomarov ॥ হ্যাঁ, সত্যি আশ্চর্য! ভাবছি ওগুলো শেষে পুলিসের হাতে গিয়ে পড়লো নাকি। তা যদি পড়ে, সত্যি বিপদ।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

(হঠাৎ কি মনে হওয়ায়) আচ্ছা ম্যাডাম, কাল যখন পোর্টফোলিওটা ঘরে রেখে বাইরে যাই, তখন কি আমি ভুলে তালা দিয়ে যাইনি?

Natasa ॥ সে তো আমি দেখিনি প্রফেসর। না না, ঘর খোলা থাকলে দাসীটা আমায় বলতো।

Kostomarov ॥ হ্যাঁ, অতটা ভুল করার লোক আমি নই। কিন্তু তবে কি করে—

Natasa ॥ সার্কুলার-এ কি ছিলো? বিদ্রোহ-প্রচারের কথা ছিলো কি?

Kostomarov ॥ হ্যাঁ ম্যাডাম। কতকটা সেই নির্দেশই ছিল। এখন কি যে হবে, কে জানে। যাক, 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' চলি।

Natasa ॥ কোথায়?

Kostomarov ॥ মেলায়।

Natasa ॥ আবার কেন ?

Kostomarov ॥ মেলাতে Shevchenko, Gulak, Savich—মানে আজকে রাতের গোপন অধিবেশনের সব সভ্যরা মেলাতেই প্রথম জড়ো হবে। গ্রামাঞ্চল থেকেও পার্টির অনেক লোক ওখানে জমায়েত হবে। মেলাতেই কথাবার্তা কইবার সুবিধা বেশি আচ্ছা, আমি আমার ঘরটা আর একবার খুঁজে যাই। যদিও জানি, সেখানে পাবো না, তবু—

[চিন্তান্বিত ভাবে Kostomarov তাঁহার কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন। বাহিরের দরজা খুলিয়া Petrov-এর প্রবেশ। খুব Smurt, ফুর্তিবাজ ছোকরা।]

Petrov ॥ আচ্ছা মা, কি আশ্চর্য বলতো। তুমি এক বার মেলাটা ঘুরে আসবার সময় করে উঠতে পারলে না ?

Natasa ॥ বাড়ীতে একজন অতিথি এনে রেখেছো। মেলা উপলক্ষে এসে অনেক ভিজিটরও দেখা করতে আসছেন। সময় কই Petrov।

Petrov ॥ প্রফেসর তো মেলাতেই আমাদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। তিনি ছাড়া আর কে visitor এলেন ?

Natasa ॥ কেন ? Police Inspector এসেছিলেন।

Petrov ॥ Police Inspector! কেন ? কিছু গন্ধ পেয়েছে নাকি শালা।

Natasa ॥ কি জানি, জানিনা। তুমি এত সকাল সকাল ফিরলে যে Petrov ?

Petrov ॥ মা! একটা বিপদে পড়ে এসেছি।

Natasa ॥ কি বিপদ Petrov!

Petrov ॥ কিছু টাকা চাই মা।

Natasa ॥ টাকা? আবার টাকা ?

Petrov ॥ হ্যাঁ মা। শ' খানেক রুবল এখনই বড্ড দরকার, নইলে মান ইজ্জত থাকবে না মা। Kiev University থেকে আমার সব বন্ধুরা দল বেঁধে এসে পড়েছে। জানো মা, তাদের আমি Shevchenko র "Dream" আর "Caucasus" কবিতা দুটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলাম। শুনে, ওদের চোখ তো ছানাবড়া। মিটিং করে তখনি ওরা আমাকে নেতা নির্বাচিত করেছে। কত বড় সম্মান বল দেখি মা! তোমার ছেলে Petrov, আজ কিনা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের Leader। যখন আবৃত্তি করছিল,

"And send a thought right uP to Ged
And ask if He will tell ;
Will hangmen still much longer rule,
And turn earth into hell ?"

[A Dream : 1844—St, Petersburg]

ঃ ! মা তখন সেকি হাততালি। যদি একবার দেখতে !

[Prof. Kostomarov এই আবৃত্তির সময় এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।]

Kostomarov ॥ (Petrov-কে) Shevehenko ?

Petrov ॥ Shevchenko। জবাব নেই স্যার। Long live Shevchenko ! হুররে। এ'কি ! কোথায় যাচ্ছেন স্যার।

Kostomarov ॥ মেলায়।

Petrov ॥ যান, আমিও আসছি। ইউনিভার্সিটির সব বন্ধুরা আমার এসে গেছে।

Kostomarov ॥ তা এসেছে ভালোই। কিন্তু Natasa-র কি হবে জানিনা। চলি।

[Kostomarov চলিয়া গেলেন]

Petrov ॥ সে যা হবে আমি জানি। আজ আগুন জ্বালবো মা। কিন্তু কাঠ খড়ের খরচাটা, একশ' রুবল। দাও মা।

Natasa ॥ (গম্ভীর স্বরে) Petrov !

Petrov ॥ কি মা ? বেশি তো চাইনি। মাত্র একশ' রুবল।

Natasa ॥ Petrov, আমি কি টাকার গাছ যে নাড়া দিলেই টাকা পড়বে। তোমার বাপের দেওয়া সামান্য ঐ পেট-ভাতায় কি কষ্ট করে আমাদের চলছে, সে কি বোঝবার বয়স তোমার হয়নি Petrov ?

Petrov ॥ আমি তো বলেছি মা। একবার সেই বুড়ো শুয়োরটাকে আমি যদি পাই, টাকা কি করে আদায় করতে হয়, আমি দেখিয়ে দেব। ওর শুয়োর, কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল আমাকে জন্ম দিতে ? আর তা যখন দিয়েছিস তার দাম দিতে হবে ষোলো আনা—যতকাল বাঁচবো। তুমি আজ শুধু আমাকে একশ' রুবল দাও মা।

Natasa ॥ দেব, দিচ্ছি—যদি তুমি একটা কাজ করতে পারো Petrov।

Petrov ॥ কি কাজ মা ?

Natssa ॥ সেই গোপন সার্কুলারগুলো আমাকে ফেরত দাও Petrov।

[Petrov তাহার ভাবান্তর লুকাইতে পারিল না]

Petrov ॥ হ্যাঁ!

Natasa ॥ হ্যাঁ!

Petrov ॥ কিন্তু সার্কুলারের আমি কি জানি? (কথা বলিতে গিয়া কথা আটকাইয়া যায়) তুমি মানে—তুমি কোন্ সার্কুলারের কথা বলছো?

Natasa ॥ Petrov! আমার কাছে লুকিও না। কোন সার্কুলার তা তুমি ভাল করেই জানো।

Petrov ॥ কি যা তা সব বলছো মা?

Natasa ॥ Petrov!

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

Natasa ॥ কাল রাতে যখন তোমার প্রফেসর মেলাতে ছিলো, তখন তুমি মেলা থেকে হঠাৎ কেন যেন বাড়ি এসেছিলে একবার।

Petrov ॥ হ্যাঁ এসেছিলাম।

Natasa ॥ আমার কাছ থেকে প্রফেসরের ঘরের Duplicate চাবি চেয়ে নিয়েছিলে।

Petrov ॥ হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। প্রফেসরের ঘরে আমার ক্যামেরাটা ছিলো। সেটা নিতে এসেছিলাম।

Natasa ॥ কিন্তু প্রফেসরকে তুমি তো বলে আসোনি। তুমি যে প্রফেসরের ঘরে ঢুকেছিলে, এখন পর্যন্ত তিনি তা জানেন না Petrov। তাই তোমাকে তিনি সন্দেহ করেননি। কিন্তু আমি সন্দেহ করছি। প্রফেসরের পোর্টফোলিও থেকে ওঁদের সেই গুপ্ত সার্কুলার তুমিই সরিয়েছো।

Petrov ॥ আমি।

Natasa ॥ হ্যাঁ তুমি!

Petrov ॥ আমি? ওঁদের দলের লোক হয়ে? তুমি কি বলছো মা!

Natasa ॥ আমি চেয়েছিলাম Petrov, ওদের দলের হয়েই তুমি কাজ কর।

Petrov ॥ আমি কি তা করিনি মা?

Natasa ॥ না। তুমি তা করনি। বরং দলের চরম শত্রুতা করেছো ওঁদের ঐ গোপন সার্কুলারগুলি চুরি করে নিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে।

Petrov ॥ পুলিসের হাতে তুলে দেব আমি? তাতে আমার লাভ?

Natasa ॥ লাভ—তোমার স্ফূর্তির জন্য টাকা রোজগার।

Petrov ॥ এইবার তুমি আমাকে হাসালে মা। ছোট থেকে তোমার কাছে কি আমি এই শিক্ষা পেয়েছি? অত্যাচার, অনাচার দূর করবার শিক্ষাই কি এতকাল তুমি আমাকে দাওনি মা?

Natasa ॥ সে শিক্ষা দেওয়া দেখছি আমার ব্যর্থ হয়েছে। শুধু এই জন্য যে, তোর রক্তে রয়েছে তোর বাপের ভোগ বিলাসের নেশা আর লুণ্ঠনের পেশা।

Petrov ॥ মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই আজ মা। কিন্তু দোহাই তোমার। মা হয়ে ছেলের নামে এমন অপবাদ দিয়ো না। ভুলোনা Tsar-এর বিরুদ্ধে, জমিদারনের বিরুদ্ধে একদিন তোমার এই ছেলেই মাথা তুলে দাঁড়াবে। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এরই মধ্যে আমাকে তাদের নেতা করেছে। আমাকে বড় হতে দাও মা, আমাকে বড় হতে দাও। মিছে কলঙ্ক দিয়ে আমার এই উঁচু মাথাটি হেঁট করোনা! সামান্য একশ'টি রুবল চাইতে এসেছিলাম, তা তো দিলেই না, তার বদলে যা দিলে নেহাৎ মা বলেই তুমি আজ বেঁচে গেলে।

[রাগত ভাবে বাড়ি হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।]

Natasa ॥ Petrov, Petrov! শুনে যা, শুনে যা। চলে গেল! আমি কি ভুল করলাম? কাগজগুলোর বদলে একশ' রুবল তো দিতে চেয়েছিলাম। তা যখন নিলোনা, তবে কি কাগজগুলো ও নেয়নি! নাকি কাগজগুলোর দাম আরো অনেক বেশি!

[Natasa-র মুখখানি কালো হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটিও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবার যখন কক্ষটি আলোকিত হইল তখন দেখা গেল এখানে Society of Cyril and Methodius সমিতির একটি গুপ্ত অধিবেশন চলিতেছে। কক্ষের পিছন দেওয়ালে সমিতির Motto-সহ ব্যানার টাঙানো রহিয়াছে! দেওয়াল ঘড়িতে দেখা গেল রাত্র তখন ৩টা। কক্ষের সমস্ত বাতায়ন বন্ধ। কক্ষের বহির্দ্বার রুদ্ধ। দ্বারপার্শে Petrov দ্বাররক্ষীরূপে নিযুক্ত। তাহার কাঁধে একটি ক্যামেরা ও হাতে একটি রিভলবার। এই অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন (১) Natasa (২) Prof Kostomarov (৩) Shevchenko এবং Shevchenko-র দুই পাশে (৪) Yarina (৫) Likera এবং আরও অনেকে যাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ৬) Gulak (৭) Savich প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এবং পল্লী-কর্মী ও ছাত্র প্রতিনিধি। ঢং ঢং ঢং করিয়া দেওয়াল ঘড়িতে তিনটা বাজিল। Shevchenko বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। সকলে করতালি দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।]

Shevchenko ॥ বন্ধুগণ, তোমরা জানো, তিন বছর আগে ১৮৪৪ সালে যখন পিটার্সবার্গে ছিলাম তখন আমার Dream কবিতাটি সারা দেশে কি আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই থেকে Tsar-এর পুলিশ আমার পেছনে ছায়ার মত ঘুরছে।

Gulak ॥ বুঝবে না? বন্ধুগণ, তবে শুনুন। Tsar-এর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮২৫ সালের ডিসেম্বরে একদল দেশপ্রাণ রাজকর্মচারী বিদ্রোহ করলেন। সে বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো বটে কিন্তু তার প্রশস্তি নতুন করে গেয়ে উঠলেন আমাদের এই শেভচেংকো তাঁর ঐ Dream কবিতায়। সে প্রশস্তি পড়ে জনসাধারণের কেন, আমাদের রক্তও গরম হয়ে ওঠে। মহামান্য Tsar যে তোমাকে মাটিতে পুতে কুকুর দিয়ে খাওয়াননি এই তো আশ্চর্য।

[সকলের হাস্য]

Savich ॥ Decembrists-দের কথা ছেড়েই দিলাম! খোদ মহামান্য Tsar-দের কি তুমি কম ঠুকেছো?

Shevchenko ॥ কিন্তু তাতে আর কি সান্ত্বনা! এই ইউক্রেন থেকে হাজার হাজার দরিদ্র কসাক কৃষক আর শ্রমিকদের ধরে নিয়ে গিয়ে Tsar প্রথম Peter যখন St. Petersburg-এর স্বর্গপুরী রচনা করবার কাজে লাগিয়ে দিলেন, কেউ দেখল না তারা কি নরক যন্ত্রনা ভোগ করলে। দুরন্ত শীতে খোলা মাঠে কি ভাবে তারা শুকিয়ে কুঁকড়ে মরলো তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামালো না। মানুষ হলে তো মানুষের দুঃখ বুঝবে! Oh wicked Tsar! accurst!

Petrov ॥ Oh wicked tsar, accurst!
Oh crafty, evil grasping tsar,
Oh viper poison-fanged!
What did you with the Cossacks do?
Their noble bones you sank
In the morass and on them raised
Your capital to be,
Their tortured bodies at its base!"

[A Dream: 1844—St. Petersburg]

সকলে ॥ ঠিক, ঠিক। Tsar নিপাত যাক।

Shevchenko ॥ বন্ধুগণ! ঐ ১৮৪৪ সালেই St. Petersburg এ Petrashevsky-র নেতৃত্বে আমরা যে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করি, তাতে Dostoyevsky, Saltykov-Shchedrin এবং Pleshcheyev এর মত বিখ্যাত লেখকও যোগ দেন। আমরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে আসি যে, Tsar এর অত্যাচারে—হতচেতন দেশবাসীকে সঞ্জীবিত করতে হলে চাই লোকসঙ্গীত আর কবিতার মুক্তি মন্ত্র।

Gulak ॥ তা আমরা পেয়েছি তোমার Caucasus কবিতায়। শাসকদের ভণ্ডামীর মুখোস তুমি ঐ একটি কবিতাতে একটানে খুলে দিয়েছো।

Shevchenko ॥ কেন দেব না।

"You love your brother as is writ
Within the Golden Rule ?
O damned by God, O hypocrites.
O sacrilegious ghouls !
Not for your brother's soul you care.
But for your brother's hide !
And off your brother's back you tear ;
Rich furs for daughter's pride.
A dowry for your bastard child,
And slippers for your spouse.
And for yourself, things that your wife
Won't even know about !"
[The Caucasus : 1845—Pereyaslav]

সকলে ॥ ধিক ধিক ! Tsar নিপাত যাক।

Shevchenko ॥ বন্ধুগণ ! ঐ বছরই—ঐ ১৮৪৫ সালে Academy of Arts এর শিক্ষা শেষ করে দেশ জননীর হাতছানিতে ছুটে চলে আসি আমার সোনার জন্মভূমি ইউক্রেনে। ১৮৪৬ সালে Kiev শহরে পরিচয় হলো আমার এই পরম বন্ধুটির সঙ্গে—প্রফেসর Kostomarov—ইনি তখন Kiev Universityতে ইউক্রেনের ইতিহাসের অধ্যাপক। ইনিই ইউক্রেনের উদারপন্থীদের সহযোগে তখন স্থাপন করেছেন এই সমিতি—Society of cyril and Methodius। এই সমিতিতে আমিও দিলাম যোগ। ঠিক হলো সমস্ত Slav জাতের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রতির বিধান করে একযোগে আমরা দণ্ডায়মান হব ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদকল্পে।

সকলে ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়।

Shevchenko ॥ এজন্য যে জনসংযোগের প্রয়োজন ছিল সৌভাগবশতঃ আমি তা পেলাম। চিত্রকর বলে Kiev Archeographic commission এর কাজ পেলাম আমি। পুরাকীর্তির সন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ হলো আমার! গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমি জনসাধারণের কাছে কেঁদেছি, অনুনয় করেছি। বলেছি, সময় এসে গেছে, তোমরা জাগো তোমরা ওঠো। জমিদারদের, সরকারী কর্মচারীদের এমন কি মহামান্য Tsar-এর

জোয়াল তোমাদের ঘাড় থেকে ফেলে দাও। সঙ্ঘবদ্ধ হও, বিদ্রোহের আগুন জ্বালো।

[করতালি। উহা মিলাইয়া যাইতেই বহির্দরজায় করাঘাত শোনা গেল।]

সকলে ॥ কে ?

Petrov ॥ (চীৎকার করিয়া) সংকেত ?

আগন্তুক ॥ (বাহির হইতে) রক্ত।

Petrov ॥ (সকলের দিকে তাকাইয়া) রক্ত।

Kostomarov ॥ বন্ধু।

[দরজা খুলিয়া দিবার ইঙ্গিত করিলেন। Petrov এক হাতে রিভলবার বাগাইয়া ধরিয়া দরজা খুলিল। কক্ষে প্রবেশ করিল Navrotsky]

সকলে ॥ Navrotsky !

Kostomarov ॥ এত দেরী হলো কেন ?

Navrotsky ॥ কানা ঘুষা শুনতে পাই "Society of cyril and Methodius" বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হয়েছে। সংবাদটা যাচাই করে দেখতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

অনেকে ॥ কি জানতে পারলে ?

Navrotsky ॥ সংবাদ ঠিক। Tsar এর স্বাক্ষরিত আদেশ এখানকার পুলিস মহলে আজই প্রচারিত হয়েছে।

অনেকে ॥ আমাদের এ প্রতিষ্ঠান আজ থেকে তবে বে-আইনী ?

অনেকে ॥ এ প্রতিষ্ঠান তবে আমাদের ভেঙে দিতে হবে ?

Navrotsky ॥ Tsar-এর তাই আদেশ।

Natasa ॥ কিন্তু এ তো জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

Kostomarov ॥ অশিক্ষিত জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Gulak ॥ Tsar-এর গভর্ণমেণ্ট যে শিক্ষার আলোক থেকে তাঁর প্রজাদের বঞ্চিত রেখেছেন সেই শিক্ষার আলো বিতরণ হলো বে-আইনী ?

Likera ॥ এ আইন আমরা মানবো না।

Yarina ॥ ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ চাই।

Savich ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। জনশিক্ষামূলক এই প্রতিষ্ঠান যখন বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে, আইনের বালাই আমাদেরও আর রইল না। Tsar-এর যে আদেশই হোক আমরা সমিতির গুপ্ত সার্কুলার পেয়ে গেছি। প্রতি পল্লীতে প্রতি মহল্লায় আমরা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করবো।

Gulak ॥ সেই নৈশ বিদ্যালয়ের প্রদীপ থেকেই জ্বালবো আমরা বিদ্রোহের আগুন।

Kostomarov ॥ সেই বিদ্রোহের প্রেরণা যোগাবে বন্ধু Shevchenko-র বজ্র কণ্ঠ আর অগ্নিমন্ত্র।

Shevchenko ॥ আমাদের মরণ পণ সংকল্প স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতন্ত্রী Tsar আর তার সামন্তদের নির্যাতন, নিপীড়ন, দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে কৃষক ক্রীতদাসদের। ইউক্রেনের মাটি আমাদের মা। সেই মা কৃষক সন্তান-দের সাধনাতেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। কিন্তু এই জল, এই ফল, এই শস্য, এতে আজ কৃষকদের কোনো অধিকার নেই। কৃষক সন্তানদের সাধনার ধন, অনন্ত এই সম্পদ লুণ্ঠন করে ভোগ বিলাসে উড়িয়ে দিচ্ছে কে? ঐ স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতন্ত্রী Tsar আর তার অনুগ্রহপুষ্ট শয়তান সামন্ত আর জমিদার দল। যাদের ক্রমাগত শোষণে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরীব হচ্ছে আরো গরীব।

সকলে ॥ নিপাত যাক Tsar, নিপাত যাক জমিদার।

[বহির্দরজায় প্রবল করাঘাত]

সকলে ॥ কে?

Petrov ॥ সংকেত?

বাহিরের আগন্তুক ॥ রক্ত।

Petrov ॥ (কম্পিত কণ্ঠে) রক্ত।

Kostomarov ॥ খুলে দাও।

[Petrov দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু এবার সে রিভলবার বাগাইয়া ধরিল না। কক্ষে প্রবেশ করিল একদল সশস্ত্র পুলিস প্রহরীসহ পূর্ব দৃষ্ট পুলিস Inspector। গভীর নিস্তব্ধতা।]

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ (দেওয়ালে টাঙানো ব্যানারটির প্রতি তাকাইয়া) "Society of Cyril and Methodius। লক্ষ্য: Slav জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য আনয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জাতিয় সংস্কৃতি উন্নয়ন" সাধু! সাধু!

Kostomarov ॥ কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানও আজ বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। দেশের আজ এই অবস্থা।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ Shut up, যে প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হয় গভীর রাত্রে এত গোপনে, তাকে যত চুনকামই করা যাক না কেন তার মলিনতা ঢাকা পড়ে না। কথায় আছে, কয়লা যতবারই ধোও সে আরও কালো হবে।

Natasa ॥ এত রাত্রে আমার ঘরে এসে আমার সম্মানিত অতিথিদের শান্তিভঙ্গ করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? হোন না কেন আপনি Police Inspector।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ আপনি যা খুশি বলতে পারেন। আপনার সাত খুন মাপ। কেন, আপনি তাও জানেন। সেটা এঁরাও বোঝেন। Baron

Engelhardt দেশের একজন সম্মানিত রাজভক্ত সামন্ত। আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে আসিনি। আপনার সম্মানিত অতিথিদেরও শান্তিভঙ্গের ইচ্ছা আমার নেই, যদি আমি বিনা বাধায় শুধু তিনজনকে আজ গ্রেপ্তার করতে পারি।

Natasa ॥ গ্রেপ্তার করতে এসেছেন আপনি ?

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ হ্যাঁ। আজ মাত্র তিনজনকেই গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা আমার হাতে আছে।

Natasa ॥ কোন তিনজন ?

[পুলিস ইনস্‌পেক্টর অঙ্গুলি সঙ্কেতে Shevchenko, Kostomarov, এবং Gulak কে নির্দিষ্ট করিলেন এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি Natasa-র হাতে দিলেন]

Kostomarov ॥ জানতে পারি কি, কি অপরাধে আমাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ?

Gulak ॥ আমাদের সোসাইটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রূপে সুপরিচিত। তার অধিবেশন আমরা দিনেই করি আর যত রাতেই করি, এরাজ্যে সেটাও অপরাধ বলে গণ্য হবে ?

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ না স্যার, মোটেই না। আপনাদের কোন ন্যায়সঙ্গত, বৈধ কর্মের জন্য গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। গ্রেপ্তার করা হচ্ছে রাজ বিদ্রোহের অপরাধে।

Natasa ॥ এ অভিযোগের কোন প্রমাণ আছে কি ? এঁরা কি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ?

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ সেটা আমার চেয়ে আপনারাই ভাল জানেন। আমি যেটুকু জানি, সেটি হচ্ছে পার্টির প্রতি এই তিন নেতার স্বাক্ষরিত এই গুপ্ত নির্দেশ পত্র (Natasaকে) দেখুন।

[পকেট হইতে একখানি সার্কুলার-পত্র বাহির করিয়া উহা Natasaকে দিলেন। এবং পকেট হইতে আর একটি বাহির করিয়া নিজে পড়িতে গেলেন]

পুলিস্ ইনস্‌পেক্টর ॥ হাতের লেখা পড়া দায় (Petrov কে) ওহে ছোকরা, তুমি তো University-র ছাত্র! এদিকে এসো। পড়তো! (Petrov আসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সপদদাপে) এ—স—[Petrov কম্পিত পদে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইনস্‌পেক্টর তাহার হাতে সার্কুলারটি দিলেন।]

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ পড়। চেঁচিয়ে পড়।

Petrov ॥ (পড়িতে লাগিল) : [পার্টির প্রতি গুপ্ত নির্দেশ] বন্ধুগণ!

ইউক্রেনের প্রতি পল্লীতে, প্রতি মহল্লায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করাই চোক আমাদের সঙ্কল্প। ঐ নৈশ বিদ্যালয়ের প্রদীপ থেকেই জ্বালবো আমরা বিদ্রোহের আগুন। আজ রাতের অধিবেশনে হবে এই শপথ গ্রহণ।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ কার স্বাক্ষর ?

Petrov ॥ Kostromarov, Gulak, Shevchenko।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ তারিখ ?

Petrov ॥ ১৫ই মার্চ ১৮৪৭ সাল।

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ (পুলিস সার্জেন্টের প্রতি) Hand cuff।

[সার্জেন্ট তিনজন আসামীকে Hand cuff পরাইয়া দিলেন।]

Shevchenko ॥ (Likera কে) তুমি আমাকে আগুন জ্বালতে বলেছিলে। (Yarina কে) আমার হাতে তুই আগুন তুলে দিয়েছিলি, সেই আগুন যেন আজ থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে। শুধু ইউক্রেন কেন, জ্বলে যেন সারা রাশিয়ায়।

Natasa ॥ যে আগুন তুমি জ্বেলেছো, আমি জানি আর তা নিববে না। কিন্তু ওরা তোমাকে রাখবে না, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

Shevchenko ॥ মারুক তাতে ক্ষতি নেই। সেজন্য আমি প্রস্তুত। আমি আমার Testament লিখে তোমাদের হাতে দিয়েছি। আমার সেই অন্তিম ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। বিদায় !

সকলে ॥ বিদায়।

[পুলিস ইনস্‌পেক্টর সার্জেণ্টদের ইঙ্গিত করিলেন আসামীদের লইয়া যাইতে। সে আদেশ প্রতিপালিত হইল। আসামী তিনজনকে লইয়া পুলিস বাহিনী নিষ্ক্রান্ত হইল।]

সমিতির সভ্যগণ ॥ ধিক, ধিক !

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ॥ Petrov তোমাকে ধন্যবাদ। এসো।

[পুলিস ইনস্‌পেক্টরের পিছে পিছে নত মুখে Petrov চলিল। ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। Natasa তাঁহার Drawer খুলিয়া একটি রিভলবার বাহির করিয়াছেন। পুলিস ইনস্‌পেক্টর নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন, Petrov নিষ্ক্রান্ত হইবে, সেই মুহূর্তে Petrov-এর পা লক্ষ্যকরিয়া Natasa গুলি ছুড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে Petrov পড়িয়া গেল।]

Natasa ॥ বেজন্মা! বিশ্বাসঘাতক! চোর!

(রিভলবার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।)

[চরম কোলাহল। সকলে Petrov এর দিকে ছুটিল-পুলিস ইনস্‌পেক্টর ও ক্রমে ক্রমে পুলিস দল ঘরে প্রবেশ করিলেন। দ্রুত যবনিকা নামিল।]

[যবনিকা]

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

(১৮৫৪ সাল)

[কাস্পিয়ান সমুদ্রের উপকূলে Novopetrovsk দুর্গ মধ্যস্থ কয়েদি-ব্যারাক। ব্যারাকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ (cell) দেখা যাইতেছে। Shevchenko-র জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের সম্মুখ ভাগ। প্রভাত। মিলিটারী অফিসার Obryadin দিনের বেলাতেই একটি হারিকেন লণ্ঠনসহ তাঁহার এক অনুচরকে Shevchenko-র প্রকোষ্ঠে ঢুকাইয়া দিলেন। অদূর হইতে কয়েকজনের গান শোনা যাইতেছে। সঙ্গে একট মেয়ে-কয়েদির গলাও পাওয়া যাইতেছে। Obryadin কান পাতিয়া তাহা শুনিতেছেন।

"My brothers slaved on the estate
And then, conscripted, marched away !
And you, my sisters ! fortune has
Reserved for you the cruellest fate !
What is the purpose of your life ?
Your youth in service slipped away,
Your locks in servitude turn grey,
In service, sisters, you will die !"
[Young Masters. 1850—Orenburg.]

Shevchenko-র প্রকোষ্ঠ হইতে লণ্ঠনধারী অনুচর একখানি কাগজ হাতে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া অফিসারটিকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

Obryadin ॥ (কাগজটি দেখিয়া) আরে, এটা তো সরকারী হুকুমপত্র। আর কোনো কাগজপত্র পেলে না, যাতে ওর হাতের লেখা বা আঁকা ছবি আছে ?

অনুচর ॥ না হুজুর।

Obryadin ॥ সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছিস তো ?

অনুচর ॥ হাঁ হুজুর।

Obryadin ॥ বালিশ, বিছানা ?

অনুচর ॥ বালিশ বিছনা তো কিছু নেই হুজুর।

Obryadin ॥ তবে লোকটা ঘুমোয় কোথায় ?

অনুচর ॥ সবাই তো বলে ঘুমোয় না।

Obryadin ॥ ঘুমোয় না ?

অনুচর ॥ না। সারা রাত এই বারান্দায় পায়চারি করে আর বিড় বিড় করে বকে। কখনো গান গায় কখনো চীৎকার করে।

Obryadin ॥ শেভচেংকো ?

অনুচর ॥ হ্যাঁ হুজুর, শেভচেংকো।

Obryadin ॥ আচ্ছা তুমি যাও।

[অনুচরের প্রস্থান। মিলিটারি অফিসার রূপে Petrov-এর প্রবেশ।]

Pe rov ॥ শেভচেংকোর cell টা সার্চ করা হয়ে গেছে ?

Obryadin ॥ হ্যাঁ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সার্চ করালাম।

Petrov ॥ কিছু পাওয়া গেল না ?

Obryadin ॥ পাওয়া গেছে শুধু এই কাগজটা।

Petrov ॥ দেখি, দেখি। (কাগজটি Obryadin এর হাত হইতে টানিয়া লইয়া পড়িল) 'Taras Shevchenko, Private No. 191—লেখা বা ছবি আঁকা তোমার একেবারে নিষেধ। অমান্য করিলে চরম শাস্তি।" এ অর্ডার তো ১৮৪৮ সালেও ছিলো–যখন Rank and File সৈনিক হয়ে Orenburg Battalion এ প্রথম নির্বাসন হয়। মহামান্য Tsar নিজ হাতে লিখে হুকুম দিয়েছিলেন "কড়া পাহারা। লিখন এবং অংকন একেবারে নিষিদ্ধ।" তা' সত্ত্বেও আবার এ নতুন হুকুম কেন ?

Obryadin ॥ সে আদেশ হতভাগা অমান্য করেছে বলে আবার এই নতুন আদেশ। এ আদেশটার বিশেষত্ব দেখছো না কি ?

Petrov ॥ কি ?

Obryadin ॥ আদেশ অমান্য করলে আর বিচার-টিচার না, চরম শাস্তি।

Petrov ॥ সে চরম শাস্তিটা কি ?

Obryadin ॥ সেটা এখানে লেখা নেই বটে, কিন্তু আমাদের কাছে যে হুকুমপত্র এসেছে তাতে আছে।

Petrov ॥ জানতে পারি কি ?

Obryadin ॥ নিশ্চয়। সেটা ওকেও মুখে বলে দেওয়া হয়েছে। To be shot to death like a dog কুকুরের মতো গুলি করে মারা হবে।

Petrov ॥ এতে কি হাত গুটিয়ে বসে আছে ?

Obryadin ॥ মনে হচ্ছে আছে। ওর কামারটাও তো রোজ আমরা সার্চ করে দেখি। পাই না তো কিছু।

Petrov ॥ কাগজ কলম তুলি বা রং কিছু পাওয়া যায়নি ?

Obryadin ॥ না। পাওয়া যায়নি। পাওয়া যাচ্ছে না।

Petrov ॥ কিন্তু ওর গান দেখছি এখানকার কয়েদিরাও গাইছে। এই তো এখনি শুনছিলাম ওর লেখা সেই—'My brothers slaved' গানটা কয়েদিরা গাইছিলো। সঙ্গে একটা মেয়ে-কয়েদিরও গলা পেলাম।

Obryadin ॥ হ্যাঁ, ফাঁক পেলেই ওরা ওর গান গায়। সেজন্য মাঝে মাঝে ওরা বেতও খায়।

Petrov ॥ এসব গান তাদের শেভচেঙ্কোই শেখাচ্ছে?

Obryadin ॥ তা'ছাড়া আর কে?

Petrov ॥ সেজন্য শেভচেঙ্কোকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না?

Obryadin ॥ শাসন করা হয় বটে কিন্তু ঠেকানো যায় না। ওর কথা বলাটা তো আর নিষিদ্ধ হয়নি।

Petrov ॥ মেয়ে কয়েদিটি কে?

Obryadin ॥ এক সন্ন্যাসিনী যুবতী। Tasr-এর কোন আত্মীয় তার ধর্ম নষ্ট করেছে বলে তাকে খুন করতে গিয়েছিল মেয়েটা। তাই নির্বাসিত হয়েছে এখানে। মাথায় ছিট আছে বটে কিন্তু দেখলে এখনো তোমার লোভ হবে। এখানকার অনেকেরই মাথা ঘুরে গেছে এর মধ্যে।

Petrov ॥ বটে। তবে তো চেখে দেখতে হবে।

Obryadin ॥ বড্ড বেশি কামড়ায়।

Petrov ॥ হুঁ। বাঃ, তাই নাকি? লোভটা তাতে বাড়ছে। শেভচেঙ্কো কোথায়?

Obryadin ॥ ওর ঘর সার্চ করবার জন্য আমরা এসময়ে ওকে drill-এ পাঠিয়ে দেই। এখনি আসবে।

Petrov ॥ নিরিবিলিতে ওর মনটা পরীক্ষা করে দেখার ভার পড়েছে আমার ওপর। কর্তাদেরও আর খেয়ে কাজ নেই। হুকুম হলো হাজার হাজার মাইল দুর্গম পথ পেরিয়ে পরীক্ষা করে এলো Shevchenkc-কে—এখন তার মানসিক অবস্থাটা কি। খ্যাপা কুকুর না নিরীহ ভেড়া।

Obryadin ॥ তা কর্তাদের হঠাৎ এ খেয়াল কেন?

Petrov ॥ হারামজাদা কবিতা দিয়ে শুধু দেশের লোক গুলোকেই পাগল করে তোলেনি, Tsar-এর আশে পাশের লোকদেরও কিছুটা হাত করে ফেলেছে। তারা Tsar-এর কাছে ওর মুক্তির জন্য অনবরত ঘ্যান ঘ্যান আর প্যান প্যান করছে। তাতেই বলি দেওয়া হয়েছে আমাকে।

Obryadin ॥ বলি দেওয়া হয়েছে। কেন?

Petrov ॥ বলি দেওয়া নয়? একটি সেরা মাল পেয়ে নতুন বিয়ে করেছি। মধুচন্দ্রিকা যাপন করছিলাম এমন সময় হুকুমটা পেলাম। প্রেয়সীর অধর চুম্বন ছেড়ে ছুটে চলে আসতে হলো তোমাদের এই কাস্পিয়ান সমুদ্রের

পাড়ে এই Novopetrovsk দুর্গের নরকে। একটা খ্যাপা কুত্তার সঙ্গে নিভৃতে নির্জনে প্রেমালাপ করতে। অবশ্য এতে একটা সুবিধাও হয়েছে Obryadin।

Obryadin ॥ কি Petrov ?

Petrov ॥ মধুচন্দ্রিকা যাপনের ছুটির পর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আমার যাওয়ার order ছিলো। সেটা থেকে রেহাই পেয়েছি।

Obryadin ॥ ভালো কথা, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবস্থা কি বুঝছো ? '৫৩ সালের June-এ ক্রিমিয়ায় যে যুদ্ধ সুরু হয়েছে, এই '৫৪ সালেও তার শেষ হলো না। আর কতদিন চলবে ?

Petrov ॥ কি জানি আর কতদিন চলবে। সবাই বেশ ছিলাম, হঠাৎ কেন যে Tsar তুর্কিদের নৌবহর ডুবিয়ে দিতে গেলেন, তিনিই জানেন। এখন বোঝা ঠেলা। শুধু তুর্কিরাই যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ফ্রান্স আর ব্রিটেন। কপালে অনেক দুঃখ আছে বাপু—অনেক দুঃখ আছে। এই যে শেভচেঙ্কো এসে গেছে। তুমি ভাই সরে পড়ো, একটু প্রেমালাপ করতে দাও।

[Obryadin চলিয়া গেলেন। Shevchenko প্রবেশ করিলেন।]

Petrov ॥ সুপ্রভাত।

Shevchenko ॥ সুপ্রভাত। তোমার না কাল চলে যাবার কথা ছিল হে ?

Petrov ॥ হ্যাঁ স্যার। কথা তাই ছিল। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ হয়ে পড়েছে বলে ভাবছি, একটু সেরে উঠে যাবো।

শেভচেঙ্কো ॥ তা শরীরের আর দোষ কি ? এখানকার যেমন আবহাওয়া তেমনি খাদ্য। আমরা যে কি করে টি'কে আছি তাই ভাবি।

Petrov ॥ না না, টি'কে আপনাকে থাকতেই হবে স্যার। সরকারের চাকরি করেও না বলে পারছিনা—দেশের আজ যা দুর্দশা তাতে আপনার উৎসাহ আর উদ্দীপনা পেয়েই দেশের লোক এখনো বেঁচে আছে—ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে আছে।

Shevchenko ॥ আমি আর কি করতে পারি হে। তোমরা না দিচ্ছ আমাকে লিখতে, আর না দিচ্ছ ছবি আঁকতে।

Petrov ॥ আমি এখনো কয়েকদিন আছি। দিন স্যার, আপনি কিছু লিখে দিন। ছবি আঁকতে চান তাও আঁকুন। দিন আমার হাতে। যেখানে চালান দিতে বলবেন, আমি ঠিক সেখানে চালান ক'রে দেব।

Shevchenko ॥ Petrov !

Petrov ॥ বলুন স্যার।

Shevchenko ॥ তোমার মা তোমাকে যখন গুলি করেছিলেন, তখন কি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, তোমার স্মরণ নেই বুঝি! আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি সবার সামনে চীৎকার করে বলেছিলেন, তুমি বেজন্মা, তুমি বিশ্বাসঘাতক—তুমি চোর।

Petrov ॥ আপনি—আপনি একটা বেশ্যার কথায় আমাকে অবিশ্বাস করছেন! অবিশ্বাস করছেন আমাকে—যে আপনার অতবড় ভক্ত, আপনার সব কবিতা যার মুখস্ত।

Shevchenko ॥ কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে বলেই আজ এই চাকরি পেয়েছো Petrov।

Petrov ॥ কিন্তু এ চাকরি যে আপনাদের কাজে লাগতে পারে, সেটা কেন ভেবে দেখছেন না স্যার? এটা আমার খুব দুরদৃষ্ট যে আপনি আমার মায়ের কথা বিশ্বাস করছেন। হ্যাঁ, দুরদৃষ্ট ছাড়া কি! লোকের মন ভোলানো যার পেশা—আমার বাপের সেই রক্ষিতার কথা বিশ্বাস করে, আপনি অবিশ্বাস করছেন আমাকে। সে যদি পুলিসের গুপ্তচরই না হবে তবে আপনাদের হলো দণ্ড, আর সে পেলো মুক্তি। এটা কেন ভেবে দেখছেন না স্যার।

Shevchenko ॥ আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না Petrov। তোমার মা যদি মুক্তি পেয়ে থাকেন তবে তা পেয়েছেন তোমার বাপের প্রভাবে। আর তাতেই প্রমাণ হয়, এ রাজ্যে বিচার বলে কিছু নেই Petrov। এ জল্লাদের রাজ্যে সবই সম্ভব। তোমাদের আইন যারা তৈরী করেছে তারা সব চামার। স্বাধীনতা যেখানে শেকল দেয়ে বাঁধা, সেখানে এতটুকু ভালো আশা করা চলেনা Petrov। এটা নরক—এটা নরক।

Petrov ॥ আমি জানি স্যার। আপনি তাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

"Temples and chapels, icons and shrines,
And candlesticks, and myrrh incense,
And genuflexion, countless times
Before The image, giving thanks
For war and loot and rade and blood,—
To bless the fratricide they beg Thee.
Then gifts of stole goods they bring Thee,
From gutted homes part of the loot!..."
[The Caucasus.: 1845—Pereyaslav.]

Shevchenko ॥ চোরাইমাল আর লুট—এই জন্যই না লড়াই! আমি কি মিথ্যা বলেছি? এই যে গেল বছর ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ শুরু করেছেন তোমাদের

Tsar। অকস্মাৎ ডুবিয়ে দিলেন তুর্কি নৌবহর! যার ফলে শুধু তুর্কিই নয়, ক্রমে ক্রমে ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে বেধে গেছে এত বড় এক যুদ্ধ—যার ফলে আজ লক্ষ লক্ষ সেনানীকে দিতে হচ্ছে জীবন—লক্ষ লক্ষ ঘরে উঠছে আজ দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার। কি দরকার ছিলো এই যুদ্ধের?

Petrov ॥ যদি বলি রুশ সাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধি?

Shevchenko ॥ নির্লজ্জ বেহায়া ছাড়া একথা কেউ বলবে না Petrov। রুশ সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি? কি গৌরব আছে এই রুশ সাম্রাজ্যের—এক তার বিশাল দেহটি ছাড়া? এই বিশাল দেশের কোটি কোটি লোক শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত নিরক্ষর—কোটি কোটি লোক অর্ধাহারে অনাহারে বুভুক্ষু মুমূর্ষু। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক দাসত্ব প্রথার জীবন যন্ত্রনায় জর্জরিত—রাজ দস্যুর লুণ্ঠনে শোষণে নিঃশেষিত—এ গৌরব না লজ্জা? শাসক গোষ্ঠীর অনাচার আর ব্যাভিচারে, দুর্নীতি আর পাপাচারে আজ এদেশে থেকে ধর্ম অন্তর্হিত, সুবিচার লুপ্ত, মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত—

Petrov ॥ থামুন স্যার, থামুন। এ সব হলো গিয়ে ঘরের কথা। কিন্তু বাইরের বিশ্বে Tsar-এর এই রাশিয়ার আজ কত বড় প্রতিষ্ঠা। কত বড় নাম ডাক। সেটা বজায় রাখতে হবে না কি স্যার?

Shevchenko ॥ কি করে বজায় রাখবে? কে বজায় রাখবে? যেখানে ঘরের ভিত টলমল করছে—যেখানে গোটা জাতটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে।

Petrov ॥ আপনি সাধারণ প্রজার কথা বলছেন স্যার। কিন্তু স্যার, মহামান্য Tsar আর তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী অন্তঃসারশূন্য নয়। তাদের শক্তির ভিত্তি দুর্বল নয়—সমস্ত বিশ্বের ত্রাসি।

Shevchenko ॥ আমি জানি Petrov, আমি তা জানি। কিন্তু এও জানি Petrov, ঐ পশু শক্তি কত দুর্বল, কত অসহায়।

Petrov ॥ সে কি স্যার!

Shevchenko ॥ হ্যাঁ। প্রজা-শক্তির ধূমায়িত অসন্তোষের সামনে ঐ পশু-শক্তি যে কত দুর্বল, কত অসহায় তা তুমি না জানতে পারো, জানেন তোমার Tsar, জানি আমরা। তার প্রমাণ Tsar এর এই যুদ্ধ।

Petrov ॥ বুঝলাম না স্যার।

Shevchenko ॥ বোঝা অতি সহজ বৎস। প্রজাশক্তির জাগরণ, প্রজাশক্তির অভ্যূত্থান Tsar লক্ষ্য করেছেন—শংকিত হয়ে পড়েছেন। আর তাই সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যুদ্ধে—তুর্কির সঙ্গে, ইংরেজের সঙ্গে, ফরাসীর সঙ্গে। দেশরক্ষার জিগীর তুলে—জাতীয় গৌরবের ধ্বজা তুলে প্রজাশক্তির জাগরণ আন্দোলনকে, ভূমিদাসদের মুক্তির আন্দোলনকে দেশপ্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে।

Petrov ॥ উঃ! Tsar-এর কি বুদ্ধি। দেশের যত অসন্তোষ, যত আন্দোলন—সব তবে উড়িয়ে দিয়েছেন একটি চালে, বিদেশীদের সঙ্গে এই লড়াই সুরু করে। নাঃ খুব চতুর বলতে হবে আমাদের এই Tsar।

Shevchenko ॥ প্রজাশক্তি যদি নির্বোধ হয়, তবেই তাঁর এই চাতুরি—চাতুরি। কিন্তু প্রজাশক্তি যদি বুদ্ধিমান হয় তবে Tsar-এর এই চাতুরি নিছক মূর্খতা।

Petrov ॥ হ্যাঁ, একটা নতুন কথা শুনছি স্যার! হ্যাঁ আমার মনে দাগ কাটছে আপনার কথা। সত্যি তো যুদ্ধ আমরা কেউ চাই না। মরতে চায় কে? কেউ না। এই ধরুন আমি, নতুন বিয়ে করেছি। সামনে আমার কত আশা, কত স্বপ্ন। আচ্ছা স্যার, আপনি এ বিষয়ে কিছু লিখছেন নাকি?

Shevchenko ॥ লিখবো? আমি? কি করে লিখবো হে। তোমার Tsar তো নিজের হাতে order লিখে পাঠিয়েছেন, শেভচেঙ্কোর হাত দুটো কেটে ফেল—যাতে সে না পারে লিখতে না পারে ছবি আঁকতে। কেন, তুমি জানো না?

Petrov ॥ না না, হাত কেটে ফেলার order নেই। ওটা স্যার আপনি বাড়িয়ে বলছেন।

Shevchenko ॥ কেটে ফেলার চেয়েও বেশি Petrov, কেটে ফেলার চেয়েও বেশি। হাত দুখানা আজ অসাড় পাথর হয়ে গেছে আমার। উঃ! কি পৈশাচিক দণ্ড!

Petrov ॥ কি কবিতা লিখবেন, বলুন না। আমি লিখে দিচ্ছি।

Shevchenko ॥ তুমি লিখে নেবে? কে তা পড়বে? তোমার Tsar? তার জন্য আমার কবিতা নয় Petrov। আমার কবিতা জনসাধারণের জন্য। কবিতা যদি আমি লিখি, আমি লিখবো তাদের জন্য।

Petrov ॥ কিন্তু কি করে লিখবেন? কোথায় আপনার কলম, কোথায় আপনার কালি?

Shevchenko ॥ দাঁড়াও—

"And wait till from prison I come home again,
And in the meantime—I shall sow
My thoughts, my bitter tears,
My words of wrath. Oh, let them grow
And whisper with the breeze.
The gentle breezes from Ukraine
Will lift them up with dew
And carry them to you, my friend!···

And when they come to you,
you'll welcome them with tender tears
And read each heartfelt line…
The mound, the steppes, the sea and me
They'll bring back to your mind.

[The Caucasus : 1845—Pereyaslav]

[এই কবিতা শুনিতে শুনিতে Petrov—যত পাপিষ্ঠই হউক, ভাবাবেগে আপ্লুত না হইয়া পারিল না। সে সজল নেত্রে মুগ্ধ ভক্তের মত Shevchenko-র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এবং আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধার সহিত সে বলিল—]

Petrov ॥ আমি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু বিশ্বাস ঘাতকের জীবনেও একটা এমন মহান মুহূর্ত আসে স্যার যার আন্তরিকতায় সে আশ্চর্য হয়ে যায়। তেমনি একটি মুহূর্ত এখন এসেছে আমার। স্যার, আমি যুদ্ধ চাইনা। মনে প্রাণে আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি। আমাকে এমন কিছু বলুন যাতে আমার এই ঘৃণা কখনও দূর না হয়—এমন কি স্বয়ং Tsar-এর আদেশেও সে ঘৃণা যেন আমার অটল থাকে।

Shevchenko ॥ Petrov! Petrov! কেন যেন তোমাকে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি লিখে দিচ্ছি।

Petrov ॥ আমি কাগজ কলম দিচ্ছি।

Shevchenko ॥ আবশ্যক নেই Petrov! কবিতাটা আমি লিখে রেখেছি।

Petrov ॥ কি করে লিখলেন? কালি কোথায় পেলেন? কলম কোথায় পেলেন?

Shevchenko ॥ বুকের রক্ত আমার কালি। ঐ পাগলী সন্ন্যাসিনীর চুলের কাঁটা আমার কলম।

Petrov ॥ বলেন কি! কই, কোথায় সে কবিতা?

[শেভচেঙ্কো ক্ষণকাল Petrov-এর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। পরে পা হইতে জুতা খুলিলেন। জুতার সুখতলার তল হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। Petrov বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ইহা দেখিল। Shevchenko কাগজটি কম্পিত হস্তে Petrov-এর সম্মুখে ধরিলেন। সশ্রদ্ধ চিত্তে Petrov তাহা গ্রহণ করিল।]

Shevchenko ॥ বুকের রক্তে লেখা আমার বুকের ধন। দেখ তো, পড়তে পারছো কি?

Petrov ॥ (অভিভূতভাবে পাঠ করিতে লাগিল)

"Dear God, calamity again !
It was so peaceful, so serene :
We but were set to shed the chains
That bind our folk in slavery……
When halt !……Again the people's blood
Is streaming ! Like rapacious dogs
Over a bone, the royal thugs
Are at each other's throat again."

Shevchenko ॥ (পুনরাবৃত্তি করিলেন)

"Again the people's blood
Is streaming ! Like rapacious dogs
Over a bone, the royal thugs
Are at each other's throat again.'
[Dear God, Calamity Again :
1854—Novopetrovsk Fortress.

[ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল]

— — —

॥ সপ্তম পর্ব ॥

(১৮৬০ সাল)

[তেরো বৎসর পরের ঘটনা। St. Petersburg। Academy of Arts-এর Attic-এ শেভচেঙ্কোর উপবেশন কক্ষ। পার্শ্বে আর একটি কক্ষ আছে। সন্ধ্যা। উপবেশন কক্ষে কতিপয় যুবক শেভচেঙ্কো রচিত একটি গান গাহিতেছে।]

"Such are the wrong that people do
To people on the earth!
One person's jailed, another slain,
Himself destroys a third···
And all for what? Nobody knows.
The world is large and wide,
Yet some are homeless and alone,
And can't a shelter find.
Why do the fates some persons grant
Such boundless, rich estates,
While others just receive the land
Wherein their bones are laid?

[Katerina : 1838—St. Petersburg.]

[পার্শ্বের কক্ষ হইতে Shevchenko-র বৃদ্ধ ভৃত্য Ivan-এর প্রবেশ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখিলেই খুনে দাগী-আসামী বলিয়া মনে হয়। দারিদ্র্যের চিহ্ন চেহারা এবং পরিচ্ছদে প্রকট। কিন্তু চোখ দুটি খুবই তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল। গলার স্বর গভীর। সব মিলাইয়া একটি দারুণ ব্যক্তিত্ব।]

Ivan ॥ আর গান নয়। কর্তা খুবই অসুস্থ। তোমাদের এখন চলে যেতে বললেন। কাল সকালে আবার এসো। নতুন গান দেবেন। না না, গোলমাল নয়।

[যুবকগণ চলিয়া গেল। ভৃত্য Ivan ঘরের আসবাবপত্র গোছাইতে লাগিল। দরজায় করাঘাত শুনিয়া Ivan দরজা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিলেন Doctor Semyonovich.]

Semyonovich ॥ তোমার মনিব কেমন আছেন ?

Ivan ॥ ভালো না।

Semyonovich ॥ খবর দাও, ডাক্তার Semyonovich এসেছেন।

Ivan ॥ কর্তা বলেছেন, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। তাঁর অসুখ।

Semyonovich ॥ কি বিপদ! তিনি ভাল নেই খবর পেয়েই তো আমি এসেছি। (চীৎকার করিয়া ডাকিলেন) শেভচেঙ্কো।

Ivan ॥ চেঁচানো বারণ।

Semyonovich ॥ তুমি কে হে! আমাকে হুকুম করছো?

[পার্শ্বের কক্ষ হইতে শেভচেঙ্কো আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

Shevchenko ॥ Semyonovich, ভাগ্যিস তুমি এসেছো। ভারি যন্ত্রণা হচ্ছে আজ আমার।

Semyonovich ॥ আর তোমার এই লোকটা তাড়িয়ে দিচ্ছিলো আমাকে। কোত্থেকে ধরে এনেছো এমন একটি মাল?

Shevchenko ॥ সে অনেক কথা। (Ivan-কে) ivan! শোনো বন্ধু, ইনি ডাক্তার Semyonovich। আমার বিশেষ বন্ধু। আমার অসুখ শুনে Moscow থেকে আমাকে দেখতে এসেছেন। ওঁকে কখনো আটকাবে না, আর যা বলবেন সব শুনবে। চটপট দু'পেয়ালা চা করে আনো দেখি।

Ivan ॥ (ডাক্তার Semyonovich কে) মাপ করবেন হুজুর। আমি হুকুমের চাকর। আর আটকাবো না! [Ivan অন্দরে চলিয়া গেল।]

Semyonovich ॥ কোত্থেকে এই ডাকাত লোকটাকে ধরে এনেছো? দেখলে ভয় হয়। তোমার যন্ত্রণাটা আবার বেড়ে গেছে। কাল রাতে ঘুম হয়নি বুঝি?

Shevchenko ॥ ঘুমের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি ডাক্তার। ঘুমের 'পিল' খেয়ে দেখেছি, কিছু হয় না। আর সারা রাত সারা দিন এই হাত দুটোর ব্যথা। ডাক্তার আমাকে বাঁচাও।

Semyonovich ॥ তোমাকে বাঁচাতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না বন্ধু। কি ভালো স্বাস্থ্যই না তোমার ছিল। এমন ভেঙে পড়েছো যে পথে দেখলে আমি হয়তো চিনতাম না। দশটি বছর নির্বাসনে রেখে Tsar তোমাকে প্রায় শেষ করে এনেছে দেখছি।

Shevchenko ॥ কিন্তু আমিও Tsarকে শেষ করবো। তুমি শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। কোন্ সালে যেন আমাকে ধরলো?

Semyonovich ॥ ১৮৪৭ সালে।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ, ১৮৪৭ সালে। সৈনিক করে মিলিটারিদের হাতে তুলে দিল। নির্বাসন দিল সেই Orenburg-এ। সেখান থেকে Orsk দুর্গে।

Semyunovich ॥ দস্তুরমতো নরক।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ, দস্তুর মত একটি নরক। ওরই মধ্যে যা একটু ভালো লেগেছিলো, যখন '৪৮ সালে Butakov তাঁর আরল সমুদ্র গবেষণা-অভিযানে আমাকে নিয়ে গেলেন—গবেষণার সব ছবি আর নক্‌শা আঁকতে। কিন্তু তখনো তো বন্দী কয়েদি। শুধু জল আর আকাশ দেখে মন হাঁপিয়ে উঠতো। ঢেউগুলো সব যেন ঘুমোচ্ছে। আকাশে যেন মেঘ নেই। সব যেন ঝিমোচ্ছে। ধুকছে। Ukraine এর সবুজ ঘাস না দেখে দেখে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। সব চেয়ে বড় যন্ত্রণা কি ছিলো জানো ডাক্তার?

Semyonovich ॥ কি?

Shevchenko ॥ Tsar-এর হুকুমে আমার চারপাশে সব সময় পুলিস পাহারা। যাতে আমি না পারি লিখতে, না পারি ছবি আঁকতে।

Semyonovich ॥ Tsar তোমাকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন শেভচেঙ্কো।

Shevchenko ॥ বিশ্রাম! ডাক্তার, তোমাকে যদি ডাক্তারী করতে না দেওয়া হয়, বাঁচবে তুমি?

Semyonovich ॥ দু'দিনেই আমি পাগল হয়ে যাবো শেভচেঙ্কো।

Shevchenko ॥ দু'দিনেই তুমি পাগল হবে বলছো, আর আমি? দশ-দশটি বছর এই যন্ত্রণা ভোগ করেছি। কিন্তু হার মানিনি। অনুতাপ করিনি। মাথা উঁচু করেই শত্রুর সঙ্গে বাস করেছি। কতকগুলো মিলিটারী পশু। মায়া নেই, মমতা নেই, কথায় কথায় হুকুম, পদে পদে লাঞ্ছনা। একটা মেসিনের মত মানতে হবে তাদের জুলুম! ভাবতাম কোথায় বাস করছি? একটা জল্লাদের রাজ্যে। মাথায় তার একটা মুকুট দেখে সব ভয়ে অস্থির।

Smyonovich ॥ কিন্তু তুমি তো ভয় পাওনি বন্ধু। দেহ-ই তোমার বন্দী ছিলো, মনকে তোমার বন্দী করতে পারেনি। তার প্রমাণও দিয়েছো তুমি। বন্দী থেকেও চালান করেছো আগুনের মত, বুলেটের মত সব কবিতা। ঐ কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও যে কি করে এ সব পেরেছো, তাই ভেবে অবাক হই।

[Ivan ট্রেতে করিয়া দু'পেয়ালা চা ও বিস্কুট লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

Shevchenko ॥ (Ivan-কে দেখাইয়া) এমনি সব অনেক বন্ধু জুটেছিল আমার। কেউ খুনী, কেউ চোর, কেউ ডাকাত। সব সকসঙ্গে থাকতাম যে! শুনতাম তাদের সব কাহিনী। সবাই তোমার আমার মত মানুষ ছিলো। তাদের মনুষ্যত্বকে চুরমার করেছে এই মুকুটধারী জল্লাদের দুঃশাসন। কিন্তু বন্ধু, তবু দেখেছি মনুষ্যত্ব অমর, অক্ষয়, অনন্ত। যত চেষ্টাই জল্লাদটা করুক না কেন, চুরমার হতে হতেও মনের কোন অতল

তলে লুকিয়ে থাকে কিছুটা মনুষ্যত্ব। (এমন সময় Ivan কক্ষান্তরে চলিয়া গেল)। যার একটি জলন্ত নিদর্শন এই লোকটি। (চায়ে চুমুক দিলেন।)

Semyonovich ॥ (চায়ে চুমুক দিয়া) ও কি তোমার সঙ্গে cell-এ ছিলো নাকি ?

Shevchenko ॥ না। পলাতক খুনে আসামী। আমার সেই Outlaw কবিতাটি পড়ো নি ?

Semyonovich ॥ পড়িনি! সে তো আমার মুখস্ত। সে Outlaw কি এই লোকটা ? ডাকো তো ওকে।

Shevchenko ॥ (উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন) Ivan। Ivan!

[Ivan-এর প্রবেশ]

Semyonovich ॥ Ivan, তোমাকে আমি চিনি।

Ivan ॥ চেনেন! সে কি হুজুর!

Semyonovich ॥ চিনি কিনা তুমিই বলো। ভূমিদাসের ঘরে জন্মেছিলে তুমি। ছোটবেলায় তোমার সমবয়সী দুই মনিবপুত্রকে কোলে-পিঠে করে নিয়ে বেড়াতে হতো তোমাকে।

Ivan ॥ হ্যাঁ হুজুর। বুঝলাম ইনি বলেছেন। আমি ছিলাম তাদের মানুষ-ঘোড়া। ঐ বয়সেই চাবুক মেরে তারা আমাকে ঘোড় দৌড় করাতো।

Semyonovich ॥ যখন তারা মাস্টারের কাছে লেখা পড়া শিখতো, তুমিও শিখতে চাইতে।

Ivan ॥ কিন্তু তার জন্য আমাকে সেলামী দিতে হয়েছে হুজুর। ওদের মা ঠাকরুণ যখনই দেখতেন আমি পড়ছি, মারতেন চাবুক, মারতেন লাথি। রক্ত দিয়েছি, চোখের জল ঢেলেছি আর সেই মূল্যে যা কিছু লেখাপড়া শিখতে পেরেছি।

Semyonovich ॥ কি করে এ অত্যাচার সইতে ?

Ivan ॥ বলুন দেখি হুজুর!

Semyonovich ॥ একটা মেয়ের মুখ চেয়ে। তোমারই মত এক ভূমিদাসের মেয়ে। তারই প্রেম তোমাকে দিয়েছিলো ঐ সহ্যশক্তি।

Ivan ॥ হুজুর। কিন্তু সেই প্রেমই হলো আমাদের কাল। ঠিক হলো আমরা বিয়ে করবো। বিয়ের দিনও এলো। খুদ কুঁড়ো জুটিয়ে একটা ভোজও হবে ঠিক হলো।

Semyonovich ॥ জানি, Ivan জানি। বিয়ের আসরে এসে পড়লেন তোমার মনিব। লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন যত সব মদের ভাঁড়। বিয়ের আসর মদে ভাসিয়ে দিয়ে সব কিছু তছনছ করে মেয়েটাকে নিয়ে হলেন উধাও।

Ivan ॥ সেই দিন থেকে হুজুর, আমিও হলাম উধাও। গেলাম

শহরে। লোকের চিঠি পত্র লিখে দিতাম আর আমারই মত সব হতভাগাদের নিয়ে গড়ে তুললাম একটা দল। গোপনে বসে আমরা ছুরি শানাতাম।

Semyonovich ॥ জানি। তারপর তোমার সমবয়সী সেই দুই মনিব পুত্রের বিয়ের দিন এলো।

Ivan ॥ হ্যাঁ, আমি দলবল নিয়ে তকে তক্কে রইলাম। খুব জাঁকজমক করে বিয়ে হয়ে গেল। ভদ্কার বন্যা বয়ে গেল গোটা গ্রামে। এলো রাত। বৌ নিয়ে আমার দুই মনিব পুত্র গেল বাসর ঘরে। রাতের অন্ধকারে ওঁৎ পেতেছিলাম আমরা। যেই তারা শুয়েছে, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাদের ওপর। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, আঘাতের বদলে আঘাত—আমরা কসাক, এই আমাদের স্বভাব। ঘট ভেঙে মদে ভাসিয়ে দিয়েছিল আমার বিয়ের আসর। দুজোড়া বর-কনে খুন করে রক্তে ভাসিয়ে দিলাম তাদের ফুলশয্যার বাসর।

Shevchenko ॥ সাবাস! সাবাস! Ivan! চোখের বদলে চোখ—দাঁতের বদলে দাঁত—জীবনের বদলে জীবন।

Semyonovich ॥ সেই থেকে স্বরু হলো তোমার পলাতক-জীবন। হলে তুমি দস্যু।

Ivan ॥ হ্যাঁ দস্যু! জল্লাদের রাজ্যে আমি হলাম আর এক জল্লাদ।

Shevchenko ॥ হতেই হবে। এখন পর্যন্ত কেন যে সবাই হচ্ছে না, আমি তাই ভাবি Ivan।

Ivan ॥ কিন্তু হুজুর, আমি তো জল্লাদ হতে চাইনি। গরীব হলেও গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমার মনের মানুষকে নিয়ে ছোট্ট একটা স্বর্গ। হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো Kiev-এর সোনার গীর্জা। সেই দিন মনে হলো ঈশ্বরের রাজ্যে আমি আজ ঢুকতে পারছি না কেন? বিচার হোক। আমি ধরা দেব কিন্তু জল্লাদের কাছে নয়, ধরা দেব জনসাধারণের কাছে—মানুষের কাছে। কর আমার বিচার, বল আমার কি দোষ। কি পাপে আমার এই শাস্তি। কর বিচার, কর বিচার।

Semyonovich ॥ বিচার হবে।

Shevchenko ॥ বিচার হতেই হবে। ঈশ্বর নামে যদি কোনো পদার্থ থাকে, ন্যায়ের দণ্ড একদিন নামবে। ভেবো না Ivan! আমি তোমাদের মূঢ় ম্লান-মূক-মুখে দেব ভাষা—

"I shall lift up
These lowly voiceless slaves!
And I shall put my words
To stand on guard from them!"

Semyonovich ॥ কিন্তু Shevchenko, সেজন্য তোমাকে বাঁচতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আর সেজন্য এখন তোমার নিতান্ত দরকার কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। যাও। শুয়ে পড়। বিশ্রাম কর। আমি কাল সকালে এসে ভালো করে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র যা দেবার দেব।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ ডাক্তার, আমাকে বাঁচাও। সত্যি আমি আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই। দেখে যেতে চাই এই ভূমিদাস প্রথার সমূল উচ্ছেদ।

Semyonovich ॥ তা যদি চাও, তবে বিশ্রাম তোমার চাই-ই চাই। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তুমি কারুর সঙ্গে দেখা করবে না। আর যদি নিতান্তই করতে হয় (Ivan-কে) তবে তিন মিনিটের বেশি কথাবার্তা নয়। মনে থাকবে Ivan ?

Ivan ॥ নিশ্চয় হুজুর।

Semyonovich ॥ ঘড়ি ধরে তিন মিনিট। আচ্ছা আসি। শুভরাত্রি।

Shevchenko ॥ শুভরাত্রি।

[Semyonovich চলিয়া গেলেন]

Ivan ॥ হুজুর! এসো শোবে এসো।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ। শুতে হবে। গোটা রাজ্যটাই আজ শুয়ে আছে।

[দরজায় করাঘাত]

Shevchenko ॥ কে ?

বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ॥ আমি Grigorovich। আসবো ?

Ivan ॥ না, না, না।

Shevchenko ॥ না না, এসো Grigorovich। এসো।

[Grigorovich কক্ষে প্রবেশ করিলেন। Ivan হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী করিয়া গৃহকর্মে রত রহিল।]

Gregorovich ॥ শেভচেঙ্কো, সুখবর এনেছি। ১৮৪৪ সালে একাডেমি থেকে তুমি Master of Fine Arts উপাধি পেয়েছিলে, এত বছর পর এই ১৮৬০ সালে আজ মিটিংএ ঠিক হল তোমাকে আর একটা উপাধি দেওয়া হবে।

Shevchenko ॥ উপাধি! আমার গলায় দড়ি! কি উপাধি ?

Grigorovich ॥ Academician of Engraving.

Shevchenko ॥ বাঃ! আচ্ছা, তোমাদের Academy, মহামান্য Tsar-কে এখনও পর্যান্ত একটা উপাধি দিতে বাকি রেখেছেন কেন ?

Grigorovich ॥ কি উপাধি ?

Shevchenko ॥ "Satan the Great."

Grigorovich ॥ (উচ্চ হাস্য করিলেন) মহামান্য Tsar ও উপাধির অনেক উর্ধ্বে।

Shevchenko ॥ ও—তাই দেওয়া হয় নি। [উচ্চহাস্য]

Grigorovich ॥ তা' ছবি-টবি কি আঁকছো? নতুন কিছু কি খোদাই করলে?

Shevchenko ॥ হ্যাঁ। করবো, করবো।

Grigorovich ॥ Academy-র Attic-এ সরকার বাহাদুর যখন তোমাকে থাকতে দিয়েছে, কিছু কাজ না দেখালে কোন্ দিন আবার তাড়িয়ে দেবে।

Ivan ॥ ওঁর যে অসুখ। কাজ করবেন কখন? ডাক্তার এসেছিলেন। হুকুম দিয়ে গেলেন কারুর সঙ্গে দেখা না করতে—স্রেফ শুয়ে থাকতে।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ। মস্কো থেকে ডাক্তার Semyonovich এসেছিল। তাই বলে গেল বটে।

Grigorovich ॥ ও, তাই নাকি! তাহলে আমি চলি।

[Grigorovich উঠিয়াছেন। এমন সময় বাহিরের দরজায় আবার করাঘাত।]

Grigorovich ॥ তোমার বিশ্রাম! My God!

[Grigorovich-এর প্রস্থান]

Shevchenko ॥ দেখ, আবার কে এলো! যিনিই আসুন, ডাক্তারের আদেশটা জানিয়ে দাও।

[Ivan বাহিরে চলিয়া গেল।]

Shevchenko ॥ (আবৃত্তি করিতে লাগিলেন)

"The days go by, the nights go by,
And, with my hands my head clasped tight,
I wonder why he comes not night,
Apostle of learning, truth and right,
[The days Go By : 1860—St. Petersburg]

[Ivan দরজা উন্মোচন করিলে প্রবেশ করিলেন নাতাসা। হাতে একগুচ্ছ ফুল।]

Natasa ॥ ভালো তো?

Shevchenko ॥ এসো। এসো মা। Vilno থেকে কবে ফিরলে?

Natasa। আজ সকালে। Kostomarov-এর কাছে তোমার অসুখের সংবাদ পেলাম। তোমার এই লোকটির মুখে শুনলাম ডাক্তারের আদেশ। ফুলগুলি নাও। আমার বাড়ির বাগানের।

Shevchenko ॥ বাঃ! সুন্দর! মনে করে যে আমার জন্য এনেছো—ভারি ভালো লাগছে আমার।

Natasa ॥ তোমার জন্য আজ আমি আরো তিনটি অদ্ভুত উপহার এনেছি।

Shevchenko ॥ উপহার! অদ্ভুত উপহার!

Natasa ॥ হ্যাঁ। তোমাকে অবাক করে দেব আমি।

Shevchenko ॥ কই, কোথায়?

Natasa ॥ Waiting room-এ রেখে এসেছি। একটি একটি করে পাঠাচ্ছি। এক সঙ্গে দিলে তোমার সইবে না, তাই। চলি। ঈশ্বর যেন তোমাকে আমাদের জন্য অনেক দিন—অ-নে-ক দিন বাঁচিয়ে রাখেন।

Shevchenko ॥ বাঁচতে আমাকে হবেই। তোমার প্রোট্রেট-টা এখনও আমার করা হয়নি। এঙ্গেল হার্দংকে তুমি বলেছিলে 'যাকে তুমি এমন অপমান করছো, সে যদি আমার ছবি আঁকে, তাতে আমারই অপমান।' সেইদিনই অবশ্য আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পাই। মুক্তির সেই মহা মুহূর্তে তোমাকে মনে হয়েছিল এই একটি মহাপ্রাণ—যাকে ভুলবো না, কোনো দিনই ভুলবো না, ভুলতে পারবো না। কই, তোমার উপহার কই? পাঠিয়ে দাও। না, না, দাঁড়াও তোমাকেও আমার কিছু দেবার আছে। দিচ্ছি।

[Shevchenko তাঁহার অন্দর কক্ষে গেলেন। বিস্ময়াবিষ্ট Natasa অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটিল। Shevchenko অন্দর কক্ষ হইতে সস্নেহে ধরিয়া আনিলেন Natasa-পুত্র, এক্ষণে উন্মাদ রোগাক্রান্ত Petrov-কে। Petrov তাহার মায়ের মুখের প্রতি বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল তাঁহাকে সে চিনিতে পারিতেছে না। Petrov-কে দেখিয়াই Natasa কাঁপিয়া উঠিলেন।]

Shevchenko ॥ (Natasa-কে) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গিয়ে shell-shock-এ মাথাটি খারাপ হয়েছে! শোনোনি?

Natasa ॥ না।

Shevchenko ॥ কোনো খবর নাও নি?

Natasa ॥ না।

Shevchenko ॥ এর বাপও বোধহয় এর কোনো খবর রাখেনা!

Natasa ॥ তিনি শুধু খবর রাখেন মহামান্য Tsar-এর! ও কি আমায় চিনতে পারছে না?

Shevchenko ॥ তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কি শান্ত দেখেছো?

Natasa ॥ হুঁ। ছেলেটা শেষে পাগল হয়ে গেল?

Shevchenko ॥ হ্যাঁ। লড়াইয়ে গিয়ে shell-shock-এ। এ তো তবু ভালো। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা যায়—এ তো তবু বেঁচে আছে।

Natasa ॥ শুনেছিলাম বিয়েও করেছে।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ তা করেছে। আমি যখন Orsk দুর্গে নির্বাসনে ছিলাম তখন এই Petrov তদন্ত করতে গিয়েছিলো, আমি কি লিখছি। তখন চলছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। নতুন বৌ ঘরে রেখে ওকে যেতে হবে যুদ্ধে, সেই ছিলো ওর ভয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটা ওর খুবই ভালো লাগে। বলেছিলো, 'কবিতাটা আমায় দাও। ঐ কবিতা থেকে আমি সেই শক্তি পাবো—যে শক্তিতে Tsar-এর আদেশও আমি অমান্য করবো—যুদ্ধের বিরুদ্ধে করবো যুদ্ধ।' কথাটা আমার বিশ্বাস হয়েছিল, ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমার বুকের রক্তে লেখা সেই কবিতা। কিন্তু শয়তান Tsar-এর শক্তি ছিল আরো বেশি। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ওকে যেতেই হলো। আর তার ফল হয়েছে এই।

Natasa ॥ তুমি ওকে পেলে কোথায় ?

Shevchenko ॥ আমি ওকে পাইনি। ও এখানে এসে গেছে।

Natasa ॥ কি রে ?

Shevchenko ॥ Shell-shock-এর চিকিৎসার জন্য ছিলো হাসপাতালে। স্মৃতি শক্তিটি একেবারে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, অদ্ভুত—

Natasa ॥ কি ?

Shevchenko ॥ সব ভুলেছে, কিন্তু ভোলেনি আমার সেই কবিতাটি আর আমার নাম। (Petrov-এর দিকে তাকাইয়া আবৃত্তি করিলেন)

"...Again the peoples's blood
Is streaming ! Like rapacious dogs
Over a bone, the royal thugs
Are at each other's throat again"

[Dear God, Calamity Again :
1854—Novopetrovsk Fortress]

[পকেট হইতে বাহির করিয়া Petrov-ও কবিতাটি আবৃত্তি করিল এবং শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল—'Shevchenko'। তাহার পর ধীরে ধীরে অন্দরের কক্ষে চলিয়া গেল।]

Shevchenko ॥ হাসপাতালে এই কবিতাটি আবৃত্তিই ছিলো ওর একমাত্র কাজ। আর আবৃত্তির শেষে আমার নাম ধরে চীৎকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মনে করলেন আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে হয়তো ওর লুপ্ত স্মৃতি আবার আসবে ফিরে। একদিন তাই—

Natasa ॥ বুঝেছি। তাই ও আজ এখানে।

Shevchenko ॥ হ্যাঁ।

Natasa ॥ কিন্তু ও তো আমাকেও চিনতে পারলো না। কিম্বা হয়তো চিনেও চিনলো না। আমি ওকে গুলি করেছিলাম।

[নাতাসা উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পিছনে পিছনে গেল Ivan। এবার Ivan যাহাকে কক্ষে আনিল সে Baron Engelhardt, ivan-এর হাতে তিনি তুলিয়া দিয়াছেন এক ঝুড়ি ফল—আর এক ঝুড়ি ফুল।]

Engelhardt ॥ Good evening। জানি—সময় মাত্র তিন মিনিট। তা তাতেই হবে! ভাবছ, কেন এলাম? কান টানলেই মাথা আসবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার বিধান। তাই আসতেই হল। ঐ যে ফল আর ফুল—এসব আমার কাছ থেকে মহামান্য জার পরিবারই পেয়ে থাকেন, আর পেলে তুমি। হ্যাঁ হে ছোকরা—তুমি যে আমার কতবড় গর্ব—সে তুমি বুঝবে না। দেশের ছোট লোকগুলো তোমাকে যেমন ভালোবাসে, বড় লোকগুলো তেমনি ভয় পায়। তা আমি মহামান্য জারের এক পার্টিতে যেই বলেছি—.য লোকটাকে নিয়ে এত হৈ চৈ—হৈ হৈ, সে লোকটা আমারি ভূমিদাস ছিল। ছবি আঁকার হাত দেখেই না মজে গেলাম। একেবারে মুক্তি দিয়ে একাডেমিতে ঢুকিয়ে দিলাম।—শুনে তো সকলের চোখ ছানাবড়া।

Shevchenko ॥ Ivan! তোর ঘড়িটা কি চলছে না?

Engelhardt ॥ ওরে বাবা—সেই তিন মিনিট পার হয়ে গেছে নাকি?

Ivan ॥ আর এক মিনিট বাকি হুজুর।

Engelhardt ॥ জানি। বাজে ঘড়িগুলোই আজকাল সব ঘোড়া হচ্ছে। তা হোক্। এক মিনিটেই সারছি। মহামান্য জারের মতটা আমি যা বুঝেছি সেটা হচ্ছে এই যে, মানে, আর কেন? হৈ হৈ করে তো মরার হাল হয়েছ। এখন যখন ছাড়া পেয়েছ, বাকী জীবনটা আরাম কর। ডাক্তারও তো বলছে বিশ্রাম কর। হাত দুটোকে বিশ্রাম দিলেই দেখবে কি আরাম? আরো টাকা—আরো নাম—কিছু ভাবতে হবে না—হুহু করে আসবে। অমর। একেবারে অমর। আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও। এইবার বলো কি বলবে?

Shevchenko ॥ ঘড়িটা কি গাধা হয়ে গেল Ivan।

Engelhardt ॥ ওরে বাবা। মানে, সুমতি আর হল না! কপালে যদি দুর্ভোগ থাকে আমি আর কি করব! (Ivanএর রক্তচক্ষু দেখিয়া) যাচ্ছি। হ্যাঁ যাচ্ছি। একটা শুধু অনুরোধ রেখে যাচ্ছি—যা বললাম এসব যেন নাতাসাকে আবার বলো না। তবে আর আমার রক্ষে নেই। জানই তো, ওকে যতটা ভালোবাসি, ভয় করি তার বেশি। নিজের ছেলেকে যে গুলি করতে পারে—স্বামীকেও সে গুলি করতে পারে—স্বামী নই এই যা ভরসা।

Ivan ॥ তিন মিনিট।

Engelhardt ॥ ফল আর ফুলগুলো সঙ্গে আনছিলাম দেখে—নাতাশা কি খুশী! দোহাই বাবা—তুমি তাকে আর চটিয়ো না। Good bye! Good bye!

[এঙ্গেলহার্দং বাহির হইয়া গেলেন।]

Shevchenko ॥ Ivan!

Ivan ॥ হুজুর।

Shevchenko ॥ গরীবের রক্তে বোঝাই ঝুড়ি দুটো সরিয়ে রাখবি। ভিক্ষুকদের বিলিয়ে দিবি। কিছুটা ফিরে পাক তারা। নাতাশা কি এই উপহার এনেছিল আমার জন্য! গিয়ে দেখ দেখি আর কি—

[মুক্ত দ্বারপথে Yarina-র প্রবেশ। হাতে পুষ্পগুচ্ছ।]

Shevehenko ॥ Yarina! বোন!

Yarina ॥ দাদা?

[Yarina শেভচেঙ্কোর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

Shevchenko ॥ "I dreamed a dream ; I see,
In a garden, flower-entwined,
... ...
'Neath a shady cherry-tree
My one and only sister dear।
My much-suffering sister saintly!
As if in Eden's Garden waits
... ...
"My joy!" "My brother!" rang the cry—
And then we awakened. you're···
A serf, and still unifree am I!···
Perforce from childhood
we've gone throught it,
A field of thorns we've has to pass!
So pray, my sister! if life last,
Then God will help us pass right
through it."

[To My Sister : 1859—Cherkassy]

Shevchenko ॥ তোকে এখানে দেখতে পাব এ যে আমার স্বপ্নেরও বেশি। কি করে এলি? তোর ছোট হুজুর ছেড়ে দিলো?

Yarina ॥ ছোট হুজুর মারা গেছে। বেঁচে গেছে দাদা। কি কষ্টই না পাচ্ছিল।

Shevchenko ॥ তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিস তুই। ভূমিদাসীর কষ্ট!

Yarina ॥ না দাদা, সে কষ্ট আর আমার নেই।

Shevchenko ॥ বলিস কি! বড় হুজুর মুক্তি দিয়েছে তোকে? কত টাকা। কে দিল!

Yarina ॥ না দাদা। মুক্তি নয়। তবে আগের সে কষ্ট নেই।

Shevchenko ॥ কেন?

Yarina ॥ নাতাসা খুশী হবে বলে বড় হুজুর আমাকে করেছে নাতাসার দাসী। আর তুমি খুশী হবে বলে নাতাসা আমাকে করেছে তার সাথী।

Shevchenko ॥ আমি খুশী হইনি। খুশী হতে পারি না। মুক্তির সুখই সুখ। ক্রতদাসীর সে সুখ কোথায়? সোনার খাঁচায় আছিস এই যা—কিন্তু সে যন্ত্রণা আরো বেশি। যেমন আমার। শেকলে বাঁধা একটা কুকুর।

Ivan ॥ আর এক মিনিট।

Shevchenko ॥ না-না তুই থাক।

Ivan ॥ না, থাকবে না।

Yarina ॥ না, থাকবো না। আমি ডাক্তারের আদেশ শুনেছি। আমি যাচ্ছি। আজকের মতো বিদায়।

Shevchenko ॥ বিদায়। আর তুই আমার কাছে আসবি নে।

Yarina ॥ সে কি দাদা?

Shevchenko ॥ তোদের দেখলে আমার কি মনে হয় জানিস? জীবনটা আমার ব্যর্থ! ব্যর্থ।

[অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া Yarina নিষ্ক্রান্ত হইল।]

Shevchenko ॥ নাতাসার তৃতীয় উপহারটি কি আমি বুঝেছি। চাই না—ফিরে যাক্—দোরটা বন্ধ কর Ivan—দোরটা বন্ধ কর।

[কিন্তু তৎপূর্বেই মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিল Likera.]

Likera ॥ শেভ!

Shevchenko ॥ তুমি এসেছ! এ যে কতবড় আনন্দ—এ যে কতবড় দুঃখ।

"Oh love of mine! Oh friend of mine!
They won't believe us without a cross,
They won't believe us without a priest ..
Slaves, weaklings, captives! Like swine
In their slavery, as in a puddled sty,

They wallow and sleep । Friend of mine,
Love of mine ! Don't cross yeurself now
And do not pray, and do not vow
To anyone on earth. People lie,
And the Byzantine Sabaoth
Fools us ! God will not fool us,
Will not punish or forgive us :
We're not his slaves—we're human beings !"
[To Likera : 1860—Strelna]

Shevchenko ॥ এখনি চলে যাবে ?

Likera ॥ নাতাসা আমাকে এখানে থাকতে বলে গেছেন। তোমার এখন সেবা দরকার।

Shevchenko ॥ নাতাসা ! নাতাসা ! আশ্চর্য এই নাতাসা। (হঠাৎ) তুমি থাকবে ?

Likera ॥ থাকবো বলেই তো এসেছি।

Shevchenko ॥ বিয়ের কথা একদিন তোমাকে আমি বলেছিলাম, সেদিন তুমি বলেছিলে, তুমি বন্দী আর আমি মুক্ত। এ বিয়ে হয় না। তোমার সম্মানে বাধে। Likera, আজো তো তাই। তুমি মুক্ত নও। আমি তোমাকে মুক্ত করতে পারিনি।

Likera ॥ "God will not fool us,
Will not punish or forgive us
We're not his slaves—We're
human beings"

Shevchenko ॥ "Oh love of mine ! Smile awhile
And your saintly spirit free
And your free had give to me,
My dear one."

[ইতিমধ্যে Ivan ফুল এবং ফলের ঝুড়ি সরাইয়া ফেলিয়াছে। Likera তাহার আনীত পুষ্পস্তবক শেভচেঙ্কোকে দিল। শেভচেঙ্কো সেই পুষ্প চুম্বন করিয়া উহা আবার তাহার হাতেই তুলিয়া দিলেন। বহির্দরজায় করাঘাত হইল। পার্শ্ব কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিল Ivan। কিন্তু মুক্ত দ্বারপথে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন Kostomarov এবং Chernyshevsky.]

Ivan ॥ ডাক্তারের হুকুম লোকটির এখন বিশ্রাম চাই।

Shevchenko ॥ না না, তুমি জানো না Ivan, এদের সঙ্গে কথা বলাটাই হবে আমার পরম বিশ্রাম।

Ivan ॥ ডাক্তারের হুকুম, কথা যদি বলতে হয়, তিন মিনিটের বেশি নয়। মাত্র তিন মিনিট।

Kostomarov ॥ বেশ তাই হবে Ivan। আমরা দু'জন মিলে মাত্র ছ' মিনিট।

[Ivan নিশ্চিন্ত হইয়া পার্শ্ব কক্ষে চলিয়া গেল।]

Shevchenko ॥ Likera! Kostomarov-কে তুমি চেনো। আর ইনি হচ্ছেন Chernyshevsky—Russian Revolutionary Democrats দলের বিশিষ্ট নেতা, আমার পরম বন্ধু। যাও, তুমি আমাদের জন্য চা করে আনো। কতকাল তোমার হাতের চা খাইনি।

[Likera পার্শ্ব কক্ষে যাইতেছিল]

Kostomarov ॥ (Likera-কে) সময় মাত্র ছ' মিনিট।

Likera ॥ (হাসিয়া) দেখছি।

Chernyshevsky ॥ সময় যখন ছ' মিনিট, খুব সংক্ষেপে বলছি Shevchenko। আমাদের Russian Revolutionary Democrats party এখন গ্রামাঞ্চলে কাজ করার সংকল্প করেছে। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ আমরাও করেছি আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। মনে হচ্ছে Tsar আর তার সামন্ত জমিদারদের টনক নড়েছে। শাসক গোষ্ঠীরা আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মনোভাব দেখাচ্ছেন। কৃষকদের ব্যাপারে তুমিই হচ্ছো আমাদের প্রধান উপদেষ্টা। এখন বলো, তোমার কি উপদেশ।

Shevchenko ॥ একটি মাত্র উপদেশই আমি দেব। আপোষ নয়। ওরা বুঝতে পেরেছে, একটা ভূমিকম্প আসছে। তা না হলে এই মৃত্যু-পথ-যাত্রীর কাছে স্বয়ং Tsar—সেই মুকুটধারী জল্লাদ—এঞ্জেল হার্দং-এর মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আমি যেন আমার এই হাত দুটো কেটে ফেলি। না না, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমার বাকী দেহটা সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন।

[সকলের উচ্চহাস্য]

Shevchenko ॥ এ থেকেই বুঝতে পারছো ভিত টলেছে, এইবার চরম আঘাত হানার সময় এসে গেছে।

"Await no good,
Expected freedom don't await—
It is asleep ; Tsar Nicholas
Lulled it to sleep, But if you'd wake
This sickly freedom, all the folk

Must in their hands sledge-hammers take
And axes sharp—and then all go
That sleeping freedom awake."
[I'm Not Unwell : 1858—St Petersburg]

Chernyshevsky ॥ তোমার এই কবিতাটি পেতে পারি ?

Shevchenko ॥ এই কবিতা আমি আজ লিখিনি বন্ধু। লিখেছি এই St. Petersburg এ ফিরে এসে ১৮৫৮ সালের ২২শে নভেম্বর। আমার Kobzar-এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ আজকালই বেরুচ্ছে, তাতে এই কবিতাটা আর আমার 'My Testament'—যেটা সেই ১৮৪৫ সালে লিখেছিলাম :

"When I am dead then bury me
In my beloved Ukraine"

সেটা-ও এই Kobzar এর নতুন সংস্করণে বেরুচ্ছে।

Kostomarov ॥ বেরোয়নি। এ দুটোর কোনটাই বেরোয়নি। এই দেখ।

[দ্বিতীয় সংস্করণ Kobzar কবিতার বইটি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া শেভচেঙ্কোর হাতে দিলেন। কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। উন্মত্তবৎ শেভচেঙ্কো Kobzar-এর পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিলেন।]

Kostomarov ॥ খুঁজে কি দেখছো ? পাবে না।

Shevchenko। আমি পাবলিশারকে খুন করবো। Tsar-এর টাকা খেয়েছে।

Kostomarov ॥ সে আমি জানি না। বইটা বেরিয়েছে খবর পেয়ে ছুটে যাই প্রকাশকের কাছে। গিয়ে দেখি, বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছো যে সব কবিতায় তার একটাও নেই। আমি কৈফিয়ৎ চাই।

Shevchenko ॥ কি কৈফিয়ৎ সে দেয় ?

Kostomarov ॥ Tsar-এর censor-রা প্রকাশকের আপত্তি সত্ত্বেও ছেটে দিয়েছে ঐ সব কবিতা।

Shevchenko ॥ আমাকে জানায় নি কেন ?

Kostomarov ॥ জানাতে নাকি নিষেধ ছিলো। [মুহূর্তের নিস্তব্ধতা]

Shevchenko ॥ (বইটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়া বুকের পাঁজরা ধরিয়া একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন।)

Kostomarov ও Chernyshevsky ॥ (উভয়ে) কি হলো ?

Shevchenko ॥ আমার বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙে গেছে। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন।)

Kostomarov ॥ Ivan ! Ivan ! Likera ! শিগ্‌গীর এসো।

[Ivan এবং Likera ছুটিয়া আসিল। Likera ছুটিয়া গিয়া শেভচেঙ্কোকে ধরিয়া বসিল।]

Kostomarov ॥ (Ivan-কে) এখুনি যাও। ডাক্তার নিয়ে এসো।

[Ivan যাইতেছিল। শেভচেঙ্কো তাহাকে নিষেধ করিলেন।]

Shevchenko ॥ না, দাঁড়াও। এ আঘাত চিকিৎসার বাইরে। আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, যদি আমাকে শান্তি দিতে চাও আমার 'My Testament' গানটি গাও। আমার এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। আমাকে শান্তিতে ঘুমোতে দাও।

[সকলে 'My Testament' গানটির প্রথম স্তবক গাহিতে লাগিল।]

"When I am dead, then bury me
In my beloved Ukraine,
My tomb upon a grave mound high
Amid the spreading plain,
So that the fields, the boundless steppes.
The Dnieper's plunging shore
My eyes could see, my ears could hear
The mighty river roar."

। যবনিকা।

। অষ্টম পর্ব ।

(১৮৬১ সাল)

[যবনিকা উঠিলে দেখা গেল প্রথম পর্বোক্ত শেভচেঙ্কোর সেই সমাধি। দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান প্রথম পর্বোক্ত দুই কসাক প্রহরী। সম্মুখে দণ্ডায়মান কৃষক জনতা। জনতা শেভচেঙ্কোর 'My Testament' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক গাহিতেছে :

When from Ukraine the Dnieper bears
To the deep blue sea
The blood of foes···then will I leave
These hills and fertile fields—
I'll leave them all and fly away
To the abode of God,
And then I'll pray···But till that day
I nothing know of God."

[হঠাৎ নিকটেই জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে সচকিত হইয়া দেখিল কয়েকজন কৃষক যুবক বাদ্য বাজাইয়া একটি ঘোষণা করিতে করিতে আসিতেছে।]

ঘোষণা : "জয় শেভচেঙ্কোর জয়। শতাব্দীব্যাপী ভূমিদাস প্রথা রাশিয়া থেকে উচ্ছেদ হলো। উচ্ছেদ হলো ১৮৬১ সালে, যে সালে শেভচেঙ্কোর হলো মৃত্যু।"

জনতা ॥ শেভচেঙ্কোর মৃত্যু নেই। জয় শেভচেঙ্কো। জয় শেভচেঙ্কো।

[উদ্দাম আনন্দ। জনতা এই আনন্দের মধ্যে গাহিয়া উঠিল 'My Testament' কবিতার সর্বশেষ তৃতীয় স্তবক :

"Oh bury me, then rise ye up
And break your heavy chains
And water with the tyrants' blood
The freedom you have gained.
And in the great new family,
The family of the free,
With softly spoken, kindly word
Remember also me."

[My Testament : 1845—Pereyaslav]

[শেভচেঙ্কোর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদন শেষ হইলে ধীরে যবনিকা নামিল ।]

সমাপ্ত

একটি উদ্ধৃতি

ইউক্রাইনের সাহিত্য বাঙালীদের কাছে খুব বেশি পরিচিত নয়। তবে ইউক্রাইনের বিখ্যাত লেখক শেভচেঙ্কোর জীবন নিয়ে একটি নাটক বাংলায় রচনা করেছেন মন্মথ রায়, কলকাতায় সেটি অভিনীতও হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন কিয়েভ শহরে সফরে গিয়েছিলেন, সেখানে এক জনসভায় তিনি মন্মথ রায়ের ঐ নাটকটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের উদাহরণ হিসেবে।

নাট্যকার মন্মথ রায় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐ সুকীর্তিটির জন্য বাঙালী হিসেবে আমি বেশ খাতির পেতে লাগলুম।

[সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত
'রাশিয়া ভ্রমণ'
১৫৭ পৃষ্ঠা।]

জীবন-মরণ

প্রথম সংস্করণ ২রা অক্টোবর ১৯৫৫

জীবন-মরণ

বাংলাদেশে সমবায় জীবনদর্শনের আদি উদ্গাতা
শ্রীনিকেতন স্রষ্টা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
অমর স্মৃতির বেদীমূলে
শ্রদ্ধার্ঘ

গান্ধীজন্মজয়ন্তী দিবস
২রা অক্টোবর
১৯৫৫

মন্মথ রায়

জীবন-মরণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতা। একটি বড় রাস্তার উপরে অবস্থিত একটি গৃহের একতালায় একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষটির এক পার্শ্বে একটি খাট। তাহাতে শয্যাটি এলোমেলো অবস্থায় রহিয়াছে। একটি লেপ কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দেওয়ালের ধারে খানকয়েক চেয়ার আর একটি দেওয়ালের ধারে একটি সুবৃহৎ আলমারি। আলমারির পাল্লায় একটি বড় আয়না।—বড় রাস্তার দিকটায় খুব বড় দুইটি জানালা। দেওয়াল ঘেঁসিয়া ছোট একটি টেবিল রহিয়াছে। তাহাতে কিছু পুঁথি-পত্র, খাতা ইত্যাদি রহিয়াছে। আলনায় কয়েকখানি জামা-কাপড় ঝুলিতেছে। একটি অর্গান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই কক্ষটির সহিত আর একটি ক্ষুদ্রায়তন কক্ষ সংলগ্ন রহিয়াছে। উহা রন্ধনাগাররূপে ব্যবহৃত হয়। খাটের তলে ছোট বড় কয়েকটি ট্রাঙ্ক দেখা যায়। কক্ষটির আর এক পার্শ্বে বাথরুম ইত্যাদি আছে। কক্ষের দেওয়ালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদামণি ও মহাকবি গিরিশ ঘোষের ফটো টাঙানো রহিয়াছে। দেওয়ালের একস্থানে হাতে লেখা সুদৃশ্য একটি বোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে লেখা আছে…"রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতি।" কাল—সন্ধ্যা। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল ভারত-সম্রাট সাজাহানের রূপসজ্জায় সজ্জিত এক ব্যক্তি অভিনয় করিতেছে।]

"মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এইরকম ব'সে নিঃসহায়ভাবে সহ্য করব! ভেবেছো এই কেশরী স্থবির ব'লে তোমরা তাকে পদাঘাত ক'রে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে। কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছ! নিয়ে এসো আমার বর্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই!"

[রুদ্ধ দরজায় করাঘাত হইল। অভিনেতা চমকিয়া উঠিল।]

যাচ্ছি স্যার।

[লোকটি চটপট্ তাহার রূপসজ্জা খুলিয়া ফেলিল এবং খাটের তলা হইতে একটি জীর্ণ ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া তাহাতে তাহার সাজসজ্জা ভরিয়া পুনরায় খাটের তলায় ঠেলিয়া দিল। দরজায় পুনরায় করাঘাত।]

সাজাহান ॥ এলাম স্যার।

[লোকটি গিয়া দরজা খুলিল। গৃহস্বামী তিলক চৌধুরী, প্রবীণ অভিনেতা শঙ্কর সেন এবং তাহার বন্ধু রজত রায় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।]

তিলক ॥ [সাজাহানকে] এই সন্ধ্যারাতে ঘুমোচ্ছিলে নাকি? দরজা খুলতে এত দেরি কেন?

সাজাহান ॥ রাঁধতে গেলে একটু-আধটু দেরি তো হবেই স্যার। এই দেরিটুকু হয়েছে ব'লেই মাছ ভাজাগুলো খাওয়া চলবে। তক্ষুণি দরজা খুলতে গেলে ওগুলো পুড়ে যেতো।

তিলক ॥ রাখো তোমার মাছভাজা। একটু আগে এই ঘরে কোন একটা মেয়ে ঢুকে পড়েছে?

সাজাহান ॥ একটু আগে? না। দুপুরে একজন এসেছিল স্যার।

তিলক ॥ আরে সে তো আমাদের দলের মেয়ে। [শঙ্করের প্রতি] মুক্তা দেবীর কথা বলছে [সাজাহানের প্রতি] আরে সে নয়। এ হ'ল গিয়ে বাইরের মেয়ে—সামনের ঐ শ্রীশ্রী হরদুর্গা অনাথ-আশ্রমের মেয়ে। ওখান থেকে পালিয়ে নাকি এই ঘরে ঢুকে পড়েছে—এই একটু আগে।

সাজাহান ॥ না স্যার।

শঙ্কর ॥ আর এ ঘরে ঢুকবেই বা কি ক'রে? দরজা তো বন্ধই ছিল।

তিলক ॥ সে কথা বলবেন না সেন মশায়। আমাদের এই সম্রাট সাজাহান যতো বার বাইরে যাবেন, বাজার করতেই হ'ক, কি রেশন আনতেই হ'ক—দরজায় চাবি দিয়ে যেতে ভুলে যান। এমন কদ্দিন হয়েছে।

শঙ্কর ॥ সাজাহান—সাজাহান। তিনি প্রহরী নন তিলক।

সাজাহান ॥ তা যা বলেছেন স্যার। চাবি দেওয়ার কথাটা আমার একেবারে মনে থাকে না। [নিজের কর্ণ মর্দন] কিন্তু এও বলবো স্যার—এই ছোটখাটো ভুলে কিছু আসে যায় না। একটু আগে দোকান থেকে কয়লা বয়ে আনলুম। দরজাটা খোলা থাকে ব'লে সুবিধে অনেক, দোর গোড়ায় মোটটা নামাতে হ'ল না। সোজা রান্নাঘরে যাওয়া গেল। চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম—যেখানকার যা, ঠিক তেমনিই আছে।

তিলক ॥ আঃ, তা না হয় আছে। কিন্তু কিছু বাড়তেও তো পারে। দেখ, দেখ—রান্নাঘর, বাথরুমটা একবার ভাল ক'রে দেখ।

সাজাহান ॥ বলছেন—দেখছি। কিন্তু এটা আমাকে আপনার বলা ভাল হ'ল না স্যার। জলজ্যান্ত একটা মেয়েমানুষ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো, আর আমার চোখে পড়লো না! তা হ'লে বলতে হবে হয় সেটা মেয়েমানুষ নয়, আর না হয় আমার চোখ চোখই নয়। [বিরক্তিসহকারে আদেশ পালন করিতে গেল।]

তিলক ॥ বোসো শঙ্করদা, বসুন রজতবাবু।

রজত ॥ [বসিতে বসিতে] আপনার চাকরটিও তো দেখছি বলতে-কইতে বেশ। এও অভিনয়-টভিনয় করতো নাকি কোন দিন ?

শঙ্কর ॥ তবে শোনো রজত। বিশ বছর আগে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে দেওয়ালে-দেওয়ালে একটা নাম বেশ বড় হরফেই দেখা যেতো—সাতকড়ি হালদার। ইনি। এমনকি সাজাহান সেজেও একসময়ে বেশ নাম কিনেছিলেন। সেই লোকের আজ অবস্থাটা দেখ। খেতে পাচ্ছিল না দেখে তিলককে ব'লে আমি এখানে চাকরি ক'রে দিয়েছি। এককালে সুনামের সঙ্গে অভিনয় ক'রেও তার পরিণামটা কি দেখলে তো ?

রজত ॥ সত্যিই বিশ্বাস হয় না !

[কথাগুলি সাজাহানের কানে গিয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া রজতের সম্মুখে দাঁড়াইল।]

সাজাহান ॥ আপনি বিশ্বাস করছেন না স্যার !

[ছুটিয়া গিয়া খাটের তলা হইতে তাহার জীর্ণ ট্রাঙ্কটি বাহির করিয়া সাজাহানের পোশাকগুলি চটপট্ নামাইয়া রাখিয়া ট্রাঙ্কের তলদেশ হইতে খানকতক জীর্ণ এবং কোন-কোনটি ছেঁড়াও বটে, হ্যাণ্ডবিল ও পোস্টার বাহির করিল। হ্যাণ্ডবিলগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া দিয়া পোস্টারটি নিজে দেওয়ালে হাত দিয়া ধরিয়া সগর্বে বলিল।]

সাজাহান ॥ এই দেখুন—

মনোমোহন থিয়েটার

দর্শকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে

পুনরায় আমাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী
ডি এল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক

সাজাহান

নাম-ভূমিকায়
নটকুশল সাতকড়ি হালদার

বিশ্বাস হচ্ছে ?

রজত ॥ তুমি ভাই বলছো,—কেন বিশ্বাস হবে না ? কিন্তু মনোমোহন থিয়েটার আবার একটা ছিল নাকি ?

সাজাহান ॥ ছিল। আপনারা অনেকেই স্যার তখন জন্মান নি। আর যদি জন্মেও থাকেন, বড় জোর তখন হামা দিতে শিখছেন। [সকলে হাসিয়া উঠিল।]

[পোস্টারটি ও হ্যাণ্ডবিলগুলি লইয়া গোছাইতে গোছাইতে]

তবে কি জানেন স্যার, মানুষের দুই দশা—কখনও হাতি, কখনও মশা। একদিন ছিলাম সাজাহান, ভারতের বাদশাহ্, আর এখন হয়েছি নফর—[তিলককে দেখাইয়া] ওঁর। তা, তিলকবাবু মহাশয় ব্যক্তি। দয়া ক'রে এমনিই খেতে-পরতে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা নিতে পারলাম না। এখনও যখন খাটতে পারি, কিছু ভিক্ষে নিতে বাধে! তা এ বেশ আছি—রাঁধছি, বাড়ছি, হাটবাজার করছি, ঘরদোর মুচছি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা করছি—এই যাঃ। [সকলের প্রতি] দিচ্ছি স্যার, এখনি দিচ্ছি।

[পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি ট্রাঙ্কে ভরিয়া উহা যথাস্থানে রাখিয়া রন্ধনাগারের দিকে যাইতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

আসল কথাটাই বলা হয় নি স্যার। যদি কেউ ব'লে থাকে, এ ঘরে কোন মেয়ে ঢুকেছে, সে তার চোখ-কানের মাথা খেয়ে বলেছে—এ আমি ব'লে গেলাম স্যার।

[সাজাহানের প্রস্থান]

রজত ॥ মশার দশাতেই যদি ইনি এই, হাতির দশাতে যে কি ছিলেন—ভাবতে পারছি না। কি নাম? সাতকড়ি হালদার?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ।

তিলক ॥ কিন্তু সাজাহান নামটাই ও শুনতে চায়। আপনি সাতকড়ি ব'লে ডাকুন—নিদেন এক পেয়ালা চা পাবেন। কিন্তু সাজাহান ব'লে ডাকুন, চায়ের সঙ্গে হয় একটা ওমলেট না হয় একটা সিঙ্গাড়া পাবেনই। [দরজায় করাঘাত] নাঃ। ভেবেছিলাম, নিরিবিলিতে আমরা এখন কাজে বসবো, তা হবার যো কই?

শঙ্কর ॥ ওহে, এ হয়তো হরদুর্গা অনাথ-আশ্রমের সেই ম্যানেজার—দয়াময় বোস।

তিলক ॥ এই যা—একেবারে ভুলে গেছি। [ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিল] আরে আসুন—আসুন—দয়াময়বাবু।

[হরদুর্গা অনাথ-আশ্রমের ম্যানেজার দয়াময় বোস ও দ্বারবান রামপাকড় সিং কক্ষে প্রবেশ করিল।]

আসুন—বসুন।

দয়াময় ॥ থাক্, আধ ঘণ্টা পথে দাঁড় করিয়ে রেখে—গরুটি মেরে আর জুতো দান করতে হবে না।

তিলক ॥ এই দেখুন—কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি।

শঙ্কর ॥ অবশ্য খুঁজে দেখতে কোনও কসুর হয় নি। মেয়েটি এ ঘরে ঢোকে নি।

তিলক ॥ তাও তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হয়েছে—নেই।

দয়াময় ॥ রামপাকড় সিং!

রামপাকড় ॥ জী হুজুর।

দয়াময় ॥ শুনলে?

রামপাকড় ॥ জী হুজুর। লেকিন্ হাম্ অপনি আঁখোসে দেখা হ্যায়—

তিলক ॥ ফিন্ দেখো—ফিন্ দেখো।

রামপাকড় ॥ জরুর দেখেঙ্গে। হাম্ রামপাকড় সিং হ্যায়। হামারা আঁখ ঝুটা নেহি হ্যায়—হাম্ চমশা নেহি পিন্তা হ্যায়। [ঘর খুঁজবার জন্য অগ্রসর হইল।]

দয়াময় ॥ ঠাহ্‌রো।

তিলক ॥ না, না, থামবে কেন? দেখুক না। আপনিও দেখুন।

দয়াময় ॥ দেখে কোন লাভ নেই। নেই যখন বলেছেন,তখন নিশ্চয়ই নেই।

রামপাকড় ॥ কেয়া? রামপাকড় সিং ঝুটা বোলা হ্যায়?

দয়াময় ॥ আরে না না। তোমার কথাও সত্যি। তুমি তাকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছো—এও ঠিক। আর, এখন যে এ ঘরে নেই—এও ঠিক। হয় জানলা টপ্‌কে পালিয়েছে, কিংবা মেয়েটার কান্নাকাটিতে ভুলে এঁদের কেউ অন্য কোন পথে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। তার মানে, পাওয়া যাবে না। বাঁচা গেল। আচ্ছা আসি নমস্কার।—রামপাকড় সিং।

রামপাকড় ॥ চলিয়ে। লেকিন্ হাম্ নেহি ছোড়েগা—জরুর পাকড়ায়েগা। যায়েগা কাঁহা?

[উভয়ের প্রস্থান]

রজত ॥ এও দেখছি এক নাটক।

তিলক ॥ জীবনটাই নাটক!

শঙ্কর ॥ তা নয়তো কি? দশ বছর পরে কলকাতার পথে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা। আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটারের ব্যায়বরাদ্দে মাত্র একটি হাজার টাকা আমাদের কম পড়ায় যখন আমরা আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম—কোথা থেকে মিলবে এই হাজার টাকা, ঠিক এমনি এক নাটকীয় মুহূর্তে হঠাৎ যার সঙ্গে দেখা হ'ল, সে হচ্ছে আবাল্য বন্ধু তুমি—দার্জিলিঙের চা-বাগানের লক্ষপতি এক মালিক। চেক্ বইটি বের কর। হাজার টাকার একখানি চেক্ লেখো। [তিলককে] তিলক, আমাদের রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতির প্রেফারেন্স শেয়ারের কাগজপত্র নিয়ে এসো।

রজত ॥ তা নাটকই বটে! প্রথম জীবনে তুমি ছিলে আমাদের সর্দার। তোমার হুকুম হাসিমুখে তামিল করেছি চিরদিন—আজও করছি। কিন্তু তোমাদের এই কো-অপারেটিভ থিয়েটার বস্তুটা কি—শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে একটু।

শঙ্কর ॥ সাজাহানকে দেখেছো?

রজত ॥ হ্যাঁ দেখেছি। ওইতো চা আনছে। [চায়ের সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া] ওরে বাবা, এ যে একেবারে মোগলাই চা!

তিলক ॥ হবে না? এসব হ'ল গিয়ে রাজকীয় ব্যাপার। সাতকড়ি হালদার আনলে শুধু চা-ই আসতো—তাও হাফ কাপ।

সাজাহান ॥ যা-ই দিই, রসদদার হচ্ছেন আপনিই স্যার।

[চা ও খাবার দিয়া চলিয়া গেল]

রজত ॥ চমৎকার। অথচ এইসব লোকের ভাত জুটছে না।

শঙ্কর ॥ আমাদেরও যে খুব ভাল ক'রে জুটছে, তা নয় রজত। মালিক-দের অব্যবস্থা, কুব্যবস্থা – সর্বোপরি শোষণ—এই ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়ে আমরা যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিলাম, তখন আমরা এক মিটিং করে ঠিক করলাম—আমরা একতাবদ্ধ হবো, সমবায় থিয়েটার খুলবো।

রজত ॥ কিন্তু তার টাকা?

শঙ্কর ॥ আমরা একশো জন নাট্যশিল্পী—সিফটার থেকে হিরো সবাই—প্রত্যেকেই দশ টাকার অর্ডিনারী শেয়ার একটি ক'রে কিনেছি। আমাদের সমিতি সমবায় আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করেছি। নামকরণ হয়েছে—রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতি।

রজত ॥ একশো জন লোক—দশ টাকার শেয়ার। হাজার টাকার ব্যবস্থা তো তবে হয়েই গেছে। তবে আর আমাকে হাজার টাকা জরিমানা করলে কেন শঙ্করদা?

শঙ্কর ॥ আরে দূর দূর। হাজার টাকায় কখনও থিয়েটার চলে? একটা থিয়েটার চালাতে হ'লে অন্তত লাখ টাকা নিয়ে বসতে হবে। এই লাখ টাকার মধ্যে এক হাজার টাকা আমাদের নাট্যশিল্পীদের দশ টাকার একশ'টি শেয়ার থেকে উঠেছে আর ৯৮ হাজার টাকার যোগাড় হয়েছে—কিছু হাজার টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু ক'রে আর কিছু আমানত নিয়ে।

রজত ॥ এই প্রেফারেন্স শেয়ার কারা নিয়েছেন?

তিলক ॥ নিয়েছেন—যাঁরা নাট্যামোদী। থিয়েটার যাঁরা ভালবাসেন, নাটক ভালবাসেন, নট-নটীদের স্নেহ করেন—অর্থ আছে, অর্থের সদ্ব্যয়ও যাঁদের আছে।

রজত ॥ তা কলকাতা শহরে এ রকম হাজার হাজার লোক আছে বৈকি!

শঙ্কর ॥ তাদের মধ্যে তুমিও একজন। তাই চেকটা লিখতে কলমটা তোমার কাঁপবে না—এ আমি জানি।

রজত ॥ [হাসিয়া] না, তা কাঁপবে না। তার কারণ—ছোটবেলা থেকেই তোমাকে আমি জানি শঙ্করদা।

শঙ্কর ॥ যাঁরা আমাকে জানেন না, তাঁরাও আপত্তি করেন নি রজত।

তার কারণ—প্রথম শ্রেণীর অনেক আর্টিস্ট, যাদের অভিনয় দেখতে তাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাও আছেন আমাদের সঙ্গে।

রজত ॥ কিন্তু একটা কথা বুঝছি না শঙ্করদা। এ থিয়েটারও তবে কি সেই বড়লোকদের হাতেই চ'লে যাবে না?

শঙ্কর ॥ না, তা যাবে না। এই সমবায় সমিতি যখন লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে, তখন এইসব প্রেফারেন্স শেয়ার সমিতি কিনে নিতে পারবে—এ শর্ত আছে। এতে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না রজত?

রজত ॥ কিছু না, এ শেয়ার নিচ্ছি থিয়েটারকে ভালবাসি ব'লে—ব্যবসা করতে নয়। [চেক্ লিখিয়া] এই নাও চেক্। আর কোথায় কি সই করতে হবে বল?

তিলক ॥ [কাগজগুলি আগাইয়া দিয়া] এই যে—এখানে—এখানে আর এখানে. সাক্ষী আমরাই হচ্ছি। [তিনজনেই সহি করিল]

শঙ্কর ॥ আর ভাবনা কি তিলক, এবার উঠে-প'ড়ে লেগে যাও। তোমার "জীবন-মরণের" রিহার্সাল শুরু করে দাও।

তিলক ॥ সে তো শুরু করেছি। আমি ব'সে নেই শঙ্করদা। এখন দরকার একটি ভালো হিরোইন—নাচ-গান-অভিনয়ে চৌকশ একটি মেয়ে।

শঙ্কর ॥ সাত রাজার ধন যখন পেয়েছো, রাজকন্যাও পাবে। না পাও—গ'ড়ে নিও। কিন্তু ভাই আর দেরি নয়। এদিকে যা করবার আমি করছি। প্লে-টা তুমি তৈরি কর।

রজত ॥ আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠি। আপনাদের রিহার্সাল দেখতে একদিন কিন্তু আসবো।

তিলক ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়।

শঙ্কর ॥ আমিও তা হ'লে চলি তিলক। আজ বড় ক্লান্ত।

তিলক ॥ আমিও।

[রজত ও শঙ্কর সেন চলিয়া গেলেন। তিলক ইঁহাদের সঙ্গে বাহিরে গিয়া বিদায় দিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিল।]

সাজাহান—

[ডাকিয়াই নিজে জামা খুলিতে লাগিল।]

[সাজাহান প্রবেশ করিল।]

সাজাহান ॥ খাবার দেবো?

তিলক ॥ না শরীরটা আজ ভাল বুঝছি না। খাবো না। তুমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

সাজাহান ॥ কড়াটা নামিয়ে এসে আমি বিছানাটা করে দিচ্ছি।

তিলক ॥ দরকার নেই। তুমি যাও—আমি দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ছি।

[শাজাহান চলিয়া গেল। তিলক রঙ্গাগারের দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গায়ের জামাটি খুলিয়া আলনায় রাখিল। শয্যায় শুইবার আগে কুণ্ডলীকৃত লেপটি টান দিয়া দেখে একটি তরুণী জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সাপ দেখিলে লোক যেমন চমকিয়া ওঠে, তিলক তেমনি চমকিয়া উঠিয়া পিছে হটিয়া আসিল। মুহূর্তকাল ঐখান হইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিল, তৎপর ধীরে ধীরে তরুণীর দিকে অগ্রসর হইল।]

তিলক ॥ এই মেয়ে শুনছো।·····কি ঘুম রে বাবা।

[কোনও সাড়া না পাইয়া তরুণীর দিকে তিলক ঝুঁকিয়া পড়িল।]

এই মেয়ে,—এই মেয়ে—

[তরুণী জাগ্রত হইল। তিলককে দেখামাত্র সন্ত্রস্ত লইয়া বিছানা হইতে চট্ করিয়া নামিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

তুমি তো আচ্ছা মেয়ে। এতোগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে লুকিয়েছিলে!

তরুণী ॥ আমায় মাপ করুন আপনি, আমি ঐ অনাথ-আশ্রমের মেয়ে।

তিলক ॥ সে আমি জানি। এখানে যখন নাচ-গানের বিহার্সাল হয়, তুমি ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁত বের ক'রে হাসো। তোমার কি সাহস! আবার আমারই ঘরে পালিয়ে এসে—আমারই লেপের তলায় শুয়ে দিব্বি ঘুমিয়ে নিলে! এতোগুলো লোককে এমন করে ঠকিয়ে আবার বলা হচ্ছে—মাফ করুন! চল—

তরুণী ॥ কোথায়?

তিলক ॥ তোমার আস্তানায়।

তরুণী ॥ অনাথ-আশ্রমে?

তিলক ॥ হ্যাঁ।

তরুণী ॥ ওরে বাবা! [করজোড়ে মিনতি করিয়া] না।

তিলক ॥ না কেন?

তরুণী ॥ ওখানে আধ-পেটা খাইয়ে রাখে—যা-তা বলে—মারধোর করে। মরবো—সেও ভালো, ওখানে যাব না।

তিলক ॥ যাবে না বললেই হ'ল!

[তরুণীটির দিকে অগ্রসর হইল। তরুণীটি চিৎকার করিয়া উঠিল।]

তরুণী ॥ দাঁড়ান। ধরতে এলেই আমি লাফ দেবো। [তিলক দাঁড়াইল] হ্যাঁ, জানালা থেকে পথে লাফিয়ে প'ড়ে আমি মরবো—সেও ভালো, অনাথ-আশ্রমে আর যাবো না।

তিলক ॥ হুঁ·····ঐ আশ্রমের যদি এতোই ভয়, তবে তারই সামনের বাড়িতে পালিয়ে এসে কি ক'রে তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারো?

তরুণী ॥ কি ক'রে ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। তবে এইটুকু মনে পড়ছে, কেবলি আমি অলিতে-গলিতে ছুটছি—পিছনে পিছনে ছুটছে রামপাকড় সিং—মরিয়া হয়ে একটা একতলা বাড়িতে ঢুকে প'ড়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে শুকোবার খান-দুই শাড়ি বেঁধে লাফিয়ে পড়ি নিচে—চোখকান বুঁজে ছুটতে ছুটতে যেখানে এসে পড়লাম, চেয়ে দেখি সেটা আমাদের আশ্রম। ওরে বাবা-তাই না দেখে কেউ আসবার আগেই ঢুকে পড়লাম এই বাড়িতে। মা-কালীর কি দয়া—আপনার ঘরের দরজাটা ছিল খোলা। আমি বেঁচে বেঁচে গেলাম। [হাঁপাইতে লাগিল]

তিলক ॥ বেঁচে গেলে মানে? কি ক'রে তুমি ভাবলে, আমি তোমায় গেলাম—আমি ধরিয়ে দেবো না?

তরুণী ॥ আমি দেখেছি—আপনি নাচ-গান করেন। আমি দেখেছি যারা গান গায়, বাঁশী বাজায়, তাঁরা ভারী ভালো লোক হয়– সত্যিকার দয়াময় হয় তাঁরা। আমাদের ঐ ম্যানেজারটা নয়—নাম যদিও তার দয়াময় বোস।

তিলক ॥ তা হ'লে তুমি ওখানে যাবে না!

তরুণী ॥ না।

তিলক ॥ তবে কোথায় যাবে?

তরুণী ॥ জানি না।

তিলক ॥ জানো না?

তরুণী ॥ কি ক'রে জানবো? আমার তো আর কেউ নেই। কেউ যদি থাকতো, তবে কি আর ঐ যমের দুয়ারে আমার গতি হয়?

তিলক ॥ হুঁ······[হঠাৎ] কিন্তু এখানেই বা তোমাকে কি ক'রে আমি রাখি?

তরুণী ॥ সে আপনি জানেন।

তিলক ॥ আমি জানি!

তরুণী ॥ তবে কি আমি জানবো? কেউ কি আমার আর আছে যে, আমি সেখানে যাবো?

তিলক ॥ তাও তো বটে।······কিন্তু—

তরুণী ॥ ও! [কি যেন ভাবিয়া] বেশ, আমি যাচ্ছি। [দরজার দিকে অগ্রসর হইল]

তিলক ॥ দাঁড়াও।····· কোথায় যাচ্ছো? আশ্রমে?

তরুণী ॥ জানি না। [দরজা খুলিতে গেল]

তিলক ॥ দাঁড়াও। আজ রাতটা তুমি এখানেই থাকো।

তরুণী ॥ তারপর কাল সকালে আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবেন। কাজ নেই আপনার এই দয়ায়। আমি ভেবেছিলাম,—আপনি নাচ গান, বাঁশী

বাজান—[ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কাপড়ে মুখ লুকাইল। তিলক গিয়া তাহার হাত ধরিল।]

তিলক॥ ভিতরে এসো। [হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল] তোমার নাম ?

তরুণী॥ মায়া।

তিলক॥ নামটি তোমার মিথ্যে হয় নি। তোমাকে দেখলে সত্যিই মায়া হয়—মমতা হয়। তুমি বসো। [তিলক মায়াকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া রান্না ঘরের দরজায় গিয়া ডাকিতে লাগিল] সাজাহান—সাজাহান—আমি খাবো না বলেছিলাম, কিন্তু এখন বলছি—খাবো। শিগগির খাবার আনো দু'জনের।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা-বাণপুর লাইনে মদনপুর গ্রাম। স্টেশনের ডিষ্ট্যান্ট সিগ্‌নালের নিকট তিলক চৌধুরীর পল্লীভবনের অন্দরমহল। তখন বেলা দশটা। একখানি ট্রেণ চলিয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল। তিলক চৌধুরীর মাতা বাতব্যাধি-আক্রান্ত আনন্দময়ী-দেবীকে একহাতে ধরিয়া ও অন্য হাতে বসবার একটি মোড়া লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল একটি প্রৌঢ়া মহিলা। নাম নিস্তারিণী দাসী—তিলক চৌধুরীর গোমস্তা তারিণী-খুড়োর পত্নী।]

নিস্তারিণী॥ [মোড়াটি মাটিতে রাখিয়া] নাও বোসো দিদি—রোদ খাও। কবরেজ বলেছে—রোদ খেতে হবে রোজ পুরো একটি ঘণ্টা। বাণপুর লোকাল চ'লে গেল—মানে বেলা এখন দশটা। ডাকগাড়ি যাবে বেলা এগারোটায়। গেলে আমায় ডেকো।

আনন্দময়ী॥ দেখ্‌, নিস্তার, আমি একলাটি এখানে ব'সে থাকতে পারবো না। তুই আমায় বাতের তেলটা মালিশ ক'রে দে।

নিস্তারিণী॥ ভালোরে ভালো। বলি, শুধু রোদ খেলেই কি পেট ভরবে ? শাক-স্থক্তো রাঁধতে হবে না এক গাদা ? আমি কি দশভুজা যে, চার হাতে তেল মাখাবো, ছ' হাতে রাঁধবো ? এমন করলে আর আমি পারবু নি বাপু।

আনন্দময়ী॥ পারবি না যদি, গোমস্তা মশাইকে বল্‌। তিনি আর-একটা বিয়ে করুন। দুই সতীন-কাঁটা মিলে আমার সেবা-শুশ্রূষা করবি।

নিস্তারিণী॥ দেখ দিদি, তোমার গোমস্তা একটা কেন, দশটা বউ পুষবে, কিন্তু সে বউ হ'ল গিয়ে তারই দাসী—তোমার তো নয় বাপু। ভালো কথা তো কানে তোলো না। তা যদি তুলতে তোমার দুঃখ কবে ঘুচে যেতো।

আনন্দময়ী ॥ কেন রে ? কি কথা তোর শুনি নি ?

নিস্তারিণী ॥ ব্যাটার বিয়ে দিতে আমি বলি নি ? যদি বল বলি নি, তবে বলবো, কানের মাথাটি খেয়েছো। তোমার হ'ল কি গো ? একে একে সব অজই যে গেল দেখছি ?

আনন্দময়ী ॥ তা যা বলেছিস নিস্তার। 'বল হরি হরিবোলের' দিন এসে গেছে। তুই কি ভাবিস, বিয়ে করবার জন্যে তিলককে আমি ধরি নি ? তা ওর ঐ এক কথা—"পাত্রীর জন্যে বিশ্বকর্মার কারখানায় অর্ডার দিয়েছি—তৈরি এখনো শেষ হয় নি মা"। মোদ্দা কথা—ও এখন বিয়ে করবে না। আজ-কালকার ছেলে—জোর তো চলে না নিস্তার।

নিস্তারিণী ॥ আঃ! এই শেষবয়সে তোমাকে দেখবারও তো একটা লোক চাই।

আনন্দময়ী ॥ [হাসিয়া] বোকার মতো কথাটা বললি নিস্তার। এ কথা বললে ও শুধু হাসবে। তিলক জানে—বেশ ভালো ক'রেই জানে—সব চেয়ে বেশি জানে যে, দেখবার লোকের আমার অভাব হয় নি—হবেও না কোন দিন—যদ্দিন তুই আছিস নিস্তার।

নিস্তারিণী ॥ আমার মরণ হ'লে আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচো।

[রাগতভাবে প্রস্থান, অন্যদিক দিয়া গোমস্তা তারিণী খুড়োর প্রবেশ।]

তারিণী ॥ কি হ'ল—আবার কি হ'ল ? বুনো ওলে বাঘা তেঁতুল গুলে দিয়েছো বুঝি বৌঠান ?

আনন্দময়ী ॥ ওটা তোমারই কাজ ঠাকুরপো। ওটাও যদি আমি কেড়ে নিই, তবে তো তোমার আর কিছু করবার থাকে না ঠাকুরপো।

তারিণী ॥ মানে ? ঐ হ'ল গিয়ে আমার কাজ ? আর কোন কাজ নেই ? ব'সে ব'সে আমি তোমার মাইনে খাচ্ছি !……ঐ দেখ !

[দেখতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তিলক মায়াকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল। মায়ার পোশাকে পরিবর্তন দেখা গেল। তাহার পরণে একখানি নূতন ভাল শাড়ি। থিয়েটারী প্রসাধনে, ঘসিয়া মাজিয়া চেহারার ঔজ্জ্বল্যও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিলক মায়াকে টানিয়া লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। নিজে চট্ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া উঠিল এবং মায়া তখনও প্রণাম করে নাই দেখিয়া মায়াকে দিয়া টিপ করিয়া প্রণাম করাইয়া লইল।]

তিলক ॥ [মায়াকে] আমার মা—আনন্দময়ী মা। [আনন্দময়ীকে] মায়া সরকার। [হাত-ঘড়ি দেখিয়া] বুঝলে মা, এখন দশটা চল্লিশ। আর এগারো মিনিট বাদে কলকাতার ডাকগাড়ি। এই এগারো মিনিটে সব কিছু সারতে হবে আমাকে। না, না, তোমাকে আর চেঁচাতে হবে না—মোক্ষদাকে

আমি ব'লে দিয়েছি খাবার আনতে। এখনো ভালো বাড়ি পাইনি—কলকাতায় যাওয়া তোমার হবে না মা। কলকাতার রাজবদ্যি হারাণ সেনকে ব'লে তোমার বাতের মারাত্মক সব ওষুধ এনেছি তিন বাক্স।

[এক প্লেট খাবার লইয়া নিস্তারিণী ও এক গ্লাস জল লইয়া মোক্ষদার প্রবেশ।

এই যে আমার খোরাক সব এসে গেছে। না, না, নিস্তার-খুড়ী, তুমি চেঁচাবে না।

[টপ করিয়া একটি রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া উহা গিলিয়া চিৎকার করিয়া]

জল দে মোক্ষদা।

[মোক্ষদা ছুটিয়া আসিয়া জলের গ্লাস দিল। তিলক ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পান করিল। চট্ করিয়া হাত-ঘড়ি দেখিয়া।]

আর ন' মিনিট। [নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া] না, না, তুমি চেঁচাবে না। ঐ খাবারগুলো বেঁধে দাও। আরাম ক'রে ট্রেনে ব'সে খাবো তোমার রান্না।

[নিস্তারিণী হতাশজ্ঞাপক ভঙ্গী করিয়া খাবারের থালা লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। মোক্ষদা তাহার অনুসরণ করিল]

তিলক ॥ [তারিণীর প্রতি] আপনি এখনো সঙের মত এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? তিন তিন কেস দামী ওষুধ গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে যদি ভেঙে ফেলে।—যান—শিগগিরি যান। [তারিণীর প্রস্থান]

[আনন্দময়ীকে] বুঝলে মা—এই যে মেয়েটি দেখছো—একে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়েছি। ঘড়ি ধ'রে তোমাকে খাওয়াবে—দু'বেলা তোমাকে তেল-মালিশ করবে—[মায়াকে] করবে তো? [মায়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল]

[আনন্দময়ীকে] দেখলে তো, তুমি সাক্ষী রইলে। [হাত-ঘড়ি দেখিয়া] আর আট মিনিট—ছুটে স্টেশনে যেতে তিন মিনিট—[হাঁফ ছাড়িয়া] যাক্। ঢের সময় আছে। এইবার ধীরে-সুস্থে সব বলছি [আনন্দময়ীকে] না, না তোমার কথা শোনবার সময় নেই। তুমি শুধু আমার কথাগুলো শুনে যাও। নাম তো বলেছি,—মায়া—মায়া সরকার। এইদেশী লোক, পূর্ববঙ্গে বাপ কি চাকরি করতেন। হিন্দুস্থান পাকিস্থান—সেসব জান তো? রিফিউজি হয়ে পালিয়ে আসে কলকাতায়। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে একদিনেই সব মারা যায় কলেরায়। মরলে এই মেয়েটাও বাঁচতো। কিন্তু কপালে অনেক দুঃখ ছিল, তাই মরতে মরতে বেঁচে গেল। ঠাঁই হল এক অনাথ-আশ্রমে [হাত-ঘড়ি দেখিয়া], নাঃ, আর বলা হল না [মায়াকে] এই মেয়ে, বাকিটা তুই সব মাকে বলো। আমাকে আবার এখুনি ঠাকুরঘরে ঠাকুর প্রণাম করতে যেতে হবে। নইলে তো তোমার আবার ঘুম হবে না মা। যাচ্ছি মা—যাচ্ছি। কিন্তু

একটা কথা না ব'লে যেতে পারছি না। মেয়েটির অনেক গুণ—চমৎকার চা করে, ওর বিধবা পিসির জন্যে শাক-সুক্তোও যা নাকি রাঁধতো, পিসি বলতেন অমৃত। দেশের বাড়িতে নাকি ঠাকুরসেবাও ছিল। তার ভারও ছিল ওরই উপর। কিন্তু এমন মেয়ের আজ মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। আমার ওখানে তো রাখা চলে না, তাই তোমার কাছে রেখে গেলাম। আর যা আমার বলবার ছিল, আজ আর তা বলা হ'ল না, সে তুমি মনে মনে বুঝে নিও। চলি মা চলি—

[ঢিপ করিয়া মাকে প্রনাম করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

আনন্দময়ী ॥ পাগলটার কাণ্ডটা দেখলে! এসো তো মা—আমাকে ধ'রে নিয়ে চল তো মা—

[মায়া আনন্দময়ীকে ধরিয়া তুলিল এবং উভয়ে তিলকের অনুগামিনী হইল।]

———

তৃতীয় দৃশ্য

[রামকৃষ্ণ নাট্যপীট সমবায় সমিতির অফিস-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা। ম্যানেজার শঙ্কর সেন বসিয়া লেখাপড়ার কাজ করিতেছে। আর-একটি টেবিলে নাট্যকার শেখর মিত্র "জীবন-মরণ" নাটকের পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে। শঙ্কর সেন কলিং বেল টিপিল। নেপথ্য হইতে সাজাহান উত্তর দিল।]

সাজাহান ॥ [নেপথ্য হইতে] যাচ্ছি স্যার—

[মুহূর্ত মধ্যে সাজাহানের প্রবেশ।]

বলুন স্যার।

শঙ্কর ॥ চা আনো সাতকড়ি……হ্যাঁ, আর শোন, পাশের ঘরে বাবুরা কাজ করছেন—ওখানে চা দিও, বুঝলে সাতকড়ি।

সাজাহান ॥ আজ্ঞে তা আর বুঝবো না—চা মানে শুধুই চা দিচ্ছি।

[সাজাহানের প্রস্থান। অন্যদিক হইতে কাগজ পড়িতে পড়িতে হিমালয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ।]

হিমালয় ॥ "ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কো-অপারেটিভ থিয়েটার—রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ।"

শেখর ॥ বেরিয়েছে নাকি?

হিমালয় ॥ হ্যাঁ—দুন্দুভিতে—একেবারে প্রথম পাতায়। ইঃ—যা লিখেছে, একেবারে আগুন জেলে দিয়েছে মশায়।

শঙ্কর ॥ দেখো আবার লঙ্কাকাণ্ড না হয়।

হিমালয় ॥ না, না, শুনুন না? [পাঠ] "ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কো-অপারেটিভ থিয়েটার—রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ—রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনায় অভূতপূর্ব ব্যবস্থা। শোষণ নাই, অথচ পোষণ আছে।"

শঙ্কর ॥ বাঃ, বেশ কথাটি লিখেছে তো। পড়—পড়—।

হিমালয় ॥ [পাঠ] "আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, বঙ্গ রঙ্গ-মঞ্চের প্রধান নট শ্রীশঙ্কর সেনের নেতৃত্বে একদল খ্যাত এবং অখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমবায় পদ্ধতিতে একটি আধুনিক থিয়েটার পরিচালনা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। মালিকদের খাম খেয়ালীতে নট-নটী এবং থিয়েটারের কর্মিগণ যাহাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেইজন্য নিজেরাই থিয়েটারের মালিক এবং শ্রমিক হিসাবে কাজ করিবার জন্য সমবায় পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইলে সর্বভারতীয় নাট্যজগতে এক যুগান্তর ঘটিবে।"

শেখর ॥ সাধু! সাধু!

হিমালয় ॥ [পাঠ] "অনেক থিয়েটারে এরূপ দেখা গিয়াছে, নাট্য-শিল্পীরা ছয়-সাত মাস বেতন না পাইয়াও থিয়েটারটি যাহাতে চালু থাকে, তজ্জন্য আধ-পেটা খাইয়াও কাজ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই উদার মনোভাবের মর্যাদা রক্ষা করে নাই; বরং তাঁহাদের এই আত্মত্যাগের সুবিধা লইয়া হয় নিজেরা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, নতুবা নিজেরা ভোগবিলাসে সবকিছু উড়াইয়া দিয়াছে।"

[ইতিমধ্যে চা লইয়া সাজাহান প্রবেশ করিয়াছে। উপরোক্ত পাঠ শুনিয়া সাজাহান তাড়াতাড়ি চায়ের ট্রেটি একপাশে রাখিয়া দিয়া ভাবাবেগে ছুটিয়া গিয়া হিমালয়কে হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল।]

সাজাহান ॥ কে লিখেছে? কে লিখেছে? এতো আমাদেরই কথা লিখেছে।

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, আমাদেরই কথা। চা-টা দাও,—নিজে এক কাপ নাও,—বসো, শোনো। তুমি পড় হিমু।

[সাজাহান তদ্রূপ করিতে লাগিল।]

হিমালয় ॥ [পাঠ] "নাট্যশিল্পীকে বুভুক্ষু রাখিয়া নাট্যশিল্প কখনও বাঁচিতে পারে না। এই দুরবস্থা বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই এতোকাল হয় নাই। এতোদিন পর শোষিত ও নিপীড়িত শিল্পীদের ঘুম ভাঙিয়াছে। তাহাদের একদল শ্রীশঙ্কর সেনের নেতৃত্বে সমবায়-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে—

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

এই নবগঠিত শিল্পগোষ্ঠীর প্রথম অবদান সুপরিচিত নাট্যকার শ্রীশেখর মিত্র লিখিত নৃত্য-গীতবহুল নাটিকা "জীবন-মরণ" পাদ-প্রদীপের সম্মুখে শীঘ্রই উদ্ভাসিত হইবে। নাটিকাটি প্রযোজনা করিবেন প্রবীণ নট শ্রীশঙ্কর সেন এবং নৃত্য-গীত পরিচালনা করিবেন তরুণ সুরশিল্পী শ্রীতিলক চৌধুরী। রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতির এই অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক—এই শুভেচ্ছা জানাইয়া উদ্বোধন-উৎসবটির সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম আমরা।"

[সাজাহান একটি চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতে করিতে পত্রিকা-পাঠ শুনিতেছিল, হিমালয়ের পাঠ শেষ হইতেই কেটলি হইতে এক কাপ চা ঢালিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল।]

সাজাহান ॥ চা নিন স্যার।

হিমালয় ॥ রিহার্সাল-ঘরে নিয়ে এসো।

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, রিহার্সালের সময় হয়েছে, এসো শেখর।

[সাজাহান ব্যতীত সকলের কক্ষান্তরে প্রস্থান। সাজাহান চায়ের কাপ-প্লেট প্রভৃতি গোছাইতে লাগিল। বাহির হইতে হারাধনসহ মুক্তার প্রবেশ।]

সাজাহান ॥ কিরে মুক্তো? এতো দেরি কেন? আর-সব মেয়েরা কখন এসে গেছে?

মুক্তা ॥ নূপুর হালদারও এসেছে?

সাজাহান ॥ না, খবর পাঠিয়েছে—অসুখ করেছে। কিন্তু তোর তো অসুখ নয়, তোর এত দেরি কেন?

হারাধন ॥ অসুখ নয় বোল না খুড়ো, কি খবর রাখো তুমি ওর? ধন্যি বাপ তুমি! মেয়ের সুখ-দুঃখের দিকে কোন দিনই চাইলে না?

মুক্তা ॥ তার দরকারও নেই হারাধনবাবু। যেদিন আমি মা হারিয়েছি, সেদিন থেকে ওঁকেও আমি হারিয়েছি। ওঁর মতন উনি আছেন—আমার মতন আমি আছি। এই বেশ আছি।

সাজাহান ॥ এসব বললে তোকে দোষ দিতে পারি না মুক্তো। তোকে যে আমি প্রতিপালন করতে পারলাম না—এ দুঃখেই একদিন মদ ধরেছিলাম রে—মদ ধরেছিলাম। বাপের যে এটা কতো বড় দুঃখ—সেটা তুই বুঝতিস্, যদি তুই আমার বুকের ভিতরটা দেখতিস্ [বুক দেখাইয়া] এটা নেই—পুড়ে গেছে। যাক্ নিজের পায়ে যে তুই দাঁড়াতে চেষ্টা করছিস্—এ ভালো রে—খুব ভালো। আর এই কো-অপারেটিভ থিয়েটারে যখন তোকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছি—দাঁড়িয়ে তুই যাবিই—দেখিস্ তখন।

হারাধন ॥ তা দাঁড়াবে তা দাঁড়াবে।

মুক্তা ॥ ছাই দাঁড়াবো। দিয়েছে তো ঐ এক লাইনের পার্ট।

সাজাহান ॥ কেন? দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী সাজছিস্ তো।

মুক্তা ॥ হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী। নামেই বটে তালপুকুর, কিন্তু ঘটি ডোবে না।

সাজাহান ॥ মানে?

মুক্তা ॥ তা নয়তো কি? গালভরা নাম, ইন্দ্রাণী, কিন্তু পার্ট হচ্ছে মাত্র একটি লাইন,—"সুদর্শনার প্রাণদান কর যমরাজ।" কেন? আমি কি ঐ সুদর্শনার পার্ট করতে পারতাম না? নূপুর হালদারের চেয়ে আমি কম কিসে?

সাজাহান ॥ না, না, কম কিসের? তোর বাপ—সাতকড়ি হালদার সেকালের এতো বড়ো নাম-করা অভিনেতা। তোর মা—চারুসুন্দরী ছিল সেকালের রঙ্গমঞ্চের বুলবুল। তুই বেটী হলি গিয়ে জাত-অভিনেত্রী। দু'দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক্। দেখবি—তর তর ক'রে উঠে যাবি। [ভিতর হইতে কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল] এই যাঃ! চা দেওয়া হয় নি।

মুক্তা ॥ দেখ বাবা; যেখানে-সেখানে আমাকে বেটী বেটী ক'র না। তর তর ক'রে আমি উঠতে পারবো আমি জানি—শুধু লোক যদি আজ না জানে যে, থিয়েটারে যে চা দিয়ে বেড়ায়, আমি তার মেয়ে।

সাজাহান ॥ ওঃ, আচ্ছা মা আচ্ছা—তাই হবে—তাই হবে—।

[সাজাহানের কক্ষান্তরে প্রস্থান।]

হারাধন ॥ যাক্! কথাটা যে বলতে পেরেছো, তোমার বাহাদুরি আছে।

মুক্তা ॥ হ্যাঁ, ওঁকেও বললাম, তোমাকেও বলছি। বাড়িতে তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই থাক্, সেটা বাহাদুরি ক'রে বাইরে প্রকাশ ক'র না। মনে রেখো, এ থিয়েটারে তুমি মাত্র সিফটার আর আমি একজন এ্যাকট্রেস!

[কক্ষান্তরে প্রস্থান।]

হারাধন ॥ তা আমি বলিও না। তবে আমার কি দোষ জানো? আমি কারের কষ্ট সইতে পারি না—বিশেষ তোমার।

[বলিতে বলিতে মুক্তাকে অনুসরণ করিল। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে শঙ্কর ও শেখরের প্রবেশ।]

শঙ্কর ॥ নূপুর হালদার তো আসেই নি, আর এরাও এতো দেরি ক'রে রিহার্সালে এলো। আর তিলক? সেই যদি এত দেরি করে, তবে এদের আমি কাকে কি বলবো?

শেখর ॥ ঐ তিলক এসে গেছে।

[তিলকের প্রবেশ।]

শঙ্কর ॥ নূপুর হালদার আজ আসে নি জানো?

তিলক ॥ আসে নি ব'লেই তো আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকেই আসছি। অসুখ-টসুখ সব বাজে কথা। একটু বেগ দেবার মতলব। দেখলুম রংমশাল থিয়েটারের ম্যানেজারও ওখানে ব'সে আছে।

শঙ্কর ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ব'সে থাকুন তাতে আমার কি? আমি সময় মতো নিয়ম মতো কাজ চাই। তার বোঝা উচিত ছিল যে, এ থিয়েটারের শুধু অভিনেত্রী নয়, একজন মালিকও বটে। কেন এলো না?

তিলক ॥ রংমশাল থিয়েটার তাকে ডবল মাইনে দেখাচ্ছে। আমি বললাম—বেশ তো। তোমার ধর্মের উপর সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছি। শুধু একটি কথা ভুলো না,—আমাদের প্লের দিন ঠিক হয়ে গেছে, আর তোমারই হ'ল গিয়ে মেন পার্ট।

শঙ্কর ॥ বেশ, আজকের দিনটা দেখ। কাল এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। আমাদের এ প্রচেষ্টা ভাঙবার জন্যে লোকের অভাব হবে না—এই আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি। যে টাকা শিল্পীদের বঞ্চিত ক'রে ঘরে ওরা মজুত করেছিল, সে টাকা ওরা এখন ছড়াবে—আমাদের দল ভাঙতে।

শেখর ॥ [পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া] তোমার অনুমান এতটুকু মিথ্যা নয় শঙ্করদা, এই দেখ চিঠি—আমার "জীবন-মরণ" নাটকটা ওরা কিনতে চাইছে হাজার টাকায়। আমার এর আগের নাটকটা ওরা করেছিল, কিন্তু সেজন্য ওরা হাজার পয়সাও দেয় নি।

শঙ্কর ॥ তুমি এখন কি করবে শেখর?

শেখর ॥ কি করবো জিগগেস করছো? আমাদের জীবন-মরণের সমস্যার এতোদিনে আমরা একটা পথ পেয়েছি। সে পথ কখনও ছাড়বো না আমরা।

তিলক ॥ হাত দিন। [শেখরের হাত ধরিয়া] যদি উঠতে হয় একসঙ্গে উঠবো, যদি পড়তে হয়, একসঙ্গেই পড়বো।

শঙ্কর ॥ পড়বো না। আমরা উঠবো—আমরা সব একসঙ্গে উঠবো।

[শঙ্কর উভয়কে বুকে টানিয়া লইল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[তিলকের পল্লীভবনের অন্দরমহল। কাল—অপরাহ্ন। আনন্দময়ীকে মায়া এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে বসিবার একটি মোড়া লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মায়া ॥ [মোড়াটি মাটিতে রাখিয়া] নাও, বোসো। [বসাইয়া দিয়া] আমি মাদুরটা নিয়ে আসছি।

আনন্দময়ী ॥ ঐ সঙ্গে রামায়ণটা আনতে ভুলিস্ নি।

মায়া ॥ আচ্ছা।

[মায়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে একখানা ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইবার শব্দ শোনা গেল। তারিণীর প্রবেশ।]

তারিণী ॥ আমায় ডেকেছিলে বৌঠান ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ ঠাকুরপো। বুড়ো বয়সে এতো ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি—এ তো আমি আর পেরে উঠি না! তোমাদের কি হয়েছে বল তো? না ডাকলে কাছে আসো না।

তারিণী ॥ সে কি বৌঠান! ডেকে আনলে তো এই একবার। সারা-দিনে খুব কম ক'রে অন্তত দশবার তো তোমার কাছে এসেছি! নিজের থেকেই এসেছি।

আনন্দ ॥ তোমার কথা হচ্ছে না। তোমার গুণবতী বৌটির কথা বলছি। আজকাল ভারী পায়াভারী দেখছি। তাই, তুমিই যাও—ডেকে দাও।

তারিণী ॥ যাচ্ছি। কর্তাদাদা স্বর্গ থেকে দেখ—আমার গোমস্তাগিরি আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে—বৌ-ডাকবার পাইক।

[তারিণীর প্রস্থান। পূর্বোক্ত ট্রেনটি ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল। মাদুর ও রামায়ণ হাতে মায়া আসিয়া মাদুর পাতিয়া রামায়ণ পড়িতে বসিল।]

মায়া। এই দেখ মা? এই দেখ সেই ছবিটা—লক্ষ্মণ কেমন স্বর্পনখার নাক কেটে দিয়েছে

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, এই পাতা থেকেই পড়। [মায়া সুর করিয়া চার লাইন রামায়ণ পড়িল]

"শ্রীরাম বলেন, ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে বিনাশ।
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক কান।"

আনন্দ ॥ তুই এতো ভাল পড়তে শিখলি কোত্থেকে রে? বাপের কাছে?

মায়া ॥ না মা।

আনন্দ ॥ তবে?

মায়া ॥ বেত খেয়ে মা—অনাথ-আশ্রমের মাস্টারের কাছ থেকে।

আনন্দ ॥ বলিস্ কি! বেত মারে?

মায়া ॥ পিঠে এখনও দাগ আছে মা। তা মারবি মার। পেট ভ'রে খেতে দে। পেটে খেলে পিঠে সয়—কি বল মা?

আনন্দ ॥ দেখি মা দেখি, কোথায় মেরেছে?

মায়া ॥ না, না, সে ওষুধটা দিয়ে সেরে গেছে মা। এই যাঃ! তোমার বিকেলের ওষুধ দিতে তো ভুলে গেয়েছি।

[মায়ার ছুটিয়া প্রস্থান। অন্যদিক হইতে নিস্তারিণীর প্রবেশ।]

নিস্তারিণী ॥ এইতো এসেছি—কি বলবে বল।

আনন্দ ॥ জ্বালারে জ্বালা! মুখ খুলেই মার-মুখো। বলি ও নিস্তারিণী, এতো জোর তোর আসে কোত্থেকে? আমার খাবি, আমার পরবি—আর আমারই ছায়া মাড়াবি না? জ্বালারে জ্বালা!

নিস্তারিণী ॥ জ্বালারে জ্বালা। চোখের মাথা খেয়েছেন উনি, দোষ হ'ল আমার? সারাদিন তো আশেপাশে কতোবার ঘুর ঘুর করছি, একবারও কি চোখে পড়লো? তা পড়বে কেন?

[খলে ওষুধ মাড়িতে মাড়িতে মায়ার প্রবেশ।]

এখন যে চোখের মনি হয়েছেন উনি।

আনন্দ ॥ হবেই তো। তোকে দিয়ে চলবে আমার সেবা-শুশ্রূষা? কি ক'রে চলবে? দু' দিন ভালো থাকিস্? তোর আজ জ্বর, কাল গা ম্যাজ ম্যাজ—এ তো তোর লেগেই আছে। এতো বলি দু'দিন শুয়ে ব'সে থাক্—ভালো ওষুধ-পথ্যি কর—একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠ্—তারপর আবার আমাকে নিয়ে পড়। তা এমন আস্পর্ধা, শুনলি নে। এই তো এখন লোক পেয়েছি। আমার যত্ন আত্তিতে তোর থেকে এতটুকু কম নয়। এইবার? তোর বিষদাঁত ভেঙেছি তো। দূর হ'—আমার সামনে থেকে দূর হ'—। ভালো চাস্ তো, তোর সেই গুণধর মানুষটিকে পাঠিয়ে দে। আজ তার একদিন কি আমার একদিন।

নিস্তারিণী ॥ তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু বেশি চেঁচামেচি করলে আজ রাতে তোমার ঘুমের দফা গয়া। সে ঠ্যালা কে সামলায় দেখবো এখন।

[মায়ার প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। মায়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

মায়া ॥ তোমরা বেশ পারো তো। নাও, ওষুধটা খেয়ে নাও।

আনন্দ ॥ ওষুধ! আবার ওষুধ কেন?

মায়া ॥ আমি কি করবো? চারটের গাড়ি চ'লে গেল কেন? চারটের সময়ই না তোমার ওষুধ খাবার কথা। তুমি বড্ডো ভুলে যাও মা।

আনন্দ ॥ [ঔষধ খাইয়া] তা দেখছি তোর কিছুতেই ভুল নেই। এই কদিনে তুই এতো শিখলি কি ক'রে? অথচ এতো বছর ধ'রে আছে ঐ নিস্তার—নাওয়াবার সময় খাওয়াবে, খাওয়াবার সময় নাওয়াবে। আবার তারই দেমাক কতো! কিছু বলবার যো নেই! রাতদিন শোনাচ্ছে—আমি না দেখলে, কে তোমাকে দেখবে? কেন? দেখবার লোকের অভাবটা কি? অমন সোনারচাঁদ ছেলে রয়েছে—বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনতে আমাকে আটকাচ্ছে কে? বলি, আটকাচ্ছে কে শুনি? তুই বল্ না মায়া?

মায়া ॥ কে আবার আটকাবে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? তুমি এখনই তোমার ছেলের বিয়ে দাও মা।

আনন্দ ॥ দেবই তো। কিন্তু বিপদ হয়েছে কি জানিস্? হতভাগা বিয়ে করতে চায় না যে!

মায়া ॥ বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু ধাড়ী ধাড়ী মেয়েগুলোর সঙ্গে ধেই ধেই নাচানাচিটা তো খুব দেখি।

আনন্দ ॥ তুই বলছিস্ কি মায়া!

মায়া ॥ যা দেখেছি, তাই বলছি। হাঁা, অনাথ-আশ্রমের জানলা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই যে আমি দেখতে পেতাম মা। কি যেন থিয়েটার হবে, মেয়েগুলোকে তারই সব নাচ-গান শেখায়। এমন চেঁচামেচি আর হৈ হৈ ক'রে সব শেখায় যে, জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিও সব শিখে নিয়েছি।

আনন্দ ॥ বটে! কি সব শেখায় রে?

মায়া ॥ বল তো আমি দেখিয়ে দিতে পারি।

আনন্দ ॥ দে তো।

মায়া ॥ এখানে কেউ আসবে না তো?

আনন্দ ॥ কে আবার আসবে?

["জীবন-মরণ" নাটকের সুদর্শনার ইন্দ্র-আবাহনের সেই গানটি মায়া নৃত্য-সহযোগে গাহিতে লাগিল। গানটি হইল এই।]

এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

[এদিকে মায়া নৃত্য-গীত শুরু করিবার ক্ষণকাল পরেই তিলক সেখানে হঠাৎ আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নৃত্য-গীতে বাধা না পড়ে, তজ্জন্য তিলক ইহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াই মায়ার এই নৃত্য-গীত উপভোগ করিল। গীতান্তে মায়া তিলকের শিক্ষামত বজ্রপাতজনিত মৃত্যু-দৃশ্যের অনুকরণ করিয়া ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল।]

আনন্দ ॥ ও কি হ'ল? ও কি হ'ল? ধপাস্ ক'রে প'ড়ে গেলি যে?

মায়া ॥ [তড়াক করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া] তোমার ছেলে এই রকমই যে ওদের শিখিয়েছে মা। [বলিয়াই লজ্জায় মায়া আনন্দময়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল।]

আনন্দ ॥ ছাই শিখিয়েছে। নাচতে নাচতে এমনি ক'রে কেউ অবার ধপাস্ ক'রে পড়ে যায় নাকি?

মায়া॥ কি জানি মা। পড়ে তো যায় দেখি। আমি তাই এটার নাম দিয়েছি 'চিৎপটাং নৃত্য'।

মায়া॥ ওরে বাবা! ঐ দেখ, কে এসেছে মা।

তিলক॥ তোমার যম।

আনন্দ॥ কি কাণ্ড বল্ দেখি। কখন এলি?

তিলক॥ নাচ-গানে এমন মশগুল থাকলে ট্রেনের আওয়াজ তো কানে ঢোকবার কথা নয়।

আনন্দ॥ এসেছিস্—ভালোই হয়েছে। এ কদিন তোকে বড্ড বেশি মনে পড়ছিলো। হ্যাঁরে, চিৎপটাং আবার একটা নৃত্য নাকি? এই সব ছাই-পাঁশ নাকি তুই শেখাস একপাল ধাড়ী মেয়েকে?

তিলক॥ ঐ চোর মেয়েটা বলেছে তো?

মায়া॥ দেখছো মা, তোমার ছেলে আমাকে চোর বললে?

তিলক॥ বলবো না? একশো বার বলবো। বুঝলে মা, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, আমি যা শেখাই, সব চুরি ক'রে শিখে নিয়েছে—জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আর তা এমন শেখা শিখেছে যে, যারা শিখেছিলো, ও তাদের এখন শিখিয়ে দিতে পারে। যাক্, এতে একটা কাজের কাজ হয়েছে মা।

আনন্দ॥ কি আবার কাজের কাজ হ'ল?

তিলক॥ সে আমার মনেই রইলো। সে এখন থাক্। [মায়াকে] কিন্তু ওটা চিৎপটাং নৃত্য নয়। ইন্দ্র-আবাহনের গানে আকাশে জমেছিল মেঘ। সেই মেঘ থেকে হঠাৎ হ'ল বজ্রপাত নর্তকীর মাথায়। তাই সে নাচতে নাচতে ধপাস্ ক'রে পড়লো আর মরলো। নাটকের গল্পটা হ'ল এই। কিন্তু চিৎপটাং নৃত্যও আছে মায়া। বুঝলে মা, সেটা হবে এখন। [মায়াকে] শিগগির দৌড়ে গিয়ে আর দু'টো মোড়া নিয়ে এসো—আমি দেখাচ্ছি। [তিলকের প্রস্থান]

মায়া॥ ওমা! এখানেও নাচ হবে নাকি মা?

আনন্দ॥ কি জানি বাপু? কখন যে কি মতলব ওর মাথায় খেলে, কে বুঝবে? আর-কাউকে হয়তো আনতে গেল। মোড়া দু'টো তুই নিয়ে আয়—নিস্তারকে ব'লে আয় খাবার দিতে।

[নিস্তারিণীর প্রবেশ।]

নিস্তারিণী॥ নিস্তারকে কিছু বলতে হয় না—চোখ কানের মাথা সে খায় নি। [মায়ার প্রস্থান] সঙ্গে দেখলাম, ভারিক্কি চালের আর একটি বাবু এসেছেন। তা এঁরা কি রাতেও থাকবেন, না পরের ট্রেনেই আবার হাওয়া হবেন কলকাতায়?

আনন্দ ॥ না, না, রাতে থাকবে ব'লেই মনে হ'ল রে নিস্তার। যতোক্ষণ এখানে ছিল, একটি বারও তো হাত-ঘড়ি দেখলো না তিলক।

[দুই হাতে দুইটি মোড়া লইয়া মায়ার প্রবেশ।]

নিস্তারিণী ॥ বাঁচালে দিদি। নইলে এত তড়ি-ঘড়ি আর পারি নে বাপু।

[নিস্তারিণীর প্রস্থান। মায়া মোড়া দুইটি যথাস্থানে রাখিল। দয়াময় বোসকে সঙ্গে লইয়া তিলকের প্রবেশ। দয়াময়কে দেখিয়াই মায়া সাতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পলাইতে গিয়া কাপড়ে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেল।]

তিলক ॥ [সোচ্ছ্বাসে]' এরই নাম হ'ল গিয়ে "চিৎপটাং নৃত্য", বুঝলে মা? [মায়ার কাছে গিয়া] নাও—ওঠো। [তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া] একটু লেগেছে হয়তো। তা এ নাচে একটু লাগেই, কিন্তু দেখতে বেশ। বসো,—মা যখন রয়েছেন, ভয় কি? মার কাছে বসো।

[মায়াকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আনন্দময়ীর পদতলে বসাইয়া দিল।]

তিলক ॥ বসুন দয়াময়বাবু। ইনিই আমার মা। ইনি হলেন দয়াময় বোস—সেই শ্রীশ্রীহরদুর্গা অনাথ-আশ্রমের ম্যানেজার। পলাতক আসামীর খোঁজ পেয়ে আমাকে ধ'রে এনেছেন এখানে—ওকে ধ'রে নিয়ে যেতে সেখানে।

মায়া ॥ আমি যাবো না।

আনন্দ ॥ আপনিই বা বাবা ওকে ধ'রে নিয়ে যাবেন কেন? ঠাকুর-দেবতার নামে অনাথ-আশ্রম খুলেছেন কিন্তু দু' বেলা দু' মুঠো খেতে দিতেও তো পারেন না শুনেছি।

দয়াময় ॥ তা যা শুনেছেন, সেটা খুব মিথ্যে নয়। কিন্তু তবু দায়িত্বটা আমাদের—অন্তত যতোক্ষণ অন্য কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক এ দায়িত্ব না নিচ্ছে।

আনন্দ ॥ এ মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আধপেটা খাইয়ে রাখা ছাড়া আর আপনারা কি করবেন বলুন দেখি?

দয়াময় ॥ সবই তো বুঝি মা, তবুও আইন—আইন। কাগজে-পত্রে প্রত্যেকটি মেয়ের জমা-খরচ রাখতে হয় মা। কাজেই খোঁজ যখন পেয়েছি, তখন আর ওকে ছাড়তে পারছি না। আমি ছাড়লে, আইন আবার আমাকে ছাড়বে না। ও যে এখানে পালিয়ে আছে, পুলিসে সেটা ডায়েরি হয়ে গেছে। আর, পুলিসের হুকুমেই না আপনার ঐ রোখা ছেলে ভোঁতা হয়ে আমার সঙ্গে এসেছেন।

তিলক ॥ সে কথা সত্যি মা। নইলে আমার যা বিপদ, তাতে কলকাতা ছেড়ে আজ আমার এখানে আসবার কথা নয়।

আনন্দ॥ তোর আবার কি বিপদ?

তিলক॥ সাংঘাতিক বিপদ। আমাদের "জীবন-মরণ" নাটক খোলার দিন ঠিক হয়ে গেছে—দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে, কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। আর আজ সকালে কিনা শুনি আমাদের নাটকের নায়িকা নূপুর হালদার—যার ঐ ইন্দ্র-আবাহনের নাচ নেচে মাথায় বাজ প'ড়ে মরবার কথা—সেই নূপুর হালদার কিনা মোটা টাকার লোভে আমাদের থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে রংমশাল থিয়েটারে যোগ দিয়ে আমাদেরই মাথায় বজ্রঘাত করলো!

আনন্দ॥ ও এই বিপদ! তাই বল।

দয়াময়॥ [পকেট ঘড়ি দেখিয়া] কিন্তু আমার বিপদটাও কম নয় মা। ও মেয়েকে নিয়ে আজই আমাকে ফিরতে হবে কলকাতায়, রিপোর্ট করতে হবে থানায়।

মায়া॥ না, না, মা। আমি যাবো না।

[আনন্দময়ীর পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।]

আনন্দ॥ [মায়াকে] আঃ! তুই থাম্ না মা। [দয়াময়কে] কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝছি না বাবা। একে নিয়ে গিয়ে আধপেটা খাইয়ে রাখা ছাড়া আর তোমরা এর জন্যে কি করবে—বল দেখি।

দয়াময়॥ কাগজে-কলমে সে অনেক কিছু করবার আছে। লেখাপড়া, কাজকর্ম—অনেক কিছু শেখানো হবে।

মায়া॥ সেসব আমি তোমার কাছে এখানে শিখবো মা।

দয়াময়॥ তারপর বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। যেমন-তেমন একটা পাত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই আমরা খালাস।

আনন্দ॥ সে ভার যদি আমি নেই?

দয়াময়॥ স্বচ্ছন্দে মা—স্বচ্ছন্দে। মেয়েটাও বেঁচে যায়, আমরাও বেঁচে যাই।

আনন্দ॥ [তিলকের প্রতি] কি রে তিলক, মেয়েটাকে উদ্ধার করবি?

তিলক॥ তোমার কোন্ কথা আমি কবে ফেলেছি মা? কিন্তু আমাকেও উদ্ধার করতে হবে তোমাকে মা।

আনন্দ॥ আমি আবার তোকে কি উদ্ধার করব?

তিলক॥ নূপুর হালদার আমাদের গালে চড় মেরে চ'লে গেছে। সে চড়টা আমি ফিরিয়ে দিতে চাই তারই মুখে—[মায়াকে দেখাইয়া] ওকে দিয়ে। বই খোলার দিন আমি আর পিছিয়ে দেবো না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ক্ষণে সমবায় থিয়েটার আমি খুলবো। সারা কলকাতা শহর দেখে তাক্ লেগে যাবে' যে নূপুর হালদার ছাড়াও সুদর্শনা

হয়, সে সুদর্শনা আমাদের এই মায়া দরকার। [ঘড়ি দেখিয়া] আর তারপর যা কিছু—সে মা ফিরে এসে। এসো মায়া।

[বলিতে বলিতে মায়ার হস্ত ধরিয়া উভয়ে মাকে প্রণাম করিল। খাবার লইয়া নিস্তারিণীর প্রবেশ।]

চলুন দয়াময় বাবু, ও—দাও। খাবার নিয়ে যাচ্ছি। ট্রেনেই খেয়ে নেব। (হাত ঘড়ি দিয়া) হ্যাঁ, এখনো সময় আছে—ধরা যাবে ট্রেন।

—————

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রঙ্গমঞ্চের যবনিকার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতির ম্যানেজার শ্রীশঙ্কর সেন।]

শঙ্কর ॥ [অভিবাদনান্তে] পরম শ্রদ্ধেয় দর্শকবৃন্দ! রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতির প্রথম অবদান শ্রীশেখর মিত্র রচিত ত্র্যঙ্ক নাটিকা "জীবন-মরণ"-এর এই শুভ উদ্বোধন-উৎসবে আপনাদের সহানুভূতি আমাদের মনে যে আশা, সাহস ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে, তা-ই আমাদের এই অভিনব নাট্য-প্রচেষ্টাকে বলবতী এবং ফলবতী করবে। সমবায়-প্রথায় এ রকম একটা রঙ্গালয় স্থাপন এদেশে সত্যিই একটা অভিনব প্রচেষ্টা। আমাদের রঙ্গালয়ের প্রতিটি কর্মী চিরদিন দাসত্বই ক'রে এসেছে। উপযুক্ত বেতন তাদের ভাগ্যে বিশেষ জোটে নি। অনেক সময় কাজ ক'রেও বেতন তারা পায় নি। রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতির প্রতিটি কর্মী এই নাট্যপীঠের মালিকও বটে। এখানে তারা শুধু ন্যায্য বেতনই পাবে না, লাভের অংশও পাবে। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্রই হ'ল—

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—

লাভেও—লোকসানেও। আজ বৃহস্পতিবার—লক্ষ্মীবারের এই শুভ সন্ধ্যায় আপনাদের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর ক'রেই আমরা আমাদের এই জীবন-মরণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি। আমাদের এই নাটিকাটিরও নাম "জীবন-মরণ"। রচনা করেছেন শ্রীশেখর মিত্র। নাটিকাটির প্রযোজনা করেছি আমি—শ্রীশঙ্কর সেন। সঙ্গীত ও নৃত্য-পরিচালনা করেছেন শ্রীতিলক চৌধুরী। আর অভিনয় করেছেন শ্রীতিলক চৌধুরী, শ্রীমতী মায়া সরকার প্রমুখ সমবায়ী শিল্পিবৃন্দ। আজ আমাদের সমবেত প্রার্থনা হ'ক ঋগ্বেদের সেই বাণী—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি ॥"

[শঙ্কর সেন যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু ঐক্যতান বাদন শুরু হইল ও ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হইলে 'জীবন-মরণ' নাটিকার অভিনয় শুরু হইল।]

[দৃশ্য : ভরতমুনির আশ্রম। ভরতমুনি যোগাসনে উপবিষ্ট। তাহার এক পার্শ্বে নটী সুদর্শনা ও অপর পার্শ্বে তাহার স্বামী নট শ্রীহর্ষ এবং আরও কতিপয় নটনটী যুক্তকরে উপবিষ্ট। সমবেত কণ্ঠে গীত হইতেছে—]

সকলে ॥ [সুরে] "সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি ॥"

ভরত ॥ তোমাদের সংকল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান ও তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হউক। যাহাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাহাই হউক।

[দূর হইতে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল। সকলে সচকিত হইয়া উঠিল,]

ভরত ॥ ঐ আবার।

শ্রীহর্ষ ॥ প্রভু! এ আর্তনাদ আর সহ্য করা যায় না। আপনি বিশ্ব-বিশ্রুত ভরতমুনি—নাট্য-শাস্ত্রের প্রবর্তক আপনি। কিন্তু আপনিই বলুন, দেশের ঘরে ঘরে যখন এমনি আর্তনাদ উঠছে, তখন আমাদের এই নাট্য-শাস্ত্রের চর্চা বিরাট একটা পরিহাস নয় কি প্রভু?

ভরত ॥ সুদীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে রাজ্য হয়েছে শস্যহীন, প্রজাগণ অন্নহীন। অচিরে বারিবর্ষণ না হ'লে এ রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য।

সুদর্শনা ॥ মহর্ষি ভরতমুনির করুণা জগতে সুবিদিত। কৃপা ক'রে সৃষ্টি রক্ষা করুন প্রভু।

শ্রীহর্ষ ॥ সৃষ্টিই যদি রক্ষা না হয়, নাট্য-শাস্ত্রেরই বা সার্থকতা কোথায় প্রভু? বারিবর্ষণের ব্যবস্থা করুন—সৃষ্টি রক্ষা করুন—ওই আর্তনাদ বিদূরিত ক'রে জগতে আবার সুখ-শান্তি আনুন—মানুষকে আবার অভিষিক্ত করুন সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে।

সুদর্শনা ॥ আর তা যদি সম্ভব না হয়, ললিত কলার এই পরিহাস থেকে আমাদের মুক্তি দিন, বিদায় দিন।

ভরত ॥ বটে!

সুদর্শনা ॥ হ্যাঁ, প্রভু।

ভরত ॥ উত্তম। আমি প্রস্তুত। বারি আকর্ষণ আমার পক্ষে কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু সেজন্য চরম আত্মোৎসর্গ চাই—আমাদের।

সুদর্শনা ॥ আমাদের!

ভরত ॥ হ্যাঁ নটী সুদর্শনা, আমাদের।

সুদর্শনা ॥ লোকহিতকল্পে যে-কোনও আত্মোৎসর্গের জন্য আমি প্রস্তুত প্রভু।

শ্রীহর্ষ ॥ আমিও।

ভরত ॥ উত্তম। মন্ত্রোচ্চারণে ইন্দ্র-দেবতার আবাহন করছি আমি—স্বয়ং ভরতমুনি। আর নৃত্যগীতে তোমরা কর ইন্দ্র-দেবতার অভ্যর্থনা। তুমি ধরণীর শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক—আমার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীহর্ষ, আর তুমি—ধরণীর শ্রেষ্ঠা নটী—সুদর্শনা। শ্রীহর্ষ! সুদর্শনা! আজ আমাদের মহাপরীক্ষা, আমাদের এই বন্দনায় যদি সুপ্রসন্ন হন ইন্দ্রদেব, ঘনকৃষ্ণ মেঘে আকাশ হবে এখনি সমাচ্ছন্ন। আর, সেই কৃষ্ণমেঘের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে হবে বজ্রপতন। কিন্তু কার শিরে হবে সে বজ্রপাত, আমি জানি না—আমি জানি না।

"শং নো বাতঃ পবতাং শং নস্তপতু সূর্যঃ।
শং নঃ কণিক্রদর্দেবঃ পর্জন্যো অভিবর্ষতু॥"

[শ্রীহর্ষের বংশী সহযোগে সুদর্শনার নৃত্যগীত।]

এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে॥
সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে
তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে,
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী॥
বকুলমুকুল রেখেছে গাঁথিয়া,
বাজিছে অঙ্গনে মিলনবাঁশরি।
আনো সাথে তোমার মন্দিরা,
চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে—
বাজিবে কঙ্কণ, বাজিবে কিঙ্কিণী,
ঝংকারিবে মঞ্জীর রুণু রুণু॥ —রবীন্দ্রনাথ

[সুদর্শনা পূর্ববৎ শ্রীহর্ষের বংশী সহযোগে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। আকাশ কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন হইল। ঘন ঘন বিদ্যুতের আলো দেখা গেল। প্রথম বজ্রপতনেই সুদর্শনার মৃত্যু হইল। সকলের আর্তনাদ "সুদর্শনা, সুদর্শনা" মেঘগর্জনে ডুবিয়া গেল। বারিবর্ষণ শুরু হইল।]

[ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্বর্গ: ইন্দ্রসভা—দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী শচীদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা, চতুর্দিকে অন্যান্য দেবগণ সমাসীন।]

যমরাজ ॥ দেবরাজ! চিত্রগুপ্তের নিকট অবগত হলাম, শ্রীহর্ষ নামধারী এক জীবিত মনুষ্য বংশীবাদ্য করতে করতে সশরীরে স্বর্গে আগমন করছে।

আর এও শুনলাম, দেবরাজের আদেশেই বৈতরণীর ঘাটরক্ষক তাকে ছাড়পত্র দিয়েছে। সে দুর্বারগতিতে এই দেবসভা অভিমুখেই অগ্রসর হচ্ছে। কোনও মনুষ্যের পক্ষে সশরীরে স্বর্গলাভ বিধিনির্দিষ্ট, নিয়মের এক জঘন্য ব্যতিক্রম। দেবরাজ! আপনার এই নিয়ম-বিরুদ্ধ নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

ইন্দ্র ॥ যমরাজ! তুমি কি ভেবেছো আমি ইচ্ছা ক'রে এই বিধান দিয়েছি? দেবগণ! তোমরা জানো, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমি সেই মানব-সন্তানকে সশরীরে এই দেবসভায় আনতে বাধ্য হচ্ছি। ওই শ্রীহর্ষ আর তার পত্নী সুদর্শনা—বর্ষাবঞ্চিত ভূমণ্ডলে বৃষ্টিধারা কামনা ক'রে যে ঘন কৃষ্ণমেঘ আকর্ষণ করেছিল আকাশে, সেই মেঘ-নিক্ষিপ্ত বজ্রেই অকালমৃত্যু বরণ করেছে নটী সুদর্শনা। পত্নীশোকে মুহ্যমান স্বামী শ্রীহর্ষের বিরহ-বেদনা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সকরুণ বংশীবাদ্যে! ভূর্ভুবস্ব লোক সমগ্র ত্রিভুবন সেই করুণ সুরে হয়ে উঠেছে ব্যথিত।

সূর্যদেব ॥ অসহ্য! অসহ্য! বেদনার সেই করুণ রাগিণীতে আমি সূর্য—আমার দুর্নিবার গতিও হয়ে গেছে স্তব্ধ।

চন্দ্রদেব ॥ আমি চন্দ্র—আমিও নিশ্চল হয়ে ঐ ব্যথা-সমুদ্রে আত্মহারা হয়ে ব'সে আছি দেবরাজ।

পবনদেব ॥ আমি পবনদেব—ত্রিভুবনে আমার গতি, কিন্তু আমিও আজ স্তব্ধ দেবরাজ।

ইন্দ্র। তবেই বুঝে দেখ যমরাজ, শ্রীহর্ষের হর্ষ-বিধান ব্যতীত আমাদের পরিত্রাণের আর কোনও পথ নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পরামর্শও আমি গ্রহণ করেছি। শ্রীহর্ষের সশরীরে দেবসভায় আগমন তাঁরা অনুমোদন করেছেন। ……ওই সে আসছে—

[বংশীবাদন করিতে করিতে শ্রীহর্ষ দেবসভায় উপস্থিত হইল। তাহার বংশীবাদনের করুণ সুরে সমাগত দেবগণ শোকে মুহ্যমান হইলেন।]

দেবগণ ॥ অসহ্য—অসহ্য—এ বেদনা অসহ্য।

ইন্দ্র ॥ থামাও—থামাও—তোমার বংশীবাদ্য বন্ধ কর শ্রীহর্ষ।

শ্রীহর্ষ ॥ প্রণাম দেবরাজ! প্রণাম দেবতামণ্ডল! এ বংশীবাদ্য—আমার বেদনাহত অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আকুল আর্তনাদ। প্রিয়তমার অকালমৃত্যু বিধান ক'রে আমার বক্ষে যে বজ্রাঘাত তুমি করেছো দেবরাজ, তাতে এই মর্মভেদী আর্তনাদ—এই হৃদয়বিদারক হাহাকার ভিন্ন আর কোন্ রাগিণী আমার এই বংশীবাদ্যে ধ্বনিত হবে—বলতে পার দেবরাজ?

শচীদেবী ॥ সুদর্শনার প্রাণদান কর যমরাজ।

অন্যান্য দেবগণ ॥ ইন্দ্রাণীর জয় হ'ক!

যম ॥ উত্তম। [শ্রীহর্ষের প্রতি] দেবতামণ্ডলের সকাতর অনুরোধে আমি তোমার প্রিয়তমার প্রাণদান করতে সম্মত আছি শ্রীহর্ষ, কিন্তু এক শর্তে। যে বেদনা তুমি আজ ত্রিভুবনে সঞ্চারিত করেছো, তার অবসানকল্পে এই দেবসভায় হোক তোমাদের নৃত্যগীত—চিরদিন চিরকাল।

শ্রীহর্ষ ॥ সে কি! এই দেবসভায় বাস করতে হবে আমাদের চিরদিন—চিরকাল? জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সেই জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গবাস কখনও আমাদের কাম্য নয়—কাম্য নয় দেবতামণ্ডল।

যম ॥ প্রাণদানের ক্ষমতা আমার আছে—আমি স্বীকার করি শ্রীহর্ষ। কিন্তু স্বর্গভূমি ত্যাগ ক'রে মর্তভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি—একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রই দয়া ক'রে দিতে পারেন—আমি নই।

ইন্দ্র ॥ এই বেদনার বিষ-বাষ্প বিদূরিত করতে সে অনুমতি দিতেও আমি সম্মত আছি শ্রীহর্ষ—এক শর্তে।

শ্রীহর্ষ ॥ কি শর্ত প্রভু?

ইন্দ্র ॥ তোমার পুনর্জীবিতা পত্নী আর তুমি নৃত্য-গীতে আমাদের আনন্দ বিধান ক'রে যখন স্বর্গভূমি পরিত্যাগ করবে, তখন তুমি যাবে আগে আগে তোমার বংশীতে আনন্দের লহরী তুলে—আর তোমার পত্নী করবে তোমারই অনুগমন আনন্দ-উচ্ছল নূপুর-নিক্কনের তালে তালে। কিন্তু সাবধান, বৈতরণী পার না হওয়া পর্যন্ত তোমার পত্নী-মুখ-চন্দ্রমা দর্শন নিষেধ। এ নিষেধ অমান্য ক'রে যদি তুমি প্রিয়া-মুখ দর্শন কর, তাহ'লে দর্শনমাত্রই তোমার প্রিয়তমা রূপান্তরিতা হবে পাষাণী মূর্তিতে।

শ্রীহর্ষ ॥ এতেও আমি সম্মত প্রভু—আমি সম্মত। অনন্ত বিরহবেদনায় আমি ছিলাম ব্যথিত। বৈতরণী পার না হওয়া পর্যন্ত পত্নীমুখ অদর্শনের এই স্বল্প দুঃখ আমি ধৈর্য ধ'রে সহ্য করবো প্রভু—করবো।

শচী ॥ সুদর্শনার প্রাণদান কর যমরাজ।

যমরাজ ॥ তথাস্তু—তথাস্তু। একদা পতিগতপ্রাণা পুণ্যবতী সাবিত্রী স্বামী-প্রেমের অভূতপূর্ব তপস্যায় এই যমরাজকে পরাভূত ক'রে মৃত স্বামী সত্যবানকে পুনর্জীবিত ক'রে জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। আর আজ—পত্নীগতপ্রাণ শ্রীহর্ষ—তোমার পত্নীপ্রেমে সন্তুষ্ট হয়ে, তোমার মৃত পত্নী সুদর্শনাকেও প্রাণদান করতে আমার কুণ্ঠা নাই। ....নটী সুদর্শনা—এসো—

[নৃত্যের ছন্দে নটী সুদর্শনার আবির্ভাব। নৃত্যগীতে দেবতামণ্ডলের আনন্দবিধান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী. অগ্রে শ্রীহর্ষ ও তৎপশ্চাৎ সুদর্শনা দেবসভা ত্যাগ করিল।]

দৃশ্যান্তর

[বৈতরণীর তীর। দূর হইতে বাঁশীর সুর ও নূপুরের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আগে আগে আসিল শ্রীহর্ষ ও তাহার পিছনে আসিল সুদর্শনা। উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সুদর্শনার পায়ের নূপুর-ধ্বনি হঠাৎ থামিয়া গেল। ব্যাপারটা কি তাহা দেখিবার জন্য সুদর্শনা নত হইল। দেখিল নূপুরের মধ্যে বালু ঢুকিয়া যাওয়ায় নূপুরের বাদ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নূপুরের ধ্বনি আর শুনিতে না পাওয়ায় শ্রীহর্ষ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মন নিদারুণ আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।]

শ্রীহর্ষ॥ [স্বগত] এ কি হ'ল! নূপুরের ধ্বনি আর শুনতে পাচ্ছি না কেন? তবে কি আমি বধির হলাম? না, না, ঐ তো বৈতরণীর কুলুকুলুধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তবে কি—তবে কি—দেবতারা আমায় প্রবঞ্চনা করলেন? সুদর্শনাকে তাঁরা কি অপহরণ করলেন? না, না, তা হয় না—তা হ'তেই পারে না—তা আমি হ'তে দেবো না—

[ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখে সুদর্শনা উপুড় হইয়া নূপুর হইতে বালুকারাশি সরাইবার চেষ্টা করিতেছে।]

শ্রীহর্ষ॥ সুদর্শনা! [সুদর্শনার কাছে ছুটিয়া গেল]

সুদর্শনা॥ এ কি করলে—এ কি করলে প্রভু! দেবতার বিধান বিস্মৃত হয়ে বৈতরণীর তীরেই তুমি আমার মুখাবলোকন করলে?

শ্রীহর্ষ॥ তোমার নূপুর-ধ্বনি সহসা বন্ধ হ'ল কেন প্রিয়তমা?

সুদর্শনা॥ বন্ধ হ'ল কেন দেখছো না? বৈতরণীর বালুকারাশিতে আমার চরণ হয়েছে নিমজ্জিত। কিন্তু এ কি! এ আবার কি হচ্ছে! আমার চরণ পাষাণ হয়ে যাচ্ছে!......এ কি! আমার সারা দেহ ক্রমশ পাষাণে পরিণত হচ্ছে! তোমারই জন্য আবার আমি মরণের কোলে ফিরে চললাম, বিদায়—প্রভু—বিদায়—

শ্রীহর্ষ॥ সুদর্শনা—সুদর্শনা—আজ আমি বুঝলাম, নিয়তি দুর্নিবার—বিধাতার বিধান দুর্লঙ্ঘ্য। তোমার এই শেষমুহূর্তেও তুমি জেনে যাও প্রিয়া, আমি তোমার—তুমি আমার—শুধু এ জন্মে নয়—জন্ম জন্মান্তরে। তোমার মৃত্যু আছে—আমার মৃত্যু আছে, কিন্তু তোমার আমার প্রেম যে মৃত্যুঞ্জয়—তার মৃত্যু নেই। প্রিয়া—প্রিয়া—

[শ্রীহর্ষ দেখিল, সুদর্শনার সমগ্র দেহ পাষাণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।]

কাকে ডাকছি? কে শুনছে? প্রিয়া আমার পাষাণ! প্রিয়া আমার পাষাণ!!

[পাষাণ মূর্তিটি দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল]

[থিয়েটারের রাজঘরের সম্মুখভাগ (লবী) : ম্যানেজারের বসিবার স্থান। খানকয়েক চেয়ারও আছে। অভিনয়ান্তে প্রেক্ষাগৃহে সাধারণত যে কলকোলাহল হয়, তাহা ভাসিয়া আসিতেছে। নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণের কাহাকেও না কাহাকেও সর্বদাই আশেপাশে ঘোরা-ফেরা করিতে দেখা যাইবে। ম্যানেজার শঙ্কর সেন ও নাট্যকার শেখর মিত্র আনন্দ-বিহ্বল হইয়া লবীতে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রেক্ষাগৃহ হইতে পুনরায় করতালির শব্দ ভাসিয়া আসিল।]

শঙ্কর ॥ শুনছো শেখর—ঐ আবার—

শেখর ॥ তার মানে দর্শকরা আবার মায়াকে দেখতে চাইছে, আর একবার অভিনন্দন জানাবে।

শঙ্কর ॥ এবার নিয়ে দু'বার হ'ল। সত্যিই মায়া আজ মাৎ ক'রে দিয়েছে। নূপুর হালদার থাকলে যা করতো, তার চেয়ে সেণ্ট পারসেণ্ট ভালো করেছে। [পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে করতালির শব্দ] যাক্! ড্রপ পড়লো।

[হিমালয় পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া]

হিমালয়—হিমালয়, সিফটার হারাধনকে বলে দাও, হাজার হাততালি পড়লেও আর ড্রপ উঠ্‌বে না।

হিমালয় ॥ সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না স্যার।

শঙ্কর ॥ তাই ব'লে সারারাত এই মাতামাতি চলবে নাকি? যাও—ব'লে এসো।

[হিমালয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিষাণকে দেখিয়া]

বিষাণ, তুমি যাও। নামেও হিমালয়, কাজেও হিমালয়, নড়তে-চড়তেই ছ' মাস।

বিষাণ ॥ যাচ্ছি স্যার। [বিষাণের প্রস্থান]

হিমালয় ॥ তা এই চেহারাটা ছিল ব'লেই আজ লোকে যমকে যমই মনে করেছে—টিকটিকি ভাবে নি। সামনের লাইনের দর্শকরা তো ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল—দু'টো ছেলে ভয়ের চোটে সিটের নিচে ঢুকে পড়েছিল। এসব খবর রাখেন? গার্ডকে জিজ্ঞেস করুন। চেহারার নিন্দে করবেন না স্যার। এই চেহারার জোরেই ক'রে খাচ্ছি।

শেখর ॥ তা ঠিক—তা ঠিক!

[হিমালয়ের প্রস্থান]

শঙ্কর ॥ [হাসিয়া] না, ছোটখাটো পার্ট—সবাই বেশ ভাল করেছে। আর মায়ার তো তুলনাই নেই। মনে হচ্ছে, ঐ মায়ার জোরেই আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম শেখর।

শেখর ॥ না, দাঁড়াতে এখনও অনেক দেরি। হিরোর পার্টে ওই তিলকবাবুই যে আমাদের শুইয়ে দিচ্ছেন।

শঙ্কর ॥ কেন—কেন?

শেখর ॥ আজ যদি তিলকবাবু শ্রীহর্ষের পার্টটা অমন যাত্রা ক'রে না ফেলতেন, তবে এ বই যে একশো রাত্রি তর তর ক'রে চলে যেতো—এ আমি জোর ক'রেই বলতে পারতাম। হ্যাঁ, এ শুধু আমার কথা নয়, কাগজের সব সম্পাদকরাও তাই বলছিলেন।

[সাজাহান কেটলি ও কাপ আনিয়া চা ঢালিয়া উভয়কে দিল।]

শঙ্কর ॥ তোমরা বলছো বটে, কিন্তু কথাটাতে আমি ঠিক সায় দিতে পারছি না। পৌরাণিক বই—লিখেছোও তুমি যাত্রার ঢঙে—তিলকও করেছে যাত্রার ঢঙে। তবে হ্যাঁ, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে কিনা সেটা দেখবার বিষয় বটে। সাজাহান, আমাদের তো চা দিচ্ছো—মায়া দেবীকে কি দেবে?

সাজাহান ॥ ওভালটিন—সে তো স্যার আপনি ব'লে দিয়েছেন। পোশাক ছাড়া হ'লেই আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সময় আমরা খেতাম এক ডোজ ভাইনাম্ গ্যালিসিয়া কিংবা ব্র্যাণ্ডি—না স্যার, মেপে।

শঙ্কর ॥ ও—হ্যাঁ, ভাল কথা। সাজাহান, গরম জলের জন্যে স্টোভ ধরাতে গিয়ে ভোলা দেখে, মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলগুলো সব খালি। বোতলগুলো তো তোমার চার্জেই ছিল।

সাজাহান ॥ হ্যাঁ স্যার, তা ছিল। কিন্তু ওতো থাকবার জিনিস নয় স্যার। ও হচ্ছে গিয়ে উপে যাওয়ারই জিনিস—মানে, এসেছে—খরচ হয়ে গেছে।

শঙ্কর ॥ আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি সাজাহান, কো-অপারেটিভ থিয়েটারে মদ্যপান চলবে না, কোন ফর্মেই না।

সাজাহান ॥ চেষ্টা করবো স্যার, আমি চেষ্টা করবো। অতো দিনের অভ্যেস—এক দিনে যায় না। মেথিলিটেড স্পিরিট থেকে কো-অপারেটিভ স্পিরিটে আসতে একটু সময় লাগবে বৈকি স্যার।

[সাজাহানের প্রস্থান]

শেখর ॥ তবু বলবো, লোকটি খুব সরল—আমার বেশ ভাল লাগে।

[মায়া ও তিলকের প্রবেশ]

শঙ্কর ॥ এসো মায়া, এসো তিলক—বোসো।

[হিমালয়ের প্রবেশ।]

হিমালয় ॥ মশাই, দরজায় ভীষণ ভিড়। সবাই ভেতরে আসতে চায় —দরজা ভেঙে ফেলে আর কি!

শঙ্কর ॥ অতো বড়ো চেহারাটা রেখেছো কি জন্ম ?

হিমালয় ॥ হুকুমের অপেক্ষা। এ চেহারায় কি হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।

শেখর ॥ না হে না, বাড়াবাড়ি করলে চলবে না। লোক বুঝে ভেতরে আসতে দিতে হবে বৈকি! চল, আমি যাচ্ছি। আপনিও আসুন শঙ্করদা।

শঙ্কর ॥ তোমরা বোসো, আমরা আসছি।

[হিমালয়কে লইয়া শঙ্কর ও শেখরের প্রস্থান। সাজাহান চা ও ওভালটিন লইয়া আসিল।]

সাজাহান ॥ [মায়াকে] এই আপনার ওভালটিন। [তিলককে] এই আপনার চা।

তিলক ॥ আমি চা খাবো না।

সাজাহান ॥ ওভালটিন শুধু উনিই পাবেন। আমি কি করবো? ম্যানেজারের অর্ডার।

মায়া ॥ [হাসিয়া] এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন ?

সাজাহান ॥ আপনার যাত্রা হয় নি, যাত্রা হয়েছে ওঁর। হ্যাঁ, সবাই বলছে যে।

মায়া। এ ওভালটিনও আপনি নিয়ে যান। আমি খাই না—খাবো না।

সাজাহান। আমি জানি। আপনাদের এখন যা দরকার, তা যে এখানে চলবে না। জানেন মশায়, অ্যালকোহল তো দূরের কথা, কো-অপারেটিভ থিয়েটারে মেথিলেটেড স্পিরিটের ওপরও নজর রাখা হয়। তা বেশ, আমি এসব বাজে জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা বরং শিগগির শিগগির বাড়ি চ'লে যান।

[কাপ দুইটি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান]

মায়া ॥ সত্যি ক'রে বল তিলকদা, আমার কেমন হয়েছে। তুমি যেমনটি শিখিয়েছিলে, আমি তেমনটি পেরেছি তো ?

তিলক ॥ না। আমি সত্যি কথাই বলবো—তা হয় নি। অন্য লোকের কথায় তুমি যা করছো, তাতে সাধারণ দর্শক খুব খুশিই হয়েছে—স্পষ্ট বুঝছি; কিন্তু পৌরাণিক নাটকের অভিনয়-ধারা ও নয়।

[শঙ্কর সেনের সহিত 'দুন্দুভি'-সম্পাদক শঙ্খ সরকার ও 'ত্রিশূল'-সম্পাদক ব্যোমকেশ বোস, প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডার রজত রায় ও ক্লপেন মিত্র ভিতরে আসিলেন। শেয়ার-হোল্ডার দুইজনের হাতে পুষ্প স্তবক। উঁহাদের দেখিয়া তিলক ও মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

শঙ্কর। মায়া, আজ তোমার জয়জয়কার। এই দেখ, কারা সব এসেছেন তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। ইনি হলেন গিয়ে 'দুন্দুভি'-সম্পাদক শ্রীশঙ্খ

সরকার। ইনি তো বলেছেন, গত দশ বছরের মধ্যে তোমার মতন—আচ্ছা, সে উনি 'দুন্দুভি'তে লিখেই ঘোষণা করবেন। ইনি হলেন গিয়ে—ত্রিশূলে'র সম্পাদক শ্রীব্যোমকেশ বোস। ওঁর সমালোচনায় লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সেই উনি আজ মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—তোমার আবির্ভাবে—এই যাঃ! কি সব ভাষা বলছিলেন, সে আমি ভুলেই গেছি।

ব্যোমকেশ॥ সে যা লেখবার, সে আমি লিখবো—প'ড়ে দেখবেন। আমার মশায় মনে এক, মুখে আর-এক নয়। যা বলি আমি চেঁচিয়েই বলি। এই যেমন, এই তিলকবাবু—থিয়েটার করতে গিয়ে করেছেন যাত্রা। আমাদের শঙ্খ তো মশায় একেবারে রেগে কাঁই।

শঙ্খ॥ কষ্ট হচ্ছিলো—মানে, এক ভাঁড় দুধে এক বিন্দু চোনা—এই আর কি! তিলকবাবু, শুনলাম মায়া দেবী আপনারই আবিষ্কার। সেজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু সেইসঙ্গে অনুরোধ যে ওঁকে এভাবে হত্যা করবেন না।

তিলক॥ আপনি কি বলতে চান?

শঙ্খ॥ আমার যা বলবার সে আমার কাগজেই বলবো—দয়া ক'রে পড়বেন। আচ্ছা আসি, নমস্কার। এসো হে ব্যোমকেশ।

ব্যোমকেশ॥ হ্যাঁ, চলি। নমস্কার। [শঙ্করকে] মায়া দেবীর একখানা ফটো কালই পাঠাবেন।

শঙ্খ॥ আমাকেও—কভারে ছাপাবো। [শঙ্খ ও ব্যোমকেশের প্রস্থান]

তিলক। এঁদের মতামতের দাম কি আমি তা জানি না মশায়। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল ক'রে একটা জিনিস দাঁড় করাই। আর এঁরা এঁদের খামখেয়ালমতো এক নিঃশ্বাসে মতামত জাহির করেন—অপূর্ব, অভূতপূর্ব, নতুবা যাচ্ছে-তাই, কিছু হয় নি, একেবারে বাজে, একেবারে অচল। বিজ্ঞের মতো এসব কথা বলেন। কিন্তু কোনও কারণ দেখান না, বিচার-বিশ্লেষণও না। তবে এ কথা ঠিক যে, সব কাগজেই তো আর এ দলে পড়ে না। এমন সব কাগজও আছে, যাদের সম্পাদক বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতে একটি কথাও বলেন না। যেটা ভালো—সেটা কেন ভালো—তা খুলে বলেন। যেটা ভালো নয়, সেটা কেন ভালো নয়—তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। যেমন ধরুন, 'প্রত্যহ' পত্রিকার নাট্য-সম্পাদক বিরূপাক্ষ বোস—নির্ভীক, নিরপেক্ষ তাঁর মতামত, জ্ঞানগর্ভ তাঁর আলোচনা। একটা নাটকের ভাগ্য তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করে—এ আমি বহুবার দেখেছি। তাঁর কি মত, সেটা আগে জানা দরকার।

রূপেন॥ [ম্লান হাসিয়া] ঠিক বলেছেন তিলকবাবু। বিরূপাক্ষ বোস—কথা কম বলেন—আর তাও যা বলেন, ওজন ক'রে বলেন। তা বলেন

বলেই একটা প্লে'র পরমায়ু নির্ভর করে—তাঁর মতামতের ওপর। আমিও তাই তাঁর পাশের সিটেই বসেছিলাম। তিনি যা মতামত প্রকাশ করেছেন, তা শেখরবাবু শুনেছেন, আমিও শুনেছি স্বকর্ণে। আপনার অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর মতামত—ওই 'দুন্দুভি' আর 'ত্রিশূলে'র মতোই মারাত্মক।

তিলক ॥ তাই নাকি। তা বেশ তো, এক্ষেত্রে কি করণীয়, সেটা মশায় আপনারা সকলে মিলে বিবেচনা করুন। আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটার—এই নাটকই আমাদের জীবন-মরণ। এ নাটক মার খেলে, আমাদের রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতি মার খাবে—সমবায়ের ওপর লোকের আস্থা চুরমার হয়ে যাবে—সে আমি চাই না। দরকার হ'লে আমি আমার পার্ট ছেড়ে দেবো। আর কাকে এ পার্ট দেওয়া যায় সেটাও আপনারা বিবেচনা ক'রে দেখুন। আচ্ছা, তা হ'লে চলি। এসো মায়া—রাত হয়ে গেল।

রজত ॥ না, না, সে কি তিলকবাবু! মায়া দেবীর এই অভাবনীয় সাফল্যকে সম্বর্ধনার জন্যে আমরা একটু মিষ্টি-মুখের আয়োজন করেছি।

শঙ্কর ॥ আর তা ছাড়া এঁদের সঙ্গে মায়া দেবীর আলাপ-পরিচয়টা হয়নি। সেটাও তো দরকার।

তিলক ॥ তাই তো! এই দেখুন—আমি একেবারে ভুলে গেছি। মায়া, এঁরা দু'জনই আমাদের অত্যন্ত আপনজন। ইনি হলেন—শ্রীরূপেন মিত্র আর ইনি হলেন—শ্রীরজত রায়—দু'জনেই আমাদের এই রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতির হাজার টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার! এমন আরো অনেক আছেন। এই প্রেফারেন্স শেয়ার আর আমানত নিয়ে আমাদের সমবায় সমিতির ভাণ্ডারের ৯৯ হাজার টাকা উঠেছে ব'লেই আজ আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটার চালু হয়েছে। কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। আমি বড়োই ক্লান্ত। আমি চলি।

মায়া। [দাঁড়াইয়া করজোড়ে] আমাকেও দয়া ক'রে ছুটি দিন। আমিও আজ বড় ক্লান্ত।

তিলক ॥ না, না, মায়া, তা হয় না। ওঁরা যে মিষ্টি-মুখের আয়োজন করেছেন, সেটা হ'ল গিয়ে ওঁদের আশীর্বাদ—তোমাকে। এ আশীর্বাদ না নিয়ে তুমি যেতে পারো না—বিশেষ তোমার এই অভিনেত্রী জীবনের প্রথম রাত্রে। শঙ্করদা, আপনি মায়াকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। আর সেইসঙ্গে আমার মিষ্টির ভাগটাও। নমস্কার।

[তিলকের প্রস্থান। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

রজত ॥ তিলকবাবু বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন মনে হ'ল।

শঙ্কর ॥ অন্য কোনও থিয়েটার হ'লে ক্ষুণ্ণ হবারই কথা ছিল। কিন্তু এ আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটার—এ বিশ্বাস আমার আছে, নিজের মান-

অপমানের চেয়ে আমাদের সকলের স্বার্থ—থিয়েটারের স্বার্থটাই বড়ো ক'রে দেখবার মতো উদারতা তিলকের যথেষ্ট আছে। আর তা প্রকাশ পেয়েছে ওরই একটি কথায়—এই থিয়েটার হ'ল আমাদের জীবন-মরণ।

রজত ॥ মরণটা আমরা চাই না—জীবনটাই আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই। কিন্তু তিলকবাবুকে না সরিয়ে যদি বাঁচবার কোনও পথ থাকে—আসুন আমরা সেইটেই আগে ভেবে দেখি।

শঙ্কর ॥ অর্থাৎ তোমরা বলতে চাও তিলক তার অভিনয়-ধারাটা বদলে দিক।

রজত ॥ হ্যাঁ, এই যাতে যাত্রাটা অ-যাত্রা হয়—এই আর কি?

শঙ্কর ॥ আপনারা তবে তিলককে চেনেন না। সে দস্তুরমতো পাকা অ্যাক্টর! সে যা করেছে, পেছনে তার যুক্তিও আছে।

রূপেন ॥ তবে মশায় আর একটিমাত্র পথ আছে। 'প্রত্যহ' পত্রিকার মতামতটা যদি—বিরূপাক্ষ বোসের বাড়ির ঠিকানাটা আমায় দিতে পারেন?

শঙ্কর ॥ আরে মশায় ঐ তো বিডন স্কোয়ারের লাগাও পুবদিকের সাদা বাড়িটা। কিন্তু রূপেনবাবু, ও বড় কঠিন ঠাঁই—ভারী একরোখা লোক। নিজে যা বুঝবেন, তা লিখবেনই। অনুরোধ, উপরোধ,—লোকটি এসবের বাইরে। কালকে শুক্রবার—'প্রত্যহে'র নাট্য-বিভাগ বেরুবে। আমাদের নাটকের ভাগ্যলিপি ওঁর কলমের মুখে রচিত হচ্ছে এতোক্ষণ। তার গতিরোধ করবার ক্ষমতা দুনিয়ায় কারোর নেই। যদি থাকতো, তা হ'লে আমি এখন এখানে ব'সে থাকতাম না।

[মুক্তার প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ হারাধন।]

মুক্তা ॥ আমি তবে এখন চলি ম্যানেজারবাবু।

শঙ্কর ॥ সে কি মুক্তা? মিষ্টি-মুখের আয়োজন হয়েছে যে!

মুক্তা ॥ সে হয়েছে তাদের জন্যে যারা বড় পার্ট করেছে—বাজিমাৎ করেছে।

শঙ্কর ॥ এক লাইনের একটা পার্ট করেছো ব'লে তোমার একটা অভিমান আমি লক্ষ্য করছি মুক্তা। সত্যি যদি বড় হ'তে চাও এই অভিমানটি ছাড়।

হারাধন ॥ না, না, ঠিক অভিমান নয় স্যার। ওর দোষই হ'ল গিয়ে—এক কথা বলতে গিয়ে আর-এক কথা বলে বসে। আসল কথাটা হচ্ছে গিয়ে—ওর মাথাটা ভীষণ ধরেছে। তাই বাড়ি যেতে চাইছে।

শঙ্কর ॥ তা একা যাবে কি ক'রে?

হারাধন ॥ আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। আমারও হয়েছে যেমন। কারোর কষ্ট সইতে পারি না।

[ব্যস্তভাবে শেখরের প্রবেশ।]

শেখর ॥ ষ্টেজে পাতা দেওয়া হয়েছে—চলুন সব।

রূপেন ॥ আপনার নাটকে এইটেরই অভাব ছিল। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয়ে—এইবার আপনার নাটক সত্যিকার নাটক হ'ল।

[সাজাহানের প্রবেশ।]

সাজাহান ॥ স্যার। চা-ও চাই তো?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, চাই।

সাজাহান ॥ চাইতেই হবে—আজ রাতে চাইতেই হবে। স্টোভটা আমি এখনি ধরাচ্ছি। পাঁচ সিকে পয়সা দিন স্যার। চট্ করে এক বোতল স্পিরিট নিয়ে আসি।

শঙ্কর ॥ নাও—নিয়ে এসো। কিন্তু স্পিরিটের বোতলটা এনে আমার হাতে দেবে।

সাজাহান ॥ দেবো মশায়, দেবো—তাই দেবো। [প্রস্থান]

শঙ্কর ॥ [সাজাহানের উদ্দেশ্যে] আমিও দেখে নেবো, কতোটা জল তুমি মেশালে! আসুন সব, আর দেরি নয়। [সকলের প্রস্থান]

———

চতুর্থ দৃশ্য

["প্রত্যহ" পত্রিকার নাট্য-সম্পাদক বিরূপাক্ষ বোসের বাসভবনে পাঠকক্ষ। কক্ষের দেওয়ালে দুইখানি ছবি—একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও অন্যটি মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের। লেখক বা সম্পাদকের গৃহসজ্জা যেরূপ হওয়া উচিত, এই কক্ষে তাহার অভাব নাই। বাতায়ন পার্শ্বে একটি ছোট রাইটিং টেবিল। তাহাতে একটি টেবিল-ল্যাম্প শুধু এই টেবিলটিকেই আলোকিত করিয়াছে। কক্ষটির অন্যান্য অংশ অলঙ্কার বলিয়াই অপরাংশে অবস্থিত সোফা-সেট প্রভৃতি অন্যান্য আসবাবসমূহ দেখা যাইতেছে না। বিরূপাক্ষ বোস নিবিষ্টমনে "জীবন মরণ" নাটকাভিনয়ের সমালোচনা লিখিয়া যাইতেছেন। উহা অদ্য রাত্রেই প্রেসে দিতে হইবে। কারণ, আগামী কল্য 'প্রত্যহ' পত্রিকার সাপ্তাহিক নাট্যবিভাগীয় পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইবে।]

[দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। বিরূপাক্ষ বোস এতোই তন্ময় ছিলেন যে, উহা তাঁহার কানে গেল না। তখন আরো একটু জোরে করাঘাত শোনা গেল। শান্ত সমাহিত লোকটি ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় রিভলভিং চেয়ারে-ঘুরিয়া দ্বারের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন।]

বিরূপাক্ষ ॥ [নিতান্ত বিরক্তিসহকারে] কে?

[বাহির হইতে ভৃত্য রামচরণ উত্তর দিল।]

রামচরণ ॥ [নেপথ্য হইতে] আজ্ঞে—আমি রামচরণ।

বিরূপাক্ষ ॥ কি?

রামচরণ ॥ [নেপথ্য হইতে] আজ্ঞে—ভারী বিপদে পড়েছি।

বিরূপাক্ষ ॥ এসো!

[দরজা খুলিয়া রামচরণের ভিতরে প্রবেশ]

রামচরণ ॥ রাত দশটার পর আপনার লেখবার সময়। তখন আপনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না—বিশেষ লক্ষ্মীবারে—এতো করে তা বলছি, তবু মানছে না।

বিরূপাক্ষ ॥ কে মানছে না?

রামচরণ ॥ খুব সুন্দরী এক স্ত্রীলোক—নাছোড়বান্দা। আনবো?

বিরূপাক্ষ ॥ [বজ্রকণ্ঠে] না। কাল সকালে আসতে ব'লে দে।

রামচরণ ॥ কিন্তু—

বিরূপাক্ষ ॥ ফের বিরক্ত করলে তোর চাকরি খতম রামচরণ।

[রিভলভিং চেয়ারে ঘুরিয়া বসিয়া লিখিতে লাগিলেন। দরজায় খট্ করিয়া শব্দ হওয়ায় বোঝা গেল রামচরণ চলিয়া গেল। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। পুনরায় দরজায় খট্ করিয়া শব্দ হইল।]

বিরূপাক্ষ ॥ [বিরক্তিভরে] আবার কে?

রামচরণ ॥ আজ্ঞে—তিনি। আমার কোন কথাই মানলেন না। পিছু পিছু এসে নিজেই ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

বিরূপাক্ষ ॥ কাল সকালে তোমার হিসেব নিয়ে এ বাড়ি থেকে দূর হয়ে যাবে।

[উঠিয়া সুইচটি টিপিলেন। ঘর আলোকে উদ্ভাসিত হইল। দেখা গেল, দ্বারে দণ্ডায়মানা—মায়া—ভীতা হরিণীর মতো। চোখে তাহার ব্যাকুল মিনতি। রামচরণ অদৃশ্য।]

বিরূপাক্ষ ॥ তুমি! মায়া!

মায়া ॥ হ্যাঁ।

বিরূপাক্ষ ॥ এতো রাতে?

মায়া ॥ হ্যাঁ।

বিরূপাক্ষ ॥ রাত দশটার পর আমি কারোর সঙ্গে দেখা করি না—বিশেষ বেস্পতিবারে। রাত বারোটার মধ্যে প্রেসে আমার সমালোচনা পাঠাতে হবে। তবেই কাল সকালে 'প্রত্যহে'র নাট্য-বিভাগে তা বেরুবে। প্রত্যেকটি মূহূর্ত আমার মূল্যবান। তুমি বরং—

মায়া ॥ কাল সকালে আপনার সমালোচনা বেরুবে ব'লে আজ রাতেই আমাকে আসতে হয়েছে।

বিরূপাক্ষ ॥ [চটিয়া গিয়া] তোমরা আমাকে কি ভেবেছো বল তো? ভাবছো আমি কিছু বুঝছি না। তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে তোমাদের

ম্যানেজার—অনুরোধ করতে। যাতে আমি তোমার সম্বন্ধে খুব ভাল লিখি। ইডিয়ট! এ সাহস তার হ'ল কি করে? এ লাইনে এতদিন থেকেও সে কি আমায় জানে না?

মায়া।। না, না, তা নয়। ম্যানেজারবাবু আমায় পাঠান নি। আমি এসেছি লুকিয়ে—চোরের মতো। আমার মনে আজ কি ঝড় উঠেছে, সে আপনি জানেন না।

বিরূপাক্ষ।। আমি বুঝি। নতুন অভিনেত্রী—প্রথম রাত্রির অভিনয়—যার ওপর নির্ভর করছে তোমার ভবিষ্যৎ। আমি তোমার সম্বন্ধে ভালোই লিখেছি। তুমি এখন এসো।

[দরজা খুলিয়া মায়াকে চলিয়া যাইবার নির্দ্রেশ।]

মায়া।। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার জন্যে আমি আসি নি।

বিরূপাক্ষ।। বেশ, আমি তা৺ বিশ্বাস করছি। কিন্তু আর কোনও কথা শোনবার সময় আমার নেই।

[উন্মুক্ত দ্বারপথে চলিয়া যাইবার পুনরায় নির্দেশ। মায়া কিন্তু নিশ্চল রহিল।]

আমাকে অভদ্র হ'তে তুমি বাধ্য করছো মায়া।

[মায়া তথাপি নিশ্চল ও নীরব রহিল। বিরূপাক্ষ দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিয়া মায়ার সম্মুখে দাঁড়াইল।]

তোমার কি বলবার আছে বল।

মায়া কোনও কথা কহিতে পারিল না। হঠাৎ পশ্চাতে অবস্থিত সোফাতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

মায়া! মায়া!! ডোণ্ট বি সিলি—ছেলেমানুষী করো না, কি হয়েছে মা, আমায় তুমি বল। কি বিপদ! আমি সব সইতে পারি। কিন্তু এসব কি?···না, না, তোমার যা বলবার আছে বল।

মায়া।। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন—আমি বলছি।

বিরূপাক্ষ।। তা দিচ্ছি। কিন্তু কাঁদলে আমি কোনও কথা শুনবো না। চোখের জল—সত্যিই আমি দেখতে পারি না। যে কাঁদে তাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি বরং ওপরে চল—আমার মেয়ের কাছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে শান্ত হয়ে তোমার কি বলবার আছে বল—আমি শুনছি, এসো— [মায়াকে লইয়া প্রস্থান]

———

পঞ্চম দৃশ্য

[তিলকের উপবেশন কক্ষ ; কাল—সকাল। তিলক এক পেয়ালা চা পান করিতে করিতে দৈনিক সংবাদপত্রটির উপর চোখ বুলাইতেছিল। হঠাৎ এক সময়ে হাত-ঘড়িটি দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ মায়ার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিল—]

তিলক ॥ মায়া—! আটটায় তোমার ট্রেন। সওয়া সাতটা বেজে গেল। শিগগির তৈরি হয়ে নাও।

[তিলক পুনরায় সংবাদপত্রে মনোযোগ দিল। শঙ্কর সেনের প্রবেশ।]

শঙ্কর ॥ এই যে তিলক! ব্যাপার কি বলো তো? ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই দেখি, সাজাহান গিয়ে হাজির। তুমি আর মায়া মদনপুর যাবার জন্যে একসঙ্গে ছুটি চেয়েছো—আজ?

তিলক ॥ হ্যাঁ দাদা। কাল রাত্রে থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরে দেখি তারিণী-খুড়ো অপেক্ষা করছে—মার অসুখটার ভারী বাড়াবাড়ি চলছে। না গেলে নয়—তাই ছুটি চেয়েছি।

শঙ্কর ॥ দু'জনেই যেতে চাইছো?

তিলক ॥ মায়া তো শুনেই কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিয়েছে। তারিণী-খুড়োর সঙ্গে সকালে এই আটটার গাড়িতে মদনপুর যাচ্ছে! আমি যাবো দুপুরের গাড়িতে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে ওষুধপত্র নিয়ে।

শঙ্কর ॥ তোমরা যাচ্ছো—কিন্তু—কাল শনিবার প্লে—তাই ভাবছি—

তিলক ॥ মায়াকে অবিশ্যি যেমন ক'রেই হ'ক কালই সময়মতো ফেরত পাঠাবো। সম্ভব হ'লে আমিও আসবো। কিন্তু কালকে তো তোমাদের বলে এসেছি, আমার বদলে আর কাউকে শ্রীহর্ষের পার্টটা দিয়ে রাখাই উচিত। মনে হয় অশোক এটা ভালোই পারবে। আগা-গোড়া রিহার্সালে ও আমার সঙ্গেই ছিল।

শঙ্কর ॥ কথাটা আমি ভালো ক'রেই ভেবে দেখেছি। অন্যান্য সহ-কর্মীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছি। আমরা অপেক্ষা করছি বিশেষ করে 'প্রত্যহ' সমালোচনার জন্যে। আজই তো সব কাগজ বেরুচ্ছে—দেখা যাক্।

তিলক ॥ কি আবার দেখবে? ওদের মত তো সেদিন সব জানাই গেছে।

শঙ্কর ॥ তবু বিরূপাক্ষ বোস যা বলবে, সেটা যুক্তি দিয়ে বলবে। আমি তার যুক্তিটা দেখতে চাই।

[ট্রেন-ভ্রমণের সাজে সজ্জিতা মায়ার প্রবেশ।]

মায়া ॥ এই যে নমস্কার, শঙ্করদা। শুনেছেন তো সব? ছুটি দিচ্ছেন আশা করি।

শঙ্কর ॥ যা শুনেছি, তাতে তো আর 'না' বলতে পারি না মায়া। কাল শনিবার প্লে। অনিবার্য কারণে তিলক না এলেও হয়তো চালিয়ে নেওয়া যাবে অশোককে দিয়ে। কিন্তু তুমি না এলে আমরা ডুবলাম। এই কথাটি ভুলো না মায়া।

তিলক ॥ কিন্তু তারিণী-খুড়ো কই ?

মায়া ॥ দু'বার তাড়া দিয়েছি—সন্ধ্যা-আহ্নিক এখনো শেষ হয় নি।

তিলক ॥ এই সেরেছে !

মায়া ॥ না, না, ট্রেনের খেয়াল আছে।

['দুন্দুভি', 'ত্রিশূল', 'প্রত্যহ' প্রভৃতি প্রমোদ-পত্রিকা এক হাতে এবং অন্য হাতে বাজারের থলি লইয়া বাহির হইতে সাজাহান আসিয়া দাঁড়াইল।]

এই যে—সাজাহানদা। আমাকে একটা দাও।

[ছুটিয়া গিয়া সে 'দুন্দুভি' কাগজটি সাজাহানের হাত হইতে লইল এবং অন্য হাতে বাজারের থলি লইয়া বাহির হইতে সাজাহান আসিয়া দাড়াইল।]

শঙ্কর ॥ দেখি—'প্রত্যহ খানা !

[সাজাহানের হাত হইতে 'প্রত্যহ'খানি লইয়া সেও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতে লাগিল। সাজাহান অন্য কাগজগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। তিলক কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। মায়া 'দুন্দুভি'খানি পড়িয়া ম্লান মুখে উহা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।]

তিলক ॥ আমাকে ঠুকেছে নিশ্চয় ? কিন্তু তোমাকে ভালো বলেছে তো ?

মায়া ॥ কোনও মানে হয় না—কোনও মানে হয় না। এরা যা খুশি তাই বলে। 'প্রত্যহ' কি লিখেছে শঙ্করদা ?

শঙ্কর ॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও...তোমার সুখ্যাতি খুবই করেছে মায়া। কিন্তু এ কি, এ যে কখনও ভাবতে পারি নি—আশা করি নি—তিলক সম্বন্ধে যা লিখেছে—

তিলক ॥ ইতরের মতো গালাগাল করেছে নিশ্চয় ?

শঙ্কর ॥ আরে না, না, সেই তো অবাক কাণ্ড ! ভূতের মুখে রামনাম। শোনো না পড়ছি—"শ্রীহর্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন সুদক্ষ অভিনেতা তিলক চৌধুরী। অভিনয় করিয়াছেন তিনি যাত্রার ঢঙে। দর্শকগণের অনেকেই এইরূপ অভিনয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের অভিনয় করিতে গিয়া যদি পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টি না হয়, সে অভিনয় ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই। পৌরানিক নাটকের অভিনয় যখন আমরা দেখিব, তখন দর্শককেও ডুবিয়া যাইতে হইবে পৌরাণিক পরিবেশে। কখনই যেন মনে না হয় আমরা কলিকাতা শহরে

বিজলী-পাখার তলায় বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি। তিলক চৌধুরীর অভিনয় এবং একমাত্র তাহারই অভিনয় এই পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। এদিক দিয়া তিনি অনন্যসাধারণ সফলতা অর্জন করিয়াছেন। বলিতে কুণ্ঠা নাই, পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইলে তিলক চৌধুরীর অভিনয় দেখা নিতান্ত আবশ্যক।"

মায়া॥ [আনন্দ-উচ্ছ্বাসে] তিলকদা—

শঙ্কর॥ বিরূপাক্ষ বোসকে চেনা দায়। বুঝলে তিলক, আমার মনে হয়—কাল যখন 'যাত্রা' হচ্ছে', 'যাত্রা হচ্ছে', ব'লে হাসাহাসি করছিল সেটা আর কিছু নয় অন্য কাগজের সম্পাদকের জ্ঞানের বহরটা বুঝবার জন্যে ঐ টোপ ফেলে একটু খেলছিল। যাক্‌, অন্য কাগজ এখন যা খুশি লিখুক। তোমাকে নিয়েই আমরা এখন বেশ লড়তে পারবো। 'প্রত্যহ'র এই একটি সমালোচনায় দেখবে দর্শকরাও তোমার অভিনয়ের ধারাটা বুঝতে পারবে, আর তার জন্যে উপযুক্ত দামও দেবে।

তিলক॥ এইসব কাগজের মতামতের ওপর আস্থা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম শঙ্করদা। কিন্তু এখন বুঝেছি, সত্যিকার সমঝদারও আছে। না, আর আমার দুঃখ নেই।

মায়া॥ দুঃখ নেই তো? আমারও আর দুঃখ নেই। [তারিণীকে আসিতে দেখিয়া] ঐ তারিণী-খুড়ো এসে গেছেন। তা হ'লে এবার আমরা চলি। কিন্তু এই 'প্রত্যহ'খানা নিয়ে যাবো শঙ্করদা, মাকে দেখাবো?

শঙ্কর॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়!

তারিণী॥ মাকে তো দেখাবে—এখন মাকে গিয়ে দেখ কিনা, সেটা দেখ। [তিলককে] তুমিও বাপু আর দেরি ক'র না—যদি মাকে দেখতে চাও। [মায়াকে] এসো—দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—[তারিণীও মায়ার প্রস্থান]

শঙ্কর॥ সাজাহান—সাজাহান—

তিলক॥ কি? চা চাই?

[চা ও খাবার লইয়া সাজাহানের প্রবেশ]

শঙ্কর॥ সে তো না চাইতেই পাবো।

এই তো! রাখো ভাই, রাখো।

[পকেট হইতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া উহা সাজাহানকে দিয়া]

সত্যিকার মিষ্টি-মুখের আয়োজন কর দেখি। ছুটে চ'লে যাও রাস্তায়। হকারের কাছে হোক, স্টল হোক—যেখানে য খানা আজকের 'প্রত্যহ' পাও—ছুটে গিয়ে কিনে নিয়ে এসো।

সাজাহান ॥ ওরে বাবা! স্পিরিট আর স্টোভ তুলে দিয়ে শেষটায় কি 'প্রত্যহ' জেলে চা হবে আজ থিয়েটারে?

শঙ্কর ॥ আঃ! যা বলছি শোনো। যাও—ছুটে যাও।

সাজাহান ॥ যাচ্ছি।

[সাজাহান প্রস্থান করিতেছিল। এমন সময়ে 'প্রত্যহ' পত্রিকার নাট্য-সম্পাদক বিরূপাক্ষ বোসের প্রবেশ। তাহার হাতে খান-দুই 'প্রত্যহ' কাগজ।]

আর কিনবো কি ছাই। ঐ তো 'প্রত্যহ' মশায় সশরীরে হাজির।

শঙ্কর ॥ কি সৌভাগ্য! আসুন—আসুন—

তিলক ॥ [সাজাহানকে] শিগগির চা।

সাজাহান ॥ বাঁচা গেল বাবা! [সাজাহানের গৃহাভ্যন্তরে গমন]

তিলক ॥ বসুন বোস মশাই। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বিরূপাক্ষ ॥ মায়া কই? মায়া?

তিলক ॥ আমার মার খুব অসুখ -বেশ বাড়াবাড়ি চলছে। মায়া এই আটটার ট্রেনে তাঁকে দেখতে মদনপুর চ'লে গেল। আমি যাবো দুপুরে।

বিরূপাক্ষ ॥ এই যা:! আমার সমালোচনাটা দেখে গেছে?

শঙ্কর ॥ হ্যাঁ, দেখে গেছে। আর শুধু দেখেই যায় নি—তিলকের মাকে দেখাবে ব'লে 'প্রত্যহ'খানা হাতে ক'রে নিয়ে গেছে।

বিরূপাক্ষ ॥ খুশি হয়ে গেছে তো? তিলকবাবু, আপনিও খুশি হয়েছেন তো?

তিলক ॥ গরু মেরে জুতো দান করলে যতোটা খুশি হবার কথা, তা হয়েছি বটে।

বিরূপাক্ষ ॥ মানে?

তিলক ॥ কাল আমার অভিনয় দেখে বলেছিলেন—যাত্রা—বলেছিলেন, একেবারে অচল। আমার পার্ট কেড়ে নেওয়া উচিত—তাও নাকি বলেছিলেন। আজ অবিশ্যি আপনারই কাগজে দেখছি আপনি লিখেছেন, আমার অভিনয়ই হয়েছে আদর্শ। যাক্, শেষটায় যে আপনার চৈতন্য হয়েছে তা দেখে খুশিই হলাম। কিন্তু দোহাই আপনাদের! এ রকম পাগলামো আর করবেন না।

বিরূপাক্ষ ॥ বটে! আমি পাগল! আমি পাগলামো করেছি!

তিলক ॥ তা নয়তো কি! ক্ষণে ক্ষণে এই মত-পরিবর্তন—একে পাগলামো ছাড়া আর কি বলা যায়, আমি জানি না।

শঙ্কর ॥ আঃ! তিলক থামো।

তিলক ॥ থামবো শঙ্করদা? কাল রাত্রে ওঁর কথাগুলো কানে আসা

মাত্র আমার মনে হয়েছিল সারা জীবনের সাধনা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। এক-একবার আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল শঙ্করদা। [বিরূপাক্ষকে] আপনারা ভুলে যান—what is game to you is death to us— আজকে আপনি আপনার কাগজে আমার অভিনয় সম্বন্ধে যা লিখেছেন— তা প'ড়ে আমি যদি এ কথা বলি—কাল রাত্রে আপনি যা বলেছিলেন তা ছিল এক মাতালের প্রলাপ,—আপনি আমায় এতটুকু দোষ দিতে পারেন বিরূপাক্ষবাবু ?

বিরূপাক্ষ ॥ [হাসিয়া] না, দেবো না। শুধু একটু ভুল শুধরে দেবো তিলকবাবু। কাল রাত্রে আপনার অভিনয় সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই কথাগুলোই সত্যি। আর আজ কাগজে আমার যে মতটা বেরিয়েছে, সেইটেই হ'ল গিয়ে মাতালের প্রলাপ। আমার এই মদ ঘুচিয়েছে—আপনারই ভাবী পত্নী মায়া দেবী—তাঁর চোখের জলে। হ্যাঁ, কাল রাত্রে ঐ মায়া দেবী আমার বাড়ি গিয়ে—আমার পায়ে প'ড়ে— থাক্। আপনার জন্যে তিনি কি করেছেন, সেটা তাঁর নিজের মুখেই শুনবেন তিলকবাবু। আসি নমস্কার।

[বিরূপাক্ষ বাহির হইয়া গেল। তিলক ও শঙ্কর স্তম্ভিত।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[তিলকের পল্লীভবনের অন্দরমহল। একখানি ইজিচেয়ারে আনন্দময়ী শুইয়া আছেন। তাঁহার কোলে একখানি 'প্রত্যহ' পড়িয়া আছে। পাশে একটি মোড়ায় মায়া বসিয়া আনন্দময়ীর মাথায়, বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছে।]

আনন্দ ॥ এ তুই যা প'ড়ে শোনালি মা, এ তো দেখছি তোদের দু'জনারই জয়-জয়কার। তা এতো লোকে তোদের থিয়েটার দেখে ধন্য ধন্য করছে— আর আমি দেখবো না ?

মায়া ॥ কেন দেখবে না মা ? একটু সেরে উঠলেই তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাবো যে আমি। যে যতোই বলুক। তুমি না দেখা পর্যন্ত আমাদের মন ভরবে না মা।

আনন্দ ॥ আর দেখছি। কাল দুপুরে মনে হচ্ছিলো, সব বুঝি শেষ হয়ে গেল। ঠাকুরকে কেবলি এই ব'লে ডেকেছি—"ঠাকুর! নিতে হয় নাও—তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু নেবার আগে ওদের দুটিকে একটিবার দেখতে দিও। আমার যে একটু কাজ এখনো বাকি রেখেছো ঠাকুর"। ঠাকুর তোকে এনে দিলেন। কিন্তু সে তো এখনো এলো না মা।

মায়া॥ ওমা! আর কতোবার বলবো! তিনি তো এই দুপুরের গাড়িতেই আসছেন—ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে ওষুধপত্র নিয়ে।

আনন্দ॥ ওষুধ! আর ডাক্তার!!

মায়া॥ কেন মা? এখন তো তুমি বেশ ভালো আছো।

আনন্দ॥ সে তুই কাছে এসেছিস ব'লে। তুই এসেছিস, তাই আজ ক'দিন পর বিছানা ছেড়ে উঠেছি। বাইরে ব'সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার বড়ো ভাল লাগে। তা একটু সুখেও আমার বাদ সেধেছিল—ঐ নিস্তার হারামজাদী। ওর মুখে শুধু এক কথা—ন'ড়ো না—উঠো না—হার্টফেল হয়ে মরবে। হারামজাদী শুধুই আমার মরার কথা বলে। বাঁচার কথা বলে না মা।

মায়া॥ সেকথা বলে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই মা। ওকে আমি চিনে নিয়েছি। মুখে যাই বলুক, নিস্তার-খুড়ী তোমার জন্যে যা করে—

[খলে ঔষধ মাড়িতে মাড়িতে নিস্তারিণীর প্রবেশ।]

নিস্তার॥ নিস্তার-খুড়ী যা করে, সে কি তুমি করবে? তুমি তো হ'লে গিয়ে বাছা সুখের পায়রা। আজ একটু ভালো আছেন; তাই পাশে ব'সে খুব বক্-বকম্ করছো। আমরা বাছা ভালোতেও আছি, মন্দতেও আছি। [আনন্দময়ীকে] নাও—ধরো—খাও।

আনন্দ॥ খেতে আমি রাজী আছি নিস্তার, যদি আমার একটা কাজ করিস ভাই।

নিস্তার॥ মাথা খুঁড়ে ওষুধ খাওয়াতে হয়। আমায় রেহাই দেবে? বল না কি কাজ?

আনন্দ॥ আমার গয়নার ছোট বাক্সটা এনে দে।

নিস্তার॥ সেজে-গুজে চিতেয় ওঠবার সাধ বুঝি!

আনন্দ॥ সে সাধ হ'লে ছোট বাক্সটা আনতে বলতাম না। বলতাম বড়োটা আন্। তাতেও যদি মন না উঠতো তবে বলতাম মাঝারি বাক্সটাও আন্—যে বাক্সটা তোর জন্যে রেখেছি—তোকে দিয়েছি। আমি চাইছি ছোট বাক্সটা—যাতে নতুন গয়না গড়িয়ে রেখেছি।

নিস্তার॥ সে তো রেখেছো ছেলের বৌয়ের জন্যে—বিয়েতে দেবে ব'লে। তোমার যা কাণ্ড—রাম না হ'তেই রামায়ণ। বৌয়ের বদলে বৌয়ের গয়না দেখেই যদি সুখ হয় দিচ্ছি এনে। দুধের সাধ ঘোলেই মেটাও, কিন্তু ওষুধটা খেলে—তবেই না যাচ্ছি—

আনন্দ॥ খাচ্ছি গো, খাচ্ছি। তুই ম'রে যেন জোঁক হ'স।

[ওষুধ সেবন করিয়া খলটি নিস্তারিণীকে দিল]

নিস্তার॥ এর চেয়ে বড়ো আশীর্বাদ তুমি আর আমাকে করো নি

দিদি। জোঁকই যদি হই, পরকালে তোমার পায়েই বসবো। [নিস্তারিণীর প্রস্থান]

আনন্দ ॥ শুনলি তো? কি বাঁধনেই যে আমায় বেঁধেছে, ওই জানে। ওর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

[একখানা ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইবার শব্দ শোনা গেল।]

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, ঐ তো কলকাতার গাড়ি এল—না?

মায়া ॥ হ্যাঁ মা।

আনন্দ ॥ এই গাড়িতেই আসবে ব'লে দিয়েছে?

মায়া । হ্যাঁ মা, তাই বলেছেন।

আনন্দ ॥ কলকাতার গাড়িগুলো যখনই আসে, আমার বুকটা ধড়ফড় করে। মনে হয়, হয়তো আসছে। এক-একদিন এসেও পড়ে।

মায়া ॥ আজও আসবে মা।

আনন্দ ॥ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আজ তার আসা বড়োই দরকার। না এলে, না জানি কী যেন একটা বাকি থেকে যাবে—কেবলই মনে হচ্ছে।

[নিস্তারিণী একটি বাক্স লইয়া আসিল।]

নিস্তার ॥ এই নাও তোমার হবু বৌয়ের গয়নার বাক্স।

[আনন্দময়ী কোন রকমে ইজিচেয়ারে উঠিয়া বসিয়া নিস্তারিণীর হাত হইতে বাক্সটি লইয়া আঁচলের চাবি দিয়া তাহা খুলিল। ইতিমধ্যে পুর্বোক্ত ট্রেনটি সশব্দে ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার আওয়াজ শোনা গেল।]

আনন্দ ॥ [নিস্তারিণীকে] হাঁ ক'রে দেখছিস কি?

নিস্তার ॥ দেখছি তোমার ভীমরতি!

আনন্দ ॥ ভীমরতি আমার না তোর? বারটার গাড়ি চ'লে গেল। এই গাড়িতে তিলক আসছে—জানিস্ তুই। তবু তুই এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস? এসে চা না পেলে তোর রক্ষে আছে?

মায়া ॥ তুমি ব'স খুড়ি। আমি গিয়ে চা ক'রে আনছি।

নিস্তার ॥ থাক্ থাক্, তুমি উঠে গেলে গয়নার বাক্সটা আমার বয়ে আনাই সার হবে। চিনির বলদ হ'তে পারি, কিন্তু চিনিটা কোন্ আড়তে জমা হবে—তা কি আর আমি জানি না? [নিস্তারিণীর প্রস্থান]

আনন্দ ॥ বুঝবে সব—করবে সব, কিন্তু মুখ খুললেই বিষ। ওকে তুমি ভুল বুঝো না মা।

মায়া ॥ না মা। ওকে আমি ভালো করেই চিনি—ভারী ভালো লাগে আমার।

আনন্দ ॥ [বাক্স হইতে এক জোড়া জড়োয়া গয়না বাহির করিয়া] তোমাদের কি সব এখন ফ্যাসান হয়েছে আমি জানি না মা, কিন্তু নিতারের পছন্দ এই বালা—আমারও পছন্দ। কেমন হয়েছে মা?

মায়া ॥ কেন? বেশ তো।

আনন্দ ॥ [মায়ার হাতখানি টানিয়া লইয়া তাহাতে পরাইতে পরাইতে] তোর হাতে কেমন মানায়—দেখতে আমার সাধ হচ্ছে। বড় আশা ক'রে গড়িয়েছি।...এই তো বেশ মানিয়েছে। দেখি, দেখি মা, ও হাতখানা। [অন্য হাতেও বালা পরাইতে পরাইতে] আজকাল কেবলই মনে হয়, সময় আমার হয়ে গেছে। কিন্তু আসল কাজ আমার বাকি রইলো। কাজটা যদি শেষ ক'রে যেতে পারতাম, যেতে আমার এতটুকুও দুঃখ হ'ত না। বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন আনন্দময়ী। সে নাম সার্থক হ'ত—যদি তোদের দু'হাত এক ক'রে দিয়ে যেতে পারতাম মা। [বালা পরানো শেষ করিয়া] এই বালাজোড়া দিয়ে আমি তোমায় আশীর্বাদ ক'রে রাখছি মা,—আমার ঐ ঘর-ছাড়া ছেলেকে ঘরবাসী করো—নিজে সুখী হও, ওকে সুখী করো। তিলকের মন জেনেছি—মত পেয়েছি বলেই এ আশীর্বাদ করতে আজ আমার এত আনন্দ। [মায়া সজলচক্ষে আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল।] এই নাও মা, তোমার বাক্স। [মায়ার হাতে বাক্সটি তুলিয়া দিল]

[তিলকের প্রবেশ, তৎপশ্চাতে আসিল তারিণী-খুড়ো।]

তিলক ॥ যাক্! আমার প্রণাম করবার লোকটি এখনও আছেন তা হ'লে। তারিণী-খুড়োর মুখে ছাই পড়ুক। [আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া উঠিল] হ্যাঁ মা, তারিণী-খুড়ো ব'লে এসেছিল—এসে নাকি তোমায় আমি দেখতেই পাব না।

মায়া ॥ গয়নার বাক্সটা আমি রেখে আসি মা।

আনন্দ ॥ রাখবে এখন। বুঝলি তিলক, সেকেলে লোকের পছন্দ একালের মেয়েরও পছন্দ হয়েছে বেশ। [মায়াকে] কি বল মা? [তিলককে] হ্যাঁ রে, এই কাগজটায় তোদের দু'জনের ছবি বেরিয়েছে। ও নাচছে, তুই বাঁশী বাজাচ্ছিস। কি সুন্দরই মানিয়েছে। কাগজে তোদের দু'জনের কি সুখ্যাতিই না বেরিয়েছে! দুঃখ এই, আমি তোদের অভিনয় দেখতে পেলাম না বাবা।

তিলক ॥ অভিনয় দেখে আর দরকার নেই। এখন আর ক'টা বছর বাঁচতে পারো কি না সেইটা দেখ। তুমি তো বাইরে এসে গয়নার বাক্স-টাক্স নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছো। কিন্তু কলকাতার সেরা ডাক্তার, সে কি হুকুম করেছে জানো? অন্তত এক হপ্তা স্রেফ শুয়ে থাকতে হবে—

নড়া-চড়া একেবারে নিষেধ। তারিণী-খুড়ো, চেয়ারটার একদিকে তুমি ধর, আর একদিক আমি ধরছি—তুলে নিয়ে চল ঘরে—শুইয়ে দিতে হবে বিছানায়। ধর—ধর—

[ইতিমধ্যে নিস্তারিণী চা ও খাবার লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

নিস্তার॥ সে কি! এ কি গঙ্গা-যাত্রা নাকি?

আনন্দ॥ [সকাতরে] দেখ্‌, দেখি নিস্তার—অত্যেচারটা দেখ্‌। আমি হেঁটে এসে এখানে বসেছি! এখনো তো মরি নি রে বাপু। আমাকে ঘাড়ে ক'রে তুলে নিয়ে যাওয়া কি গো!

নিস্তার॥ ছেলে তো নয়, যম। [চা ও খাবার নামাইয়া রাখিয়া মায়াকে] গয়নার বাক্স হাতে নিয়ে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। ওটা নামিয়ে রাখো—ধরো। ওঠো দিদি—ওঠো।

[আনন্দময়ীকে নিজে টানিয়া তুলিল। মায়া গয়নার বাক্স নামাইয়া সাহায্য করিল। আনন্দময়ীকে ধরিয়া লইয়া নিস্তারিণী ও মায়া যাইবে এমন সময়ে—]

তিলক॥ মায়া দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। [তারিণীকে] যাও না খুড়ো—গিয়ে ধর।

নিস্তার॥ জানি গো জানি। ছাই ফেলতে সেই ভাঙা কুলো—এই আমরাই দু'জন।

মায়া॥ না, না, সে কি। আমিও ধরছি।

তিলক॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] ওঁরা যাক্‌, তুমি থাকো। আমার দরকারী কথা আছে।

[ইতিমধ্যে তারিণী-খুড়ো ও নিস্তারিণী আনন্দময়ীকে ধরিয়া লইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।]

মায়া॥ আচ্ছা, ওঁরা কি ভাবলেন বলতো? তুমি এক-একটা কাজ এমন কর, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। তবে এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। [হাতের বালা দেখাইয়া] এই দেখ, মা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। এবার তুমি আমার প্রণাম নাও। [প্রণাম করিতে গেল।]

তিলক॥ না, দাঁড়াও। আমার কথার আগে জবাব দাও। খবরদার মিথ্যা ব'ল না। কাল রাত্রে থিয়েটার থেকে বাড়ি ফেরবার পথে 'প্রত্যহ' পত্রিকার নাট্য-সম্পাদক বিরূপাক্ষ বোসের বাড়ি গেয়েছিলে তুমি?

[মায়া পাংশু হইয়া গেল। মাথা নিচু করিয়া নীরব রহিল।]

তিলক॥ [গর্জিয়া উঠিয়া] উত্তর দাও।

মায়া॥ [নতমুখেই] গিয়েছিলাম।

তিলক ॥ 'প্রত্যহ' কাগজে আমার অভিনয়ের প্রশংসা বের হবার জন্যে তুমি তার পায়ে প'ড়ে কেঁদেছিলে? [মায়া নতমুখে নীরব রহিল ।] [পুনরায় বজ্রকণ্ঠে] কথা কইছো না যে? জবাব দাও।

মায়া ॥ হ্যাঁ—

তিলক ॥ আমাকে এভাবে অপমান করবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?

মায়া ॥ তোমার অপমান সইতে পারবো না বলেই আমি—

তিলক ॥ অপমান সম্বন্ধে লোক-নিন্দাটাই তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো মায়া? দশজনের মতটাই তুমি মেনে নিলে! আমার ওপর তোমার কি কোন শ্রদ্ধা—কোন আস্থাই ছিল না মায়া?

মায়া ॥ কেন থাকবে না?

তিলক ॥ কিন্তু তার তো কোন প্রমাণ পেলাম না মায়া। প্রমাণ পেতাম—যদি দেখতাম, সমস্ত জনমত আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু তুমি তাতে ভয় পেলে না—এতোটুকু বিচলিত হ'লে না। সকলের বিরুদ্ধে একা তুমিই এসে দাঁড়ালে আমার হাত ধ'রে।

মায়া ॥ আমার ভুল হয়েছে—আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

তিলক ॥ কে তুমি? কাকে ক্ষমা করবো আমি? তুমি আমাকে এতটুকু বোঝো নি—আমিও তোমাকে এতোটুকু বুঝি নি। আমার ওপর তোমার কোনও বিশ্বাস নেই—তোমার ওপরও আমার কোন বিশ্বাস নেই। তুমি আমাকে চেনো না;—আমি তোমাকে চিনি না। আমাদের পরিচয় আজ থেকে শেষ।

[তিলক গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। মায়া প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।]

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[উত্তর কলিকাতার একটি বাড়িতে মায়ার ফ্ল্যাট। দুইটি কক্ষের সম্মুখে বসিবার ঘর। সাদাসিধে সাজসজ্জা ও পরিবেশ। মায়া বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল ও পরিচারিকা কালীর মা চেয়ার-টেবিলের ধুলা ঝাড়িতেছিল। বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া মায়া কালীর মাকে বলিল—]

মায়া ॥ কালীর মা—দেখে এসো—

[কালীর মা বাহিরে চলিয়া গেল এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—]

কালীর মা ॥ তোমাদের থ্যাটারের লোক গো!

মায়া ॥ নিয়ে এসো।

[কালীর মা পুনরায় বাহিরে গিয়া শঙ্কর, শেখর ও অশোককে লইয়া ভিতরে আসিল। মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের নমস্কার করিল।]

মায়া ॥ বসুন। কালীর মা, চা করো।

কালীর মা ॥ চাও নেই, চিনিও নেই।

মায়া ॥ [ম্লান হাসিয়া শঙ্করের প্রতি] টাকাও নেই।

শঙ্কর ॥ না, না, সে কি! তোমার বেতন দিতেই তো আমরা এসেছি। নাও সই কর।

[একখানি কাগজ আগাইয়া দিলে মায়া তাহ'তে সই করিতে লাগিল ও শঙ্কর নিজে নোট গুণিয়া মায়া'কে দিল।]

অশোক ॥ শঙ্করদা, সিগারেট খাবেন?

শঙ্কর ॥ দাও।

অশোক ॥ [পকেট হাতড়াইয়া] নেই। কেনবার পয়সাও নেই শঙ্করদা।

[শঙ্কর ও অন্য সকলে হাসিয়া উঠিল।]

শেখর ॥ তাই ব'লে তোমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে না অশোক।

অশোক ॥ বা রে! এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন?

শঙ্কর ॥ মায়া নতুন ঘর-সংসার বেঁধেছে। এখনই কিছু টাকা চাই বৈকি! তাই ডিরেক্টররা এক মাসের বেতন ওকে অগ্রিম মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু মায়া, তাড়াহুড়ো ক'রে এই ফ্লাটে উঠে এলে বটে, কিন্তু এই ফ্লাটের যা ভাড়া তা চালিয়ে খেতে-পরতে তোমার যে কি থাকবে এই বেতনে—আমি তাই ভাবছি।

মায়া ॥ তা ভাববেন বৈকি! "সকলের তরে সকলে আমরা—প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" [একখানি নোট কালীর মাকে দিয়া] যাও কালীর মা, আর তোমার দুঃখ নেই। এবার আমাদের সকলের দুঃখ দূর কর। [কালীর মার প্রস্থান]

শেখর ॥ কিন্তু যাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, তার দুঃখ কে দূর করবে শুনি? তিলকবাবুর বাড়িতে ছিলে—বেশ ছিলে। গায়ে ফুঁ দিয়ে দিব্বি কেটে যাচ্ছিল। শখ ক'রে এসব হাঙ্গামায় কেন এলে বুঝি না।

মায়া ॥ অনাথ-আশ্রমে কি চিরকালই আমাকে কাটাতে বলেন শেখর-বাবু? যখন নিজে রোজগার করছি তখনও?

শঙ্কর ॥ না, না, মায়ার এই মনোবৃত্তি আমি শ্রদ্ধা করি। সমব্যবসায়ীদের ধর্মই এই যে, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবে। ছুটি নেবার পর তিলকের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আমার শুধু একটা মাত্র চিন্তা,—বুঝছি না, মায়ার সঙ্গে তিলকের ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে কিনা।

মায়া ॥ [হাসিয়া] আমি তো বলছি—হয়েছে! আর সেটা কেন হয়েছে—সেটাও শোনবার মতো শঙ্করদা।

অশোক ॥ বলতে বাধা না থাকে তো আমরা জানতে চাই মায়া দেবী।

মায়া ॥ কেন শুনবেন না? শুনুন। মা'র অসুখ শুনে মদনপুরে আমরা দু'জনেই গেলাম—জানেন তো। সন্ধ্যেবেলা একটা ঝড় উঠবে দেখে পিদিমটা আমি আঁচলের আড়াল ক'রে কোনও রকমে জ্বালিয়ে রাখছি! নিভে যাবে বলে ভয়ে আমি কাঁপছিলাম। তিলকদা এই না দেখে রেগেই আগুন। বলে কিনা, আমি তাঁর অপমান করেছি। বলে কিনা, পিদিমটার অতো তোয়াজ কেন? এতো ভয়ই বা কিসের? নিভে যেত—যেতো। অন্ধকার হ'ত—হ'ত—আমি তো তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাত ধ'রে ঐ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারতে না কি তুমি? শুধু এ দোষেই মশায়, আমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে।

অশোক ॥ সত্যি! সত্যি বলছেন?

মায়া ॥ বিশ্বাস না হয়, জিগ্‌গেস ক'রে দেখবেন।

শঙ্কর ॥ ব্যাপারটা আমি খানিকটা বুঝতে পারছি—বুঝতে পারছি মায়া। 'প্রত্যহ' কাগজে প্রশংসার পরেই তিলকের মাথাটা খারাপ হয়েছে।

শেখর ॥ শুধু পরে কেন, বরাবরই তিলকের মাথায় ছিট আছে। নইলে সেই প্রথমদিনের প্লে-র কথা মনে নেই? সবাই বলেছে, যাত্রা করবেন না—করবেন না মশায়। তবু সেই যাত্রা ক'রে অযাত্রা ক'রে দিলে।

মায়া ॥ তা যদি বলেন, যাত্রার বই লিখে অযাত্রাটা আপনিই শুরু করেছেন শেখরবাবু। তিলকদা বরং আপনারই মুখ রেখেছিলেন।

শেখর ॥ আপনার একথায় আমি প্রতিবাদ করি মায়া দেবী। তাই যদি হ'ত, তবে শ্রীহর্ষের ভূমিকাতে স্বাভাবিক অভিনয় ক'রে ঐ অশোকের আজ এতো নাম হ'ত না। বরং বলবো, আমার মুখ রেখেছে ঐ অশোক।

শঙ্কর ॥ আঃ! তোমরা থামো। এসব আলোচনার জন্যে আজ আমরা এখানে আসি নি। [চা প্রভৃতি লইয়া কালীর মার প্রবেশ]

কালীর মা ॥ বাইরে আরো দু'জন বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

মায়া ॥ তাদের নিয়ে এসে আমাদের সবাইকে চা দাও।

[কালীর মা বাহিরে গিয়া তারিণী ও তৎসহ হারাধনকে লইয়া আসিল এবং নিজে রন্ধনাগারে চলিয়া গেল।]

মায়া ॥ এ কি তারিণী-খুড়ো—আপনি!

হারাধন ॥ আগে এক গেলাস জল খেতে দিন ওঁকে। সারা শহর ঘুরেছেন আপনার খোঁজে। শেষে থিয়েটারে গিয়ে—ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক এখনও হাঁপাচ্ছেন। বসুন স্যার, আপনি বসুন। আমি জল এনে দিচ্ছি। [যাইতে যাইতে] "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

[কাঁচের জলপাত্র হইতে জল গ্লাসে ভরিয়া তারিণীকে তাহা দিল। তারিণী গ্লাসটি মুখে না ছোঁয়াইয়া জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিল।]

হারাধন ॥ নিন—এইবার বলুন।

তারিণী ॥ গিন্নী-মার এখন-তখন। তোমাকে শেষ দেখা দেখার জন্যে পাগল। শুধু এইটুকুর অপেক্ষাতেই প্রাণটা এখনও রয়েছে। তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেই আমি এসেছি।

মায়া ॥ [আর্তকণ্ঠে] শঙ্করদা!

শঙ্কর ॥ আজ রোববারের প্লে—হাউস ফুল। কি ক'রে যে তুমি যাবে, আমি ভেবে পাই না।

মায়া ॥ কিন্তু আমার মা! তিনি যে আমার কি—তিনি যে আমার কতোখানি কি ক'রে আমি তা আপনাদের বোঝাবো শঙ্করদা?

শঙ্কর ॥ 'হাউস ফুল' থিয়েটারে তুমি যদি আজ না নামো, সে যে কি তাণ্ডব হবে—আমিই বা তোমাকে তা কি ক'রে বোঝাবো? চারদিকেই দেখছি জীবন-মরণের সমস্যা।

হারাধন ॥ তা যা বলেছেন স্যার। তবে যে, সমাধানও একটা না হ'তে পারে, তেমন নয়। অভয় দেন তো বলি—

শঙ্কর ॥ কি?

হারাধন ॥ মুক্তোর কথা ভাবছিলাম! ওর সবই তৈরি আছে স্যার।

শঙ্কর ॥ মুক্তোর কথা ভাববো সেইদিন, যেদিন মায়াকে আমরা হারাবো। ওজন ক'রে কথা বলতে তুমি শেখো নি হারাধন।

মায়া ॥ আজকের প্লে আমি চালিয়ে দিচ্ছি শঙ্করদা। কিন্তু তারপর আর বোধহয় আমি পারবো না। আপনারা হয়তো বলবেন, সমবায় থিয়েটারের দস্তুর এটা নয়। তিলকদাও হয়তো এটা চান না। কিন্তু সমবায়ের অর্থ যদি এই হয়—মুমূর্ষু মা'র কাছে ছুটে যাওয়া চলবে না, সে সমবায়ে আমি নেই শঙ্করদা। তারিণী-খুড়ো, আপনি একটু বসুন, মাকে আমি লিখে দিচ্ছি—আজ প্লের পর রাত দশটার ট্রেনে আমি তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছি। এই চিঠি নিয়ে আপনি এই ট্রেনেই চ'লে যান। যেমন

ক'রে হ'ক এই কয়েক ঘণ্টা মাকে আমার ধ'রে রাখুন—আমার জন্য—আমার জন্য। [মায়া ছুটিয়া গিয়া চিঠির কাগজপত্র লইয়া লিখিতে বসিল।]

শঙ্কর ॥ তা হ'লে আমরাও আসি মায়া। দেখছি, এখনি আমাদের একটা জরুরী মিটিং ডাকতে হবে।

শেখর ॥ অন্তত আজকের দিনটা যে আমাদের বাঁচালে—সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ মায়া।

[সকলের প্রস্থান। মায়া চিঠি লিখিতে লাগিল। তারিণী অপেক্ষা করিতে লাগিল।]

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মুক্তা দেবীর বাসকক্ষ : সাজাহান ও মুক্তা কথোপকথনে রত।]

মুক্তা ॥ বিয়ের আগে রইলেন দু'জনে একসঙ্গে—আর বিয়ের কথাটা যখন পাকা হ'ল, তখন একেবারে ছাড়াছাড়ি! ব্যাপারটা কি বলতো বাবা?

সাজাহান ॥ নাটক—নাটক—এসবও নাটক। এরকম ছাড়াছাড়ি তোর মার সঙ্গে আমার হামেশাই হ'ত। কিন্তু হ'লে হবে কি! ও হ'ল শরতের মেঘ—খানিকটা গর্জন, খানিকটা বর্ষণ—তারপরেই আর নেই।

মুক্তা ॥ তা যাই বল বাবা, আমি শুনেছি—তিলকবাবু পার্ট ছেড়ে দিয়েছেন ব'লে তিনিও চাইছেন মায়াও তার পার্ট ছেড়ে দিক্।

সাজাহান ॥ এ তোর মন-গড়া কথা মুক্তো। ঐ পার্টটাতেই তোর বড় লোভ। আর কেউ চা'ক্ আর না চা'ক্ তুই চাই'ছিস মায়া ঐ পার্টটা ছেড়ে দিক্—যাতে ও পার্টটা তোর হাতে আসে। কিন্তু শোন্ মুক্তো, মায়ার জন্যেই বইটা চলছে—আমাদের থিয়েটারটা দাঁড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে। কতোকাল পর বল দেখি মাসের পয়লা তারিখে না চাইতেই মাইনে পাচ্ছিস? আর তা পাচ্ছিস ওই মায়ার জন্যেই। মায়াও যদি এখন থিয়েটার ছেড়ে যেতে চায়, আমরাই তাকে যেতে দেবো না।

মুক্তা ॥ এ তোমাদের বাড়াবাড়ি বাবা। কেন, মায়া ছাড়া ও পার্ট করবার কি আর লোক নেই?

সাজাহান ॥ [চটিয়া গিয়া] আছে কিনা জানি না। কিন্তু এটা জানি, সে লোক তুই নোস্। তুই তো নাচতেই জানিস না।

মুক্তা ॥ জানি কি জানি না, তুমি কোনদিন দেখেছো?

সাজাহান ॥ নাচ আর আমায় দেখাস নি মুক্তো। নাচ শিখতে সাধনা

চাই। হ্যাঁ, নাচতো বটে আমাদের সময় নেত্যকালী। যেমন ছিল তার শিক্ষা—তেমনি ছিল তার সাধনা। যখন নাচতো, তখন তার জ্ঞানই থাকতো না। একদিন নাচতে নাচতে মেয়েটা ম'রেই গেল!

মুক্তা॥ সে কি?

সাজাহান॥ হ্যাঁ। 'আলিবাবা' প্লে হচ্ছে··· নেত্যকালী সেজেছে মর্জিনা ···মর্জিনা নাচছে···সকলে অবাক হয়ে দেখছে···হঠাৎ দেখা গেল, নেত্যকালী স্টেজের নিচে তলিয়ে গেল···তার একটা আর্তনাদ শোনা গেল মাত্র। ষ্টেজের একখানা কাঠ কেমন করে আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, সেই আল্‌গা কাঠে পা পড়তেই মেয়েটা প'ড়ে গেল—জন্মের মতো শেষ হয়ে গেল।

মুক্তা॥ বল কি বাবা! ম'রে গেল?

সাজাহান॥ হ্যাঁ রে। মেয়েটার হার্টটা ছিল দুর্বল। প'ড়ে যেতেই ভয়ে আঁৎকে উঠে ম'রে গেল। এত বড়ো অ্যাক্সিডেণ্ট স্টেজের ওপর আর কখনো হয় নি।

মুক্তা॥ [হাসিয়া] নেত্যকালীর চেয়ে তোমাদের এই মায়ার নামও বড়ো কম হয় নি। দেখো বাবা, নেত্যকালীর মতো মায়ারও আবার কোনদিন এরকম অ্যাক্সিডেণ্ট না হয়।

সাজাহান॥ ওঃ! তবেই বুঝি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয়?

মুক্তা॥ হয় বৈকি!

সাজাহান॥ [হাসিয়া] কিন্তু মুক্তা, শকুনের শাপে গরু মরে না—এই যা রক্ষা। চলি—

[সাজাহান প্রস্থানোদ্যত। হারাধনের প্রবেশ।]

হারাধন॥ এ কি! চললে যে খুড়ো? বোসো—চা খাও।

সাজাহান॥ তোমাদের এসব চা আমি খাই না। স্টোভ আছে? মেথিলিটেড স্পিরিট আছে? থাকে তো বল। নিজে চা তৈরি করে খাচ্ছি—তোমাদেরও খাওয়াচ্ছি।

হারাধন॥ না খুড়ো, ওসব বালাই এখানে নেই। আমি একটা কথা ভাবি খুড়ো! তুমি থিয়েটারের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে একটা স্পিরিট তৈরির কারখানা খুলে বোসো না কেন!

সাজাহান॥ মূলধনটা যোগাড় কর,—কারখানা এখনি খুলে দিচ্ছি। বেশ ভালো ডিভিডেণ্ড দেব। [সাজাহানের প্রস্থান]

হারাধন॥ নাঃ, তুমি ওকে এখনও বড্ডো বেশি লাই দাও মুক্তো।

মুক্তা॥ বাবা ব'লে নয়—অনেক খবর পাই কিনা—তাই—

হারাধন॥ ও আর কি খবর দেবে? খবর দিচ্ছি আমি। জবর খবর।

মুক্তা॥ বল না গো, কি খবর?

হারাধন ॥ আজকের প্লেই মায়ার শেষ প্লে। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অগুই তার শেষ রজনী।

মুক্তা ॥ বল কি গো ?

হারাধন ॥ তিলকের মা'র এখন-তখন—মায়াকে দেখতে চেয়েছে। মায়া যাবেই—থিয়েটারের কর্তারাও যেতে দেবেন না। ব্যাপার কি বুঝলাম না। শেষটায় মায়া বললে—আজকের প্লে'টা আমি চালিয়ে দিচ্ছি শঙ্করদা, কিন্তু এর পর বোধহয় আমি আর পারবো না।

মুক্তা ॥ তবে কাল থেকে আমাদের থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ?

হারাধন ॥ কর্তাদের যা ভাবগতিক বুঝলাম, ব্যাপার তাই-ই দাঁড়াচ্ছে।

মুক্তা ॥ কেন ? ও পার্ট'টা কি আমি চালিয়ে দিতে পারতাম না ?

হারাধন ॥ ভাবছো কি আমি তা বলি নি ? তাতে ম্যানেজার শঙ্কর সেন বললেন—যেদিন মায়াকে হারাবো, সেদিন এ কথা ভাববো।

মুক্তা ॥ যেদিন মায়াকে হারাবো।

হারাধন ॥ তুমিও যেমন। রোজ ফুল হাউস হচ্ছে—মায়াকে ওরা ছেড়ে দেবে ? তিলকের বুড়ী-মা অক্কা পেলেই হাতে-পায়ে ধ'রে ওকে ফিরিয়ে আনবে না ?

মুক্তা ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] না, ফিরে সে আসবে না।

হারাধন ॥ আসবে না কি গো ? আমরাই আনবো। আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটার দাঁড়িয়ে যাবার মুখে এমন ক'রে হোঁচট খাবে ?

মুক্তা ॥ হোঁচট খাবে কেন ? মায়ার চেয়ে আমি কম কিসে ? চেহারায় ?

হারাধন ॥ না।

মুক্তা ॥ অভিনয়ে ?

হারাধন ॥ না।

মুক্তা ॥ নাচে ? গানে ?

হারাধন ॥ তাও না।

মুক্তা ॥ তবে ? আজ মিউজিক ডিরেক্টার মায়াকে তুলে ধরেছে ব'লেই মায়া আজ মায়া। আর তুমি সামান্য সিফটার ব'লেই আমার এ দুর্গতি। [ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

হারাধন ॥ মুক্তো—মুক্তো—

মুক্তা ॥ সারাটা জীবন তোমার মুখ চেয়েই ব'সে আছি। আমার জীবনের সকল আশা—সকল স্বপন তুমি যে এমন ক'রে চুরমার করবে —এ আমি কখনো ভাবি নি—ভাবতেই পারি নি।

হারাধন ॥ মুক্তো—মুক্তো। শোন—শোন—

মুক্তা ॥ তোমার কথা ঢের শুনেছি। জীবনে একটিবার তুমি আমার কথা শুনবে ?

হারাধন ॥ বল।

মুক্তা ॥ আমি চাই—মায়া আর ফিরে না আসে। আসতে চাইলেও আর অভিনয় করতে যেন না পারে। আমি বলছি—এ ব্যবস্থা তুমিই করতে পারো। হ্যাঁ, তুমি—তুমি। সিফটার ব'লেই তুমি তা পারো। রূপে গুণে মায়ার চেয়ে আমি এতোটুকু কম নই,—এ যদি তোমার মনের কথা হয়, তোমার কো-অপারেটিভ থিয়েটারের কোনও ক্ষতি না ক'রেও আমার জন্যে এটুকু কি তুমি করবে না ?

হারাধন ॥ তুমি বল। কি করতে হবে বল।

মুক্তা ॥ আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—আজ তোমাকে বলছি শোনো: মায়া সুদর্শনা সেজেছে। ভরতমুনির আশ্রমে মেঘ-আবাহন ক'রে নাচছে, গাইছে। দর্শকরা তন্ময় হয়ে দেখছে। কিন্তু এ কি!···নাচতে নাচতে সুদর্শনা হঠাৎ তলিয়ে গেল কেন অমন আর্তনাদ ক'রে? দর্শকরা চমকে উঠলো। স্টেজের ভেতরের লোকেরা স্টেজের ওপর ছুটে এলো—সকলের গোলমাল আর চিৎকারে শেষে ড্রপ-সিন ফেলতে হ'ল।

হারাধন ॥ ব্যাপার কি মুক্তো ? ব্যাপার কি ?

মুক্তা ॥ স্টেজের লোকেরা এসে দেখে স্টেজের মাঝামাঝি জায়গায় একখানা কাঠ আলগা ছিল—একেবারে আলগা—স্ক্রু-বল্টু খুলে ফেলে কে যে কাঠখানা ওখানে ওভাবে রেখেছিল তার খোঁজ কেউ পেলো না। ওই আলগা কাঠের ওপর নাচতে নাচতে যেই মায়ার পা পড়েছে, অমনি গেল সে তলিয়ে। আর···তলিয়ে গেল জন্মের মতো।

হারাধন ॥ মুক্তো—মুক্তো! এ স্বপ্ন তুমি কেন দেখলে ?

মুক্তা ॥ তুমি সার্থক করবে ব'লে—তুমি সার্থক করবে ব'লে।

তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

———

তৃতীয় দৃশ্য

★ এই দৃশ্য অপরিহার্য্য নয়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত "জীবন-মরণ" নাটিকার ভরতমুনির আশ্রমদৃশ্য অভিনয় হইতেছে। শ্রীহর্ষের ভূমিকায় তিলক চৌধুরীর পরিবর্তে অশোক চক্রবর্তীর অভিনয় ভিন্ন অন্য কোনও পরিবর্তন হয় নাই। ভরতমুনি কর্তৃক স্তোত্র উচ্চারণের পরেই শ্রীহর্ষের বংশী সহযোগে সুদর্শনার নৃত্য-গীত শুরু হইল। ক্ষণকাল পরেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। ষ্টেজের উপরকার একটি আলগা কাঠ সরিয়া যাওয়ায়

নৃত্যরতা সুদর্শনা স্টেজনিম্নস্থ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার আর্তনাদে দর্শকগণ চমকিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—স্টেজ-অভ্যন্তরস্থ লোকজনও। প্রম্পটার পুঁথি-হস্তে ছুটিয়া স্টেজের উপর আসিল। ছুটিয়া আসিল মিস্টার হারাধন ছুটিয়া আসিল ম্যানেজার শঙ্কর সেন ও তাহার অন্যান্য কর্মিগণ। প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চে কোলাহল উঠিল—]

—"কি হ'ল?" —"ব্যাপার কি?" —"কি সর্বনাশ!" —"সুদর্শনা প'ড়ে গেছে।" —"প'ড়ে গেছে কি, নিচে একেবারে তলিয়ে গেছে।" —বেঁচে আছে তো?" —"বাঁচবার কথা নয়।" —"নামো, নামো। কয়েকজন নিচে নেমে পড়।" —"ডাক্তার ডাকো—ডাক্তার ডাকো—" —অ্যাম্বুলেন্সে ফোন কর।"

[উন্মত্তবৎ শঙ্কর সেনের প্রবেশ।]

শঙ্কর ॥ আমি জানতে চাই—কার এই কাজ!

হিমালয়। সিন ওঠার একটু আগে আমি দেখেছি, মিস্টার হারাধন ওখানে ব'সে কি করছিল।

শঙ্কর ॥ পুলিশে খবর দাও, আমি কাউকে রেহাই দেব না।

হিমালয় ॥ আমি যাচ্ছি স্যার, কিন্তু ভিড় বেড়ে যাচ্ছে—ড্রপ ফেল—ড্রপ ফেল।

[প্রম্পটার ড্রপ ফেলিবার জন্য হুইসিল দিল। হারাধন হঠাৎ যেন ড্রপের কাছাকাছি আসিয়া আহত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ড্রপ-সিন পড়িয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[তিলকের পল্লীভবনে আনন্দময়ীর শয়নকক্ষ। অন্তিমশয্যায় শয়ন আনন্দময়ী। পাশে উপবিষ্ট তিলক আনন্দময়ীকে ব্যজনরত। ঔষধের গ্লাস হস্তে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান নিস্তারিণী। রাত্রি প্রায় এগারোটা।]

তিলক ॥ মা! নিস্তার-খুড়ী ওষুধ এনেছে খাও।

আনন্দ ॥ তোদের হাতে তো এতোকাল কতো ওষুধই খেলাম। যার হাতে ওষুধ খাওয়া বাকি আছে, এবার সে এসে খাওয়াক। কলকাতার গাড়ি রোজ তো এমনি সময়েই আসে। আজ এখনো আসছে না যে? হ্যাঁ রে তিলক, সে তো আসবেই লিখেছে। কি লিখেছে আর একবার আমায় প'ড়ে শোনা।

[চিঠিখানি উঁহার হাতের মুঠায় ছিল—তিলকের হাতে দিলেন। তিলক চিঠিটি না পড়িয়া পারিল না।]

তিলক ॥ [পাঠ] "অনেকের কাছে অনেক অপরাধই আমি করেছি মা। তার শাস্তিও পেয়েছি। তাই তার সান্ত্বনা আছে। কিন্তু মা, তোমাকে না ব'লে চ'লে এসে তোমার চরণে যে অপরাধ করেছি, তুমি তার শাস্তি না দিয়ে তোমার অনন্ত স্নেহে আমায় ডুবিয়ে দিলে—অভাগিনীকে আবার তোমার বুকে টেনে নিতে চেয়ে। জানি মা, জানি—কুসন্তান যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়। এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে তোমারই পায়ে গিয়ে পড়বো আমি আজ রাত এগারোটার ট্রেনে। আমার অপরাধ যদি তুমি ক্ষমা ক'রে থাকো, তবে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেও না—যেও না মা। একটু সেবা, একটু শুশ্রূষার সুযোগ আমায় তুমি দিও। রাত এগারোটা—রাত এগারোটা—রাত এগারোটায় আজ তোমাকে আমি আবার দেখবো। সময় যেন আমার কাটতে চাইছে না মা।"

আনন্দ ॥ আমারও না। ওরে আমারও না। চুপ সব চুপ! ঐ আসছে।

[ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিবার শব্দ শোনা গেল। কক্ষমধ্যে চরম উৎকণ্ঠা—গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।]

আনন্দ ॥ [হঠাৎ] ওরে, আমার বুকের ভেতর কেমন যেন করছে।

তিলক ॥ সে কি মা!

আনন্দ ॥ কলকাতার গাড়ি যখনই আসে, আমার বুকটা তখনি দুরদুর ক'রে কাঁপে।

নিস্তার ॥ [তিলককে] ওঁর এ ব্যারামটি সৃষ্টি করেছো তুমি। আসবে ব'লেও কতোবার আসো নি। তোমাদের কাছে যা খেলা, আমাদের কাছে যে সেটা কতো মারাত্মক হয় একবার বুঝে দেখ ভাসুরপো।

আনন্দ ॥ নিস্তার ঠিকই বলেছে। তোদের কাছে যা খেলা তাতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যায় রে তিলক—প্রাণ বেরিয়ে যায়। উঃ! এ কি যন্ত্রণা!

তিলক ॥ [উঠিয়া গিয়া কোরামিন আনিয়া] এই কোরামিনটা খেয়ে ফেলো তো মা, শিগগির খেয়ে ফেলো, হাঁ কর—[আনন্দময়ীর মুখে ঔষধ দিয়া] হ্যাঁ, লক্ষ্মী মা। এই—এখনি সেরে যাবে।

[গাড়িটি স্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল।]

আনন্দ ॥ চুপ! ঐ গাড়ি চ'লে গেল। [যেন স্বপ্ন দেখিতেছে] মায়া আমার নিশ্চয়ই এসেছে। আমার জন্যে না জানি কতো রকমের ফল এনেছে। কিন্তু এতো রাতে মেয়েটা একা আসবে কি ক'রে?

নিস্তার ॥ কেন? বুড়ো তো লোকজন নিয়ে, লণ্ঠন নিয়ে স্টেশনে গেছে।

আনন্দ ॥ ঠাকুরপোর সে খেয়াল আছে। কিন্তু তোর কি খেয়াল আছে হারামজাদী যে, ক্ষিধেয় জ্ব'লে-পুড়ে সে আসছে? তা যদি থাকতো, তা হ'লে তার খাবার তুই আমার সামনে এখানে ঢাকা দিয়ে রাখতিস। কদ্দিন পর তার খাওয়াটা আজ আমি বিছানায় ব'সে দেখতে পেতাম।

তিলক ॥ [নিস্তারিণীকে ঈঙ্গিত করিয়া] যাও—যাও শিগগির নিয়ে এসো। [নিস্তারিণীর প্রস্থান]

আনন্দ ॥ তিলক! আমার একটা কথা রাখ্‌, বাবা।

তিলক ॥ কি মা?

আনন্দ ॥ আমার এই চাবিটা নে—সিন্দুকটা খোল্‌। গয়নার ছোট বাক্সটা বের কর। আজ সব গয়নাগুলো ওকে আমি পরাবো। আমার মা-দুর্গাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আমার ভোলানাথ শিবের পাশে দাঁড় করিয়ে একটিবার নয়ন ভ'রে দেখে নেবো। হ্যাঁ রে আমার মন বলছে—আজ না দেখলে আর আমার দেখাই হবে না।

[নীরবে তিলক তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। গয়নার বাক্সটি বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার কাছে রাখিল। ইতিমধ্যে নিস্তারিণীও পঞ্চব্যঞ্জন সমন্বিত খাবারের থালা আনিয়া মেঝেতে রাখিয়া একটি আসনও পাতিয়া দিল, খাবার ঢাকিয়া রাখিল।]

নিস্তারিণী ॥ নাও, পূজোর আয়োজন হয়ে গেছে—এখন দেবী এলেই হয়।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ রে, গাড়ি তো কখন্‌ চলে চ'লে গেল। এখনো সে তো এলো না।

তিলক ॥ এলো ব'লে। ঐ তো কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

[সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। নিস্তব্ধতা—ক্ষণপরে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে যে আসিল, সে তারিণী—একা।]

আনন্দ ॥ এ কি! তুমি একা! আমার মা? আমার মা? [তারিণী মাথা নিচু করিল]

তিলক ॥ আসে নি?

তারিণী ॥ না।

[আনন্দময়ীর কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ বাহির হইল।]

নিস্তার ॥ এ কি! দিদি যে ঢ'লে পড়লো!

[তিলক ছুটিয়া গিয়া তাঁহার নাড়ী ধরিল। নিস্তারিণী আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

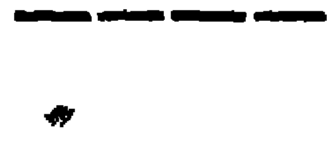
নিস্তার ॥ দিদি—দিদি—

তারিণী ॥ বৌঠান—বৌঠান—!

নিস্তার ॥ [তারিণীকে] ওগো, তুমি যাও ডাক্তার আনো।

তিলক ॥ [নির্বিকারচিত্তে] দরকার নেই, হয়ে গেছে। শেষ—সব শেষ!

———



পঞ্চম দৃশ্য

[মায়ার ফ্ল্যাট। বসিবার ঘরে মায়া পা হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত একখানি শালে আবৃত করিয়া একটি ইজি-চয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে। বাহির হইতে কালীর মার প্রবেশ।]

কালীর মা ॥ দিদিমণি! থ্যাটারের এক বাবু এসেছেন—সেই বাবু গো—ঐ যে—খুব ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলেন—এখন যে তোমার বর সাজে গো!

মায়া ॥ ব'লে দে—দেখা করবার ক্ষমতা আমার নেই। ডাক্তারের বারণ।

কালীর মা ॥ তা কি আর আমি বলি নি? শুনছে কে?

[কালীর মা বাহিরের দরজায় চলিয়া গেল। মায়া পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিল। কালীর মা ফিরিয়া আসিল।]

মায়া ॥ হ্যাঁ রে কালীর মা, তোর তো মেয়ে আছে।

কালীর মা ॥ ঐ কালী গো।

মায়া ॥ তার কি কখনও অসুখ করে নি রে?

কালীর মা ॥ জন্মে অবধিই অসুখ—ভাল থাকলো কবে?

মায়া ॥ সেটা বুঝতে পারছি কালীর মা। যত্ন-আত্তি কিছু করিস না তাই। নইলে, আমাকে তুই ওষুধ-পথ্য দিতে ভুলে যাস!

কালীর মা ॥ [জিভ কাটিয়া] এই দেখ! দিচ্ছি মা—দিচ্ছি।

মায়া ॥ মা হওয়া অতো সোজা নয় রে—অতো সোজা নয়। যে তা হয়, তাকে আর কিছু ব'লে দিতে হয় না। বুঝলি কালীর মা, এমনি মা পেয়েও আমি পাই নি—আমি হারিয়েছি।

[কালীর মা ঔষধ আনিয়া দিলে মায়া তাহা সেবন করিল।]

হ্যাঁ রে কালীর মা, তুই ঠিক জানিস—সেই যে সেদিন আমাকে

দেশে নিয়ে যেতে এসেছিলেন—সেই যাঁর হাতে আমি চিঠি লিখে পাঠাতাম—সেই লোকটি—তারপর আর এখানে আসে নি—না রে ?

কালীর মা ॥ না দিদিমণি। আর তো তাকে দেখি নি।

মায়া ॥ দেখ, কালীর মা, তিনি যদি আবার আসেন, যত্ন করে তাঁকে তখন নিয়ে আসবি আমার কাছে। শুধু তাঁকেই আনবি! আর যারা আসবে, সব ফিরিয়ে দিবি—বুঝলি ?

কালীর মা ॥ আচ্ছা গো, আচ্ছা। তাই হবে দিদিমণি—তাই হবে।

[কালীর মা গৃহকার্য্যে যাইতেছিল, কিন্তু বাহিরের দরজায় করাঘাত হওয়াতে সে মায়াকে বলিল—]

ঐ আবার কে এলেন! আর পারিনে বাপু! ভ্যালা আপদ।

[কালীর মা বাহিরে প্রস্থান করিল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া মায়াকে কহিল—]

আর ব'ল না দিদিমণি। কাছা-গলায় এক জোয়ান-মদ্দ দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি ব'লে দিয়েছি—ও ভিক্ষে-টিক্ষে এখানে হবে না। এগিয়ে দেখ বাপু।

মায়া ॥ অঁা! কাছা-গলায়? তুই করেছিস কি কালীর মা? ছুটে যা—ছুটে যা—তাকে নিয়ে আয়। হাতে-পায়ে ধ'রে যেমন ক'রে পারিস তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়।

[কালীর মা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মায়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে দ্বারের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই কালীর মা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—]

কালীর মা ॥ বাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন। ঐ যে আসছেন—আমি একটু শরবত টরবত—

তিলক ॥ ভিক্ষা চাইতে আমি আসি নি মায়া—বরং কিছু দিতে এসেছি।

মায়া ॥ তুমি তো চিরদিন দিয়েই এসেছো।

তিলক ॥ আমি কি দিয়েছি, কি দিই নি—সে কথা আজ থাক। আজ যা দিতে এসেছি, এ দিয়েছেন মা—যাঁর দানে পাত্রাপাত্রের জ্ঞান ছিল না। এই নাও—

তিলক ॥ [হাত-ঘড়ি দেখিয়া] চলি।

মায়া ॥ শোন—দাঁড়াও—

তিলক ॥ কি বলবে বল। আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে—

মায়া ॥ একটু বস। আমার কথা একটু শোনো।

তিলক ॥ আবশ্যক নেই। তোমার কথার কোনও দাম নেই, কারণ তোমার হৃদয় নেই।

মায়া ॥ এ কথা তুমি বলতে পার—আমি জানি, এ কথা তুমি বলবেও।

তিলক ॥ কেন বলবো না?. আমার সঙ্গে তুমি যে খেলাই খেলে থাক, আমার স্নেহময়ী মাকে তুমি ছলনা করলে কোন্ প্রাণে? মুমূর্ষু নেই অভাগিনীর মনে আশার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে—একটি ফুৎকারে আশা-দীপ এমনি করে নিভিয়ে দিতে কি ক'রে পারলে তুমি মায়া? কি অপরাধ করেছিলেন তিনি তোমার কাছে?

মায়া ॥ আমি জানি—আমি জানি—আমার অপরাধের ক্ষমা নেই।

তিলক ॥ ক্ষমা নেই? শেষনিঃশ্বাসেও যে তিনি তোমায় আশীর্বাদ ক'রে গেছেন সে আশীর্বাদ—তোমার ওই বুকে।

[গহনার বাক্স দেখাইয়া দিল। মায়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

তিলক ॥ আজ কাঁদবার কথা তোমার নয় পাষাণী! সারা জীবন কাঁদতে হবে আমাকে। বিদায়— [প্রস্থানোদ্যত]

মায়া ॥ ওগো—দাঁড়াও—শোনো। আর একটি কথা শোনো। [তিলক ঘুরিয়া দাঁড়াইল] তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—একটিবার আমার কাছে এসো।

তিলক ॥ [আত্মস্থ হইয়া] কেন?

মায়া ॥ আমায় তুলে ধর। তোমাকে আমার শেষ প্রণাম করতে দাও।

[মায়া নিজেই উঠিতে গেল। শালটি তাহার দেহ হইতে পড়িয়া গেল। দেখা গেল, তাহার একখানি পা আগাগোড়া প্লাস্টার-ব্যাণ্ডেজে আবৃত। তিলক দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মায়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তিলক ছুটিয়া গিয়া মায়ার হাত দুইখানি ধরিল। মায়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনমতে দাঁড়াইল।]

তিলক ॥ এ কি! এ কি মায়া!

মায়া ॥ এই অ্যাক্সিডেণ্ট—এই অ্যাক্সিডেণ্টের জন্যেই আমি সে রাত্রে যেতে পারি নি।

তিলক ॥ মায়া—

[মায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। মায়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

[দরজায় আঘাত।]

মায়া ॥ ওই আবার কে এসেছে! আমাকে বসিয়ে দাও তিলকদা, শালটা দিয়ে আমার গা'টা ঢেকে দাও। এ চেহারা মানুষকে দেখাতে আমার লজ্জা হয়। [মায়া কাঁদিতে লাগিল।]

তিলক ॥ তোমার সকল লজ্জা আমি ঢেকে দেবো মায়া।

[তিলক মায়াকে পূর্বের মতো ইজিচেয়ারে শোয়াইয়া দিয়া ঢাকিয়া দিল। ইতিমধ্যে কালীর মা বাহিরের দরজায় ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল।]

কালীর মা ॥ থ্যাটারের সব বাবুরা—

মায়া ॥ কতোবার ওঁরা আমায় দেখতে এসেছেন, কিন্তু আমি দেখা করি নি। আজ তুমি এসেছো, আমার লজ্জানিবারণ—আমার সকল লজ্জা ঘুচে গেছে। হ্যাঁ, এবার ওদের নিয়ে আয় কালীর মা। তুমি আমার পাশে বোসো—আমার মাথায় তোমার হাতখানি রাখো। [কালীর মার প্রস্থান।]

[তিলক মায়ার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। শঙ্কর সেনের নেতৃত্বে "জীবন-মরণ নাটকের সকল শিল্পী ও কর্মী সশ্রদ্ধচিত্তে ধীর পদক্ষেপে পরম সহানুভূতি সহকারে কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। তিলক উঠিয়া দাঁড়াইল। কালীর মা ভিতরে গেল।]

★ সময় সংক্ষেপার্থ পরবর্তী অংশ অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইতে পারে।

শঙ্কর ॥ এই যে তিলক! মাকে হারিয়েছো শুনেছি—আমরাও মায়াকে হারাতে বসেছিলাম। আজ যখন তুমি এসে গেছো—আমরা নিশ্চিন্ত। বোধহয় সব শুনেছো?

তিলক ॥ শুনেছি শঙ্করদা। দুঃখ এই, মায়া আর অভিনয় করতে পারবে না। আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটারের এ যে কতো বড়ো ক্ষতি, এও বুঝেছি শঙ্করদা। তবু বলবো, ও যে আজ বেঁচে আছে, এই আমার মহাভাগ্য। মাকে হারিয়ে যদি আমি ওকেও হারাতাম, তবে কী নিয়ে আমি বেঁচে থাকতাম, শঙ্করদা?

মায়া ॥ কিন্তু এমন বোঝা হয়ে বাকী জীবন কাটানোর চেয়ে আমি মরলাম না কেন শঙ্করদা?

শঙ্কর ॥ তুমি আমাদের বোঝা নও মায়া—তুমি আমাদের শক্তি। তোমার জন্যেই আমাদের কো-অপারেটিভ থিয়েটারে নাম করেছে—দাঁড়িয়ে গেছে।

রূপেন ॥ রামকৃষ্ণ নাট্যপীঠ সমবায় সমিতি আপনার এই দান কখনও ভুলবে না মায়া দেবী। আর তার নিদর্শনস্বরূপ—সমবায় সমিতি আপনাকে invalid pension মঞ্জুর করেছেন। এ pension যতোই ক্ষুদ্র হোক্ আপনার সহকর্মী সমবায়ী শিল্পীদের এই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করবেন—এ আশা আমরা করবো। এই নিন্ মায়া দেবী।

[মায়ার হস্তে একখানি চেক দিল। মায়া তাহাদিগকে নমস্কার জানাইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে চেকখানি গ্রহণ করিয়া বুকে রাখিল। নেপথ্যে দরজায় করাঘাত। কালীর মা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই কক্ষে প্রবেশ করিল জনৈক পুলিস ইন্সপেক্টর ও তাহার অনুচর।]

ইন্সপেক্টর ॥ খবর পেলাম, আপনারা সবাই এখানে শঙ্কর বাবু! বুঝলাম, মায়া দেবী কিছুটা সুস্থই হয়েছেন। সেদিনকার দুর্ঘটনা সম্পর্কে মায়া দেবীকে আরো দু'একটা কথা আমার জিজ্ঞাসার আছে। উত্তর পেলেই investigation আমার শেষ হবে। জিগগেস করবো?

শঙ্কর ॥ করুন না।

ইন্সপেক্টর ॥ মায়া দেবী! আপনি সেদিন হাসপাতালে বলেছিলেন সিফ্‌টার হারাধনবাবুর সঙ্গে আপনার কোনও শত্রুতা নেই।

মায়া ॥ না, নেই।

ইন্সপেক্টর ॥ আমার আজকের জিজ্ঞাসা হচ্ছে, থিয়েটারে আপনার আর কেউ শত্রু আছেন,—যিনি স্টেজের ঐ কাঠখানা আল্‌গা ক'রে আপনাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন ব'লে আপনার মনে হয়?

মায়া ॥ না, আমার কোনও শত্রু নেই।

ইন্সপেক্টর ॥ আমারও আর তবে কিছু জিজ্ঞাসার নেই। হিমালয়বাবু স্বচক্ষে দেখেছিলেন, নাচের সীনের ঠিক একটু আগে হারাধনবাবু অন্ধকারে একটা কাঠের উপর কী ঠক্ ঠক্ শব্দ করছিলেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান ক'রেও আমি এমন কোন evidence পেলাম না—যা থেকে মনে হ'তে পারে এই দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্যে হারাধনবাবুর কোনও motive—মানে মতলব ছিল। সিফ্‌টার হিসেবে প্রতি সীনেই হারাধনবাবুকে হাতুড়ি ঠুকতেই হয়, সেদিনও ঠুকেছেন—তিনি তা স্বীকারও করছেন। কিন্তু তাঁর কোনও Criminal motive—মানে বদ মতলব ছিল এ প্রমাণ আসছে না। কাজেই আমরা নিঃসন্দেহ যে এই হিমালয় চাটুজ্জেদের মতো অভিনেতাদেরই পায়ের দাপটে স্ক্রুগুলো হয়তো আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, আর তাতেই এই accidentটা ঘটেছে। হ্যাঁ, এটা accident—এই রিপোর্টই আমি দিচ্ছি। আচ্ছা নমস্কার—

[ইন্সপেক্টর প্রস্থানোদ্যত, সাজাহান চিৎকার করিয়া উঠিল।]

সাজাহান ॥ দাঁড়ান—দাঁড়ান—ইন্সপেক্টার সাহেব। Motive—মানে মতলব আপনি খুঁজে পান নি। কিন্তু আমি পেয়েছি।

ইন্সপেক্টার ॥ কী পেয়েছেন?

সাজাহান ॥ ওই সিফ্‌টার হারাধনের motive ছিল। আর সে motive জুগিয়েছিল আমারই মেয়ে ওই মুক্তা।

মুক্তা ॥ [ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া] বাবা ! বাবা !

সাজাহান ॥ [মায়ার দেহ হইতে শালখানি টানিয়া তুলিয়া] চেয়ে দেখ্, রাক্ষসী, তুই কী করেছিস্ ! হিংসায় ঈর্ষায় তুই ওকে খোঁড়া করেছিস্ ঐ হারাধনের সাহায্যে। কিন্তু তুইতো শুধু ওকে খোঁড়া করিস্ নি—আমাদের এতোগুলো লোকের অন্ন যোগাচ্ছিল যে কো-অপারেটিভ থিয়েটার—তাকে তুই খোঁড়া করেছিস। ইন্সপেক্টার সাহেব, আমার এই হিংসুটে মেয়ের মতলব ছিল—মায়াকে এমনি করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে—মায়ার পার্ট ও নেবে। তাই হারাধনের সাহায্যে—

মুক্তা ॥ [আর্তকণ্ঠে] বাবা !

সাজাহান ॥ না, না, মেয়ে ব'লে আমি তোকে রেহাই দেবো না। ইন্সপেক্টার সাহেব, আমি বাপ—বাপ হয়ে নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে আমি যখন এই অভিযোগ আনছি, তখন আপনিও এদের রেহাই দেবেন না। বিচারে আমি প্রমাণ ক'রে দেব এদের পাপের তুলনা নাই। এরা দু'জনে আমাদের মন্দিরের ভিৎটাই আজ ভেঙে দিয়েছে—যে মন্দির গ'ড়ে উঠছিলো আমাদের এতো লোকের সেবায়, সাধনায়, তপস্যায়।

[ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে তাহার অনুচরবর্গ মুক্তা ও হারাধনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

—যবনিকা—